খুতবাতে মসরূর

প্রথম খণ্ড

(২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের জুমুআর খুতবার সংকলন)

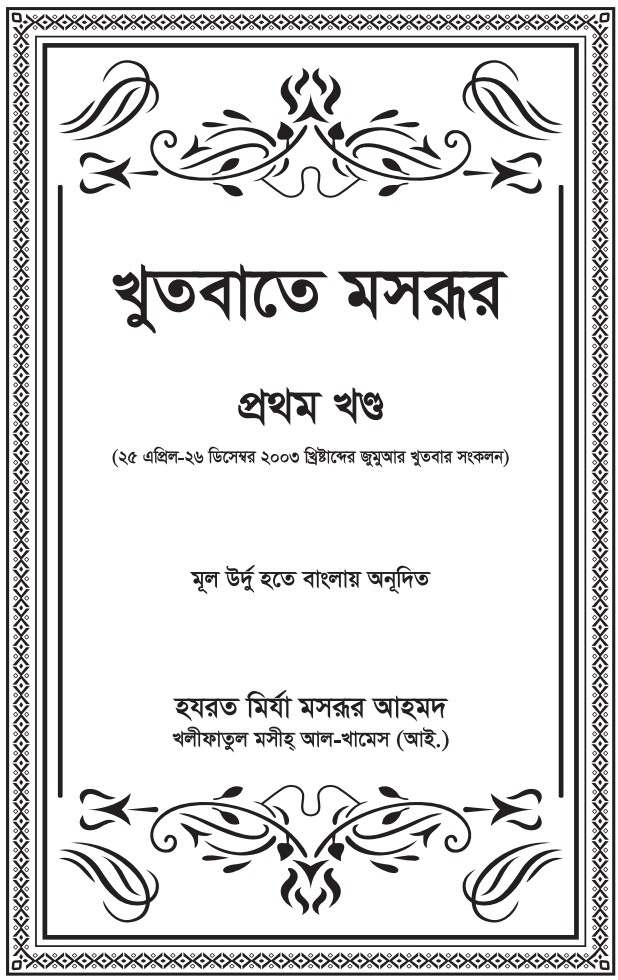
মূল উর্দু হতে বাংলায় অনূদিত

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)

খুতবাতে মসরূর

প্রথম খণ্ড

(২৫ এপ্রিল-২৬ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের জুমুআর খুতবার সংকলন)



প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

খুতবাতে মসরূর

প্রথম খণ্ড

(২৫ এপ্রিল-২৬ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের জুমুআর খুতবার সংকলন)

গ্রন্থস্বত্ব | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায় | আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

মূল | হযরত মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)

ভাষান্তর | মওলানা মামুন-উর-রশীদ

প্রকাশকাল | প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২৬

সংখ্যা | ১০০০ কপি

মুদ্রণে | বাড-ও-লিভস্
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Khutbat-e-Masroor
Vol: 1
2003

খুতবাতে মসরূর
(১ম খণ্ড)
২০০৩

by **Hazrat Mirza Masroor Ahmad** aba
Khalifatul Masih the V

Translated into Bangla by
Maulana Mamun-ur-Rashid

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

1st Bangla translation published in June 2026

©Islam International Publications Ltd., U.K.

ISBN 978-984-991-279-8

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ২০০৩ সালের ১৯ এপ্রিল খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, নবুওয়তের কল্যাণ মানুষ নিজ নিজ যুগে ঐশী খিলাফতের মাধ্যমে লাভ করতে সক্ষম। এজন্যই এ পদকে খিলাফত বলা হয়।

খলীফাগণ যুগ-উপযোগী নির্দেশনা প্রদান করে খুতবা প্রদান করেন, যা আমাদের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পাথেয় হয়ে থাকে। হুযূর (আই.)-এর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের সময় থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত প্রদত্ত খুতবাসমূহের ওপর ভিত্তি করে খুতবাতে মসরূর-এর প্রথম খণ্ডটি সংকলিত হয়েছে। এ খণ্ডে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির পাশাপাশি বয়আতের ৪টি শর্ত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক আহমদীর জন্য এগুলো ভালোভাবে অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করা একান্ত আবশ্যক। পরবর্তী খণ্ডে বয়আতের অন্যান্য শর্ত বিষয়ে প্রদত্ত খুতবার অনুবাদ থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে রেফা: বিডিএল-১৪৯২/১৪ সংবলিত একটি পত্রের মাধ্যমে হুযূর (আই.) বাংলাদেশের কয়েকজন মুরব্বী সাহেবকে সাল অনুযায়ী খুতবাতে মসরূর-এর বিভিন্ন খণ্ড অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইতিপূর্বে খুতবাতে মসরূর-এর ত্রয়োদশ খণ্ড তথা ২০১৫ সালের খুতবাগুলো অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এবার খুতবাতে মসরূর-এর প্রথম খণ্ড তথা ২০০৩ সালের খুতবাগুলো অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। মরকযী বাংলা ডেস্কের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে এটির অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন মওলানা মামুন-উর-রশীদ, ওয়াকফে যিন্দেগী।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের জন্য এ কাজকে বরকতময় করুন এবং অনুবাদক-সহ যারা-ই একাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

ওয়াস্সালাম

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

ঢাকা
জুন ২০২৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের পক্ষে নিবেদন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) এর অনুমোদনক্রমে মরকযী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে জামা'তের বিভিন্ন বই-পুস্তকের অনুবাদের কাজ চলমান রয়েছে । এরই ধারাবাহিকতায় **'খুতবাতে মসরূর (১ম খণ্ড)-২০০৩'** বহুপূর্বে অনূদিত হলেও অন্যান্য অনুবাদের ভিড়ে এ কাজটি বিলম্বিত হতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ্, এখন মওলানা মামুন-উর-রশীদ সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, যিনি এ সংকলনের অনুবাদ প্রস্তুতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন– আমরা বইটি ছেপে পাঠকদের হাতে তুলে দেবার মতো অবস্থানে রয়েছি। অনুবাদ পরিমার্জন এবং এর মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে খাকসারের সাথে লন্ডন, ঢাকা এবং জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত কর্মীদের একটি দল নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সবার সম্মিলিত প্রয়াসে পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাই সংশ্লিষ্ট সবার জন্য বিনীতভাবে দোয়ার অনুরোধ করছি। আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে বলছি– আমরা পাঠকদের সামনে যথাসাধ্য সহজবোধ্যরূপে অনুবাদ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। কোথাও যদি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে থাকে এর জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস গ্রহণ করুন। আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। এ পুস্তকটি সত্যের অনুসন্ধানীদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে উঠুক। আল্লাহ্ তা'লা হুযূর আনোয়ার (আই.), অনুবাদক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভে সুরভিত করুন আর আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, আমীন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব পুস্তকটি প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাই আমরা তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ওয়াসসালাম
খাকসার

ফিরোজ আলম
ইনচার্জ
মরকযী বাংলা ডেস্ক

ইউকে
জুন ২০২৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যুগের আহ্বান

আমাদের পরম সৌভাগ্য, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যুগ-ইমামকে চেনার তৌফিক দান করেছেন এবং এটি সম্পূর্ণ তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়া যে, তিনি আমাদেরকে খিলাফত ব্যবস্থানার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাদেরকে এমন একজন খলীফা দান করেছেন যিনি আমাদের জন্য নিজের অন্তরে দরদ রাখেন, আমাদের জন্য ভালোবাসা পোষণ করেন। এ সৌভাগ্যের জন্য যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক না কেন, তা কম হবে। আর এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি অন্যতম উপায় হলো– আমরা যুগ-খলীফার বাণী তথা দিকনির্দেশনা শুনব এবং এর ওপর আমল করব। এর ফলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হয়। যুগ-খলীফার আহ্বান মূলত যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হয়ে থাকে। ঐশী সাহায্য ও সমর্থন সর্বদা তাঁর সঙ্গী হয় এবং খোদা তা'লার গুণাবলি তাঁর মাঝে প্রতিফলিত হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সানী (রা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যাকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন, তাকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী জ্ঞানও দান করেন এবং তাকে নিজের গুণাবলিতে গুণান্বিত করেন।" (আল-ফুরকান, মে-জুন ১৯৬৭, পৃ. ৩৭)

তিনি (রা.) আরো বলেন, "খিলাফতের অর্থই হলো, যে মুহূর্তে খলীফার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় তখন সমস্ত পরিকল্পনা, সব প্রস্তাব এবং সকল চেষ্টাপ্রচেষ্টা বন্ধ করে দিতে হবে আর বুঝতে হবে, এখন কেবল সেই প্রকল্প, সেই প্রস্তাব এবং সেই চেষ্টাপ্রচেষ্টাই কার্যকর ও উপকারী সাব্যস্ত হবে যে বিষয়ে যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে আদেশ হয়েছে। জামা'তের মাঝে যতদিন এই মনমানসিকতা সৃষ্টি না হবে ততদিন সব খুতবা অকার্যকর, সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ আর সকল চেষ্টাপ্রচেষ্টা নিরর্থক।" (জুমুআর খুতবা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৬; আল-ফযল, ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৬-এ প্রকাশিত)

জামা'তের সদস্যদের জ্ঞানগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের কথা বিবেচনা করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর খুতবাসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রথম খণ্ডটি হুযূর (আই.)-এর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের সময় থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত প্রদত্ত খুতবাসমূহের ওপর ভিত্তি করে সংকলিত হয়েছে। এসব খুতবা আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন-এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। কেবল এতটুকু পরিবর্তন রয়েছে–

১) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতির মূলপাঠকে প্রকৃত উদ্ধৃতি অনুযায়ী পরিমার্জিত করা হয়েছে।

২) গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতিগুলো পূর্ণাঙ্গ এবং বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের জন্য এ কাজটিকে বরকতময় করুন এবং সেসব সুহৃদকে উত্তম প্রতিদান দিন, যারা এ কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আমীন।



সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)



সূচিপত্র

খুতবা নম্বর	খুতবায় আলোচিত বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা
(০১)	**হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি সর্বদার ন্যায় তোমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজ জামা'তের ওপর তোমার ভালোবাসার দৃষ্টি দাও।** ২৫ এপ্রিল ২০০৩, মোতাবেক ২৫ শাহাদাত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'মুজীব'-এর ঈমান উদ্দীপক উল্লেখ। * যারা দোয়ার আশ্রয় নেয়, আল্লাহ্ তাদের জন্য কোনো না কোনো পথ খুলে দেন। * তোমরা যদি সুখে থাকতে চাও, আর যদি চাও তোমাদের ঘরে শান্তি বিরাজ করুক তাহলে অনেক বেশি দোয়া করো। * যে ঘরে সর্বদা দোয়া করা হয়, খোদা তা'লা সে ঘর ধ্বংস করেন না। * আল্লাহ্ করুন, আপনাদের কষ্ট যেন আমার কাছে আমার নিজের কষ্টের চেয়ে অধিক অনুভূত হয়। * আল্লাহ্ তা'লা এই সুন্দর জামা'তে কখনো যেন অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। * নেযামে খিলাফত...। আল্লাহ্র রজ্জু...। কল্যাণমণ্ডিত পথ। * খিলাফত এক পবিত্র বৃক্ষ...। তিনি আহমদীয়া খিলাফতকে কখনো ধ্বংস হতে দেবেন না। * নেযামে জামা'ত এবং নেযামে খিলাফতের এক পবিত্রতা।	১-৯

(০২)	**আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় জামা'তকে খুব ভালোবাসি।** ০২ মে ২০০৩ মোতাবেক ২ হিজরত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * দোয়া ছাড়া একজন মুমিন এক মুহূর্তের জন্যও জীবন অতিবাহিত করার কথা চিন্তাই করতে পারে না। * হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় জামা'ত...। আজ সারা পৃথিবীতে এই জামা'ত ছাড়া অন্য কোথাও এর বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যাবে না। * দোয়া ও প্রশংসার মাধ্যমে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনের অঙ্গীকার। * আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। * এমটিএ-র নিয়ামত। * আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই প্রিয় জামা'তকে খুব ভালোবাসি।	১০-১৫
(০৩)	**আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য এমন ভবিষ্যদ্বাণীও পবিত্র কুরআনে আছে যেগুলো ভিন্ন মতাবলম্বীদের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট।** ০৯ মে ২০০৩, মোতাবেক ০৯ হিজরত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'খবীর'-এর অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা। * যাকাতের আবশ্যকতা। * নেযামে খিলাফতের বরকত। * বিশ্ব ব্যবস্থাপনা এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী। * মানবতাকে রক্ষা করার জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। * মহানবী (সা.)-কে 'খবীর' খোদার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিষয়ে অবগত করা। * হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত সংবাদসমূহ। * জামা'ত প্রতিষ্ঠা এবং জামা'তের উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী। * জামা'তে আহমদীয়া ইংল্যান্ড এবং এমটিএ-র কর্মীদের জন্য দোয়া।	১৬-২৫

(০৪)	**নিজেদের ঘরগুলোকে জান্নাতপ্রতীম বানান– নিজেদের পরিবেশে এমন তাকওয়া প্রতিষ্ঠা করুন যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন।** ১৬ মে ২০০৩, মোতাবেক ১৬ হিজরত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'খবীর'-এর বর্ণনা। * বড়ো বড়ো রাজত্ব ধ্বংস হবার সংবাদ। * নিজেদের মাঝে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করুন। * নিজেদের ঘরগুলোকেও জান্নতপ্রতীম বানান। * পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী। * ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের যুগ। * বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও এর রহস্য। * আহমদীয়া জামা'তের ওপর অত্যাচার হবে মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী। * শেষ যুগ এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস। * হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী (মুসলেহ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হলো)।	২৬-৩৬

(০৫)	**উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করা সবচেয়ে বড়ো তবলীগ। আমাদের প্রত্যেকের জন্য আব্যশ্যক– সকল মানবতাকে মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার শিক্ষার পতাকাতলে নিয়ে আসুন।** ২৩ মে ২০০৩, মোতাবেক ২৩ হিজরত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'খবীর'-এর বর্ণনা। * ... নিজের এবং অন্যদের সংশোধন করা আহমদীয়া জামা'তের দায়িত্ব। * ... উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করা সবচেয়ে বড়ো তবলীগ। * ... বংশ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়া মুত্তাকীর শোভা পায় না। * ... বিয়েশাদির বিষয়ে কটাক্ষ করা খুবই অন্যায়। * ... কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং নব নব আবিষ্কার। * ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আগামীতে ভবিতব্য ঘটনাবলি, সা'দুল্লাহ্ লুধিয়ানভী, কাংড়ার ভূমিকম্প।	৩৭-৫২

(০৬)	**ইহকাল ও পরকালের সফলতার গূঢ় রহস্য হলো, মানুষ যেন প্রত্যেক কথা-কাজে স্মরণ রাখে, খোদা তা'লা আমার প্রতিটি কাজ সম্বন্ধে অবগত। এটিই তাকওয়ার মূল ভিত্তি।** ৩০ মে ২০০৩, মোতাবেক ৩০ হিজরত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... খোদা তা'লার সত্তা বহু পর্দার অন্তরালে। কোনো মস্তিষ্ক তা আবিষ্কার করতে অক্ষম। * ... ইহকাল ও পরকালে সফলতার একটি গূঢ় রহস্য হলো, মানুষ যেন আগামীকালের চিন্তা আজ করে। * ... মুমিনের উচিত, যে কাজ সে করবে তার পরিণতির ব্যাপারে যেন প্রথমে চিন্তা করে নেয়। * ... মেয়েদের ওপর শ্বশুরবাড়ির লোক অথবা স্বামীর পক্ষ থেকে অন্যায়-অত্যাচারের বিষয়াদি এবং এর ভুল প্রতিক্রিয়া। * ... আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'বাসীর', 'আলীম' এবং 'খবীর'– এদের পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক। * ... ভবিষ্যৎ যুগের বিষয়ে কুরআনের আগাম সংবাদ, নব নব উদ্ভাবন। * ... খিলাফতে রাশিদা, অতঃপর রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা আর সবশেষে 'খিলাফতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়ত'-এর বিষয়ে সুসংবাদ। * ... চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী। * ... আহমদীয়া জামা'তের সাহায্য ও সমর্থনের বিষয়ে ঐশী প্রতিশ্রুতি।	৫৩-৬৮
(০৭)	**দোয়ার মূলমন্ত্র হলো ধৈর্য। আল্লাহ্ তা'লা 'সামী' (তথা সর্বশ্রোতা) এবং 'আলীম' (তথা সর্বজ্ঞানী)।** ০৬ জুন ২০০৩, মোতাবেক ০৬ এহসান ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'সামী'-এর বিষয়ে ঈমান উদ্দীপক ব্যাখ্যা। * ... কাজের পাশাপাশি দোয়া করা। নবীদের সুন্নত। * ... বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ এবং এর গুরুত্ব ও প্রজ্ঞা। ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া। * ... কখনো দোয়া করতে ভয় করা উচিত নয়। মুমিন কখনো ক্লান্ত হয় না। * ... মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা। * ... চাঁদা আদায় এবং বাজেট নির্ধারণ। * ... সদা সত্য কথা বলুন।	৬৯-৮০

(০৮)	**আমাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলেই তবে আমরা দোয়া করব– এটি আবশ্যক নয়। ভবিতব্য বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পূর্বেই দোয়া করা আবশ্যক।** ১৩ জুন ২০০৩, মোতাবেক ১৩ এহসান ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... আল্লাহ্ তা'লা সবার দোয়া শোনেন, কিন্তু মুমিন সুখে থাকলেও দোয়া করে। * ... কোনো আহমদীর নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং আগামীতেও করবেন, ইনশাআল্লাহ। * ... কুরআনে বর্ণিত উত্তরাধিকার ব্যবস্থাপনা এবং মেয়েদেরকে তাদের উত্তরাধিকার না দেবার পরিণাম। * ... ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তাকওয়া এবং সত্যবচন অধিক কাম্য। * ... বৃথা ও বাজে কসম পরিহার করা। * ... আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'সামী'-সংবলিত মহানবী (সা.)-এর হাদীস। * ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া কবুলিয়তের কয়েকটি ঘটনা।	৮১-৯৪
(০৯)	**ইসলামের শান্তি ও সম্প্রীতির অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রচারণার আকারে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা বর্তমানে আহমদীয়া জামা'তের দায়িত্ব।** ২০ জুন ২০০৩, মোতাবেক ২০ এহসান ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... ইসলামের ওপর বলপ্রয়োগের অভিযোগ আরোপ করা খুবই ঘৃণ্য অপবাদ। * ... ইসলাম ধর্ম শান্তি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দানকারী ধর্ম। * ... ইসলামের শান্তি ও সম্প্রীতির অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রচারণার আকারে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা বর্তমানে আহমদীয়া জামা'তের দায়িত্ব। * ... ইসলামের বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে নয় বরং নিরেট সন্ধি এবং খোদা তা'লা নির্দেশিত কর্মপন্থার মাধ্যমে হয়েছে। * ... বর্তমান যুগ এবং জিহাদের বিষয়ে ভুল চিন্তাধারা। * ... প্রত্যেক আহমদীর আবশ্যকতা দায়িত্ব হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের যে অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রদান করেছেন ... তা নিয়ে ... সেই বাণী সর্বত্র পৌঁছে দেবে।	৯৫-১০২

(১০)	**ভবিষ্যতের জন্য বিরাট সংখ্যায় মুবাল্লিগের প্রয়োজন** ২৭ জুন ২০০৩, মোতাবেক ২৭ এহসান ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... ওয়াকফে নও সন্তানদের তরবিয়তের বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা। * ... জিহাদ সম্পর্কে ভুল চিন্তাধারা এবং এর ভয়াবহ ক্ষতি। * ... সন্তানদের ওয়াকফ করার কল্যাণময় তাহরীক এবং এর উত্তম ফলাফল। * ... আহমদীয়া জামা'তের জ্ঞানগত ও কলমের জিহাদ। * ... তারাই সফল হবে যাদের মাঝে খিলাফত এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে। * ... ওয়াকফে নওদের তরবিয়ত এবং লালন-পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো– বিশ্বস্ততা, পাঁচবেলার নামায আদায়, খাবারের আদব, সত্যের প্রতি ভালোবাসা এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, স্বল্পেতুষ্টি, হাস্যবদন, উন্নত চরিত্র ইত্যাদি। * ... পিতামাতা নিজেদের তরবিয়তও করুন। * ... ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য করা শেখান। * ... জীবন উৎসর্গ করা ... প্রত্যেক যুগে এর চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই। * ... মুবাল্লিগের প্রয়োজনীয়তা ... আর ওয়াকফে নও সন্তানদের পিতামাতার দায়িত্বাবলি।	১০৩-১১৪

(১১)	**সর্বদা দোয়া করতে থাকা উচিত, সন্তানরা যেন পুণ্যবান, সালেহ এবং ধর্মভীরু হয়; কেননা সন্তানের জন্য পিতামাতার দোয়া কবুল হয়।** ০৪ জুলাই ২০০৩, মোতাবেক ০৪ ওফা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... সর্বদা দোয়া করতে থাকা উচিত, সন্তানরা যেন পুণ্যবান, সালেহ এবং ধর্মভীরু হয়। *... নিজেদের জন্য আর নিজ সন্তানদের জন্য, স্ত্রী-সন্তান, আপনজন এবং আমাদের জন্য রহমতের কারণ হয়ে যাও। * ... নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন এবং দোয়ার পাশাপাশি নিজ সন্তান ও স্ত্রীর জন্য দোয়া করতে থাকা উচিত। * ... সন্তানের ক্ষেত্রে কেবল এই আকাঙ্ক্ষা থাকা আবশ্যক, সন্তান যেন ধর্মের সেবক হয়।	১১৫-১২৪

(১২)	**ইমামের ঢালের পেছনে থাকার মাধ্যমে আহমদীয়াতের বিজয় নির্ধারিত।** ১১ জুলাই ২০০৩, মোতাবেক ১১ ওফা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... সর্বাবস্থায় ইমামের আনুগত্য করুন। * ... ইনশাআল্লাহ্ তা'লা, আহমদীয়াতের বিজয় তথা প্রকৃত ইসলামেরই বিজয় হবে। * ... আপনাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারিত ইমামরূপী ঢালের পেছনে থাকুন। * ... মুবাহাসা বা ধর্মীয় বিতর্কের মাধ্যমে শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যই করো, কিন্তু ইমামের ইচ্ছানুযায়ী। * ... উহুদ যুদ্ধের বিস্তারিত উল্লেখ। * ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্য সদা স্মরণ রাখবেন– 'আমি প্রত্যাদিষ্ট এবং আমাকে বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।'	১২৫-১৩৫

(১৩)	**সকল অতিথিকে আবশ্যকভাবে সম্মান দেখিয়ে আতিথির অধিকার প্রদান করুন।** ১৮ জুলাই ২০০৩, মোতাবেক ১৮ ওফা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... অতিথেয়তার মান যা ইসলামী সমাজে দেখা যাওয়া উচিত। * ... নিজ প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। * ... নিজ অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। * ... অতিথিও যদি কোনো ঘাটতি দেখেন তবে যেন বিনম্রভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। * ... একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। * ... কোনো অভিযোগ-অনুযোগ করবেন না। * ... পরস্পর সালাম বিনিময় করুন। * ... হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করুন। * ... মসজিদের আদব ও পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখুন।	১৩৬-১৪৯

(১৪)	**ঈমান, একীন, মারেফাত আর আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও পারস্পরিক পরিচয় বৃদ্ধি করার জন্য জলসায় যোগদান করুন** ২৫ জুলাই ২০০৩, মোতাবেক ২৫ ওফা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... জলসা সালানার গুরুত্ব এবং এতে অংশগ্রহণের কল্যাণ। * ... হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাসদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় হবে। * ... হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় এবং ঐশী সাহায্য-সমর্থনের প্রতিশ্রুতি ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন। * ... এই ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যতেও পূর্ণ হবে এবং হতে থাকবে। * ... জলসার প্রোগ্রামগুলোতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। * ... আমাদের সকল কাজ দোয়ার মাধ্যমেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। * ... অধিকহারে দরূদ ও ইস্তিগফার পড়ার ব্যবস্থা করুন।	১৫০-১৬০
(১৫)	**আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এবং আরো কল্যাণের ভাগীদার হোন** ০১ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ০১ যহুর ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আরো কল্যাণের ভাগীদার হোন। * ... খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় পূর্ণ করেছেন আর জামা'তের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের স্পৃহাকে তিনি মূল্যায়ন করেছেন। * ... অতএব নিজেদের বিশ্বস্ততা, নিজেদের দোয়া আর নিজ প্রভুর সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের স্পৃহা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর কৃপাবারি কখনো থামতে দেবেন না। * ... দোয়া, তওবা এবং দানখয়রাত করতে থাকুন। * ... লন্ডন জলসায় যারা কর্মী হিসেবে সেবাদান করেছেন, তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।	১৬১-১৬৮
(১৬)	**আমানতের অর্থ অনেক ব্যাপক। সব দিক থেকে তা পালন করা আবশ্যক।** ০৮ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ০৮ যহুর ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... আমানতের অর্থ অনেক ব্যাপক এবং সেগুলো পালন করার তাগিদ, যেন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।	১৬৯-১৭৭

	* ... প্রত্যেক আহমদীর জন্য সঠিকভাবে আমানত প্রদান করা আবশ্যক। * ... কর্মকর্তা এবং কর্মীদের কাছে আসা প্রত্যেকটি বিষয় এক একটি আমানত, এক একটি গোপন বিষয়, এটি মানুষের কাছে বলে বেড়ানোর অধিকার নেই। * ... পরামর্শও একটি আমানত। * ... পদবি ও সেবা– এ দুটি খোদা ও তাঁর বান্দার মাঝে একটি অঙ্গীকার বিশেষ।	

(১৭)	**খোদাভরসায় ঘাটতি থাকায় খোদার সাথে দূরত্ব, মিথ্যা, ভুল বর্ণনা এবং তোষামোদের মতো পাপের জন্ম হয়।** ১৫ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ১৫ যহুর ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... খোদা তা'লা সবচেয়ে বেশি তাঁর ওপর ভরসা নিজ নবীদের মাঝে সৃষ্টি করেন। * ... ইসলামের উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সন্ধির ভিত্তি স্থাপন করা। * ... মহানবী (সা.) খোদাভরসার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। * ... মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির ফলে সাহাবীদের (রা.) খোদাভরসার উচ্চমান প্রদর্শন। * ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনে খোদাভরসার দৃষ্টান্ত স্থাপন। * ... স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াবিবাদ খোদাভরসার ঘাটতির কারণে হয়ে থাকে। * ... তাওয়াক্কুল তথা খোদাভরসা এমন একটি বিষয়– যা মানুষকে সফল ও সার্থক জীবন দান করে।	১৭৮-১৯০

(১৮)	**আল্লাহ্ তা'লার রজ্জু ধরে রাখা এবং নেযামের সাথে সংযুক্ত থাকার মাঝেই আপনাদের স্থায়ীত্ব নিহিত।** ২২ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ২২ যহুর ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... নেযামের সফলতা এবং উন্নতি সেই নেযামের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন এবং উক্ত নেযামের নিয়মশৃঙ্খলার পরিপূর্ণ অনুসরণের ওপর নির্ভর করে। * ... জামা'তের নেযামের সাথে সর্বদা যুক্ত থাকুন, কেননা বর্তমানে এটি ছাড়া আপনাদের স্থায়ীত্ব নেই। * ... যারা জামা'তের নেযামকে পরিত্যাগ করে লাভবান হবার উদ্দেশ্যে অন্যত্র যায় তাদের চালাকি এবং তাদের জন্য সাবধানবাণী।	১৯১-২০১

	* ... তোমাদের কাজ কেবল আনুগত্য, আনুগত্য এবং একমাত্র আনুগত্য করা। * ... জামা'তের নেযামের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিদান। * ... এই জলসাকে কোনো জাগতিক মেলার মতো মনে কোরো না।	
(১৯)	**ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। পরিপূর্ণ আনুগত্যই প্রকৃত ধর্ম।** ২৯ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ২৯ যহুর ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... বয়আতের ৭ম ও ৮ম নম্বর শর্ত। অহংকার, দম্ভ পরিত্যাগ করা, নম্রতা, বিনয় এবং উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা। * ... অহংকার কেবল আল্লাহ্ তা'লার ভূষণ। শিরকের পর অহংকারের চেয়ে বড়ো কোনো পাপ নেই। * ... বাড়িতে অহংকার ও অত্যাচারমূলক আচরণকারীদের পরিণাম। * ... অহংকার অনেক ধরনের চারিত্রিক স্খলনের কারণ হয়ে পুণ্যের পথ রুদ্ধ করে দেয়। * ... প্রত্যেক আহমদী একে অপরকে ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন ... আল্লাহ্ তা'লার আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি করতে থাকুন। * ... ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেবার অঙ্গীকার।	২০২-২১৭
(২০)	**মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রত্যেক আহমদীর দরূদ প্রেরণ করার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন** ০৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ০৫ তাবুক ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রত্যেক আহমদীর দরূদ প্রেরণ করার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। * ... এই ওয়াসীলা যদি অবলম্বন করা না হয় তাহলে তোমাদের সকল ইবাদত বৃথা যাবে। * ... "সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদি উলদি আদামা ওয়া খাতামিন নাবিয়্যীন"। * ... দরূদ শরীফের কল্যাণরাজি। * ... আমাদের সকল ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং জামা'তের কল্যাণ, বরকত আর উন্নতি এই ওয়াসীলার সাথে সম্পৃক্ত। * ... জুমুআর গুরুত্ব এবং দরূদ শরীফের সাথে এর গভীর সম্পর্ক।	২১৮-২৩৩

(২১)	**মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন অনেক বড়ো ইবাদত এবং ঐশী সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম।** ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১২ তাবুক ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সকল জীবের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন ...বয়আতের ৯ম শর্তের প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যা। * ... কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে, উপঢৌকন দিতে গিয়ে তার সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। অঙ্গসংগঠনগুলোও এ বিষয়ে মনোযোগী হোন। * ... রোগী দেখতে যাওয়া, অন্যের কষ্টের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং ক্ষমা করা ...। * ... স্মরণ রাখবে! খোদা তা'লার আদেশ দুটি। প্রথমত, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং দ্বিতীয়ত, মানবসেবা করবে। * ... সৃষ্টির সেবায় বেশি বেশি অংশগ্রহণ করা জামা'তে আহমদীয়ার বৈশিষ্ট্য। * ... আহমদী শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা দরিদ্র এবং অভাবীদের সাহায্য করুন। আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাদের সহায়সম্পদ এবং সন্তানসন্ততির মাঝে বরকত দেবেন, ইনশাআল্লাহ্‌।	২৩৪-২৪৬
(২২)	**হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা।** ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১৯ তাবুক ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা ...। বয়আতের শেষ (অর্থাৎ ১০ম) শর্ত। * ... যুগ-খলীফার দিকনির্দেশনার অনুসরণ করা তোমাদের কাজ আর এই সম্পর্ক আল্লাহ্‌র খাতিরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং আনুগত্যের স্বীকারোক্তির সাথে সম্পৃক্ত। * ... মারূফ (ন্যায়সংগত) এবং গয়ের মারূফ (অসংগত) সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা নিয়ে পড়ে থাকবেন না। * ... মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা এবং তাঁর জীবন উৎসর্গকৃত সাহাবীদের উত্তম আদর্শ দৃষ্টিপটে রেখে জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করুন। * ... বিরোধীদের নোংরামির কোনো পরোয়া করবেন না।	২৪৭-২৫৮

	* ... বান্দা যখন প্রতিবাদ না করে তখন খোদা প্রতিবাদ করেন আর খোদা যখন প্রতিবাদ করেন তখন আমরা বিরোধীদেরকে টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি এবং ভবিষ্যতেও দেখব। * ... আপনারা সৌভাগ্যবান! কেননা আপনারা যুগ-ইমামকে মেনেছেন। * ... পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করুন এবং মতবিরোধ পরিত্যাগ করুন।	

(২৩)	**তোমাদের জন্য সুসংবাদ, কেননা এখন তোমরা সর্বদা মারূফ ফয়সালার (তথা ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তের) অধীনে রয়েছ।** ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ২৬ তাবুক ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... বয়আতের দশম শর্ত "ন্যায়সংগত নির্দেশের আনুগত্য"– এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ। * ... যে কাজ আমাদের মতে ন্যায়সংগত নয়, আমরা সেটি পালন করব না– এটি অন্যায়। * ... খিলাফত ব্যবস্থাপনা– যা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে জামা'তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। * ... খিলাফতের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব এবং ঐশী সাহায্য-সহযোগিতা। * ... খিলাফতের পক্ষ থেকে প্রদত্ত তাহরীক ...। এ সবকিছু "ন্যায়সংগত নির্দেশের আনুগত্য"– এর অধীনে। * ... তোমাদের জন্য সুসংবাদ, কেননা এখন তোমরা সর্বদা মারূফ ফয়সালার (তথা ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তের) অধীনে রয়েছ। * ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বয়আতের শর্তের ওপর আমলকারীদের উত্তম আদর্শ।	২৫৯-২৭২

(২৪)	**মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য ভবনের সাথে নয়, বরং নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত।** ০৩ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ০৩ ইখা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... মসজিদ বায়তুল ফুতুহ উদ্‌বোধন। * ... আল্লাহ্ করুন, এই মসজিদ সর্বদা ইউরোপে ইসলামের সন্ধি, শান্তি এবং পুনর্মিলনের শিক্ষার চমৎকার আদর্শ উপস্থাপন করে।	২৭৩-২৮৭

	* ... এজন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, এই নবজীবন দানকারীদের মাঝে আপনারাও গণ্য। * ... মসজিদে তাকওয়ার সৌন্দর্য নিয়ে যাও, এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত।	
(২৫)	**কাঠিন্যের সময়ও খোদা তা'লার কাছে কোনো অভিযোগ-অনুযোগ করবে না, খোদার কৃপা যাচনা করতে হবে এবং তাঁর সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।** ১০ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ১০ ইখা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... আহমদীয়াত কবুল করার পর পুণ্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ। * ... সন্তানদের মৃত্যুতে অবাক করার মতো ধৈর্য ও অবিচলতার ঈর্ষণীয় দৃশ্য। * ... বিরোধীদের লাঞ্ছনাকর ব্যবহার কৃতজ্ঞচিত্তে কবুল করা। * ... ধূমপান পরিত্যাগ করুন। এটি দাজ্জালের বিছানো জাল। * ... লটারি, জুয়া ইত্যাদি কখনো বৈধ নয়, বরং হারাম...। * ... বিনয়, নম্রতা আর উত্তম আচরণকারী। এছাড়া আহমদীদের চিত্তাকর্ষক ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনা। * ... হে শেষ যুগের মসীহ্! আপনার জন্য সুখবর। আপনি আপনার জামা'তের কাছে যা প্রত্যাশা করেন, আপনার প্রিয় জামা'ত তা পূর্ণ করেছে ...।	২৮৮-৩০৬
(২৬)	**জামা'তের সদস্যরা মানবসেবা এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছে।** ১৭ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ১৭ ইখা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... আহমদীয়া জামা'ত আন্তরিকতার সাথে মানবসেবার কাজ করেছে। * ... ডাক্তারদের স্থায়ী ও অস্থায়ী ওয়াকফ করার তাহরীক। * ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের মানবসেবার ঘটনা। * ... আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে মানবসেবার বিষয়ে অআহমদীদের স্বীকারোক্তি।	৩০৭-৩২১

(২৭)	**রোযা ঢালস্বরূপ আর এর প্রতিদান স্বয়ং খোদা তা'লা।** ২৪ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ২৪ ইখা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... বরকতময় রমযান মাসের কল্যাণরাজি এবং বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলের তত্ত্বপূর্ণ বর্ণনা। * ... রোযার উপকারিতা এবং কল্যাণের উল্লেখ। * ... পবিত্র কুরআনের বিরাম স্থানে থামা-ও তাকওয়া। * ... মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তি যেন রোযা না রাখে। * ... সর্বদা তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে রোযা রাখা বা না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। * ... রমযান মাসে নামায, তাহাজ্জুদ এবং নফল ইবাদতের বিষয়ে যত্নবান হোন এবং সম্পূর্ণ কুরআন একবার পড়ে শেষ করুন।	৩২২-৩৩৫
(২৮)	**রোযা হলো তাকওয়া, দোয়া কবুলিয়ত এবং খোদার সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম।** ৩১ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ৩১ ইখা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... রমযানের গুরুত্ব, ইবাদত এবং তিলাওয়াতের বিষয়ে যত্নবান হওয়া আর যেখানে দরসের ব্যবস্থা আছে সেখানে দরস শোনার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। * ... হৃদয়কে আলোকিত করার এটি একটি উত্তম মাস। * ... অধিকহারে পবিত্র কুরআন পাঠ করা আবশ্যক এবং এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার ওপর আমল করা উচিত। * ... রমযান মাস অতি কল্যাণমণ্ডিত মাস। এটি দোয়া করার মাস। * ... দোয়ার দর্শন, বৈপ্লবিক প্রভাব এবং শর্তসমূহ। * ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি দোয়া।	৩৩৬-৩৪৮
(২৯)	**আল্লাহ্ তা'লার পরিতোষ অর্জন এবং ধর্মের উন্নতির জন্য নিজ ধনসম্পদ ব্যয় করুন।** ০৭ নভেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ০৭ নবুওয়ত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... খোদার পথে ব্যয় করার পদ্ধতি এবং এর ফলাফল। * ... এ যুগে আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়কারী লোক বলতে আপনাদেরকে বুঝায়। * ... ভালোভাবে স্মরণ রাখুন! নবীরা যে চাঁদা চায় তা নিজের	৩৪৯-৩৬০

	জন্য নয়, বরং সেই চাঁদা প্রদানকারীদের কিছু দেবার উদ্দেশ্যে...। * ... খোদার পথে ব্যয় করার কল্যাণ...। * ... তাহরীকে জাদীদের নতুন অর্থবছরের ঘোষণা এবং পুণ্যকাজে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। * ... তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের সৌভাগ্য।	

(৩০)	**লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম, যাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।** ১৪ নভেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১৪ নবুওয়ত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... রমযানুল মুবারকের শেষ দশক এবং লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও কল্যাণের তত্ত্বপূর্ণ বর্ণনা। * ... রমযানের শুরুতেই সকল ইবাদতের দিকে মনোযোগ আবশ্যক। * ... কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা। * ... ইস্তিগফার ও তওবা। * ... লাইলাতুল কদরের বিভিন্ন দোয়া এবং মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবির [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] আগমন।	৩৬১-৩৭২

(৩১)	**জুমুআ হলো ঈদের দিন। আমাদের ধর্ম আমাদের ওপর এটি আদায় করা আবশ্যক করেছে।** ২১ নভেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ২১ নবুওয়ত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... জুমুআর গুরুত্ব, আবশ্যকতা, আদবকায়দা এবং কল্যাণরাজি। * ... জুমুআতুল বিদা পরিভাষা এবং এ সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা। * ... রমযানের পবিত্র পরিবর্তনসমূহ অব্যাহত থাকা উচিত। * ... বড়োই হতভাগা সেই ব্যক্তি– যে রমযান পেল ঠিকই, কিন্তু নিজের মাঝে কোনো পরিবর্তন খুঁজে পেল না! * ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার কারণে একজন আহমদীর দায়দায়িত্ব। * ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে জুমুআর বিশেষ সম্পর্ক। * ... দোয়ার গুরুত্ব এবং গ্রহণীয়তার দর্শন। * ... রাতগুলোকে স্বীয় ইবাদতের মাধ্যমে জীবিত করুন।	৩৭৩-৩৮৫

(৩২)	**আমাদের ব্যক্তিগত এবং জামা'তী উন্নতির চাবিকাঠি হলো, দোয়া। তাই দোয়ার ক্ষেত্রে অলস হয়ো না।** ২৮ নভেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ২৮ নবুওয়ত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... সব ধরনের ইবাদত ও দোয়ার গুরুত্ব। * ... দোয়ার বিষয়টি এমন একটি বিষয় যা ছাড়া আহমদীরা এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। * ... বর্তমান যুগে যদি বিজয় লাভ হয় অর্থাৎ ইসলামের বিজয় যদি দেখতে হয় তবে তা দলিলপ্রমাণাদির পাশাপাশি কেল দোয়ার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। * ... আম্মাইঁ ইউজিবুল মুযতার-এর ঈমানবর্ধক তফসীর। * ... দোয়ার মাধ্যমে বিজয়ের নিদর্শনাবলি। ... বড়ো বড়ো ফেরাউন এসেছে এবং চলেও গেছে, কিন্তু ঐশী জামা'ত উন্নতি করেই চলেছে। * ... মসজিদসমূহ আবাদ করার তাহরীক। * ... দোয়া কবুলিয়তের একটি শর্ত হলো, ... জামা'তের জন্য বেদনা অনুভব করা। * ... তাহাজ্জুদ, পাঁচবেলার নামায এবং নফল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন।	৩৮৬-৩৯৬
(৩৩)	**আহমদীয়া জামা'তের ব্যবস্থাপনার কারণেই প্রত্যেক আহমদীর পরস্পরের মাঝে প্রেম-ভালোবাসা গ্রোথিত হয়ে যায়।** ০৫ ডিসেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ০৫ ফাতাহ ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... কর্মী এবং কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ আর তাদের দায়দায়িত্ব। * ... জামা'তের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি আর এর ফলে যুগ-খলীফার সাথে সম্পর্ক। * ... জাতির নেতা জাতির সেবক হয়ে থাকে। কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিজ স্বভাবের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করুন। * ... জামা'তের কর্মকর্তারা যুগ-খলীফার প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। সেটি উপলব্ধি করে দায়িত্ব পালন করতে হবে। * ... বিভিন্ন বিভাগ এবং সেসব কর্মকর্তাদের আবশ্যিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে দিকনির্দেশনা। * ... যে-সব উপদেশ কর্মকর্তাদের জন্য হয়ে থাকে, তা জামা'তের সকল সদস্যদের জন্যও প্রযোজ্য। * ... বিচার বিভাগ-সংক্রান্ত বিষয়াবলি এবং তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে দিকনির্দেশনা। * ... জামা'তের নিয়ম-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা এবং সেটির সুরক্ষাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিন।	৩৯৭-৪১৩

(৩৪)	**আল্লাহ্ তা'লার অধিকারসমূহ খর্ব করলে শয়তান অবশ্যই ঘাড়ে চেপে বসবে।** ১২ ডিসেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১২ ফাতাহ ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... নিজের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করতে থাকো এবং সর্বদা শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো। * ... শয়তানের কবল থেকে বাঁচতে খোদার অনুগ্রহের পাশাপাশি নামায আদায় এবং ইস্তিগফার করা আবশ্যক। * ... বর্তমান যুগের একটি সামাজিক ক্ষতিকর দিক হলো, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন। এর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ। * ... ইন্টারনেটের ক্ষতিকর ব্যবহার এবং এর ক্ষতিসমূহ। * ... শয়তানের কবল থেকে বাঁচতে প্রতিদিন যে-সব দোয়া করতে হবে ...। * ... পারিবারিক এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে শয়তানের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা।	৪১৪-৪২৬

(৩৫)	**হে মুমিনরা! আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।** ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১৯ ফাতাহ ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... সততার মূর্তমান প্রতীক হলো, কুরআন শরীফ এবং সত্যের আলোকবর্তিকা হলেন মহানবী (সা.)। * ... নবীগণ গোটা সৃষ্টিজগৎকে সত্যের পথ দেখাতে এসে থাকেন। * ... বর্তমান বিশ্বে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে মহান কোনো সত্যবাদী নেই। ... সে কারণে এই নবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে নাও। * ... সত্য এবং সততার বিষয়ে কুরআনে যত আদেশ রয়েছে তা অন্য কোনো কিতাবে নেই। * ... আমাদের ওঠা-বসা এবং আমাদের মুখনিঃসৃত সকল কথা যেন সত্য হয়। * ... আহমদী উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক– সবার জন্য দিকনির্দেশনা। হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব (রা.)-এর দৃষ্টান্ত। * ... কেবল মিথ্যাই নয়, বরং সন্দেহপূর্ণ কথাও বোলো না। * ... বিয়েশাদি একটি পবিত্র সম্পর্ক ও অঙ্গীকার। একে সম্মান করো। * ... সত্যের মাঝে বীরত্ব ও সাহসিকতা বিদ্যমান। মিথ্যাবাদী কাপুরুষ হয়ে থাকে। * ... আহমদীদের উচিত সততার উন্নত ও স্মরণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা।	৪২৭-৪৩৯

(৩৬)	**সন্দেহ থেকে গোয়েন্দাগিরি এবং গোয়েন্দাগিরির ফলে গীবতের অভ্যাস সৃষ্টি হয়।** ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ২৬ ফাতাহ ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা * ... কিছু সামাজিক ব্যাধি, যেমন- সন্দেহ পোষণ, গোয়েন্দাগিরি এবং গীবত প্রভৃতি পরিত্যাগ করার বিষয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহত। * ... কুধারণা পোষণকারীরা নিজের বিষয়ে কুধারণা শ্রবণ না করা পর্যন্ত মারা যায় না। * ... ধর্মের সেবা প্রদানকারী মহিলারা গীবতের মতো ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে। * ... গীবত এবং চুগল– এ দুটি ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য অঙ্গসংগঠনসমূহের কর্মপদ্ধতি পালন করুন। * ... এসব ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের একটিই উপায় আর তা হলো, সর্বদা ইস্তিগফার করতে থাকুন। * ... কখনোই একতরফ থেকে কথা শুনেই কারো বিরুদ্ধাচরণ কিংবা কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। * ... আমরা যেন নিজেদের ভাইদের দোষ বর্ণনা করার পরিবর্তে আত্মসংশোধন করি।	৪৪০-৪৫৪

(১)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৫ এপ্রিল ২০০৩, মোতাবেক ২৫ শাহাদাত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা আল-বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ
فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

(আল-বাকারা: ১৮৭)

অনুবাদ: "আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বলো,) 'নিশ্চয় আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যেন তারা সঠিক পথ পায়'।"

যে আয়াতটি এখন পাঠ করা হয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'মুজীব'-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। অনন্য এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যদিও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পূর্বেও আলোচনা করেছেন, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আজকের খুতবার জন্য আমি এ বৈশিষ্ট্যটি বেছে নিয়েছি। দোয়া গৃহীত হবার বিষয়টি এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আজ এ বিষয়টি বর্ণনা করা হবে এবং দোয়া গৃহীত হবার নিদর্শনস্বরূপ যে অগণিত কৃপা ও অনুগ্রহ এ জামা'তের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা করেছেন তা-ও তুলে ধরা হবে।

এ সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে, হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা পরম লজ্জাশীল, অতীব দয়ালু ও উদার। কোনো বান্দা যখন তার দরবারে দুহাত তুলে যাচনা করে তখন তিনি তা খালি ও বিফল ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" [জামে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব ফি দুয়াইন নবী (সা.)]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "আমার সম্পর্কে বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সাথে ব্যবহার করে থাকি। বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। নিরালে যদি সে আমাকে মনে মনে ডাকে তবে আমিও তাকে সেভাবেই স্মরণ করব। সে যদি কোনো জনসমাবেশে আমাকে স্মরণ করে তবে আমি তার চেয়ে উত্তম বৈঠকে তাকে স্মরণ করব। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হবো। আমার দিকে যদি সে এক হাত অগ্রসর হয় তবে আমি দুহাত এগিয়ে যাব, আর সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে ছুঁটে যাব।" (তিরমিযী, আবওয়াবুদ দাওয়াত বাব ফি হুসনিয যান্নি বিল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা)

এখানে [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মৃত্যুতে –অনুবাদক] জামা'তের সদস্যরা ডাঙায় তোলা মাছের মতো ছটফট করছিল। সুতরাং খোদা স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে আমাদের দিকে দৌড়ে আসবেন না এবং আমাদের সাহায্য করবেন না– কীভাবে তা হতে পারে! আলহামদুলিল্লাহ্।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, বিরলই ঘটে থাকবে যে, মহানবী (সা.) কোনো বৈঠক থেকে উঠেছেন অথচ তিনি তাঁর সাহাবীদের জন্য এ বাক্যে দোয়া করেন নি, "হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এমন ভীতি দান করো যা আমাদের এবং তোমার অবাধ্যতার পথে অন্তরায় হবে। আর আমাদেরকে তোমার এমন আনুগত্য করার সামর্থ্য দান করো যার কল্যাণে তুমি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে আর এমন বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করো যার ফলশ্রুতিতে জাগতিক বিপদাপদ তুমি আমাদের জন্য সহজ করে দেবে। হে আমার আল্লাহ্! আমাদেরকে নিজেদের কান, চোখ এবং সকল শক্তিসামর্থ্যকে আজীবন যথাযথভাবে কাজে লাগানোর সামর্থ্য দান করো এবং আমাদেরকে এসবের কল্যাণে আশিসমণ্ডিত করো। যে আমাদের ওপর অত্যাচার করে তুমি আমাদের পক্ষ হয়ে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। আমাদের সাথে যে শত্রুতা পোষণ করে তার বিপক্ষে তুমি আমাদের সাহায্য করো এবং আমাদের ধর্মের বিষয়ে আমাদেরকে কোনো পরীক্ষায় ফেলো না। এ পার্থিব জগৎকে আমাদের সমস্ত দুশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বানিও না এবং বস্তুজগৎ পর্যন্তই যেন আমাদের জ্ঞান বা চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ না থাকে অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান যেন কেবল ইহজগৎকে ঘিরে না হয়। আর আমাদের ওপর এমন ব্যক্তিকে চাপিয়ে দিও না, যে আমাদের প্রতি দয়া করবে না।" (জামে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব মা জাআ ফি আক্বদিত তাসবীহ্ বিল ইয়াদ)

দোয়ার বিষয়ে খোদা তা'লা আমার মাঝে সেই আবেগ-উচ্ছ্বাস-প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "যারা দোয়ার মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পথ উন্মুক্ত করে দেন। তিনি দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন না .... পবিত্র কুরআন দোয়ার দুটি দিক বর্ণনা করেছে। একদিকে আল্লাহ্ তা'লা নিজের কথা মানাতে চান এবং অপরদিকে বান্দার কথা মেনে নেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ

(আল-বাকারা: ১৫৬)

আমি নিজের অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে মানাতে চাই। 'নূনে সাকিলা' ব্যবহার করে যে বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অটল-তকদীর প্রকাশ করবেন; এর চিকিৎসা হলো,

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

(আল-বাকারা: ১৫৭)

দ্বিতীয় সময়টি হলো, খোদা তা'লার কৃপা ও দয়া উদ্‌বেলিত হবার সময় যা–

ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(আল-মুমিন: ৬১)-এ প্রকাশ করা হয়েছে। ... মোটকথা, দোয়ার এ প্রকারভেদ সদা মনে রাখা উচিত যে, কখনো আল্লাহ্ তা'লা নিজের কথা মানাতে চান আবার কোনো সময় তিনি মেনে নেন। এটা অনেকটা বন্ধুত্বসুলভ আচরণের মতো। (দোয়া গৃহীত হবার ক্ষেত্রে আমাদের মহানবী (সা.) যেমন সুমহান মর্যাদা রাখেন তেমনই খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা ও সমর্পণের ক্ষেত্রেও তিনি এক মহামর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন- তাঁর এগারোজন সন্তান মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও তিনি কখনো অনুযোগ করেন নি যে, কেন এমন হলো?" (আল-হাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০২, মলফুযাত, খণ্ড: ০২, পৃ. ১৬৭-১৬৮)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "খোদা তা'লা দোয়ার ক্ষেত্রে আমাকে সেই আবেগ-উচ্ছ্বাস ও প্রেরণা দিয়েছেন যেমন আবেগ-উচ্ছ্বাস সমুদ্রে বিরাজ করে।" (আল-বদর, ০৩ এপ্রিল ১৯০৩, মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১৭২)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা যদি নিজেরা নিরাপদ থাকতে চাও আর চাও যে, তোমাদের ঘরে শান্তি বিরাজমান থাকুক তাহলে তোমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় হবে অনেক বেশি দোয়া করা এবং নিজেদের ঘরবাড়িকে দোয়ায় ভরে দেওয়া। যে বাড়িতে সর্বক্ষণ দোয়া করা হয়, খোদা তা'লা তা ধ্বংস করেন না।" (আল-বদর, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩, মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ২৩২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমি সর্বদা দোয়ায় রত থাকি এবং সবচেয়ে অগ্রগণ্য দোয়া এটিই হয়ে থাকে, খোদা তা'লা আমার সুহৃদ বন্ধুদেরকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে নিরাপদ রাখুন, কেননা তাদের দুঃখ এবং দুশ্চিন্তাই আমাকে দুঃখভারাক্রান্ত করে। এরপর সাধারণ ও সর্বজনীনভাবে এ দোয়া করা হয়, কাউকে যদি কোনো দুঃখ বা ক্লেশ স্পর্শ করে থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা এ থেকে তাকে মুক্তি দিন। আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করার উদ্দেশ্যেই আমার সকল ব্যস্ততা ও সকল আবেগ-উচ্ছ্বাস নিবেদিত থাকে।" (রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭, শেখ ইয়াকূব আলী ইরফানী সাহেব কর্তৃক লিখিত, পৃ. ১৩০-১৬৭, মলফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ রীতি অনুসরণের সামর্থ্য দান করুন আর আপনাদের দুঃখ-বেদনা যেন আমার কাছে নিজের দুঃখ-বেদনার চেয়ে অগ্রগণ্য হয়। আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন ও পাপ থেকে মুক্তি লাভের দোয়াই হলো সর্বোত্তম দোয়া, কেননা পাপের কারণেই হৃদয় কঠোর হয়ে যায় এবং এর ফলে মানুষ জগতের কীট হয়ে যায়। আমাদের এই দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেসব পাপ বিমোচন করুন যা হৃদয়কে কঠোর করে এবং আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথপ্রদর্শন করুন।" (আল-বদর, ২৪ আগস্ট ১৯০৪, মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৩০)

তিনি (আ.) বলেন, আমি এ দোয়াই করি, খোদা তা'লা জামা'তকে নিরাপদ রাখুন,

জগদ্‌বাসীর সামনে প্রকাশিত হোক, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্য নবী ছিলেন আর খোদা তা'লার অস্তিত্বে মানুষের ঈমান সৃষ্টি হোক।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ২৬১)

তিনি (আ.) বলেন, "যারা এ জামা'তভুক্ত হয় তাদের সবচেয়ে বড়ো লাভ হলো, আমি তাদের জন্য দোয়া করে থাকি। দোয়া এমন এক জিনিস যা মরা গাছে ফুল ফোঁটাতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে। এর গভীর কার্যকারিতা রয়েছে।" (আল-হাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩, মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১০০)

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেসব দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন যে-সব দোয়া তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য করেছেন। সর্বোপরি সেই দোয়ার ভাগীদার করুন যা হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মতের জন্য করেছেন।

এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয়জনদের দোয়ার উত্তরাধিকারী করেছেন যার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মৃত্যু আমাদের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা সেসব দোয়ার বরকতেই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। যেমন তিনি বলেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(আন-নূর: ৫৬)

অনুবাদ: "তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা নিযুক্ত করবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অবস্থাকে) নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে তারাই দুষ্কৃতকারী।"

আমার দোয়া থাকবে

আল্লাহ্ তা'লা এ প্রিয় জামা'তকে যেন কখনো অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না করেন

একটি হাদীসে হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা যতদিন চাইবেন তোমাদের মাঝে নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তিনি তা তুলে নেবেন আর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ যখন চাইবেন এ নিয়ামতও প্রত্যাহার করে নেবেন। তখন তাঁর তকদীর অনুযায়ী কষ্টদায়ক রাজত্ব

প্রতিষ্ঠিত হবে (যার ফলে মানুষ অসহনীয় কষ্ট ও মর্মযাতনায় ভুগবে)। এ যুগের অবসানে খোদার আরেক নিয়তি অনুযায়ী এর চেয়েও কঠিন স্বৈরাচারী রাজত্ব কায়েম হবে। একপর্যায়ে খোদার করুণা উদ্‌বেলিত হবে এবং নিপীড়ন-নির্যাতনের যুগের অবসান ঘটবে। অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। একথা বলে তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।" [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল (রহ.), খণ্ড: ০৪, পৃ. ২৭৩, হুযায়ফা বিন ইয়ামান কর্তৃক বর্ণিত]

আল্লাহ্ তা'লা এই নিয়ামতকে কিয়ামতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা যেন কখনো জামা'তের ওপর থেকে নিজ কৃপার হাত প্রত্যাহার না করেন। এ জামা'ত যেন কৃতজ্ঞ ও দোয়াকারীদের জামা'ত হিসাবে চিরবিরাজমান থাকে। আমাদের ওপর সদা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও কৃপাদৃষ্টি থাকবে– এটিই আমার প্রত্যাশা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কোনো রসূল বা পুণ্যবান ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন পৃথিবীতে এক ভূমিকম্প দেখা দেয় আর তা হয়ে থাকে বিপজ্জনক এক মুহূর্ত; কিন্তু খোদা তা'লা একজন খলীফার মাধ্যমে সে অবস্থার নিরসন ঘটান। অতঃপর বলা যায় সেই খলীফার মাধ্যমেই নবরূপে সে বিষয়ের সংশোধন ও সংহতির প্রতিবিধান হয়।" (আল-হাকাম, ১৪ এপ্রিল ১৯০৮, মলফুযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৫২৪-৫২৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে খোদা তা'লার বিধান হচ্ছে বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে পদদলিত করার জন্য তিনি দুটি কুদরত বা দুবার শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে থাকেন; সুতরাং খোদা তা'লা এখন তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এটি অসম্ভব। ... তোমাদের জন্য 'দ্বিতীয় কুদরত' (বা খোদার শক্তির দ্বিতীয় বিকাশ) দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়, কেননা তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না ... যেমনটি 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। সে প্রতিশ্রুতি আমার ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং তা তোমাদের সাথে সম্পর্কিত। খোদা তা'লা যেমনটি বলেন, আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর জয়যুক্ত রাখব। ... আমাদের খোদা অঙ্গীকার রক্ষায় অনড়, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সবকিছুই তোমাদের প্রদর্শন করবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ অবতীর্ণ হবার সময়, তবুও সেসব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকা অবশ্যম্ভাবী, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে (তাঁর) এক (শক্তিমত্তার বিকাশ বা) কুদরতরূপে আবির্ভূত হয়েছি, বরং আমি খোদা তা'লার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কিছু ব্যক্তি হবেন যারা (খোদার শক্তিমত্তার দ্বিতীয় বিকাশ বা) 'দ্বিতীয় কুদরত'-এর বিকাশ হবেন।" (আল-ওসিয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৩০৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল-ওসিয়্যত পুস্তকে আরো বলেন, "পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে খোদা তা'লা স্থায়ীভাবে এ নিয়ম প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদের সাহায্য করে থাকেন আর তাদেরকে বিজয় দান করেন। যেমন তিনি বলেন–

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِیْ

(আল-মুজাদালা: ২২)

(অর্থাৎ আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, 'আমি ও আমার রসূলরা অবশ্যই বিজয়ী হবো।') এখানে 'গালাবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে, খোদার (সত্যতার) 'হুজ্জত' বা প্রমাণ পৃথিবীতে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ দাঁড়াতে না পারা; যেমনটি রসূল ও নবীগণের বাসনা হয়ে থাকে। একইভাবে খোদা তা'লা শক্তিশালী নিদর্শনসমূহ দ্বারা তাঁদের (অর্থাৎ নবীদের) সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন; আর যে সাধুতা তাঁরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, খোদা তা'লা এর বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং এমন সময় তাঁদের মৃত্যু দিয়ে বিরুদ্ধবাদীদেরকে হাসিঠাট্টা ও উপহাস করার সুযোগ দেন যা বাহ্যত একপ্রকার অকৃতকার্যতার আশঙ্কা নিজের মাঝে রাখে। তাদের ঠাট্টাতামাশা করা শেষ হলে পরে খোদা তা'লা স্বীয় কুদরত বা শক্তিমত্তার অপর রূপ প্রদর্শন করেন এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হয় যা পূর্বে কিছুটা অসম্পূর্ণ দেখাচ্ছিল।" (আল-ওসিয়্যত পুস্তক, পৃ. ০৬, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৩০৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "এটিই তোমাদের জন্য একটি কল্যাণময় পথ, সুতরাং তোমরা এই 'হাবলুল্লাহ্'-কে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার রজ্জু) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। এটিও খোদারই রজ্জু যা তোমাদের বিশৃঙ্খল-বিক্ষিপ্ত লোকদের ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। অতএব একে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখো।" (আল-বদর, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১২, পৃ. ০৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, "খিলাফত প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো জগতে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্ তা'লার এ প্রতিশ্রুতি অটল, যা কখনো টলতে পারে না, নড়তে পারে না আর এতে কখনো কোনো পরিবর্তনও আসবে না। ... খিলাফতের পুরস্কার অর্থাৎ চূড়ান্ত ফলাফল হিসাবে তোমাদেরকে এটি প্রদান করা হবে যে, তোমরা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না, পূর্ণ একত্ববাদের অনুসারী হয়ে আমার ইবাদত করে যাবে এবং আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে থাকবে। এটি সেই পরম জান্নাতের প্রতিশ্রুতি, যা আহমদীয়া জামা'তকে প্রদান করা হয়েছে এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে, আমরা যে-সব দৃশ্য অবলোকন করেছি যার ফলশ্রুতিতে দুঃখ-বেদনার ধারার সমান্তরালে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার ধারাও বইছে সেসব এতটাই বিস্ময়কর যে, বর্তমানে জগতের অন্য কোনো জাতি এর ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারবে না। বিশ্বে আহমদীয়া জামা'তের যে অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে তা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের নেই। ... আল্লাহর ওপর আমাদের এই পূর্ণ ভরসা ও আস্থা ছিল যে, তিনি আহমদীয়া খিলাফতকে কখনো বিনষ্ট হতে দেবেন না। একে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী করে রাখবেন। জীবিত, সতেজ, সুদৃঢ়-সুসম্পূর্ণ এবং সদা সুগন্ধময় আতরের সৌরভে সুরভিত রেখে এক পবিত্র বৃক্ষের আদলে এটিকে সর্বদা জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন যার সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, ... এটি এমন এক 'পবিত্র বৃক্ষ' যার শিকড় মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত আছে

এবং জগতের কোনো শক্তি একে উপড়ে ফেলতে পারবে না। ... প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়টি একটি অনন্ত বিষয়। এটি একটি চিরঅম্লান বিষয়। এটি কোনো ব্যক্তিসত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। পূর্বের কোনো খলীফার সাথে এটি সম্পৃক্ত ছিল না এবং আমার সাথেও নেই আর ভবিষ্যতের কোনো খলীফার সাথেও থাকবে না বরং তা 'খিলাফত' পদটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। এটি একটি জীবন্ত ও চিরউজ্জ্বল দিক। কখনো এর পতন ঘটবে না, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। তবে একটি শর্ত রয়েছে, আর তা হলো ... দেখো! আল্লাহ্ তোমাদেরকে পৃথিবীতে তার খলীফা বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তিনি তোমাদের প্রতি কিছু দায়িত্বও অর্পণ করেছেন। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। অতএব পুণ্যের ওপর যদি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আমরা দোয়া করি আর জামা'ত চিরকাল ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার সাথে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর এ উদ্দেশ্যে সর্বদা আমরা চেষ্টা অব্যাহত রাখি, তাহলে খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতিও আমাদের সাথে চিরকাল বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে এবং আহমদীয়া খিলাফত স্বীয় পূর্ণ মহিমায় 'পবিত্র বৃক্ষ' হয়ে এমন মহিরুহের ন্যায় হিল্লোলিত হবে যার শাখাপ্রশাখা হবে গগনচুম্বী।" (দৈনিক আল-ফযল রাবওয়া, ২২ জুন ১৯৮২, পৃ. ০৩-০৪)

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আরো বলেন, "আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন সেই নিয়ামতকে স্মরণ রাখবেন। এ সম্পর্কে আপনারা জানতেনই না যে, তা কীভাবে দেওয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে আপনারা পুনরায় এ নিয়ামত লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে এ নিয়ামত পুনরায় অবতীর্ণ করেছেন। নিয়ামত বা পুরস্কার ছাড়া হৃদয় সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। আপনারা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধারণাই মন থেকে মুছে ফেলেন তাহলে আপনাদের কেউই অপর কারো তোয়াক্কা করবে না। খিলাফত এ সম্পর্কটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং এ সম্পর্ক প্রথমে খিলাফতের মাঝে কেন্দ্রীভূত হয় তারপর অন্যদের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করে।" (জুমুআর খুতবা, ১০ জুন ১৯৯০, আল-ফযল, ০৭ আগস্ট ১৯৯১)

হুযূর (রাহে.) জামা'তকে ঐক্যের গুরুত্ব ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "অতএব এটি খোদার অশেষ কৃপা যে, তিনি আপনাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আজ এটি দুভাবে প্রকাশিত হলো।" আলহামদুলিল্লাহ্, আজ আমরা পুনরায় প্রত্যক্ষ করছি। "আজ পুনরায় আপনাদের ভাই ভাই বানানো হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আজকের ভ্রাতৃত্ববন্ধন তিনি কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, ইনশাআল্লাহ্। তোমরা যদি বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জীবন কাটাতে থাকো তবে কেউই তোমাদের কাছ থেকে এই নিয়ামতকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।" (জুমুআর খুতবা, ০৫ আগস্ট ১৯৯৪; আল-ফযল, ২৩ আগস্ট ১৯৯৪)

হুযূর (রাহে.) বলেছিলেন, "আমি আপনাদের একটি সুসংবাদ দিচ্ছি, তা হলো ... এখন থেকে খিলাফতে আহমদীয়া কখনো কোনো বিপদের সম্মুখীন হবে না, ইনশাআল্লাহ্। খোদার দৃষ্টিতে এই জামা'ত এখন পরিণত জামা'ত। কোনো শত্রুর কুদৃষ্টি, ষড়যন্ত্র ও

অপচেষ্টা এ জামা'তের কেশাগ্রও বাঁকা করতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া খিলাফত সেভাবেই সগৌরবে-সমহিমায় ক্রমাগতভাবে উন্নতি করতে থাকবে, যে মহিমায় আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ জামা'ত কমপক্ষে এক হাজার বছরব্যাপী প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কাজেই, দোয়া করুন, প্রশংসাগীত গেয়ে চলুন এবং পুনরায় নিজেদের অঙ্গীকার নবায়ন করুন।" (আল-ফযল, ২৮ জুন ১৯৮২)

হে বিদায়গ্রহণকারী! আজ আমরা সবাই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি এ প্রিয় জামা'তকে যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আজ এ জামা'ত খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও এর দৃঢ়তাকল্পে পুনরায় সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়েছে এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যা আজ আমরা ধরাপৃষ্ঠে দেখতে পাই না। হে খোদা, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে তুমি সবসময়ের মতো তোমার প্রিয় জামা'তের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টি রেখো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি দৃপ্তকণ্ঠে ও দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এক্ষেত্রে বিজয় আমারই। আমার দূরদর্শী দৃষ্টি যতদূর যায় সমগ্র পৃথিবীকে আমার সত্যতা স্বীকার করতে দেখছি। অচিরেই আমি এক মহান বিজয় লাভ করতে যাচ্ছি, কেননা আমার কথার সমর্থনে আরেক সত্তা কথা বলছেন এবং আমার হাতকে শক্তিশালী করতে আরেকটি হাত ক্রিয়াশীল, যা জগৎ দেখতে পায় না; কিন্তু আমি দেখছি। আমার মাঝে এক স্বর্গীয় আত্মা কাজ করছে যা আমার প্রতিটি শব্দ ও অক্ষরে প্রাণসঞ্চার করে চলছে। স্বর্গে এক মহাউচ্ছ্বাস ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, যা মাটির এই ঢেলাকে এক পুতুলের মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।" (ইযালায়ে আওহাম, পৃ. ৩০৩, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৪০৩)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "খোদা তা'লা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে বিজয় দান করব এবং প্রত্যেক অভিযোগের বিপরীতে তোমার নির্দোষ হওয়া প্রকাশ করে দেবো। বিরোধীদের ওপর তোমার জামা'ত কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত থাকবে। তিনি আরো বলেন, প্রবল আক্রমণের মাধ্যমে আমি তোমার সত্যতা প্রকাশ করব।" (আনওয়ারুল ইসলাম, পৃ. ৫৪, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৯, পৃ. ৫৪)

পরিশেষে আমি আবারো দোয়ার আহবান জানাচ্ছি। আমার জন্য অনেক দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন, অনেক বেশি দোয়া করুন। খোদা তা'লা যেন আমার মাঝে এমন সব যোগ্যতা ও সামর্থ্য সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই প্রিয় জামা'তের সেবা করতে পারি আর আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হতে পারি।

গতকাল এক বন্ধু আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি এতে আমাকে দোয়া দিয়েছেন। তা হলো, আপনার মাঝে যদি খিলাফতের গুরুভার বহন করার যোগ্যতা না-ও থাকে আল্লাহ্ তা'লা আপনার মাঝে সে যোগ্যতা সৃষ্টি করুন; এ দোয়াটি আমার কাছে

খুবই ভালো লেগেছে। নিশ্চয় দোয়া ও খোদা তা'লার কৃপাতেই আমাদের এ কাফেলা সাফল্যের সাথে নিজ গন্তব্য অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আপনাদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। তবে একটি বিষয় এখনই পরিষ্কার করে বলে দেই আর তা হলো, জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতের একটি নিজস্ব সম্মান ও পবিত্রতা রয়েছে, যা আপনাদেরকে কখনোই এ অনুমতি দেয় না যে, প্রকাশ্য বৈঠকে বসে একথা বলাবলি করবেন, এ খলীফার মাঝে অমুক দুর্বলতা আছে বা তমুক ঘাটতি রয়েছে। আমার দুর্বলতা সম্বন্ধে আপনারা আমাকে অবহিত করুন। আমি সাধ্যানুযায়ী সেগুলো দূর করার চেষ্টা করব; কিন্তু ভরা মজলিসে বসে সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে জামা'তী ব্যবস্থাপনা সক্রিয় হবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এজন্য আমার আবেদন হলো, দোয়ায় রত থাকুন এবং দোয়ার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করুন, তাহলে আমরা সবাই জামা'ত হিসাবে বা সমষ্টিগতভাবে ইসলামের বিজয়ের দিন দেখব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

(২)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২ মে ২০০৩, মোতাবেক ২ হিজরত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা আল-আরাফের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

(আল-আরাফ: ৪৪)

অনুবাদ: "আর আমরা তাদের অন্তরের সব বিদ্বেষ টেনে বের করে দেবো। তাদের নিয়ন্ত্রণে নদনদী প্রবাহিত হবে। আর তারা বলবে, 'সব প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহ্‌র– যিনি আমাদেরকে এই (বেহেশতের) পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে পথ না দেখাতেন, আমরা কখনো হিদায়াত পেতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক-প্রভুর রসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন।' আর তাদের ডেকে বলা হবে, 'এটি হলো সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমাদের করা হলো, তোমাদের কৃতকর্মের দরুন'।"

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হামদ এমন প্রশংসাকে বলা হয়, যা কোনো প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তির ভালো কাজের জন্য করা হয়। একইভাবে এমন পুরস্কারদাতার প্রশংসাকেও হামদ আখ্যায়িত করা হয়, যিনি স্বেচ্ছায় পুরস্কৃত করেছেন এবং নিজের ইচ্ছানুসারে অনুগ্রহ করেছেন। প্রকৃত অর্থে 'হামদ' কেবল এমন সত্তার জন্য প্রযোজ্য হয়, যিনি সকল কল্যাণ ও জ্যোতির উৎস এবং পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে কারো ওপর অনুগ্রহ করেন, অজ্ঞতাবশত বা বাধ্য হয়ে নয়। হামদ-এর এ অর্থ কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্‌র সত্তাতেই বিদ্যমান। তিনিই সত্যিকার অনুগ্রহকারী এবং আদ্যন্ত সমস্ত অনুগ্রহ তাঁরই পক্ষ থেকে (উৎসারিত)। সমস্ত প্রশংসা ইহকালেও তাঁর আর পরকালেও শুধুই তাঁর। তিনি ভিন্ন অন্যদের যে প্রশংসা করা হয় তা-ও মূলত তাঁরই প্রাপ্য। ... হামদ শব্দের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা সেই গুণাবলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা তাঁর আদি জ্যোতির্ময় সত্তায় বিদ্যমান।" (এজাযুল মসীহ্, পৃ. ১২৫-১২৭, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ১২৯)

দোয়া ব্যতীত জীবন কাটানোর কথা কল্পনাও করা যায় না

দোয়া এমন একটি বিষয় যা ব্যতীত কোনো মুমিন এক মুহূর্তের জন্যও জীবনধারণের কথা ভাবতে পারে না এবং আল্লাহ্ তা'লার রহমত ও কৃপায় মুমিনের দোয়া যখন গৃহীত হয়, তখন অবলীলায় মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাগীত গেয়ে ওঠে। বিগত

দিনগুলোতে গোটা জামা'তের ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ এবং ধনী-দরিদ্র সকলেই যেভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় বিনত হয়ে স্বীয় সত্তা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে তাঁর সমীপে নতশির করে রেখেছে, তারই ফলে আল্লাহ্ তা'লা একান্ত নিজ অনুগ্রহে আমাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছেন। এ নিয়ামত পেয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় এ জামা'ত যেভাবে আনন্দিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার মহিমাগীত গেয়েছে তা কেবল এ জামা'তেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে এ জামা'ত ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোথাও প্রতিক্রিয়ার এরূপ বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পাওয়া ভার। হৃদয়ে খোদাভীতি থাকলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা বোঝার জন্য এ যুগে এই নিদর্শনই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদের জামা'তকে যখন পরকালে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেন, তখন সেই দৃশ্য কেবল পরকালেই দেখানোর প্রতিশ্রুতি দেন না বরং নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত ইহকালেই দৃশ্যমান করে পারলৌকিক জান্নাতের প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ়তর করেন। এরই দৃশ্য আমি এখন প্রাত্যহিক চিঠিপত্রে দেখছি। বিস্ময়কর বিষয় হলো, এক ব্যক্তি শতসহস্র মাইল দূরে বসবাস করা সত্ত্বেও নিছক আল্লাহ্‌র খাতিরে যুগ-খলীফার প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করছে-আর একই অবস্থা এদিকেও (আমার হৃদয়েও) সৃষ্টি হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তড়িৎ তরঙ্গের ন্যায় সেই একই আবেগ-অনুভূতি দেহজুড়ে ছেয়ে যায় (এ কারণে) হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় ভরে যায়। আলহামদুলিল্লাহ্ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্।

দোয়া এবং প্রশংসার মাধ্যমে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনের অঙ্গীকার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, "আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল হাযানা ওয়া আতানি মা লাম ইউ'তা আহাদুম মিনাল আলামীন"। সমস্ত প্রশংসা সেই খোদার, যিনি আমার দুঃখ-বেদনা দূর করেছেন এবং আমাকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা এ যুগের লোকদের মাঝে অন্য কাউকে দেন নি। (তাযকেরা, পৃ. ৬৬৪, সংস্করণ: ১৯৬৯)

কিন্তু আমাদের এসব আবেগ-অনুভূতিকে আমরা কেবল সাময়িক হতে দেবো না বরং দোয়া ও আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসার মাধ্যমে এর অতি মহান দৃষ্টান্ত স্থাপনের অঙ্গীকার করা উচিত। আমরা সেই রসূল (সা.)-এর মান্যকারী যিনি স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততা ও তাঁর প্রশংসাগীতির সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রাথমিক যুগেও তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মগ্ন থাকতেন। এক পর্যায়ে লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং বিজয়ীর বেশে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন; কিন্তু কী অবস্থায়! এ প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন, "(মক্কা বিজয়ের দিন) মহানবী (সা.) যখন 'যি তাভা' নামক স্থানে পৌঁছালেন, তখন তিনি (সা.) পবিত্র চেহারার কিছু অংশ লাল রঙের ডোরাকাটা একটি চাদরের প্রান্ত দ্বারা আবৃত করে রেখেছিলেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) যে সম্মানে ভূষিত করেছিলেন– সেকথা স্মরণ করে বিনয়ের আতিশয্যে তিনি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এতটাই নতশির ছিলেন যে, তার পবিত্র শ্মশ্রু পালানের সম্মুখভাগ স্পর্শ করছিল। (সীরাত ইবনে হিশাম, মক্কা বিজয়ের স্মরণ)

এ অবস্থা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দাদের যে উচ্চমর্যাদা প্রদান করা হয়, তা প্রকাশের ভাষা হয়ে থাকে 'বিনয়'; কিন্তু শয়তানের (মিথ্যা) মর্যাদা দাম্ভিকতায় কলুষিত হয়ে থাকে। লক্ষ করে দেখো! আমাদের প্রিয়নবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেছিলেন তখনো তিনি সেভাবেই নতশির ও সিজদাবনত ছিলেন, যেভাবে তিনি (সা.) সেই বিপদাপদ ও সমস্যাসংকুল যুগে নতজানু হয়ে সিজদা করতেন যখন কিনা এই মক্কাতেই তাঁর সকল প্রকারের বিরোধিতা করা হতো এবং তাঁকে দুঃখ-যাতনা দেওয়া হতো। মহানবী (সা.) যখন দেখলেন, কত অসহায় অবস্থায় এখান থেকে গিয়েছিলাম আর কত সম্মানের সাথে এখন ফিরে এলাম, তখন এটি ভেবে খোদার কৃতজ্ঞতায় তাঁর (সা.) হৃদয় ভরে যায় এবং তিনি সিজদাবনত হলেন।" (আল-হাকাম, ৩১ অক্টোবর ১৯০২; মলফুযাত, খণ্ড: ০২, পৃ. ৪০৪, টীকা)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ বিষয় অর্থাৎ হামদ বা প্রশংসাজ্ঞাপনের বিষয়টি অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দান করুন। এ বিষয়ে আরো কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি এক দিনে একশ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' যপ করে, তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় সীমাহীনই হোক না কেন! (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব ফাযলুত তাসবীহ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, এমন দুটি শব্দ রয়েছে যা উচ্চারণ করা খুব সহজ কিন্তু ওজনে অত্যন্ত ভারী আর রহমান খোদার দৃষ্টিতে খুবই প্রিয়। সে শব্দদ্বয় হলো, "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম" (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা অতীব পবিত্র, তিনি স্বীয় প্রশংসার সাথে বিরাজমান, মহান আল্লাহ্ অতীব পবিত্র- অনুবাদক)। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুদ তাওহীদ, বাব ফি কাওলিল্লাহি তা'লা ওয়া নাযায়াল মাওয়াযিনাল কিসতি লিইয়াওমিল কিয়ামাতি, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব ফাযলুত তাসবীহ)

একটি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন এ বলে আহ্বান করা হবে যে, **'হাম্মাদুন'**! দাঁড়িয়ে যাও। এতে একদল দাঁড়িয়ে যাবে আর তাদের জন্য একটি পতাকা ওড়ানো হবে। আর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল! এ 'হাম্মাদুন' কারা? জবাবে মহানবী (সা.) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা সর্বাবস্থায় খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।' (হুলিয়্যাতুল আওলিয়া লিআবি নায়িম, খণ্ড: ০৬, পৃ. ৬২, আব্দুর রহমান আবি আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুল ফারাজ কর্তৃক প্রণিত সাফওয়াতুস সালাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৮৩)

আল্লাহ্র কাছে আমার মিনতি, এ জামা'তের একজনও যেন এ শ্রেণির বহির্ভূত না হয়।

সাফল্য লাভের পর কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করার উপদেশ দিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "অত্যন্ত জরুরি এবং আবশ্যকীয় বিষয় হলো, প্রত্যেক সাফল্যের পর মুমিন যেন আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা আদায় করে, কেননা তিনি তার পরিশ্রমকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেন নি। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ফলে আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং ঈমান দৃঢ়তর হবে; শুধু এটিই নয় বরং আরো সাফল্য লাভ হবে, কেননা

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে আমি আমার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে স্মরণ রেখো! কঠোর শাস্তি পাবে।

(আল্লাহ্‌র) এ নীতিকে সর্বদা স্মরণ রেখো। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো সফলতা লাভের পর (নিজের অবস্থাদৃষ্টে) সে লজ্জিত হয় এবং এই বলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে যে, সব তাঁরই অনুগ্রহ। এভাবে সে অগ্রসর হতে থাকে এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় অবিচলতার কল্যাণে ঈমান লাভ করে।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৯৮, নতুন সংস্করণ)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, (আল্লাহ্‌র এমন) নিরঙ্কুশ অনুগ্রহ যা সৃষ্টির মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তির কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ হয় না (বরং অনুগ্রহ হিসাবে হয়ে থাকে), তা মুমিনদের হৃদয়কে আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন, স্তবগীত ও প্রশংসাকীর্তনে অনুপ্রাণিত করে। অতএব তারা খাঁটি অন্তঃকরণে ও বিশুদ্ধ মনমানসিকতা নিয়ে স্বীয় অনুগ্রহকারীর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। একইভাবে অযাচিত দানকারী খোদা সন্দেহাতীতভাবে তার প্রশংসাভাজন হয়ে যান, কেননা এমন পুরস্কার প্রদানকারী সত্তা, যিনি মানুষের কোনো অধিকার না থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার অনুগ্রহ করেন, তাঁর প্রশংসা এমন সকল মানুষই করবে যাদেরকে নিয়ামত ও সম্মান প্রদান করা হয়, আর এটা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব। অতঃপর নিয়ামতের পূর্ণতার কল্যাণে প্রশংসা যখন পরম রূপ লাভ করে তখন তা পূর্ণ ভালোবাসাকে আকর্ষণ করে। এমন অনুগ্রহকারী, স্বীয় প্রেমিকদের দৃষ্টিতে অনেক বেশি প্রশংসনীয় ও প্রিয়ভাজন হয়ে যান আর এটা আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যেরই ফলাফল। (এজাযুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ১০৪-১০৫)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁরই প্রশংসাকীর্তন হয় এবং প্রশংসাকারীরা সর্বদা তাঁর গুণকীর্তনে ব্যস্ত এবং খোদার স্মরণে মগ্ন থাকে। সবকিছু সর্বদা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানে রত। তাঁর কোনো বান্দা যখন নিজ হীন কামনা-বাসনার পরিচ্ছদ ছুড়ে ফেলে দিয়ে, নিজের প্রকৃতিগত আকর্ষণের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ ও তাঁর পথ আর তাঁর ইবাদতে বিলীন হয়ে নিজের সেই প্রভুকে চিনে যায়, যিনি স্বীয় বদান্যতায় তার প্রতিপালন করেছেন, সারাক্ষণ তাঁরই প্রশংসাগীত গায়, নিজের পুরো অন্তঃকরণ বরং নিজ (সত্তার) প্রতিটি কণা দিয়ে তাঁকে ভালোবাসে, সেই ব্যক্তি, জগৎসমূহের মধ্যে এক জগতে পরিণত হয়। ... আরো একটি জগৎ রয়েছে তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা নিজ সন্ধানীদের প্রতি করুণাবশত শেষ যুগে মুমিনদের অপর একটি দল সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বাণী 'লাহুল হামদু ফিল উলা ওয়াল আখিরাত'-এ সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা দুইজন আহমদের কথা বলে উভয় আহমদকে তাঁর সীমাহীন নিয়ামতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে প্রথম আহমদ হলেন আমাদের প্রিয় নবী আহমদ মুস্তফা ও রসূল মুজতবা (সা.) এবং দ্বিতীয় আহমদ হলেন শেষ জামানার আহমদ যার নাম অনুগ্রহকারী খোদার পক্ষ থেকে মসীহ্ ও মাহদী-ও রাখা হয়েছে। এ গূঢ়তত্ত্ব আমি খোদার বাণী 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' থেকে

আহরণ করেছি। সুতরাং প্রত্যেক বিবেকবান চিন্তাশক্তির অধিকারী ব্যক্তির প্রণিধান করা উচিত।" (এজাযুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ১৩৭-১৩৯)

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "আমি আরো একটি কথা বলতে চাই এবং এ ওসিয়্যত করতে চাই যে, আল্লাহ্‌র রজ্জুর সাথে তোমাদের দৃঢ় সম্পৃক্ততা থাকা বাঞ্ছনীয়। তোমাদের জীবনবিধান বা পথচলার নীতি যেন হয় আল-কুরআন। তোমাদের পরস্পরের মাঝে যেন কোনো ঝগড়াবিবাদ না থাকে; কেননা বিতণ্ডা ঐশী কল্যাণধারার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি এই দোষেই জঙ্গল বা মরুতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর জাতি সতর্কতা অবলম্বন করেছিল এবং তারা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তৃতীয়বার এখন তোমাদের পালা। অতএব গোসলদাতার হাতে লাশের অবস্থা যেমন হয়, তোমাদের অবস্থাও যেন নিজ ইমামের অধীনে তেমনটিই হয়। তোমাদের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ওপর যেন মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নিজেদেরকে ইমামের সাথে সেভাবে সংযুক্ত করো যেভাবে রেলগাড়ি ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত থাকে। তারপর প্রতিদিন বিশ্লেষণ করে দেখো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাচ্ছো কিনা? বেশি বেশি ইস্তিগফার করো এবং দোয়ায় রত থাকো। ঐক্য ও সংহতিকে হাতছাড়া হতে দিও না। অন্যদের সাথে পুণ্য ও সদাচরণে কোনো কার্পণ্য কোরো না। তেরোশ বছর পরে এ যুগ এসেছে, ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত তা আর আসবে না। সুতরাং এ নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, কেননা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। **'লাইন শাকারতুম লাআযিদান্নাকুম'** (ইবরাহীম: ৮, অর্থাৎ যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো তাহলে নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো– অনুবাদক)। কিন্তু যারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না তারা যেন স্মরণ রাখে, **'ইন্না আযাবী লাশাদীদ'** (ইবরাহীম: ৮, অর্থাৎ নিশ্চয় আমার আযাব অত্যন্ত ভয়ানক –অনুবাদক)। (খুতবাতে নূর, পৃ. ১৩১)

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এ থেকে নিরাপদ রাখুন এবং চিরকাল খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে,

"نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي. يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ. وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ. اِذَا جَآءَ نَصْرُاللّٰهِ وَالْفَتْحُ. وَ انْتَهٰى اَمْرُ الزَّمَانِ اِلَيْنَا. اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ".

অনুবাদ: "আমরা তোমার প্রশংসাগীত গাই এবং তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করি। আল্লাহ্‌র জ্যোতিকে লোকেরা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পূর্ণতা না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা একে পরিত্যাগ করবেন না– অস্বীকারকারীরা যতই অপছন্দ করুক না কেন!

আমরা শীঘ্রই তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব। আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় যখন আসবে এবং আমাদের দিকেই যুগের প্রত্যাবর্তন ঘটবে তখন বলা হবে, এটা কি সত্য ছিল না?" (তাযকেরা, পৃ. ৪৮, সংস্করণ: ১৯৬৯)

পরিশেষে আমি বলতে চাই, গত খুতবায় আমি এক বন্ধুর পত্রের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এ প্রেক্ষিতে জামা'তের কোনো কোনো বন্ধু সীমাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমি সেই বন্ধুকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি এক পুণ্যবান পরিবারের নিষ্ঠাবান সদস্য। তিনি তার নিজস্ব বোধবুদ্ধি অনুসারে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমি ভাবলাম ব্যাপারটা জামা'তের সামনে তুলে ধরি, কেননা আমার আশঙ্কা হলো, সমবেদনার আবরণে কোথাও এ ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনা সমাবেশের রূপ না নেয় এবং কোথাও কোনো নির্বোধ হোঁচট খেয়ে বসে! আল্লাহ্‌র তা'লার কৃপায় জামা'ত অনেক বড়ো হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমান যুগে আল্লাহ্ এমটিএ-র মতো নিয়ামতও আমাদেরকে প্রদান করেছেন যার ফলে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাই এমন কথা বলা আমার একান্ত অপারগতা ছিল। চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমার ধৈর্য-মনোবল বৃদ্ধি করা হয়, জাযাকাল্লাহ্, কিন্তু আমার নিজের সাথে যতটুকু সম্পর্ক, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পূর্ণ ধৈর্য-মনোবল রয়েছে এবং (এ নিয়ে) চিন্তার কোনো কারণ নেই। মূলত জামা'তের প্রয়োজনে কিছু কথা আমাকে বলতেই হয়। আবেগের বশে কখনো কেউ এমন বলে বসে যে, জামা'তের সামনে এমন কথা বলার এবং কঠোরতা প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজন ছিল না; এ ব্যাপারে খুবই দরদের সাথে আমি বলছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই প্রিয় জামা'তের প্রতি আমার অন্তরেও গভীর ভালোবাসা আছে। কোথায় কঠোরতা আর কোথায় কোমলতা প্রদর্শন করা দরকার– আল্লাহ্‌র ফযলে তা আমি ভালোই জানি আর তাঁর দেওয়া যোগ্যতাবলে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করার তৌফিক দান করুন। আবারো অত্যন্ত স্নেহের সাথে বলছি, জামা'তের জন্য যা ভালো মনে করব তা অবশ্যই বলব আর কারো এটি বলার প্রয়োজন নেই যে, এর প্রয়োজন ছিল কিনা। বলে যেহেতু দিয়েছি, তাই (আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়) তা জামা'তের জন্য মঙ্গলজনক হবে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যদি চান, আমার অন্তর থেকে এমন ধারণা সরিয়ে দেবেন। এ সম্পর্কে কারো কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই যে, আমি এমনটি কেন বললাম– তবে হ্যাঁ, সকল অবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবগত রাখবেন, যেন তরবিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে যা বলার প্রয়োজন তা বলতে পারি। পরিশেষে আবারো পরিষ্কার করে বলছি, বিষয়টি এখানেই শেষ করুন, চিঠিপত্রে এ বিষয়ে আর কিছু লিখবেন না, তবে নিজের নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাগীত গেয়ে চলুন এবং তাঁর প্রশংসা ও দোয়ায় লেগে থেকে এই কাফেলার অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করুন।

(৩)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ৯ মে ২০০৩, মোতাবেক ৯ হিজরত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পরে হুযূর (আই.) সূরা আল-মায়েদার নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

(আল-মায়েদা: ০৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নামগুলো সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে যে খুতবা দিচ্ছিলেন, আমি আপাতত সেই ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করব। আল্লাহ্র গুণবাচক নাম 'খবীর' সম্পর্কে হুযূর (রাহে.) খুতবা দিচ্ছিলেন। এখন আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এর অনুবাদ হলো–

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) খাতিরে সাক্ষী হিসাবে ন্যায়ের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হও আর কোনো জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন আদৌ অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো; এটি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর মৃত্যুতে পাকিস্তানের পত্রপত্রিকাগুলোর হীন প্রতিক্রিয়া

দুঃখের বিষয় হলো, আজ মুসলমানরা অন্যান্য নির্দেশের ন্যায় এ নির্দেশকেও ভুলে গেছে আর তারা মনে করে, যা কিছু তারা বলছে ও করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন না। এমন লোকদের কাছে কেবল তাদের মনগড়া তফসীর এবং তাদের সার্থসিদ্ধি হয় এমন শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষার মর্যাদা রাখে। হুযূর (রাহে.)-এর মৃত্যুতে পাকিস্তানের কিছু পত্রপত্রিকা যে ধরনের নোংরামি এবং ভ্রষ্টতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা দেখে 'ইন্না লিল্লাহ্' পড়া ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। যাহোক, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এমনটি হবার ছিলই আর এতে আমাদের ঈমান আরো দৃঢ়তা লাভ করে, খবীর (সর্বজ্ঞ) খোদা এসব অবস্থা সম্পর্কে পূর্বেই মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দিয়েছেন আর আজ আমরা স্বচক্ষে তা পূর্ণ হতে দেখছি।

বর্তমান যুগের মুসলমানদের মাঝে সৃষ্ট পরিবর্তন বা অধঃপতন সম্বন্ধে মহানবী (সা.) যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ভাষায় সেগুলো থেকে একটির উল্লেখ এখানে সংক্ষেপে করছি। তিনি (রা.) বলেন, "মুসলমানদের মাঝে ঘটিতব্য

একটি পরিবর্তন বা অধঃপতনের কথা মহানবী (সা.) এভাবে বলেছেন যে, লোকেরা যাকাতকে জরিমানা মনে করবে। হযরত আলী (রা.)-এর বরাতে আল-বিযারও এটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন, বর্তমানে মুসলমানরা সকল অর্থে বিপর্যস্ত ও বিপদগ্রস্ত, এমতাবস্থায় যাকাতের পাশাপাশি তারা যত দানখয়রাতই করুক না কেন তা হবে অপ্রতুল। অথচ অধিকাংশ মুসলমান আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত যাকাত আদায় করা এড়িয়ে চলে। ইসলামী শিক্ষার অধীনে যেখানে যাকাত নেওয়া হয় সেখানে তারা অনীহা সত্ত্বেও কিছুটা হলেও দিয়েই দেয় কিন্তু যেখানে এ ব্যবস্থাপনাই নেই সেখানে গুটি কতক লোক ব্যতীত অন্যরা যাকাত দেয় না। যারা যাকাত দেয় তারাও এটিকে নিজেদের নাম জাহির করার মাধ্যম হিসাবে নেয় এবং এমনভাবে যাকাত দেয় যে, অন্যরা এটিকে যাকাত নয় বরং জাতিগত কাজে প্রদত্ত চাঁদা মনে করে।

পাকিস্তানে যখন থেকে ইসলামী আইনের কঠোর প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে যাকাতকেও আবশ্যক করা হয়েছে। সেখানকার চিত্র হলো, আহমদীরা (তাদের মতে) অমুসলিম! কিন্তু অনেকেই যাকাত না দেবার জন্য ব্যাংকে নিজেদের আহমদী হিসাবে পরিচয় দেয় অথবা বছর শেষ হবার দুদিন আগেই ব্যাংক থেকে জমানো টাকা তুলে নেয় যাতে করে যাকাত আদায় করতে না হয়। যারা যাকাত আদায় করে তারাও হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ভাষ্যানুসারে নাম জাহির করা বা লোক-দেখানোর জন্যই করে থাকে। এতে যেহেতু কোনো কল্যাণ নেই এবং (বিতরণের) সঠিক ব্যবস্থাপনাও নেই তাই পত্রপত্রিকায় যাকাত বিতরণের প্রকাশিত খবর পড়ে মনে হয়, না জানি কী হুলুস্থুল পড়ে গেছে। পত্রপত্রিকার সংবাদে জানা যায়, কখনো কখনো যাকাত কমিটির সদস্যরা পরস্পর হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেল, আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন সেখানকার অনেক অআহমদী ভদ্রলোক নিজেদের যাকাত এই বলে আমাদের কাছে নিয়ে আসত যে, আমরা আমাদের যাকাতের অর্থ আহমদীয়া জামা'তের হাতে তুলে দিচ্ছি, কেননা আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, জামা'ত এ টাকা যেখানেই খরচ করবে তা সঠিক উদ্দেশ্যেই করবে আর এভাবে আমাদের যাকাত দেবার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আমরা যদি আমাদের আলেমদেরকে এ অর্থ দেই, তবে জানা নেই এর কী পরিণতি হবে? কেননা যখন তাদেরকে দেওয়া হয় তখন তারা তা অন্যায়ভাবে বণ্টন শুরু করে দেয়।

খিলাফত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও কল্যাণ

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ আর আমরা যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না। আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তন করুন, কেননা তিনি আমাদেরকে এমন এক ব্যবস্থাপনা ও এমন এক মালায় গেঁথে দিয়েছেন যেখানে প্রাপ্ত অর্থের প্রতিটি পয়সা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুগ-খলীফার তত্ত্বাবধানে সুচিন্তিত পরিকল্পনানুসারে খরচ করা হয়।

এখন আমি আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম **'আল-খবীর'** সম্পর্কিত আরো কিছু আয়াত পাঠ করছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ

(বনী ইসরাঈল: ৩১)

অর্থাৎ "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক-প্রভু যার জন্য চান রিযক বৃদ্ধি করেন এবং সংকুচিতও করেন। নিশ্চয় তিনিই নিজ বান্দাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত (ও) সম্যক দ্রষ্টা।"

তিনি আরো বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝

(আল-হাজ্জ: ৬৪)

অর্থাৎ "তুমি কি লক্ষ করে দেখো নি, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, যার ফলে পৃথিবী সবুজশ্যামল হয়ে ওঠে? নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।"

অতঃপর সূরা আল-ফুরকানে তিনি বলেন–

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۝

(আল-ফুরকান: ৫৯)

অর্থাৎ "আর তুমি সেই চিরঞ্জীব অস্তিত্বের ওপর ভরসা করো যাঁর মৃত্যু নাই এবং তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। আর নিজ বান্দাদের পাপ সম্বন্ধে পুরোপুরি খবর রাখার ব্যাপারে তিনিই যথেষ্ট।"

আলহামদুলিল্লাহ্, এর দৃষ্টান্তও আহমদীয়া জামা'ত অনেক দেখেছে। কুরআন করীম মুমিনদের জন্য কেবল একথাই বলে নি বরং আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য এমন ভবিষ্যদ্বাণীও কুরআন শরীফে রয়েছে যা অন্যদের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক পবিত্র হৃদয় এ সাক্ষ্য দেয় যে, এ কিতাব সর্বজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ খোদার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। ভবিতব্য এবং ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কতক এমন সংবাদ রয়েছে, যার সম্পর্কে সাহাবীরাও তখন হয়ত ভাবতেও পারতেন না। যেমন তিনি বলেন, **'ওয়া ইযাস্ সামাউ কুশিতাত'** অর্থাৎ, এবং যখন আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে (আত-তাকভীর: ১২)। আকাশের রহস্যাবলি উদ্‌ঘাটন করা, আকাশের আবরণ তুলে ফেলারই নামান্তর। প্রাচীণকালে মানুষ খালি চোখেই চন্দ্র, সূর্য, তারকা ইত্যাদি দেখত। তখনো দূরবীক্ষণ ইত্যাদি আবিষ্কার হয় নি। অতঃপর ১৬০৯ সালে ইটালীর বিজ্ঞানী গ্যালিলীও দূরবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কার করেন। এরই সাথে তিনি মহাকাশ সম্বন্ধীয় বহু আবিষ্কারাদি দৃশ্যপটে নিয়ে আসা আরম্ভ করেন যার মাঝে রয়েছে সান স্পট বা সূর্যের গায়ে দাগ, চাঁদে পাহাড়ের অস্তিত্ব এবং বৃহস্পতির চারটি চাঁদ। গ্যালিলীও এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মহাকাশীয় গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি উদ্‌ঘাটন করেছেন। (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা, অ্যাস্ট্রোনমি শব্দের ব্যাখ্যা)

কুরআন করীম ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য বিভিন্ন খবরের কথা উল্লেখ করেছে যা এ যুগে

পূর্ণতা লাভ করছে, সেগুলোর একটি হলো রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়তা এবং পারমাণবিক যুদ্ধ যা আমরা বর্তমান যুগে প্রত্যক্ষ করি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝٩ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝١٠ وَلَا يَسْـَٔلُ
حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝١١ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ
يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ۝١٢

(আল-মাআরিজ: ৯-১২)

অর্থাৎ "সে-দিন আকাশ হবে গলিত তামার ন্যায়। আর পাহাড়পর্বত হয়ে যাবে ধুনা পশমের ন্যায়। আর কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু আরেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর খোঁজখবর জানতে চাইবে না। (কেননা) তাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের অবস্থা ভালোভাবে দেখিয়ে দেওয়া হবে। অপরাধী সে-দিনের আযাব থেকে রক্ষা পেতে মুক্তিপণরূপে দিতে চাইবে নিজ সন্তানদের।"

পারমাণবিক যুদ্ধের সময় আকাশ বিগলিত তামার ন্যায় পরিদৃষ্ট হওয়া সম্ভব। এখানে তেজস্ক্রিয়তারূপী আযাবের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যা এতটাই ভয়ংকর যে, এ পর্যন্ত যে-সব স্থানে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এটিই দেখা গেছে যে, তখন মানুষ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও খবর নেয় না। এমনকি মায়েরা নিজ সন্তানদের ভুলে গেছে এবং প্রত্যেকের ভেতর পারমাণবিক যুদ্ধ অথবা রেডিয়েশনের এমন ভীতি কাজ করে যে, সেই মহাসংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য সেসময় মানুষ নিজ সন্তানকে জলাঞ্জলি দেবার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায়।

মানবতাকে রক্ষার জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে, যদিও সেসব অ্যাটম বোমার তেজস্ক্রিয়তা অনেক কম ছিল অর্থাৎ সেগুলো প্রাথমিক অবস্থার অ্যাটম বোমা ছিল কিন্তু এখন বেশ কয়েকগুণ বেশি বিধ্বংসী অ্যাটম বোমা তৈরি হয়ে গেছে। বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থা দৃষ্টে এটিই মনে হয় যে, পৃথিবী খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অতএব ঐতিহ্যগতভাবে আহমদীয়া জামা'ত, যাদের হৃদয়ে মানবতার জন্য সমবেদনা রয়েছে, বর্তমানে তাদের দায়িত্ব হলো মানবতাকে রক্ষার জন্য দোয়া করা, অনেক বেশি দোয়া করা যেন জগদ্বাসী খোদাকে চেনে এবং ধ্বংসের কবল থেকে যতটা সম্ভব রক্ষা পায়। (বিভিন্ন বিষয়ে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবগত হয়ে মহানবী (সা.) যে-সব সংবাদ দিয়েছেন বা যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তার কতক এখানে বর্ণনা করছি।

(বদরের যুদ্ধে) মক্কার মুশরিক সর্দারদের নিহত হবার স্থান সম্পর্কে মহানবী (সা.) পূর্বেই খবর দিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত উমর (রা.)-এর সাথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কোনো এক স্থানে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবহিত করেন যে, রসূলে করীম (সা.) বদরের যুদ্ধের একদিন পূর্বে মক্কার কাফিরদের নিহত হবার স্থানগুলো বলে দিয়েছেন আর বললেন, আল্লাহ্ তা'লা যদি চান তবে আগামীকাল এগুলো হবে অমুক অমুক ব্যক্তির মৃত্যুস্থল।

হযরত উমর (রা.) বললেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম খেয়ে আমি বলছি, তারা সত্যি সত্যিই ওখানে মরুক। পরবর্তীতে (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) তাদেরকে এক গর্তে নিক্ষেপ করা হলো। অতঃপর রসূলে করীম (সা.) আসলেন এবং দুবার নাম ধরে ডাকলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমার প্রতিপালক-প্রভু তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তুমি কি তা পূর্ণ হতে দেখো নি? আমার সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকারকে আমি সত্যিই পূর্ণ হতে দেখছি। এটি দেখে হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনি কি লাশের সাথে কথা বলছেন! তিনি (সা.) বললেন, তুমি আমার কথা তাদের চেয়ে বেশি শোনো না। (সুনানে নিসাঈ, কিতাবুল জানায়েয, বাব আরওয়াহুল মু'মিনীন)

তিনি (সা.) ইয়েমেন, সিরিয়া এবং পূর্বের দেশসমূহের বিজয়ের খবরও পূর্বেই দিয়েছিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন, পরিখা বা আহযাবের যুদ্ধের প্রাক্কালে পরিখা খনন করতে গিয়ে একটি শক্ত পাথর আমার খননকাজে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। মহানবী (সা.) তখন আমার কাছেই ছিলেন। ঐ শক্ত পাথরটি ভাঙতে আমার সমস্যা হচ্ছে দেখে তিনি (সা.) আমার হাত থেকে কোদাল নিয়ে নিলেন এবং সেই পাথরে আঘাত করতেই তা থেকে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হলো। তিনি (সা.) দ্বিতীয়বার কোদাল দিয়ে আঘাত করলেন আর পুনরায় স্ফুলিঙ্গ বের হলো। তৃতীয়বারও এমনটি হলো। এটি দেখে আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনার কোদালের আঘাতে এ কেমন স্ফুলিঙ্গ বের হলো? তিনি (সা.) বললেন, তুমিও কি তা দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, জি হুযূর! তিনি (সা.) বললেন, প্রথমবারের স্ফুলিঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইয়েমেন বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। দ্বিতীয়বার সিরিয়া এবং পশ্চিমের দেশগুলো আর তৃতীয়বারের স্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে পূর্বের দেশগুলো বিজয়ের খবর দিয়েছেন। (সীরাতুন নবুবীয়্যাহ লেইবনে হিশাম, যিকরি গাযওয়াতু খন্দক)

অতএব দেখুন! মহানবী (সা.)-এর এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে আল্লাহ্ তা'লা কত মহিমার সাথে পূর্ণ করেছেন।

হযরত যয়নব বিনতে জাহ্হাশ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) চিন্তিত অবস্থায় তার কাছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সন্নিকটবর্তী অনিষ্ট ও পাপের কারণে আরব ধ্বংস হোক। আজ ইয়া'জুজ মা'জুজের দেয়ালের মাঝে এতটুকু একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি (সা.) বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে তাঁর দুটি আঙুল অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জনী দিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের মাঝে পুণ্যবান মানুষ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ, পাপ ও অনাচারের মাত্রা যখন পুণ্যকর্মকে ছাড়িয়ে যাবে তখনই এমনটি ঘটবে। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব ইয়া'জুজ মা'জুজ)

মক্কাবাসীদের জন্য হাতেব বিন আবি বলতার গোপন পত্রের খবর আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মহানবী (সা.)-কে অবহিত করার কথা পবিত্র কুরআন শরীফেও উল্লিখিত আছে। হাদীসে এর উল্লেখ যেভাবে রয়েছে তা হলো, মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন হাতেব বিন আবি বলতা। তিনি অতি সরলতাবশত মক্কাবাসীদের প্রতি সহানুভূতি

প্রদর্শন করে একটি পত্র লিখেন, যাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর মক্কা অভিযানের বিষয়ে লিখেছিলেন। এই পত্রটি পাঠাতেই আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.), হযরত আবু মারসাদ গানাভী (রা.) এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে ঘোড়াযোগে পাঠালেন আর বললেন, 'রওযায়ে খাখ' নামক স্থানে তোমরা এক মুশরিক মহিলাকে দেখবে এবং তার কাছেই মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হাতেব বিন আবি বলতার চিঠি পাবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যে স্থানের কথা বলেছেন আমরা ঠিক সেখানে পৌঁছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলে, সে পত্রের কথা অস্বীকার করল। তখন হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা মহিলার উটকে বসিয়ে দিলেন আর তাকে কঠোরতার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। উপায়ান্তর না দেখে সেই মহিলা মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হাতেব বিন আবি বলতার চিঠি তার খোঁপা থেকে বের করে আমাদের হাতে তুলে দিল। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ফাযলু মান শাহিদা বাদরান)

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে যদি মাছি পড়ে তবে তা একবার ডুবিয়ে নাও তারপর ফেলে দাও, কেননা এর এক পাখায় প্রতিষেধক এবং অপর পাখায় জীবাণু থাকে। (বুখারী, কিতাবু বাদউল খালক, বাব ইযা ওয়াকাআয যুবাবু ফিল আনায়ে)

বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, মাছির এক পাখায় প্রতিষেধক এবং অপর পাখায় জীবাণু থাকে যেমনটি কিনা মহানবী (সা.) ১৪০০ বছর পূর্বে বলেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত ঘটনাবলির সংবাদ

এখন ভবিষ্যতে ঘটিতব্য যে-সকল ঘটনার সংবাদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদান করেছেন সেগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি–

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পিতার মৃত্যু-সংবাদ অবগত হওয়া সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই আমাকে এ বিষয়ে অবগত করেছিলেন। আমার পিতা (আল্লাহ্ তাকে স্বীয় অনুগ্রহে সিক্ত করুন) মরণব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় যে-দিন তার মৃত্যু নির্ধারিত ছিল সেদিন দুপুরে আমার প্রতি ইলহাম হলো, **"ওয়াস সামায়ি ওয়াত তারিক"** আর তখনই হৃদয়ে এ বিশ্বাস সঞ্চার করা হয়, এটি তাঁর মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত। এর অর্থ হলো, আকাশের কসম এবং সেই দুর্ঘটনার কসম যা সূর্যাস্তের পর ঘটবে। ... সেই আল্লাহ্‌র শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ এবং যার নামে মিথ্যা বলা শয়তান এবং অভিশপ্তের কাজ, বাস্তবে এমনটিই ঘটল। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২১৮, ২১ নম্বর নিদর্শন)

'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু'
(আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?)

এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমাকে যখন এই সংবাদ দেওয়া হলো যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা সূর্যাস্তের পর মৃত্যুবরণ করবেন তখন মানবীয় দুর্বলতাবশত এ সংবাদ শুনে আমি ব্যথিত হলাম, কেননা আমাদের আয়ের অধিকাংশ উৎস সম্পৃক্ত ছিল তাঁর জীবনের

সাথে ... এজন্য এ চিন্তার উদ্রেক হলো যে, তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের কী হবে? একথা ভেবে হৃদয় উৎকণ্ঠিত হলো যে, সম্ভবত এখন আমাদের অভাব-অনটন ও কষ্টের দিন আসন্ন। এসকল ধারণা বিদ্যুৎচমকের ন্যায় এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে অন্তরে ছেয়ে যায়। তখনই তন্দ্রাভাব হয়ে দ্বিতীয় ইলহাম 'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু' হলো; অর্থাৎ আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই ইলহাম পেতেই হৃদয় সেভাবে দৃঢ়তা লাভ করল, যেমনটি ভীষণ কষ্টদায়ক ক্ষত কোনো মলম লাগালে এক নিমিষেই নিরাময় হয়। ... তখনই আমি বুঝলাম, খোদা আমাকে বিনষ্ট করবেন না।

তখন আমি কাদিয়াননিবাসী মালাওয়ামাল নামক এক হিন্দু ক্ষত্রিয়, যে এখনো জীবিত আছে, তাকে সে ইলহাম লিখে দিলাম এবং পুরো ঘটনা শুনালাম। এরপর তাকে অমৃতসর পাঠালাম যেন সে হাকিম মৌলবি মুহাম্মদ শরীফ কালানূরীকে দিয়ে ইলহামটি কোনো পাথরে খোদিত করে আংটি বানিয়ে নিয়ে আসে। আমি এই হিন্দু ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন করলাম যেন সে এই মহান ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাক্ষী হয়ে যায় আর একইভাবে মৌলবি মুহাম্মদ শরীফও যেন সাক্ষী থাকেন। অতএব মৌলবি সাহেবের মাধ্যমে সেই আংটি পাঁচ রুপি ব্যয়ে তৈরি হয়ে আমার কাছে পৌঁছে গেছে যা এখনো আমার কাছে আছে এবং যা এ সত্যের পরিচায়ক যে, এই ইলহাম সে যুগে হয়েছিল যখন আমাদের ভরণপোষণ ও আরামের সবটাই আমার শ্রদ্ধেয় পিতার সামান্য আয়ের ওপরই নির্ভরশীল ছিল আর তখন বাইরের কেউ আমাকে চিনত না। আমি অপরিচিত এক মানুষ ছিলাম আর কাদিয়ানের মতো নিভৃত গ্রামে অচেনা অবস্থায় পড়ে ছিলাম। এরপর খোদা স্বীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে আমার দিকে আকৃষ্ট করলেন এবং আর্থিক ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে এমন সাফল্য দান করলেন, যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে আমার এতটুকুও আশা ছিল না যে, মাসে ১০ রুপি আয় হবে, কিন্তু খোদা তা'লা দরিদ্র বা বিনয়ীদের উত্থান ধুলা থেকে ঘটান এবং অহংকারীদের ধুলায় মিশিয়ে দেন। তিনি এত আশ্চর্যজনকভাবে আমায় সাহায্য করেন, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এ যাবৎ প্রায় ৩ লক্ষ রুপি আমার হাতে এসেছে, সম্ভবত এর চেয়ে অধিক হবে।" আপনারা দেখুন, বর্তমানে তা কোটি কোটিতে রূপ নিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। "এ আয়ের ধারণা এভাবে করা যেতে পারে যে, কেবল লঙ্গরখানা বা অতিথিশালার জন্য মাসিক গড়ে দেড় হাজার রুপি পর্যন্ত ব্যয় হয় আর বছরের পর বছর এভাবে চলছে।" সেই যুগে মাসে লঙ্গরখানা খাতে ব্যয়কৃত দেড় হাজার রুপি আজকের লক্ষ লক্ষ টাকার সমান হবে। "এছাড়া অন্যান্য ব্যয়খাত যেমন মাদ্রাসা এবং পুস্তকাদির মুদ্রণ ইত্যাদি এর বাইরে। অতএব লক্ষ করা উচিত, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অর্থাৎ "আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু" কত সুস্পষ্টতা, দৃঢ়তা ও মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। এটি কি কোনো মিথ্যা উদ্ভাবনকারীর কাজ বা শয়তানী কুপ্ররোচনা? কখনো নয়, বরং এটি সেই খোদার কাজ যার হাতে সম্মান ও লাঞ্ছনা এবং উত্থান ও পতনের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২১৯-২২১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর এই আংটিটি হযরত মুসলেহ মওউদ

(রা.)-এর ভাগে আসে। পরবর্তীতে তিনি (রা.) ওসিয়্যত করেছিলেন, আমার পর যিনিই খলীফা হবেন তাকে যেন এই আংটিটি দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এটি খিলাফতেরই উত্তরাধিকার হবে আর আমার পৈত্রিক সম্পত্তি হবে না। এরপর থেকে এটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.), খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এবং পরবর্তীতে আপনারা দেখে থাকবেন, সেই আংটিই (এটি যা) আমাকে পরানো হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা এই কল্যাণধারা চিরকাল প্রবহমান রাখুন।

একটি রেওয়ায়েত হযরত শেখ ফযল এলাহী সাহেব (ডাক পিয়ন) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি চিঠিপত্র নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট যাচ্ছিলাম। ডেপুটি শংকর দাসের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি, তিনি বাড়ির আঙিনার ছায়ায় বিছানা পেতে বসেছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, হে শেখ! গোলাম আহমদকে বলে দেবে, ছেলেরা মসজিদে আসার সময় হইচই এবং চিৎকার-চেঁচামেচি করে, বিরক্ত করে; এতে আমার কষ্ট হয়। তিনি যেন তাদের এমনটি করতে বারণ করেন আর তারা যেন শান্তভাবে আসা-যাওয়া করে। আমি হুযূর (আ.)-এর কাছে তার সে কথাগুলো হুবহু বললাম, তখন তিনি (আ.) বললেন, 'এ বাড়ি তো আমাদের হস্তগত যাচ্ছে কেননা আল্লাহ্ এ ঘর আমাদেরকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' (আল-হাকাম, খণ্ড: ৩৮, সংখ্যা: ০৯, ১৪ মার্চ ১৯৩৫, পৃ. ০৪)

জন আলেকজাণ্ডার ডুই-এর ধ্বংস এবং কোরিয়া প্রসঙ্গ

একইভাবে রয়েছে জন আলেকজাণ্ডার ডুইয়ের ধ্বংসের খবর। এ বিষয়ে জামা'তের বইপুস্তকে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যক্তি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিল। সে 'যিয়ন' নামে একটি শহর গড়ে তুলেছিল। ১৯০১ সনে সে দাবি করে যে, হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের জন্য সে এলিয়া হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯০২ সালে সে প্রচার করেছিল যে, মুসলমানরা যদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আবার ১৯০২ সালের আগস্ট মাসে সে লিখে, মানবতার চেহারায় সবচেয়ে বড়ো কলঙ্ক (নাউযুবিল্লাহ), ইসলামকে, 'যিয়ন' ধ্বংস করে দেবে।

তখন এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৯০৩ সালে একটি 'প্রচারপত্র' প্রকাশ করেন যার শিরোনাম ছিল, 'ডুই ও পিগট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী'। তিনি এতে লিখেন, "আমেরিকার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই নিদর্শন দিয়েছেন যে, ডুই যদি আমার সাথে মুবাহালা করে এবং আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অথবা আকার–ইঙ্গিতে দণ্ডায়মান হয় তাহলে সে আমার চোখের সামনে ভীষণ আক্ষেপ ও দুঃখদুর্দশার সাথে ইহজগৎ থেকে বিদায় নেবে।"

এর উত্তরে ডুই বলেছিল, তোমরা কি মনে করো যে, আমি এসব কীটপতঙ্গের কথার জবাব দেব? এদের ওপর পা রেখে আমি নিমিষেই এদের পিষ্ট করতে পারি।

পরিশেষে সে খোদার ক্রোধানলে পতিত হয়। সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তার স্ত্রী-সন্তানরা তার অসৎ চরিত্রের সাক্ষ্য দেয় যার ফলে তার মুরিদরা তার প্রতি আস্থা হারিয়ে মুখ ফিরিয়ে

নেয় এবং ১৯০৭ সনের ৮ মার্চ চরম আক্ষেপ নিয়ে ডুই মারা যায়। তার মৃত্যুর পর আমেরিকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা হলো, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী জয়ী হলেন আর ডুই হেরে গেল।

এরপর রয়েছে কোরিয়া সম্পর্কিত সংবাদ। ১৯০৪ সালে যখন রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়, "প্রাচ্যের একটি শক্তি এবং কোরিয়ার শোচনীয় অবস্থা।" এই ইলহাম অনুযায়ী পরিশেষে জাপান জয় লাভ করে এবং কোরিয়া থেকে রাশিয়াকে বের হতে হয়। (যিকরে হাবীব, পৃ. ১২৩) আজও সেখানকার অবস্থা খুব ভালো নয়।

জামা'তের উন্নতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

জামা'তের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির সংবাদ, যার মাধ্যমে আমাদের ঈমান আরো দৃঢ় হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–

"বারাহীনে আহমদীয়ায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আমি আমার স্নেহ প্রদর্শন করব। আমি আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উন্নতি দেবো। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং প্রবল আক্রমণের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করে দেবেন। এ ভবিষ্যদ্বাণী (অবতীর্ণ হবার) পর ২৫ বছর কেটে গেছে। এটি সেই যুগের (ভবিষ্যদ্বাণী) যখন আমি কিছুই ছিলাম না। এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত চরম বিরোধিতার ফলে এ জামা'ত টিকে থাকার মতো কোনো আশাই থাকবে না। কিন্তু খোদা তাঁর সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলির মাধ্যমে জগদ্বাসীকে এদিকে আকৃষ্ট করবেন এবং আমার সত্যায়নের জন্য জোরালো আক্রমণ হানবেন। যেমন সে আক্রমণগুলোর একটি হলো প্লেগ, যার সম্পর্কে অনেক পূর্বেই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। আর এসব আক্রমণের মধ্যে ভূমিকম্পও রয়েছে, যা পৃথিবীতে আঘাত হানছে, না জানি আরো কী কী আক্রমণ সংঘটিত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীতে যেমনটি বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা একান্তই স্বীয় শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে এ জামা'তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নতুবা এরূপ কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও কয়েক লক্ষ মানুষের এত দ্রুত আমার অনুসারী হয়ে যাওয়া একটি অসম্ভব বিষয় ছিল। বিরোধীরা অনেক চেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু খোদা তা'লার ইচ্ছার বিপরীতে তাদের কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হয় নি।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২৭৮, ১১১ নম্বর নিদর্শন)

১৯০৮ সালে একটি ইলহাম হয় যা 'পয়গামে সুলহ' পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তা হলো, "খোদা আমাকে যে-সব সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো হলো, জগদ্বাসী যদি তাদের অসৎকর্ম থেকে বিরত না হয় এবং মন্দকাজ পরিত্যাগ না করে তবে পৃথিবীতে ভয়াবহ বিপদাবলি নেমে আসবে আর এক বিপদ কাটতে না কাটতেই আরেক বিপদ এসে হাজির হবে। অবশেষে মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিরুপায় হয়ে বলে উঠবে, এখন কী হবে! আর বহু লোক সমস্যাকবলিত হয়ে উন্মাদের মতো হয়ে যাবে।" (পয়গামে সুলেহ্, পৃ. ০৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজ প্রভুর কাছে নিবেদন করেন,

"হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে অবলম্বন করেছি, তুমিও আমাকে গ্রহণ করো, আমার অন্তর দেখো এবং আমার কাছে আসো, কেননা তুমি সকল রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত এবং এমন প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবগত যা অন্যদের কাছে গোপন রাখা যায়। হে আমার প্রভু! তোমার দৃষ্টিতে আমার শত্রুরা যদি সত্যবাদী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে তাহলে আমাকে সেভাবে ধ্বংস করো যেভাবে চরম মিথ্যুকদের ধ্বংস করা হয়। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে যদি আমি তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকি এবং তোমারই পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে থাকি তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য করো, তুমি আমার সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হও, কেননা আমি তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।" (এজাযুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ২০৩-২০৪)

জামা'তে আহমদীয়া ইউ.কে. এবং এমটিএ-র কর্মীবৃন্দ

পরিশেষে আমি যুক্তরাজ্য জামা'ত এবং এখানকার নিবেদিত প্রাণ বন্ধুদের অসাধারণ কাজের জন্য তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রিয় এই জামা'তের সদস্যরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের সময় অনন্যসাধারণ কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমার জানামতে হুযূর (রাহে.)-ও আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। হুযূর (রাহে.)-এর তিরোধানে সকল পদধারী ও কর্মীরা যে-রূপ শৃঙ্খলা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছেন আর অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েকগুণ বেশি মেহমান আসা সত্ত্বেও সে অবস্থায় যতটা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব ছিল এর সবই তাদেরকে তারা সানন্দে প্রদান করেছেন। এটি কোনো সামান্য জিনিস নয়, তা কোনো ছোটো বিষয় নয়। আল্লাহ্ তা'লার নিবেদিত এই জামা'ত ও তাদের কাজ দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। যাহোক, উদ্দেশ্য মহৎ হলে ঐশী সাহায্য-সমর্থনও লাভ হয়। সেই সময় প্রত্যেক কর্মী ঐশী সাহায্য-সমর্থনের দৃশ্য অবলোকন করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এখন মানুষের অসংখ্য পত্র আসছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে সুশৃঙ্খল এই পুরো ব্যবস্থাপনার জন্য যুক্তরাজ্য জামা'ত এবং এমটিএ-র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন। যারা এখানে আসতে পারেন নি তারা এমটিএ-র মাধ্যমে যত ব্যাপকভাবে নিজেদের আত্মার পরিতৃপ্তির খোরাক পেয়েছেন, এর জন্য পৃথিবীর কোটি কোটি আহমদী এমটিএ-র কর্মীদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কেননা যারা আসতে পারে নি এমন নিরুপায় লোকদেরকে তারা তৃষিত থাকতে দেন নি। আমার কাছে প্রেরিত রিপোর্ট থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, কিছু কর্মী একটানা ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ডিউটি পালন করে তারপর গিয়ে কিছুটা বিশ্রাম করতেন। তারা সবাই নিশ্চিতভাবেই আমাদের দোয়া লাভের অধিকার রাখে। যে-সব কর্মী ব্যবস্থাপনার দিক থেকে সেবা করেছেন অথবা যারা এমটিএ-তে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের সবার জন্য জামা'তের সকলের নিকট বিশেষ দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন। আগামীতেও তারা একই বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সাথে অনুরূপ ত্যাগের প্রেরণায় কাজ করা অব্যাহত রাখবে; এটিই প্রত্যাশা। আমীন।

(৪)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৬ মে ২০০৩, মোতাবেক ১৬ হিজরত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে হুযূর (আই.) খুতবা দিয়েছেন।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(আন-নামল: ৮৯)

"আর তুমি পাহাড়পর্বত দেখে সেগুলোকে স্থির ও নিশ্চল মনে করছ, অথচ সেগুলো মেঘমালার ন্যায় ভেসে চলেছে। (এই হলো) আল্লাহ্‌র সৃষ্টিনৈপুণ্য– যিনি সবকিছু অটল ও সুদৃঢ় বানিয়েছেন। তোমরা যা করো, নিশ্চয় তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

এ আয়াতের তফসীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, " تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ -এর অর্থ এটি নয় যে, পৃথিবী এবং পাহাড় পৃথক-পৃথকভাবে ঘুরছে। বরং এর অর্থ হলো, ভূমি ঘূর্ণায়মান বলে সেগুলোও এরই সাথে সচল। ভূমি যেভাবে মেঘমালাকে নিজের সাথে বয়ে বেড়ায় সেভাবেই তা পর্বতমালাকেও নিজের সাথে বহন করে।"

ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্‌বাণী

বাহ্যত এই আয়াতে পর্বতমালার সচল হওয়া এবং মেঘমালার সাথে এগুলোর সাদৃশ্য বর্ণনা করা হলেও বাস্তবে এখানে রূপকভাবে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের ধ্বংসের সংবাদই দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বলা হয়েছে, তোমাদের যুগের ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যগুলোকে দেখে তোমরা মনে করো, শত শত বছরেও সেগুলো ধ্বংস হবে না কিন্তু ইসলামের মহিমা প্রকাশের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোকে এমনভাবে ধ্বংস করবেন যার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজেই এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ইসলামের সমর্থনে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যখন অনুকূল বাতাস বইতে শুরু করবে তখন বাতাসের মেঘমালাকে উড়িয়ে নেবার মত কুফর ও শিরক-এর দানবতুল্য শক্তিগুলো এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যে, তাদের কোনো নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ সবকিছু মানবীয় চেষ্টায় হবে না বরং খোদা তা'লার হাতেই হবে আর এর দ্বারা তাঁর শক্তিমত্তা ও শিল্পনিপুণতার বিকাশ ঘটবে। পরিশেষে বলেন, اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ (অর্থাৎ 'তোমরা যা করো, নিশ্চয় তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।') মুসলমানরা নিজেদের মাঝে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলেই এরূপ মহাবিপ্লব ঘটতে পারে। তোমরা যদি নিজেদের মাঝে পরিবর্তন সাধন না করো আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সীমালঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত হও তাহলে এক

সীমালঙ্ঘনকারীকে নির্মূল করে কেনইবা তিনি সেস্থলে আরেক সীমালঙ্ঘনকারীকে বসাবেন? তোমরা যদি ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হও এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও সুদৃষ্টি লাভের যোগ্যতা অর্জন করো তবেই তিনি এসব পাহাড়কে ধ্বংস করবেন। (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৭, পৃ. ৪৫৩)

আমাদের প্রতি এক মহান দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে

অতএব আজ আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার দাবি করি, তাদের ওপর নিজেদের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের দায়িত্ব বিশেষভাবে অর্পণ করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের উচিত নিজ গৃহকে জান্নাতপ্রতিম বানানো এবং নিজেদের চারপাশে এমন তাকওয়া সৃষ্টি করা যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাশা করেন। এমন কোনো কর্ম যেন আমাদের দ্বারা সাধিত না হয় যা ঐশী এই সুসংবাদের পূর্ণতাকে বিলম্বিত করতে পারে। অতএব দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া আমাদের গুরুদায়িত্ব, কেননা আজ ইসলামী বিশ্বের সুরক্ষার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি আহমদীয়া জামা'তের কাঁধে ন্যস্ত। আমাদের কাছে (জাগতিক) কোনো শক্তি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কিছুই নেই কিন্তু হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বক্তব্য অনুসারে দোয়ার কল্যাণে সকল ধাপই অতিক্রান্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন পবিত্র কুরআনের আরো কিছু আয়াত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি যাতে আল্লাহ্ তা'লার **'খবীর'** বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي
السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝

(লুকমান: ১৭)

অর্থাৎ "হে আমার প্রিয় পুত্র! সরিষা দানাসম কোনো কর্মও যদি থেকে থাকে আর তা কোনো পাথরে বা আকাশসমূহে অথবা ভূগর্ভে কোথাও লুকায়িত থাকে– আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী (ও) সম্যক অবহিত।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, কোনো জিনিস বানানোর জন্য সে জিনিস সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ লতীফ ও খবীর। আত্মা এবং বস্তু কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে, এ বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন আর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাধরও বটে। আল্লাহ্ তা'লা যদি কোনো অণুপরমাণু এবং আত্মার সৃষ্টি না-ই করে থাকেন তবে এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান কীভাবে থাকতে পারে? (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০৪, পৃ. ১৭০)

তিনি (রা.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা তুচ্ছ ও উচ্চ সব বিষয় সম্পর্কেই অবগত আছেন। ঐশী জ্ঞানে বিশ্বাস করলে পুণ্য অর্জন হয়। বড়ো কেউ আমাকে দেখছেন– এরূপ বিশ্বাস কারো হৃদয়ে থাকলে সে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। এছাড়া নিজেদের জ্যেষ্ঠ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং শাসকগোষ্ঠীর সামনে পাপ না করার বিষয়ে মানুষ আরো বেশি সচেতন থাকে। একইভাবে যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সমস্ত

কাজকর্ম ও ওঠাবসা বা গতিস্থিতি লক্ষ করছেন এবং আমাদের হৃদয়ের ধ্যানধারণা ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও অবগত আছেন, তখন সে পাপের ধারেকাছেও যেতে পারে না। (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৬৭)

পরবর্তী আয়াত হলো–

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۳﴾

(আল-আহযাব: ৩)

অর্থাৎ "আর তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে যে ওহী করা হয়, তুমি তারই অনুসরণ করো। তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।"

অতঃপর সূরা সাবা-তে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝﴿۲﴾

(সাবা: ২)

অর্থাৎ "সব প্রশংসা সেই আল্লাহ্র– যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সবকিছুরই অধিকারী। আর পরকালেও সমস্ত প্রশংসা হবে তাঁরই। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাবান, সম্যক অবগত।"

ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য সংবাদসমূহ

কুরআন করীমে বর্ণিত ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য ও ঘটিতব্য সংবাদসমূহের কিছুটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আর এখন আরো কিছু সংবাদ এখানে আমি সংক্ষেপে উপস্থাপন করব। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান যুগে (পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে) ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদীদের ফিলিস্তিনে একত্রিত হবার সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই দিয়েছেন। তিনি বলেন–

وَّ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۝﴿۱۰۵﴾

(বনী ইসরাঈল: ১০৫)

অর্থাৎ "আর আমরা তারপর বনী ইসরাঈলকে বললাম, 'তোমরা এ (প্রতিশ্রুত) দেশে বসবাস করো। অতঃপর শেষ যুগের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হবার সময়) যখন আসবে তখন আমরা তোমাদের আবার একত্র করে নিয়ে আসব'।"

এ আয়াতের তফসীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছেন, فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ এখন তোমরা কেনানে (ফিলিস্তিনে) যাও কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর সেখান থেকে তোমাদের বের হতে হবে। তারপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন। অতঃপর তোমরা আবার অবাধ্য হবে এবং দ্বিতীয়বার শাস্তি পাবে। এরপর তোমরা দেশান্তরিত অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমাদের অনুরূপ জাতির সম্পর্কে দ্বিতীয় ধ্বংসের খবর পূর্ণ

হবার সময় এসে যায়। তখন পুনরায় তোমাদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে একত্র করে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে ফেরত আনা হবে। (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৩৯৭)

অতএব দেখুন! ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে ১৮৮২ সাল থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে তুরস্কের উসমানী রাজত্ব ইহুদীদেরকে প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনে পুনরায় বসবাসের অনুমতি দেয়। ফলে রাশিয়ার ইহুদীরা এখানে এসে বসতি গড়া আরম্ভ করে। তারপর ব্রিটিশ সরকার স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্রের পরিকল্পনার ঘোষণা দেয় এবং ১৯১৭ সালে 'লীগ অব নেশনস' ব্রিটেনের এ সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি দেয় যে, তারা ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। অতঃপর ১৯৪৭ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এত ব্যাপকহারে ইহুদী এখানে এসে জড়ো হয় যে এর ফলে আজ আপনারা দেখুন! (অত্র অঞ্চলের) সবগুলো মুসলমান দেশকে এরা একটি অসহনীয় কষ্টে নিপতিত করে রেখেছে আর এ সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। এটি ঐশী ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারেই হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন–

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ
اَحَدًا ﴿۴۸﴾

(আল-কাহফ: ৪৮)

অনুবাদ: "আর (স্মরণ করো!) যে-দিন আমরা পাহাড়পর্বতকে সঞ্চালিত করব এবং তুমি পৃথিবীকে (অর্থাৎ জাতিসমূহকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) বেরিয়ে আসতে দেখবে। আর আমরা (এ মহাবিপদে) তাদের সবাইকে একত্র করব এবং তাদের কাউকেই ছাড়ব না।"

বিধ্বংসী যুদ্ধের যুগ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এখানে মানুষের কথা বলা হয়েছে। পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালার কথা বলা হয় নি। আর বলা হয়েছে, এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী সেদিন পূর্ণতা লাভ করবে যেদিন বড়ো বড়ো ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হবে। তুমি সমগ্র বিশ্বকে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখবে। এমন ভয়ংকর যুদ্ধ হবে, মনে হবে যেন তাদের কেউই বাঁচবে না। এ ঘটনার প্রতি ইনজীলেও ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, শেষ যুগে জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য চড়াও হবে। (মথি: অধ্যায় ২৪)

তিনি (রা.) বলেন, 'আল-আরয' বলতে হয়ত সাধারণ জনতা এবং 'আল-জিবাল' বলতে বড়ো বড়ো ক্ষমতাধর মানুষকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হলো, সেদিন একদিকে 'জিবাল' বা ডিকটেটর অর্থাৎ স্বৈরাচারীদের আবির্ভাব ঘটবে আর অপরদিকে জনগণ বা 'আরয' অর্থাৎ গণতন্ত্রপন্থি বা জনপ্রতিনিধি বের হবে এবং উভয়ের মাঝে ভয়ংকর যুদ্ধ হবে।

আজ দেখুন! সভ্য হবার দাবিদার পরাশক্তিগুলো এমনই আচরণ করছে। ইতিপূর্বে যদিও মনে হচ্ছিল যে, ব্লক ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু এখন পুনরায় তা নতুন আঙ্গিকে গড়ে উঠছে এবং পৃথিবী বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত হচ্ছে আর এ প্রক্রিয়া এখন শুরু হয়ে গেছে। এখন এ যুদ্ধ কবে হবে আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রক্ষা করুন।

اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا
لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

(আল-আম্বিয়া: ৩১-৩২)

অনুবাদ: "যারা অস্বীকার করেছে তারা কি তবে লক্ষ করে দেখে নি, আকাশসমূহ ও পৃথিবী উভয়ই দৃঢ় সংবদ্ধ (এক পিণ্ডাকারে) ছিল, এরপর আমরা এতদুভয়কে বিদীর্ণ-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। আর আমরা পানি থেকে প্রত্যেক জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেছি। তবুও কি এরা ঈমান আনবে না? আর আমরা পৃথিবীতে পাহাড়পর্বত সৃষ্টি করেছি, যেন তা তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করে। আর আমরা তাতে প্রশস্ত রাস্তাঘাট বানিয়েছি, যেন তারা সঠিক পথের দিশা পায়।"

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, এ আয়াত বিশ্বজগতের রহস্যাবলি এমনভাবে উদ্‌ঘাটন করেছে যে, সেই যুগের মানুষ এটি কল্পনাও করতে পারত না। বলা হয়েছে, গোটা মহাবিশ্বই দৃঢ়ভাবে বাধা এমন এক গোলকপিণ্ডে আবদ্ধ ছিল যার মধ্য থেকে কোনো জিনিস বের হতে পারত না। অতঃপর আমরা এটিকে বিদীর্ণ করলাম আর তা থেকে সমগ্র মহাবিশ্বের উন্মেষ ঘটল এবং পরবর্তীতে পানির মাধ্যমে সব ধরনের জীবন সৃষ্টি করলাম। পানির কথা বলার পরপরই 'রাওয়াসিয়া বা পর্বতমালা'-র সাথে এই পানি অবতীর্ণ হবার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর আকাশ কীভাবে পৃথিবী ও পৃথিবীর অধিবাসীদের হিফাযত করে তা বর্ণনা করেছেন। তারপর বলেছেন, পৃথিবী, আকাশ ও সমস্ত জ্যোতিষ্কের চিরস্থায়ী আবর্তনের কথা। পরে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, আকাশ ও পৃথিবী যেমন চিরস্থায়ী নয় তেমনই মানবজাতিও চিরস্থায়ী নয়।

পুনরায় কিয়ামতের পূর্বে ঘটিতব্য বড়ো বড়ো ঘটনার সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝
وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

(আত-তাকভীর: ২-৫)

অনুবাদ: "যখন সূর্যকে ঢেকে দেওয়া হবে, আর তারকারা যখন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, আর পাহাড়পর্বতকে যখন স্থানচ্যুত করা হবে, আর দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো যখন (অযত্নে-অবহেলায়) পরিত্যক্ত হবে।"

আলোচ্য আয়াতগুলো সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছেন, পৃথিবীতে বিরাট বিরাট যে-সব পরিবর্তন সাধিত হবার কথা ছিল কুরআন শরীফে এর খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো কিয়ামতের নিদর্শনস্বরূপ হবে। সূর্যকে সাক্ষী করা

হয়েছে, যখন একে ঢেকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, মানবজাতির কল্যাণের জন্য মহানবী (সা.)-এর জ্যোতিকে এ যুগে শত্রুরা বিচ্ছুরিত হতে দেবে না আর তাদের জঘন্য অপপ্রচার এতে বাদ সাধবে। অর্থাৎ তাদের জঘন্য অপপ্রচার এ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। আর যখন সাহাবীদের (রা.) জ্যোতিও শত্রুদের অপচেষ্টার মাধ্যমে ঘোলাটে করে দেওয়া হবে অর্থাৎ সূর্যের অনুপস্থিতিতে তারকারাজি কিছুটা হলেও আলোর চাহিদা পূরণ করে (সেভাবে সাহাবীদের জ্যোতিও কাজে দিত) কিন্তু তাদের জ্যোতিও মানুষের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এটি সেই যুগে হবে যখন বড়ো বড়ো পাহাড়গুলোকে পরিচালিত করা হবে অর্থাৎ পাহাড়সম বড়ো বড়ো সামুদ্রিক জাহাজ এবং উড়োজাহাজ উভয়ই ভ্রমণ ও মালামাল পরিবহনের জন্যও ব্যবহৃত হবে আর এর বিপরীতে উষ্ট্রীগুলো অনেকটা পরিত্যক্ত বাহনের মতো হবে।

আহমদীয়া জামা'তের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের ভবিষ্যদ্‌বাণী

এ যুগে আহমদীদের ওপর যে নিপীড়ন ও নির্যাতন হচ্ছে, একটি আয়াতে এরও উল্লেখ রয়েছে।

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ﴿۵﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ﴿۶﴾ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ﴿۷﴾ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ﴿۸﴾ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿۹﴾

(আল-বুরূজ: ৫-৯)

অনুবাদ: "পরিখাসমূহের অধিকারীরা (নির্ঘাত) ধ্বংসপ্রাপ্ত। অর্থাৎ ইন্ধনসমৃদ্ধ আগুনের (অধিকারীরা), তারা যখন এর চারপাশে (তদারকির জন্য) বসে থাকবে। আর তারা মুমিনদের সাথে যা করে, সে সম্পর্কে নিজেরাই সাক্ষী। আর মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রশংসাময় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার কারণেই তারা এদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।"

এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন লোকদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে যারা গর্তে বা পরিখায় আগুন জ্বালিয়েছিল এবং তাতে মুমিনদেরকে নিক্ষেপ করে পাশে বসে সে দৃশ্য তারা মজা করে দেখত। এই আয়াতসমূহে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীটি উহ্য আছে যে, এরূপ ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটবে আর সে যুগ হবে প্রতিশ্রুত (মহান নেতার) যুগ। অতএব এ ভবিষ্যদ্‌বাণীটি সেসব নির্যাতিত আহমদীদের দ্বারা নিশ্চিতভাবে পূর্ণতা পায় যাদেরকে ঘরে আটকে রেখে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। আর 'কুঊদ' শব্দ দ্বারা এটি বুঝায় যে, মানুষ নির্বিকার বসে তামাশা দেখেছে এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করে নি। অতএব এই মহান ভবিষ্যদ্‌বাণী কয়েকবার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, আক্রমণকারীরা পুলিশের তদারকিতে নিষ্পাপ আহমদীদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে এবং এ কাজে

কয়েকবার সফল হয়েছে আর অনেক সময় ব্যর্থও হয়েছে।" [টীকা: সূরা আল-বুরূজ, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক অনূদিত]

অথচ আগমনকারী (ইমামের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধ তাদের ছিল না। তারা হলেন এমন বিশ্বস্ত অনুসারী যারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে আগমনকারী প্রতিশ্রুত (ইমামের) সত্যতার সাক্ষী হয়েছেন।

অপরদিকে এমন আচরণকারীদের সামান্যতম অনুশোচনা এবং লজ্জাশরমও নেই বরং এমন আচরণের পরও ভীষণ দম্ভের সাথে বলা হয় যে, আমরা আহমদীদের সাথে এই করেছি, সেই করেছি। এসব ঘটনা পূর্বে ঘটত অথবা কেবল আহমদীয়াতের প্রাথমিক যুগেই ঘটছিল, এখন আর ঘটে না– বিষয়টি এমন নয়। বরং আজও এমন ঘটনা অনবরত ঘটে চলেছে এবং এ আচরণ অব্যাহত রয়েছে আর নিপীড়ন ও নির্যাতনের শোকগাঁথা আজও একইভাবে রচিত হচ্ছে। পাকিস্তানের কোনো কোনো স্থানে আহমদীদের সাথে এমন (নিষ্ঠুর) আচরণ করা হয়, যা শুনলে গা শিউরে ওঠে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, তাদের অপরাধ কী? তাহলে এর উত্তর তাদের কাছে নেই। লোকেরা মসজিদে বসে তাদের প্রিয় ইমামের বক্তৃতা শুনছে, এটিই তাদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ, কেননা এতে তাদের আঁতে ঘা লাগে। এছাড়া চরম নিপীড়ন ও নির্যাতনের পুরোটাই খোদার নামে করা হচ্ছে। তাদের মাঝে যদি সামান্যতম খোদাভীতিও থেকে থাকে তবে আমরা শুধু এতটুকুই বলতে পারি, "হে অত্যাচারীরা! দোহাই লাগে তোমরা আল্লাহ্‌র নামে এমনটি কোরো না।" কিন্তু আল্লাহ্‌র দোহাই তো সেখানেই দেওয়া যায় যেখানে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে। তাই আমাদের প্রভুর সমীপে আমাদের এটিই প্রার্থনা–

"হে খোদা! তোমার বান্দারা আজ খোদা সেজেছে,
তোমার শক্তিমত্তা প্রদর্শনের দিন এসেছে।"

আখেরি জামানা সম্পর্কে হাদীসে উল্লিখিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্‌বাণী

আখেরি জামানায় প্রকাশ পাবার মতো বিভিন্ন অবস্থা এবং ঘটনাবলির সংবাদও মহানবী (সা.) দিয়েছেন যা তাঁর সাহাবায়ে কেরামের (রা.) মাধ্যমে আমরা জেনেছি। সেগুলোর মধ্য থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু রেওয়ায়েত আমি এখানে উপস্থাপন করছি যেগুলোকে আমরা মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করতে দেখেছি এবং বর্তমানেও দেখছি।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না এবং কুরআনের কেবল অক্ষরগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। সে যুগে লোকদের মসজিদগুলো বাহ্যত হবে আড়ম্বরপূর্ণ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমরা হবে আকাশের নীচে বসবাসকারী সকল সৃষ্ট জীবের মাঝে নিকৃষ্টতম জীব। তাদের মধ্য থেকেই ফিতনা ও নৈরাজ্যের উদ্ভব ঘটবে এবং তাদের মাঝেই তা ফিরে যাবে।" অর্থাৎ তারাই হবে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা ও বিশৃঙ্খলার মূল। (মিশকাত, কিতাবুল ইলম আল ফাসলুস সালেস) আর আমরা বর্তমানে এসবই দেখছি।

তিনি (রা.) আরো বলেন, হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ইসলাম এমনভাবে নিস্প্রভ হয়ে যাবে যেভাবে কাপড়ের ওপর অঙ্কিত নকশা নিস্প্রভ হয়ে যায়। এমনকি কারো জানা থাকবে না যে, রোযা কী? নামায কী? কুরবানী কী এবং সদকা কাকে বলে? এছাড়া আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন এমন এক অমানিশার সম্মুখীন হবে যে, এর একটি আয়াতও পৃথিবীতে কার্যকর থাকবে না এবং পৃথিবীর বুকে কেবল লোকদের শ্রেণিভেদই অবশিষ্ট থাকবে। এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা বলবে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমা পড়তে শুনেছি। তাই আমরাও এই কলেমা পাঠ করি। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব যিহাবুল কুরআন ওয়াল ইলম) অর্থাৎ প্রকৃত কোনো আমল থাকবে না। বাহ্যিকভাবে আমল করবে ঠিকই, কিন্তু এতে কোনো সার বা মজ্জা থাকবে না।

মুসলিম উম্মতের ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অনুসরণের সংবাদ রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, হে মুসলমানেরা! অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণের সেভাবে অনুকরণ করবে যেভাবে বিঘত বিঘতের সমান আর বাহু বাহুর সমান হয়ে থাকে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তোমরাও তা-ই করবে। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পূর্ববর্তী লোক বলতে কি ইহুদী ও খ্রিষ্টানকে বুঝানো হয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, তারা ছাড়া আর কে? (বুখারী, কিতাব আহাদীসুল আম্বিয়া, বাব মা যাকারা আন বানী ইসরাঈল)

একটি রেওয়ায়েত রয়েছে আর তাতে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, বনী ইসরাঈল ৭১ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মাঝে ৭০টি ফিরকা ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু মাত্র একটি ফিরকাকে রক্ষা করা হয়েছিল। অচিরেই আমার উম্মত ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হবে। অতঃপর তাদের ৭১টি ফিরকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং ১টি ফিরকাকে নাজাত (বা মুক্তি) দেওয়া হবে। তখন সাহাবীরা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই ফিরকা কোনটি হবে? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, সেই ফিরকা হবে, একটি জামা'ত।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন এখন আমি সেগুলোর কয়েকটি উপস্থাপন করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, কাদিয়ানের জীবনযাত্রা যখন আহমদীদের জন্য এতটা কষ্টদায়ক ছিল যে, খোদা তা'লার ইবাদতের জন্য মানুষকে মসজিদে আসতে বাধা দেওয়া হতো আর পথে খুঁটি পুঁতে রাখা হতো যেন পথচারী হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়; সে যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে দেখানো হয়েছে, এই অঞ্চলে মানুষের বসতি এতটা বৃদ্ধি পাবে যে, জনবসতি বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে।

মুসলেহ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী

১৮৮৮ সালের একটি ইলহামে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'মুসলেহ মওউদ'-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমার প্রথম পুত্র এখনো জীবিত, যার নাম মাহমুদ। তার জন্মের পূর্বেই আমাকে কাশফ তথা দিব্যদর্শনে তার জন্মের সংবাদ প্রদান করা হয়। মসজিদের দেয়ালে আমি তার নাম 'মাহমুদ' লেখা দেখতে পাই। তখন আমি এই ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশের জন্য সবুজ রঙের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করি যার প্রকাশকাল হলো, ০১ ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ। (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৫, পৃ. ২১৪, তাযকেরা, পৃ. ১৬৪-১৬৫, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণ)

এর বিশদ বিবরণ হলো, কাদিয়ানের আর্যসমাজিরা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট একটি নিদর্শন দেখতে চাইল, তখন তিনি এ লক্ষ্যে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নির্ভৃতে-নির্জনে দোয়া করার পর এ ইলহাম লাভ করেন যে, **"তোমার গ্রন্থি হুশিয়ারপুরে খোলা হবে"**। (অর্থাৎ হুশিয়ারপুরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে)।

এই ইলহাম অনুসারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হুশিয়ারপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখানে চিল্লাহ্ আরম্ভ করেন বা ধ্যানমগ্ন হন। সেখানে ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক মহান পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করেন, যা তিনি (আ.) ২০ জানুয়ারি ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এ ভবিষ্যদ্‌বাণীতে তাঁকে যে প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্মের সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে খোদার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে ৮ এপ্রিল, ১৮৮৬ সনে তিনি সবিস্তারে অবহিত করেন। তিনি বলেন, "খুব শীঘ্রই এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে যাতে এক গর্ভকালের বেশি সময় লাগবে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, সম্ভবত নিকটতম সময়ে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে অথবা নিকটবর্তী গর্ভকালে অবশ্যই জন্ম নেবে। কিন্তু এটি প্রকাশ করা হয় নি যে, এখন জন্মগ্রহণকারী সন্তানই সেই (প্রতিশ্রুত) পুত্র নাকি সে নয় বছরের মধ্যে অন্য কোনো সময় জন্মগ্রহণ করবে।" (বিজ্ঞাপন- ০৮ এপ্রিল ১৮৮৬, মজমুআ ইশতেহারাত, খণ্ড: ০১)

অতএব **'খুব শীঘ্রই এক পুত্রসন্তান জন্ম নেবে'**– ঐশী এ সংবাদ তথা ইলহামের ভিত্তিতে ৭ আগস্ট ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বশীর আউয়াল জন্মগ্রহণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ভবিষ্যদ্‌বাণীতে উল্লিখিত "সুশ্রী পবিত্র পুত্র তোমার অতিথি হয়ে আসছে"– ঐশী এ সংবাদকে পূর্ণ করে স্বল্প বয়সেই ১৮৮৮ সনে সে মৃত্যুবরণ করে। এতে বিরোধীরা অনেক হইচই করে কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত পুত্র, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা সংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, "অথবা নয় বছরের মধ্যে অন্য কোনো সময় সে জন্মগ্রহণ করবে"– এই ঐশী সংবাদ অনুসারে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রা.) ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐশী সুসংবাদ অনুসারেই বড়ো হতে থাকেন। পরে ১৯৪৪ সনের ৫ ও ৬ জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে এক মহান স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রা.)-এর কাছে এটি প্রকাশ করেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত পুত্র যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। তাঁর খিলাফতকাল, তাঁর কুরআনের জ্ঞান, তাঁর ধর্মসেবা, তাঁর মানবসেবা একথার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, তিনিই সেই "প্রতিশ্রুত পুত্র"।

সন্দর্ভটি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে এ আগাম সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে তাঁর ভাষাতেই বলছি:

"একবার এক হিন্দু ভদ্রলোক কাদিয়ানে আমার কাছে আসেন যার নাম স্মরণ নেই। তিনি বলেন, আমি একটি ধর্মীয় সম্মেলন করতে চাচ্ছি। এই সম্মেলনে পাঠ করার জন্য আপনিও নিজ ধর্মের সৌন্দর্যাবলি সম্পর্কে কোনো একটা প্রবন্ধ লিখুন। আমি প্রবন্ধ লিখতে অস্বীকৃতি জানাই কিন্তু তিনি খুবই জোরাজোরি করেন, বার বার অনুরোধ করেন। যেহেতু আমি জানি যে, নিজস্ব শক্তিবলে আমি কিছুই করতে পারি না আর সত্য কথা হলো, আমার মাঝে কোনো শক্তি নেই। খোদা আমাকে না বলালে আমি বলতে পারি না, তিনি না দেখালে আমি কিছু দেখতে পাই না। তাই আমি খোদার দরবারে দোয়া করলাম, তিনি যেন আমাকে এমন প্রবন্ধ লেখার বিষয় বুঝান যা এই সম্মেলনের সকল বক্তৃতার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। দোয়া করার পর আমি দেখলাম, আমার মাঝে একপ্রকার শক্তি সঞ্চার করা হয়েছে। আমি এই ঐশীশক্তিকে আমার মাঝে সক্রিয় বলে অনুভব করলাম। আমার উপস্থিত বন্ধুবর্গ জানেন যে, আমি এ প্রবন্ধের কোনো পাণ্ডুলিপি লিখি নি। যা কিছু লিখেছি তা আমি সরাসরি লিখেছিলাম আর এত দ্রুত লিখছিলাম যে, লিপিকারের পক্ষেও এত দ্রুত এর অনুলিপি প্রস্তুত করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। আমি যখন প্রবন্ধটি লিখে শেষ করি তখন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম হলো, **'তোমার প্রবন্ধই শ্রেষ্ঠ'**।

তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা, সেই সম্মেলনে শ্রোতারা প্রবন্ধটি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করে আর চতুর্দিক থেকে প্রশংসাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এমনকি এই সম্মেলনের সভাপতি এক হিন্দু ভদ্রলোক নিজ মুখে অবলীলায় বলে ফেলেন, এ প্রবন্ধটি সবগুলো প্রবন্ধের মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিল। **লাহোর থেকে প্রকাশিত সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট** নামে একটি ইংরেজি পত্রিকাও সাক্ষ্য দিয়ে লিখে যে, 'এই প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ ছিল'। সম্ভবত আরো ২০টি উর্দু পত্রপত্রিকাও এই একই সাক্ষ্য দিয়েছে।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২৯১-২৯২)

এছাড়া **'পাঞ্জাব অবজারভার'** নামের একটি ইংরেজি পত্রিকারও সাক্ষ্য রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "প্রায় ২০ বছর যাবৎ আমি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত আর এ কারণে একবার আমার দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারে আশঙ্কা দেখা দিল, কেননা এমন রোগের ফলে চোখে ছানি পড়ার বা চোখ থেকে লাগাতার পানি ঝরার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহ ও কৃপাবশত এক ওহীর মাধ্যমে আমাকে সান্ত্বনা, ধৈর্য ও প্রশান্তি প্রদান করেন। আর সেই ওহীটি হলো, **"নাযালাতির রাহমাতু 'আলা সালাসিন আল আ'য়ুন ওয়া 'আলাল উখরায়াইন"** অর্থাৎ 'তিনটি অঙ্গের ওপর কৃপা বর্ষিত

হয়েছে। এদের একটি হলো চোখ এবং বাকি দুটি অন্য অঙ্গ কিন্তু সেগুলো কী– তা স্পষ্ট করা হয় নি। আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, ১৫/২০ বছর বয়সে আমার দৃষ্টিশক্তি যেমন ছিল আজ প্রায় ৭০ বছর বয়সেও তা তেমনই আছে। অতএব এ হলো সেই অপার অনুগ্রহ– যার প্রতিশ্রুতি খোদা তা'লার ওহীতে দেওয়া হয়েছিল। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ৩১৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আজ রাত দুটোয় ইলহাম হয় (এটি ১৭ আগস্ট, ১৯০৭ সালের কথা), **"ইন্না খাবরা রাসূলিল্লাহে ওয়াকি'উন"** অর্থাৎ 'নিশ্চয় আল্লাহ্র রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করবে'- এ থেকে বুঝা যায় যে, কোনো ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছে। প্রত্যেক দু-তিন মাসের মধ্যে কোনো না কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর পরিসমাপ্তি সন্নিকটে, কেননা লেখা আছে, শেষ যুগে নতুন নতুন নিদর্শন প্রকাশিত হবে। তসবির সুতা ছিঁড়ে ফেললে দানাগুলো যেভাবে একের পর এক খসে পড়ে ঠিক তেমনইভাবে একের পর এক নিদর্শন প্রকাশিত হবে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, দু-চার মাস (অতিক্রান্ত হতেই) কোনো না কোনো নিদর্শন অবশ্যই প্রকাশিত হয় আর কোনো বছরই এখন বাদ যায় না। সকল নবীই একথা স্বীকার করেছেন যে, যে-দিন থেকে শেষ যুগের নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ হয় তা এর পূর্বে কখনোই ঘটে নি। (আল-হাকাম, ২৪ আগস্ট ১৯০৭, মলফুযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ২৫৬-২৫৭)

পরিশেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি সতর্কবাণী পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা ... নিরাপদ থাকবে অথবা তোমরা নিজেদের চেষ্টাপ্রচেষ্টায় নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে? কখনোই না। সেদিন মানুষের কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটবে। ... হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও, হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোনো কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে গুড়িয়ে যেতে দেখছি। আমি জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য দেখছি। এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল নীরব ছিলেন, তাঁর চোখের সামনে ঘৃণ্য কাজ করা হয়েছে আর তিনি চুপ ছিলেন। কিন্তু এবার তিনি রুদ্রমূর্তিতে নিজের চেহারা প্রদর্শন করবেন। যার শোনার মতো কান আছে সে শুনে নিক, কেননা সে দিন দূরে নয়।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২৬৯)

(৫)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৩ মে ২০০৩, মোতাবেক ২৩ হিজরত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা হূদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝١

(হূদ: ২)

এর অর্থ হলো, "**আনাল্লাহু আরা** অর্থাৎ আমি আল্লাহ, আমি সর্বদ্রষ্টা। (এটি) এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ সুরক্ষিত ও ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (এগুলো) সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।"

আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'খবীর'

এ আয়াতের তফসীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লেখেন, "এই গ্রন্থের আয়াতসমূহ প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ। এতে যা কিছুই বর্ণনা করা হয়েছে তা মানুষকে পাপ থেকে বিরত রেখে পুণ্যের পথে পরিচালিত করে আর মানুষকে তার গোপন পাপসমূহের বিষয়ে অবহিত করে সেগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে তাকে অবগত করে। এই বাণীতে কোনোকিছুর ঘাটতি নেই এবং অত্যুক্তিও নেই। মোটকথা, অপ্রয়োজনীয় এবং বৃথা বিষয়াদি থেকে মুক্ত থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা এতে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যাখ্যাও যেন এসে যায় সে দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এগুলোর শাখাপ্রশাখাকেও উপেক্ষা করা হয় নি, বরং প্রয়োজন অনুসারে তা-ও বর্ণনা করা হয়েছে।

... **মিল্লাদুন হাকীমিন খবীর** দ্বারা বুঝানো হয়েছে, এর উৎসও মহান। তাই এর বিশদ বর্ণনার ওপর বিশ্বাস রাখা যেতে পারে। পরিস্থিতির দাবি অনুসারে যে কাজ করে তাকে 'হাকীম' বলা হয়। এই গুণবাচক নামের মাধ্যমে এটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানুষের মাঝে খ্যাতি বা সম্মান লাভ করা এই বাণী প্রেরণকারী সত্তার উদ্দেশ্য নয় বরং তাঁর উদ্দেশ্য হলো, মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা। অতএব তিনি এমন কোনো শিক্ষা এতে দেন নি যা বাহ্যত সুন্দর অথচ অভ্যন্তরীণভাবে মন্দ। বরং মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রতিটি শিক্ষাই তিনি এতে উপস্থাপন করেছেন, মানুষ এ কুরআনকে যতই এড়িয়ে চলুক আর এটিকে যতই মন্দ মনে করুক না কেন!

বাহ্যিকভাবে উত্তম আর আভ্যন্তরিকভাবে মন্দ শিক্ষার উদাহরণ হলো ইনজীলের শিক্ষা। যেমন- কেউ যদি তোমার এক গালে চপেটাঘাত করে তাহলে তুমি অপর গালও এগিয়ে দাও। অপরদিকে বাহ্যত শুনতে মন্দ হলেও সত্যিকার অর্থে উত্তম শিক্ষার উদাহরণ

হলো, পবিত্র কুরআনের এ শিক্ষা যে, ধর্মের বিষয়ে যে-সব জাতি জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ করে তাদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করা উচিত। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মানুষের মাঝে সমাদৃত হওয়া তা প্রথমোক্ত শিক্ষামালার ওপর নির্ভর করবে এবং যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সংশোধন, তা মানুষের পছন্দ বা অপছন্দের কথা চিন্তা না করে কল্যাণকর সমস্ত বিষয় বর্ণনা করবে।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১৪১-১৪২)

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আরো বলেন, "খবীর শব্দটি ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত। খবীর শব্দটি প্রকৃত অবস্থা জানার বিষয়ে প্রমাণ বহন করে এবং গুপ্ত বিষয়াবলি জানার প্রতি ইঙ্গিত করে বলে যে, এই গুণের অধিকারী সত্তা অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের বিষয়ে নিশ্চুপ থাকতে পারেন না আর মন্দকর্মের শাস্তি প্রদানের বিষয়টিও উপেক্ষা করতে পারেন না।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১৪২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "**আনাল্লাহু আরাঃ** মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রতিমার সমর্থকরা মহানবী (সা.)-এর যে বিরোধিতা করছে তা আমি দেখছি (যার অর্থ হলো, তাদের দুষ্কৃতি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি আর সে অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে)। এই সূরাতে মহানবী (সা.)-এর শত্রুদের দুষ্কৃতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে ...।

মিল্লাদুন হাকীমিন খবীরঃ এই গ্রন্থ (অর্থাৎ কুরআন) হাকীম খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। সাধারণ এক হাকীম (বা বিচারক) কিছু বললে তার সামনেই যেখানে সাধারণ জনতার আপত্তি করার সাহস নেই, সেখানে এক মহামহিমান্বিত হাকীমের পক্ষ থেকে কিছু বলা হলে আর তা-ও আবার এমন হাকীম যিনি সর্বজ্ঞ তবে তো কোনো কথাই নেই।" (আল-বদর পত্রিকার পরিশিষ্ট, কাদিয়ান, ০৯ ডিসেম্বর ১৯০৯, পৃ. ১২৪)

এখানে আল্লাহ্ তা'লা কেবল এটিই বলেন নি যে, যা কিছু বর্তমানে হচ্ছে তা আমি দেখছি বরং পূর্ববর্তীদের সম্পর্কেও এটি অবহিত করেছেন যে, অস্বীকারের ফলে যে-সব জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং অনাগত যুগে যা কিছু ঘটবে অর্থাৎ, মুসলমান হবার দাবিদাররা সাক্ষ্যদাতা (মসীহ্)-এর সাথে যে ব্যবহার করবে সে সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবগত। অতএব এ কারণেই মহানবী (সা.) (সূরা হূদের যে আয়াত আমি তিলাওয়াত করেছি সে সম্পর্কে) বলেন, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। তাঁর (সা.) পূর্ববর্তী নবীগণের অস্বীকারকারীদের ধ্বংস হবার দুঃখ তো তাঁর ছিলই, (পাশাপাশি) নিজ উম্মতের জন্যও কষ্ট ছিল, কেননা এ উম্মতের দায়িত্বও তাঁর (সা.) স্কন্ধেই অর্পণ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, বর্তমানে একই দায়িত্ব তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং অনুসারীদের ওপরও বর্তায়। প্রকৃতি এবং পরিমাণ উভয় দিক থেকেই এই দায়িত্ব এত বেশি যে, তা পাঠে হৃদয় কেঁপে ওঠে।

অতঃপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, হূদ এবং এ জাতীয় সূরাগুলো আমাকে সময়ের পূর্বেই বৃদ্ধ করে দিয়েছে ...

কেননা তিনি (সা.) দেখতেন যে, তাঁর (সা.) সাথে তওবাকারী লোক কেবল তাঁর (সা.) যুগেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। তাদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব তিনি (সা.) কীভাবে পালন করবেন? এই চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করে এবং তাঁকে বৃদ্ধ করে দেয়। কিন্তু তাঁর (সা.) এরূপ তাকওয়া আল্লাহ্ তা'লা এতটাই পছন্দ করেন যে, এই দায়িত্বভার তিনি নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, আমি তোমার উম্মতের মধ্য হতে সর্বদা এমন মানুষ আবির্ভূত করতে থাকব যারা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমার নৈকট্য লাভ করবে এবং তোমার পক্ষ থেকে এই উম্মতের সংশোধন করবে।

নিজের এবং অন্যদের সংশোধন করা আমাদের দায়িত্ব ...

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর আমল বা ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের বিপরীতে এখন আমাদের ভাবা উচিত যে, আমরা কী করেছি? মহানবী (সা.)-এর মতো নিজেদের সংশোধনের পাশাপাশি অন্য মুমিনদের সংশোধনের প্রতিও মনোযোগী হওয়া আবশ্যক করা হয়েছে। একটু ভাবলেই এ বিষয়টি বোধগম্য হতে পারে যে, একটি পূর্ণাঙ্গীন ব্যবস্থাপনা ব্যতীত এ আদেশ পালন সম্ভব নয়। একজন মুমিন বান্দা তার আশপাশের মুমিনদের নসীহত করতে পারে, কিন্তু কোনো ব্যবস্থাপনা ছাড়া পৃথিবীর সকল মুমিনকে সে কীভাবে নসীহত করতে সক্ষম হবে? কেবল পূর্ণাঙ্গীন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই মানুষ ঘরে বসে সব মুসলমানের খবরাখবর রাখতে পারে, কেননা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সে যখন সাহায্য করে, তা অর্থ, সময়, লেখনী, বক্তব্য অথবা বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমেই হোক না কেন, তখন সে উক্ত ব্যবস্থাপনার একটি অংশ হয়ে যায়। আর এই ব্যবস্থাপনার অধীনে যেখানেই কাজ হয়, তাতে তার অবদান থাকে। বর্তমানে কেবল আহমদীয়া জামা'তই একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে রয়েছে। তোমরা দেখো! কেবল তারাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারের কাজ করে চলেছে।

তিনি বলেন, পাঞ্জাবের কোনো এক গ্রামের কৃষক অথবা আফগানিস্তানের এক প্রান্তে বসবাসকারী কোনো এক আফগান, যে কিনা ভূগোলের সাথে নিতান্ত অপরিচিত, যখন নিজের আয়ের একটি অংশ জামা'তের কোষাগারে দান করে, তখন সে কেবল নিজের দায়িত্বই পালন করে না বরং ইউরোপ, আমেরিকায়, সুমাত্রা, জাভা, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশে এবং দেশসমূহে ইসলাম প্রচারের যে কাজ হচ্ছে তাতে অংশীদার হয়ে যায় আর এই আদেশ পালনের দায়িত্ব একঅর্থে সম্পাদন করে। (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৩, পৃ. ২৬৫)

সংশোধন .... আহমদীয়া জামা'তের দায়িত্ব

অতএব বর্তমানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী আমাদের এই জামা'ত, যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসা ও প্রেমের দাবি করে, তারা এ যুগে মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে এটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আমরা কেবল দাবিই করি না বরং সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, তাঁর (সা.) আদেশ অনুযায়ী আমরা যুগ-ইমামকে চিনেছি এবং মেনেছি। আমরা সেই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন যে, ভবিষ্যতেও তারা জগতের

সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকবে। সুতরাং প্রেমের সেই দাবি বাস্তবায়ন করে দেখানো আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক, বিশেষভাবে মুসলিম উম্মতের ক্ষেত্রে, কেননা তারা আমাদের প্রিয় রসূল (সা.)-এর উম্মত বলে দাবি করে আর মোটের ওপর সমগ্র মানবজাতিকে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষার পতাকাতলে সমবেত করতে হবে। এর পাশাপাশি সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের সংশোধন করতে হবে। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, কেননা উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সবচেয়ে বড়ো তবলীগ। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হই যাদের বিষয়ে উৎকণ্ঠিত দেখে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তোমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণের মাধ্যমে তারা আমার নৈকট্য অর্জন করবে।

আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'খবীর' সম্পর্কে এখন আমি আরো কিছু আয়াত উপস্থাপন করছি।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿۱۸﴾

(বনী ইসরাঈল: ১৮)

অর্থ: "আর নূহের পর আমরা কত প্রজন্মকেই ধ্বংস করে দিয়েছি! আর তোমার প্রতিপালক-প্রভু তাঁর বান্দাদের পাপের খবরাখবর রাখার এবং পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, "জগতের সূচনা থেকেই এমন দৃষ্টান্ত তোমাদের চোখে পড়বে। নূহ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যত নবী এসেছেন সবার যুগে এমনটি হয়ে আসছে। "ওয়া কাফা বিরাব্বিকা বিযুনুবি ইবাদিহি খাবীরাম্ বাসীরা" বলে এটি বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা, যিনি 'খবীর' (সর্বজ্ঞ) এবং 'বাসীর' (সর্বদ্রষ্টা) তিনি তাঁর বান্দাদের ভুল পথে চলতে দেখে কীভাবে চুপ থাকতে পারেন? কতক নির্বোধ উপরোক্ত আয়াতের যে অর্থ করেছে এ বাক্যটি সেসব অর্থকে প্রত্যাখ্যান করে (অর্থাৎ তারা বলে, খোদা তা'লা বড়ো বড়ো মানুষকে পাপাচারী হবার আদেশ দিয়ে থাকেন) কেননা এখানে বলা হয়েছে, শাস্তিপ্রাপ্ত লোকেরা পূর্ব থেকেই পাপাচারী হয়ে থাকে; এমন নয় যে, খোদা তা'লা তাদেরকে পাপী বানিয়ে থাকেন।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৩১৭)

আরেকটি আয়াত হলো–

وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۳۲﴾

(ফাতির: ৩২)

অর্থ: "আর আমরা তোমার প্রতি কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) থেকে যা ওহী করেছি তা-ই (পূর্ণ) সত্য। (এ কিতাব) তার সত্যায়নকারী যা এর সামনে (তথা পূর্ববর্তী কিতাবে) রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, সম্যক দ্রষ্টা।"

'ইনাল্লাহা বিইবাদিহি লাখাবীরুম বাসীর'-এর বরাতে ইমাম রাযি (রহ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার এ আদেশের দুটি দিক রয়েছে।

(১) প্রকৃত অর্থে একথাটি সত্য, কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার ওহী। আর **"ওয়াল্লাহু খাবীর"**-এর অর্থ হলো, তিনি গুপ্ত কথাসমূহ জানেন। 'বাসীর' শব্দের অর্থ হলো, তিনি বাহ্যিক বিষয়গুলিও জানেন। অতএব, তাঁর ওহীতে বাহ্যিকভাবেও আর অভ্যন্তরীণভাবেও কোনোপ্রকার মিথ্যা কথা নেই।

(২) **'ইনাল্লাহা বিইবাদিহি লাখাবীরুম বাসীর'** আয়াতটি মক্কার মুশরিকদের এই আপত্তির উত্তরও হতে পারে যে, এই কুরআন মহামর্যাদাবান কোনো ব্যক্তির প্রতি কেন নাযিল হয় নি?

অতঃপর তিনি বলেন, **'ইন্নাল্লাহা বিইবাদিহি লাখাবীরুম বাসীর'**-এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদের ভিতর সম্পর্কেও অবগত এবং তাদের বাহির সম্পর্কেও জানেন। অতএব তিনি মুহাম্মদ (সা.)-কে মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে (সা.) বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তিনি মনোনীত করেন নি, কেননা তাদের মধ্য থেকে তিনিই তাঁর দৃষ্টিতে সর্বাধিক যোগ্য ছিলেন। (তফসীরে কবীর রাযী, খণ্ড: ২৬, পৃ. ২৪)

তিনি আরো বলেন–

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ
بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾

(আশ-শূরা: ২৮)

অর্থ: "আর আল্লাহ্ যদি তাঁর বান্দাদের রিযক ব্যাপক পরিসরে বৃদ্ধি করে দিতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহাত্মক আচরণ করত, কিন্তু তিনি যা চান এক নির্ধারিত পরিমাপ অনুযায়ী অবতীর্ণ করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সদা অবহিত (এবং তাদের প্রতি) গভীর দৃষ্টি রাখেন।"

এ আয়াত সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) যে-সব কথা বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীকে অপমান করে সে যেন আমাকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল এবং আমি আমার ওলীদের সাহায্যার্থে সবচেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করব, তাদের অসম্মানের কারণে আমার সেভাবে রাগ হয় যেমনটি হয়ে থাকে ক্রোধান্বিত এক বাঘের। আমি কোনো কাজ করতে দ্বিধা করি না অবশ্য এক মুমিনের রূহ কবজ করতে আমি দ্বিধান্বিত হই, যে মৃত্যুকে অপছন্দ করে। যদিও তার এই অসহনীয় অবস্থা আমি অপছন্দ করি কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি তাদের ওপর যা ফরয করেছি সেসব আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করেই কোনো মুমিন বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করে। মুমিন বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে আমার কাছে আসতে থাকে এমনকি একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি। আমি যখন তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি তখন আমি তার কান, চোখ, মুখ ও হাত তথা তার সাহায্যকারী হয়ে যাই।

অতঃপর সে যদি আমার নিকট কিছু যাচনা করে আমি তাকে তা দান করি এবং আমার নিকট যদি কোনো দোয়া করে তবে আমি তার দোয়া গ্রহণ করি। আমার কতক বান্দা আমার নিকট ইবাদতের দ্বার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আমি জানি যে, আমি যদি এটি তাদেরকে বলে দেই তাহলে তাদের মাঝে অহংকার সৃষ্টি হবে যা তাদেরকে বিপথগামী করবে। আবার আমার কতক মুমিন বান্দা এমনও রয়েছে যাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যই সঠিক রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। আমি যদি তাদেরকে দারিদ্র্যে জর্জরিত করি তবে দারিদ্র্য তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেবে। আমার মুমিন বান্দাদের মাঝে কতক এমনও রয়েছে যাদেরকে দারিদ্র্যই সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে। আমি যদি তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেই তবে ধনী হবার কারণেই তারা বিশৃঙ্খলায় বা নৈরাজ্যে নিপতিত হবে। আমি আমার বান্দাদের হৃদয়ের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েই ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। সুতরাং আমি সর্বজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ।

এরপর হযরত আনাস (রা.) এ শব্দগুলো পড়ে দোয়া করেন, **"আল্লাহুমা ইন্নী মিন ইবাদিকাল মু'মিনীনাল্লাযীনা লা ইউসলিহুহুম ইল্লাল গিনা ফালা তুফক্বিরনী বিরাহমাতিকা।"** অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার সেই মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের কেবল স্বাচ্ছন্দ্যই ভালো লাগে। অতএব নিজ কৃপায় তুমি আমাকে দরিদ্র বানিও না। (তফসীরে কুরতুবী)

অতঃপর তিনি বলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

(আল-হুজুরাত: ১৪)

অর্থ: "হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমরা নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ে অবহিত।"

এই আয়াতের তফসীরে আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা বা বাহিরকে জানেন, তোমাদের বংশ সম্পর্কে জানেন আর তোমাদের অভ্যন্তর বা ভিতর সম্পর্কেও জ্ঞাত। তোমাদের অপ্রকাশিত বিষয় তাঁর কাছে অপ্রকাশিত নয়। অতএব তোমরা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হও এবং আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে যেভাবে তাকওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেভাবেই এগিয়ে যাও। (তফসীরে কবীর রাযী, খণ্ড: ২৮, পৃ. ১৪০)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ও অধিক সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী। পুণ্য এবং সৎকর্মের পরিমাণ যার মধ্যে যত বেশি সে তত বেশি সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়। অযৌক্তিক অহংকার এবং আমিত্ব কি সৃষ্টি হচ্ছে না? তাহলে বলো, এই অনুগ্রহের কী মূল্যায়ন করলে? ইসলামের দেখাদেখি ভ্রাতৃত্ব ও

আত্মীয়তাবোধের মতো মর্যাদাপূর্ণ বিষয় এখন অন্যান্য জাতিও অবলম্বন করছে। প্রথমদিকে হিন্দু এবং অন্যান্য জাতির লোকেরা অন্য কোনো ধর্ম ও জাতির লোকদেরকে নিজ ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করা দোষনীয় মনে করত এবং এটি থেকে বিরত থাকত কিন্তু এখন তারা শুদ্ধিও করে এবং অন্তর্ভুক্তও করে নেয়, যদিও পূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তরিকতা নিয়ে নয়। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো! তিনি (সা.) তাঁর আদর্শের মাধ্যমে কী প্রমাণ দিলেন, যায়েদের মতো লোকদের বিয়ে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সাথে হয়েছে। ইসলাম তথা পবিত্র ইসলাম জাতিগত বৈষম্য দূর করেছে। যেভাবে তা পৃথিবীতে একত্ববাদকে জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল এবং এখনো চায়, একইভাবে প্রতিটি কথায় ইসলাম একত্ববাদের প্রেরণা সঞ্চার করেছে এবং তাকওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছে। আর জাতিগত ভেদাভেদ দূর করে দিয়েছে যা ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে ভালোবাসার নীতির প্রতি বিরোধী হতে পারত। চরম অস্বীকারকারী এবং খোদা ও রসূলের অমান্যকারী ইসলাম গ্রহণ করে শেখ অভিহিত হয়। সৌভাগ্যের এই মুকুট এবং নেতৃত্বের এই দৃষ্টান্ত যা ইসলাম স্থাপন করেছিল তার ভিত্তি ছিল কেবল তাকওয়া।" (আল-হাকাম, ০৫ মে ১৮৯৯, পৃ. ০৪)

বংশ নিয়ে ঝগড়া করা মুত্তাকীর শোভা পায় না

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, "জাগতিক রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে কেউ সম্মানিত ও মহৎ হতে পারে না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি বড়ো, যে মুত্তাকী। **ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতক্বাকুম। ইন্নাল্লাহা আলীমুন খাবীর।** বংশের ভিন্নতা কাউকে সম্ভ্রান্ত করে না। আল্লাহ্ তা'লা শুধুমাত্র পরিচিতির জন্যই বংশকুল বানিয়েছেন। বর্তমানে তো চারপুরুষ আগের সঠিক আত্মীয়তা খুঁজে বের করাই দুরূহ। বংশ নিয়ে ঝগড়া করা মুত্তাকীর শোভা পায় না, কেননা আল্লাহ্ তা'লাই যেখানে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যে, আমার দৃষ্টিতে বংশকুল কোনো সনদ হতে পারে না, প্রকৃত সম্মান ও মাহাত্ম্যের কারণ কেবল তাকওয়া।" (জলসা সালানার রিপোর্ট-১৮৯৭, পৃ. ৫০)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "স্বধর্মের দরিদ্র ভাইদের প্রতি কখনো তাচ্ছিল্যভরে তাকিও না। ধনসম্পদ কিংবা বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অযথা গর্ব করে অন্যদেরকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছজ্ঞান করো না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সম্মানিত সে, যে মুত্তাকী। অতএব তিনি বলেন, **ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতক্বাকুম**। যদিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের মাঝে একটি বড়ো অংশ এমন রয়েছে যারা এর (বা তাকওয়ার) ওপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি কখনো কখনো এমন উদাহরণও আমাদের সামনে এসে থাকে। এই শিক্ষাকে এখন আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত। এখনও এমন চিঠি এসে থাকে যাতে একথা লেখা থাকে যে, আমাদের অথবা আমাদের আত্মীয়স্বজনের মেয়েদেরকে দরিদ্র হবার কারণে বিয়ের পরে খোঁটা দেওয়া হয় অথবা জাতপাত নিয়ে খোঁটা দেওয়া হয়। এ কথাগুলো এমন যা বিয়ের পূর্বেই চিন্তা করা উচিত। জাতপাত বা দরিদ্রতা এবং বাড়িঘর সম্পর্কে কি প্রথমে জানা ছিল না? এটি খুবই অন্যায় কথা। কোনো জায়গায় বিয়ে করতে কেউ আপনাকে বাধ্য করে নি।

স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে বিয়ে করার পর এ ধরনের খোঁটা দেবার বা এ ধরনের কথা বলার কোনো কারণ নেই। কিছুটা হলেও খোদাকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত করুন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং আধুনিক আবিষ্কারাদি

পবিত্র কুরআনে আরো অনেক ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং আগাম সংবাদ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"ওয়া ইযাল ইশারু উত্তিলাত"** অর্থাৎ, 'আর যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী কোনো নিগরানী ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হবে।

সূরা তাকভীর-এর এই আয়াতের তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কুরআন এবং হাদীস উভয়টি বলছে যে, মসীহ্‌র যুগে উষ্ট্রী পরিত্যক্ত হবে অর্থাৎ এর পরিবর্তে অন্য কোনো যানবাহন আবিষ্কার হবে। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে বিদ্যমান। হাদীসের শব্দগুলো হলো, **'ওয়া ইউতরাকান্নাল কালাসু ফালা ইউসআ আলাইহা'** আর কুরআনের শব্দগুলো হলো, **'ওয়া ইযাল ইশারু উত্তিলাত'**। শিয়াদের পুস্তকাদিতেও এই হাদীসটি বিদ্যমান, কিন্তু এই লক্ষণকে কেউ কি বিন্দুমাত্র মূল্যায়ন করেছে? এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর চিত্তাকর্ষক দৃশ্য মক্কা এবং মদীনায় স্পষ্টভাবে সামনে আসবে যখনকিনা উটের এক লম্বা লাইনের পরিবর্তে রেলের বগি দেখা যাবে এবং তেরোশ বছরের বাহনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে একটি নতুন বাহন সামনে আসবে। সে সময় সেই মুসাফিরদেরকে যখন এই আয়াত **'ওয়া ইযাল ইশারু উত্তিলাত'** এবং এই হাদীস **'ওয়া লাইউতরাকান্নাল কালাসু ফালা ইউসআ আলাইহা'** পড়ে শুনানো হবে তখন কতটা গুরুত্ব দিয়ে তাদের এটি মানতে হবে যে, আজকের যুগের জন্য সত্যিই এটি একটি নিদর্শন এবং মহান ভবিষ্যদ্‌বাণী যা আমাদের মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী ছিল আর আজ তা পূর্ণ হলো"। (নুযুলুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ৪০৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ এ যুগে এটিও এজন্য সামনে আনা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি যার যুগে এ দেশে রেল চলাচল শুরু হয়ে উট পরিত্যক্ত হয়েছে। অচিরেই সে সময় আসছে বরং ঐ সময় খুবই সন্নিকটে যখন মক্কা ও মদীনার মাঝে রেল চলাচল আরম্ভ হয়ে সেসব উট বেকার হয়ে যাবে, যা তেরোশ বছর যাবৎ এই আশিসমণ্ডিত সফর করত। উট সম্পর্কিত সহীহ মুসলিমের এই হাদীস **"লাইউতরাকান্নাল কালাসু ফালা ইউসআ আলাইহা"** তখনই পূর্ণ হবে; অর্থাৎ, মসীহ্‌র যুগে উট বেকার করা হবে এবং সেগুলোতে কেউ ভ্রমণ করবে না।" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৩৬)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **"ওয়া ইযাস সুহুফু নুশিরাত"** (আত-তাকভীর: ১১) অর্থাৎ, "এবং বইপুস্তক যখন (ব্যাপকহারে) প্রকাশ করা হবে।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেন, "একইভাবে কুরআন শরীফে আখেরি জামানা

সম্বন্ধে আরো ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে এই ভবিষ্যদ্‌বাণীও রয়েছে যে, **'ওয়া ইযাস সুহুফু নুশিরাত'** অর্থাৎ আখেরি জামানা তখন হবে যখন বইপুস্তক এবং গ্রন্থাদি এত বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হবে যা ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। এটি সেসব ছাপাখানার দিকে ইঙ্গিত করছে যা দ্বারা বর্তমানে বইপুস্তক ছাপা হয় এবং তারপর রেলগাড়িযোগে শতসহস্র ক্রোশ দূরে তা পৌঁছানো হয়।" (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২৩, পৃ. ৩২২)

প্রাচীনকালে গাছের পাতা, ছালবাকল, হাড়, পাথর প্রভৃতির ওপর লেখার প্রচলন ছিল যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু রীতিমতো লিখন পদ্ধতির সূচনা হয় চীন দেশে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ৭৭০ সালে প্রকাশিত প্রথম পুস্তকটি চীনের।

যাহোক, এ প্রযুক্তি এখন প্রতিনিয়ত উন্নতি করে চলেছে। এর নতুন নতুন রূপ যেমন- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারাইজড ছাপাখানা আবার বর্তমানে ইমেইল বা এ ধরনের বিভিন্ন জিনিসের প্রচলন রয়েছে যার সবই ঐশী সেই সংবাদ **'ওয়া ইযাস সুহুফু নুশিরাত'**-এর সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

অতঃপর তিনি বলেন,

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(আন-নাহল: ৯)

অর্থ: "আর (তিনি) ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা (সৃষ্টি করেছেন) যেন তোমরা এগুলোতে আরোহণ করতে পারো এবং (এগুলো যেন তোমাদের) শোভাবর্ধনের কারণও হয়। এছাড়া তিনি (তোমার জন্য) আরো (বাহন) সৃষ্টি করবেন, যা তোমরা এখনো জানো না।"

এই আয়াতস্থ সূরার পরিচিতিমূলক নোটে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, "সকল প্রাণী সৃষ্টি করার কথা বলার পর এই মহান ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে যে, এ জাতীয় আরো অনেক যানবাহন আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করবেন যে সম্পর্কে এখন তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। সুতরাং বর্তমান যুগের আবিষ্কৃত নতুন নতুন যানবাহনের ভবিষ্যদ্‌বাণী এই আয়াতে করা হয়েছে।"

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন রয়েছে এবং সেগুলোর জ্বালানিও ভিন্ন ভিন্ন, যার মাধ্যমে তা চলে থাকে। সৌরশক্তির মাধ্যমে চলে এমন যানবাহনও বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

অতঃপর উন্নত জাতিসমূহের পতনের খবরও রয়েছে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

(আল-ফীল: ২-৬)

অর্থ: "তুমি কি লক্ষ করে দেখো নি, তোমার প্রতিপালক-প্রভু হস্তীবাহিনীর সাথে

কীরূপ আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দেন নি? আর তিনি (এরপর) তাদের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন, যারা শুকনো মাটি ও কংকর মিশ্রিত শক্ত পাথরে তাদের (মাংস) আছড়ে মারত। ফলে তিনি তাদেরকে চর্বিত খড়কুটার মতো করে দিলেন।"

এর তফসীরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, "বস্তুবাদী জাতিসমূহের উন্নতি অবশেষে সেই চরম শিখরে গিয়ে থেমে যাবে যখন সকল মহাশক্তি ইসলামকে ধূলিসাৎ করার জন্য উঠেপড়ে লাগবে। কুরআন করীম অতীতের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলে যে, ইতিপূর্বেও 'উম্মুল কুরা' অর্থাৎ মক্কাকে বাহ্যত বড়ো বড়ো শক্তিধর জাতি ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। তারা ছিল আসহাবুল ফীল অর্থাৎ বড়ো বড়ো হাতির মালিক। কিন্তু তারা বড়ো বড়ো হাতিতে আরোহণ করে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই সমুদ্র তীরবর্তী পাহাড়ের গর্তে বসতি গড়া আবাবিল পাখি তাদের ওপর এমন সব নুড়িপাথর নিক্ষেপ করে যাতে বসন্তের জীবাণু ছিল। এতে গোটা সৈন্যবাহিনীর মাঝে ভয়ংকর সেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং নিমিষেই তারা এমন লাশের স্তূপে পরিণত হয় যেমনটি চর্বিত খড়কুটো হয়ে থাকে। লাশখেকো পাখিরা তাদের শরীরের মাংস ছিঁড়ে সজোরে মাটিতে আছড়াতো। অতএব ভবিষ্যতেও কোনো জাতি যদি শক্তির বড়াই করে ইসলাম অথবা মক্কার অসম্মান ও ধ্বংসের দুরভিসন্ধি করে তবে তাদেরকেও একইভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।"

চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়া

অতঃপর রয়েছে চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হবার সংবাদ। বলা হয়েছে, **"ইক্বতারাবাতিস সাআতু ওয়ানশাক্কাল কামারু"** অর্থাৎ, সময় নিকটবর্তী হলো এবং চাঁদ ফেটে গেল।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর মক্কায় অবস্থানকালীন সময়েই ইলহাম হয়, **'ইক্বতারাবাতিস সাআতু ওয়ানশাক্কাল কামারু।'** ইসলামের উন্নতির সময় এসে গেছে এবং আরব সাম্রাজ্য ধ্বংস করা হয়েছে। চন্দ্র দ্বারা আরবকে বুঝানো হয়েছে। কোনো ব্যক্তির স্বপ্নে চাঁদ দেখার অর্থ হলো, তাকে আরবের শাসনক্ষমতার অবস্থা সম্পর্কে জানানো হচ্ছে। সুতরাং চাঁদ বিভক্ত হবার অর্থ ছিল আরবের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা (রা.) যখন প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় থাকতেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গলা যখন চেপে ধরা হতো আর তাঁর (সা.) গলায় কাপড় প্যাঁচানো হতো, কা'বাঘরে যখন তাঁর (সা.) নামায পড়ারও অনুমতি ছিল না এবং সমগ্র মক্কায় যখন তাঁর (সা.) বিরোধিতার আওয়াজ গুঞ্জরিত হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কাবাসীকে সংবাদ দেন, খোদা তা'লা আরব সাম্রাজ্য ধ্বংসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের বিজয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এরপর কয়েক বছরের মধ্যেই এ ভবিষ্যদ্বাণী কত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে (তা দেখুন)! কীদারের সমস্ত প্রতিপত্তি ধুলায় মিশানো হয়। ইসলামের পতাকা সমুন্নত করা হয়। চাঁদ বিদীর্ণ হয়। কিয়ামত সংঘটিত হয় আর এক নতুন আকাশ ও নতুন ভূমি সৃষ্টি করা হয়।" [দীবাচা তফসীরুল কুরআন (কুরআনের তফসীরের ভূমিকা), পৃ. ২৮৩]

এরপর মহানবী (সা.)-এর কিছু হাদীস রয়েছে যা আমি উপস্থাপন করছি, যাতে হযরত যায়েদ (রা.) এবং হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, (আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে) রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত জাফর এবং হযরত যায়েদ (রা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ তাদের মৃত্যুর পূর্বেই প্রদান করেন যখন তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। (বুখারী কিতাবুল মাগাযী বাব আযুহু মাওতুহু মিন আরযি শাম)

মহানবী (সা.)-প্রদত্ত এই সংবাদ অনুযায়ী যে-দিন তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে হযরত যায়েদ এবং হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দিয়েছিলেন ঠিক সেদিনই মু'তার ময়দানে উভয় সাহাবীর শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে যে ব্যক্তি তাদের শাহাদাতের সংবাদ নিয়ে এসেছিল তার সংবাদ থেকেই এ ঘটনার সত্যায়ন হয়।

এছাড়া তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে সুসময়েরও সংবাদ দেন। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, "তোমাদের কাছে কি গালিচা আছে? আমি বললাম, হুযূর! আমাদের কাছে গালিচা কোথা থেকে আসবে! রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, খুব শীঘ্রই তোমাদের কাছে গালিচাও থাকবে। অতঃপর সেই যুগ আসে যখনকিনা আমি আমার স্ত্রীকে বলি, আমার রাস্তা থেকে গালিচা সরিয়ে ফেলো। তখন আমার স্ত্রী বলে, মহানবী (সা.) কি বলেন নি, অচিরেই তোমাদের কাছে গালিচা থাকবে? এই উত্তর শুনে আমি সেই গালিচাগুলোকে বিছিয়ে রাখতে দেই।" (বুখারী কিতাবুল মানাকেব, বাব এলামাতুন নবুওয়্যাতি ফিল ইসলাম)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি দেখেছি যে, কালো বকরির পাল আমার পেছনে আসছে এবং এর পেছনে রয়েছে মেটে রঙের বকরির পাল। এটি শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই আরববাসী আপনার অনুবর্তিতা করবে আর এরপর অনারব লোকেরা তাদের অনুসরণ করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ফেরেশতারাও এই একই ব্যাখ্যা করেছে। [লেখক ইবনে আবি শেবা, খণ্ড: ১১, পৃ. ৫৯, কিতাবুল ঈমান ওয়ার রুইয়া বাব মা কালু ফিমা ইয়াখবিরুন নাবী (সা.) মিনার রুইয়া, হাদীস নম্বর: ১০৫২৭]

অতঃপর মুসলমান এবং অন্যান্য জাতিসমূহের আক্রমণ করার সংবাদ রয়েছে।

আব্দুর রহমান, বিশর, ইবনে জাবের, আবু আব্দিস সালাম ও সওবান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, অচিরেই অন্যান্য জাতিসমূহ তোমাদের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করবে যেভাবে খাদ্য গ্রহণকারীরা কোনো খাবারের পাত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এক ব্যক্তি নিবেদন করে, আমাদের সংখ্যা স্বল্প হবার কারণে কি এমনটি হবে? তিনি (সা.) বলেন, না। সেই যুগে তোমাদের সংখ্যা হবে অনেক কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে নদীর পানির উপরিভাগের ময়লা ও কুটামিশ্রিত ফেনার ন্যায়। আল্লাহ্ শত্রুদের হৃদয় থেকে তোমাদের প্রতাপ বা ভয় বের করে দেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে **'ওয়াহান'** সঞ্চার করবেন। এক ব্যক্তি নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! **'ওয়াহান'** কী? তিনি (সা.) বলেন, এটি হলো জগতের প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুর ভয়। (সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল মুলাহেম, বাব ফি তুদাঈল উমামি আলাল ইসলাম)

বর্তমানে আমরা এমনটিই দেখতে পাচ্ছি।

আখেরি জামানার ব্যাবসাবাণিজ্য সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী যুগ যখন আসবে তখন কেবল বিশেষ শ্রেণির মানুষকেই সালাম দেওয়া হবে, আর ব্যাবসাবাণিজ্য এত বেশি ছড়িয়ে পড়বে যে, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের ব্যবসায় সাহায্য করবে এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ০১, পৃ. ৪১৯, বৈরূত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! জান্নাত যদি আকাশ ও পৃথিবীময় বিস্তৃত হয়ে থাকে তাহলে দোযখ কোথায়? তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি দেখো নি! রাত আসলে দিন কোথায় চলে যায়? সে বলে, আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক সেভাবেই আল্লাহ্ তা'লা যা চান তা-ই করেন। (আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, কিতাবুল ঈমান, খণ্ড: ০১, পৃ. ৯২, হাদীস নম্বর: ১০৩)

সে যুগে এটি বুঝা কঠিন ছিল, কিন্তু এতে যে বিভিন্ন ডাইমেনশনের অস্তিত্বের সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা বর্তমানে মানুষ বুঝতে সক্ষম।

অতঃপর ভবিষ্যতে ঘটিতব্য যে-সব বিষয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন তার কতক উদাহরণ তুলে ধরছি। তিনি (আ.) বলেন, "আমার নিষ্ঠাবান বন্ধু মৌলবি নূরুদ্দীন সাহেবের এক পুত্র মারা গিয়েছিল, যে ছিল তাঁর একমাত্র ছেলে। তার মৃত্যুতে কতক নির্বোধ শত্রু এ বলে আনন্দে বগল বাজায় যে, মৌলবি সাহেব অপুত্রক হয়ে গেলেন। তখন আমি তার জন্য অনেক দোয়া করি এবং দোয়া করার পর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয় যে, তোমার দোয়ার ফলে একজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং সে যে কেবল দোয়ার মাধ্যমেই জন্ম নিয়েছে– এর প্রমাণস্বরূপ বলা হয় যে, তার শরীরে অনেক ফোঁড়া বের হবে। অতএব সেই পুত্রের জন্ম হয় যার নাম রাখা হয় আব্দুল হাই এবং তার শরীরে অসংখ্য অস্বাভাবিক ফোঁড়া বের হয় যেগুলোর দাগ এখনও রয়েছে। আর ফোঁড়া হবার এই নিদর্শন সেই ছেলের জন্মের পূর্বেই বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২৩০)

সাদউল্লাহ্ লুধিয়ানভীর মৃত্যুর সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "সেসব নিদর্শনের মাঝে একটি হলো সাদউল্লাহ্ লুধিয়ানভীর মৃত্যু যা ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী প্রকাশ পেয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মুনশি সাদউল্লাহ্ লুধিয়ানভী যখন অপলাপ এবং নোংরা কথাবার্তায় সীমাতিক্রম করে এবং স্বলিখিত গদ্য ও পদ্যে আমাকে এত বেশি গালমন্দ করে যে, ... আমার বিশ্বাস হয় না, পৃথিবী সৃষ্টি অবধি কোনো নবী এবং প্রেরিতকে কেউ এত নোংরা ভাষায় গালাগালি করেছে। যে ব্যক্তি তার বিরোধিতামূলক কবিতা, গদ্য এবং বিজ্ঞাপনসমূহ দেখেছে তার জানা থাকবে যে, আমার ধ্বংস এবং বিনাশের জন্য, অধিকন্তু আমার লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতা দেখার জন্য সে কতটা লালায়িত ছিল এবং আমার বিরোধিতায় তার হৃদয় কতটা নোংরা হয়ে গিয়েছিল! অতএব এসব কারণে আমি তার ব্যাপারে এই দোয়া করি যে, আমার জীবদ্দশাতেই যেন সে ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনার মৃত্যু দেখে।

খোদা তা'লা-ও এমনটি করেন এবং ১৯০৭ সালে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই নিউমোনিয়া-প্লেগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে শতসহস্র আক্ষেপসহ নশ্বর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় ... আর যে ভবিষ্যদ্‌বাণীতে আমি লিখেছিলাম, ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনার সাথে আমার সামনেই সে মারা যাবে, তা 'আঞ্জামে আথম' পুস্তকের আরবী পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে আর তা হলো, তুমি তোমার নোংরামি দ্বারা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। অতএব তোমার মৃত্যু যদি লাঞ্ছনার সাথে না হয় তাহলে আমি সত্য নই। আর শুধু তোমার লাঞ্ছনাতেই বিষয়ের সমাপ্তি ঘটবে না বরং খোদা তোমাকে তোমার দলবলসহ লাঞ্ছিত করবেন এবং আমাকে সম্মানিত করবেন আর মানুষ আমার পতাকাতলে সমবেত হবে।

হে আমার খোদা! তুমি আমার এবং সাদউল্লাহ্‌র মাঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করো। অর্থাৎ, যে মিথ্যাবাদী তাকে সত্যবাদীর সামনে ধ্বংস করো। হে সর্বজ্ঞানী ও সর্বজান্তা খোদা! যিনি আমার হৃদয় ও আমার অভ্যন্তরের গুপ্ত বিষয়াদি দেখছেন, হে আমার খোদা! প্রার্থনাকারীদের জন্য তোমার অনুগ্রহের দ্বারসমূহ আমি সদা উন্মুক্ত দেখি। সুতরাং সাদউল্লাহ্‌র বিষয়ে আমি যে দোয়া করেছি তুমি তা কবুল করো এবং তা প্রত্যাখ্যান কোরো না অর্থাৎ আমার জীবদ্দশাতেই তাকে লাঞ্ছনাকর মৃত্যু দাও।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬)

অতঃপর রয়েছে কাংড়ার ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্‌বাণী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "ভূমিকম্প সম্পর্কে আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলাম যা আল-হাকাম ও আল-বদর পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল আর তা হলো, একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আসতে যাচ্ছে যা পাঞ্জাবের কোনো কোনো অংশে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করবে। ভবিষ্যদ্‌বাণীর পুরো বাক্যটি হলো, "ভূমিকম্পের আঘাত, আফাতিদ দায়ারু মাহিল্লুহা ওয়া মাক্বামুহা।" সুতরাং এই ভবিষ্যদ্‌বাণী ১৯০৫ সালের ৪ এপ্রিলে পূর্ণ হয়েছে।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২৩১)

এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী কাংড়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প আসে যার ফলে হিন্দুদের বিখ্যাত মন্দির মাটিতে মিশে যায়। ধর্মশালা ও বিভিন্ন স্থানে যে-সব ছাউনি ছিল সেগুলোও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Cautious Estimation অর্থাৎ সতর্ক অনুমান অনুযায়ী বলা হয় যে, প্রায় বিশ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে আর এটিও আল্লাহ্‌র তা'লার বিস্ময়কর নিদর্শন যে, এতে কোনো আহমদীর প্রাণহানি বা সম্পদহানি হয় নি।

এরপর কাংড়ার ভূমিকম্পের অবস্থা বর্ণনা করে হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) নিজের বই **'যিকরে হাবীব (আ.)'**-এ বলেন, "১৯০৫ সালের ৪ এপ্রিল সকালে যখন পাঞ্জাবে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে এবং কাংড়ার পাহাড়ে অবস্থিত কয়েকটি বস্তি বা জনপদ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় আর হিন্দুদের দেবী জ্বালামুখীর অগ্নি নিভে যায় ও ভবন ধ্বসে পড়ে, তখন সকাল প্রায় সাড়ে ছয়টার সময়ে কাদিয়ানেও প্রচণ্ড ভূমিকম্প অনুভূত হয় কিন্তু খোদার কৃপায় লাহোর এবং অমৃতসরে যেমন কয়েকটি বাড়ি ধ্বসে পড়েছে, মানুষ মারা গিয়েছে এবং অনেকে আহত হয়েছে, কাদিয়ানে তেমন কোনো দুর্ঘটনাই সংঘটিত হয় নি। সে দিনগুলোতে আমি কিছুটা অসুস্থ ছিলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার

চিকিৎসা করছিলেন। প্রতিদিন নতুন ঔষধ আনিয়ে আমার জন্য নিজ হাতে একটি বড়ি পাঠিয়ে দিতেন। সেসময় আমি আমার পরিবারের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাড়ির **'গোল কামরা'** নামে খ্যাত কক্ষে অবস্থান করছিলাম। ১৮৯১ সালের প্রথমদিকে কাদিয়ানে প্রথমবার এসে আমি এখানেই অবস্থান করেছিলাম। যেহেতু ভূমিকম্পের এই বড়ো ধাক্কা আসার পরও কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তর হালকা ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছিল তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঘর ছেড়ে বাগানের খোলা জায়গায় সাময়িক তাঁবু খাটানোর প্রস্তাব দেন। অধিকাংশ বন্ধু পরিবারসহ বাইরে চলে যান। ছোটো ছোটো ঝুপড়ি ঘর বানানো হয় আর কয়েকজন তাঁবু বানিয়ে নেয় আর এভাবে কয়েক মাস পর্যন্ত সেই বাগানে অবস্থান করা হয়। সে সময় জাপানের একজন অধ্যাপক উমুরী সাহেব যিনি ভূমিকম্প বিষয়ক গবেষক এবং পর্যালোচক ছিলেন, এই ভূমিকম্পের ওপর গবেষণা করতে ভারতে এসেছিলেন। গবেষণার পর তিনি বিশেষজ্ঞ মতামত দেন যে, এখানে আগামী কয়েক বছর পর্যন্ত আর কোনো ভূমিকম্প হবে না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ করেছিলেন যে, বসন্তকালে আবার ভূমিকম্প হবে। সে অনুসারে পরবর্তী বছর পুনরায় এমনই এক শক্তিশালী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।" (মওলানা মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব রচিত 'যিকরে হাবীব' পুস্তক, পৃ. ১২৬)

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা ইলহাম করেন, "ভূমিকম্প এসেছে এবং প্রচণ্ডভাবে আঘাত হেনেছে। ভূমিকে ওলটপালট করে দিয়েছে"।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেন, "সেদিন আকাশ থেকে সুস্পষ্ট ধোঁয়া অবতীর্ণ হবে আর ভূমি হলুদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ চরম দুর্ভিক্ষের লক্ষণাবলি প্রকাশিত হবে। বিরুদ্ধবাদীরা তোমাকে লাঞ্ছিত করার পর আমি তোমাকে সম্মানিত করব এবং তোমাকে মর্যাদা দান করব। তারা চাইবে তোমার কাজ যেন অসম্পূর্ণ থাকে, কিন্তু তোমার সমস্ত কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে পরিত্যাগ করতে চান না। আমি রহমান। আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করব এবং প্রতিটি বিষয়ে আমি তোমাকে কল্যাণরাজিতে ভূষিত করব।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ৯৮)

হুযূর (আ.) একস্থানে বলেন, "স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে শাস্তি সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা সেই শাস্তির জন্য বার বার যালযালাহ (বা ভূমিকম্প) শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদিও বাহ্যিকভাবে সেটি ভূমিকম্প আর (ভবিষ্যদ্বাণীর) শব্দাবলিও বাহ্যত এটিই বলে যে, এটি ভূমিকম্পই হবে কিন্তু রূপকের ব্যবহার যেহেতু ঐশী রীতিভুক্ত বিষয় তাই এটিও বলতে পারি যে, খুব সম্ভব এটি ভূমিকম্পই হবে বা পিত্ত পানি করে দেবার মতো কোনো অস্বাভাবিক আযাব হবে যা নিজের মাঝে ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য রাখে।" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "স্মরণ রাখা প্রয়োজন! খোদা আমাকে সর্বজনীনভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। অতএব নিশ্চিত জেনে রাখো! ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেভাবে আমেরিকায় ভূমিকম্প হয়েছে তদ্রূপ ইউরোপেও হয়েছে, এমনকি

এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও হবে। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি হবে কিয়ামতসদৃশ। এত অধিক লোক মারা যাবে যে, রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। এ মৃত্যু হতে পশুপাখিও নিষ্কৃতি পাবে না। পৃথিবীতে এত ভয়ংকর ধ্বংসলীলা নেমে আসবে যে, মানুষের সৃষ্টি অবধি এরূপ ধ্বংসলীলা কখনো আসে নি। অধিকাংশ অঞ্চল এমনভাবে লন্ডভন্ড হয়ে যাবে যা দেখে মনে হবে, সেখানে কখনো কোনো জনবসতি ছিল না। সেই সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে আরো ভয়ংকর বিপদাবলি দেখা দেবে এমনকি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টিতে এগুলো অস্বাভাবিক বলে মনে হবে। আর জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের পুস্তকাবলির কোনো পৃষ্ঠায় এর কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হবে যে, এটি কী হতে যাচ্ছে? অনেকে মুক্তি পাবে আবার অনেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐ দিন সন্নিকট বরং আমি দেখছি ঐ দিন দ্বারপ্রান্তে উপনীত যেদিন জগদ্‌বাসী এক কিয়ামতের দৃশ্য দেখবে। কেবল ভূমিকম্পই নয় বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলি দেখা দেবে। কিছু হবে আকাশ হতে এবং কিছু ভূপৃষ্ঠ হতে। এমনটি হবার কারণ হলো, মানবজাতি তাদের খোদার উপাসনা করা ছেড়ে দিয়েছে এবং তারা তাদের পুরো অন্তর, পুরো সংকল্প ও সকল ধ্যানধারণা জাগতিকতার জন্যই উজাড় করে রেখেছে ... সবাইকে আমি খোদার আশ্রয়ে একত্র করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এ দেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগ তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লূতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাবে কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অতএব তওবা করো যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয়, কীট। তাঁকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নয়, মৃত।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২৬৮-২৬৯)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "হে যারা শুনছ! তোমরা স্মরণ রেখো! এই ভবিষ্যদ্‌বাণী যদি শুধু সাধারণভাবে পূর্ণ হয়, তাহলে তোমরা নিশ্চিত জেনো, আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত নই। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হবার সময় যদি পৃথিবীতে এক মহাবিপর্যয় নেমে আসে, ব্যাকুলতার আতিশয্যে মানুষ উন্মাদের ন্যায় হয়ে যায় এবং অধিকাংশ স্থলে অট্টালিকাসমূহ এবং প্রাণিকুল ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তোমরা সেই খোদাকে ভয় করো যিনি আমার সমর্থনে এসব প্রদর্শন করেছেন।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যা, পৃ. ০৪, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৩৯৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু ইলহামও রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, "মহাপ্রতাপান্বিত খোদা আমাকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, কতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং কতক রাজাবাদশাকেও তিনি আমার জামা'তভুক্ত করবেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, আমি তোমাকে কল্যাণের পর কল্যাণ দান করব। এমনকি বাদশারা তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ সন্ধান করবে।

এর কিছুটা আমরা পূর্ণ হতেও দেখেছি এবং ভবিষ্যতেও দেখব, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর রয়েছে ১৮৮৩ সালের এই ইলহামটি। তিনি (আ.) বলেন, **"ইন্না আনযালনাহু**

কারীবাম মিনাল কাদিয়ান। ওয়া বিল হাক্কি আনযালনাহু ওয়া বিল হাক্কি নাযালা। সাদাকাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু। ওয়া কানা আমরুল্লাহি মাফউলা।" অর্থাৎ আমরা এসব নিদর্শন ও বিস্ময়কর বিষয়াদি এবং গভীর তত্ত্ব ও তথ্য-সংবলিত ইলহাম কাদিয়ানের নিকটে অবতীর্ণ করেছি এবং যথাযথ প্রয়োজনের ভিত্তিতে অবতীর্ণ করেছি আর সঠিক প্রয়োজনেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) যে-সব সংবাদ দিয়েছিলেন তা যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে এবং খোদা যা কিছু চেয়েছিলেন তা হবারই ছিল।" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০১, পৃ. ৫৯৩, অবশিষ্ট টীকা সংযুক্ত টীকা নম্বর: ৩, তাযকেরা, পৃ. ৭৪-৭৫, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত)

তিনি (আ.) বলেন, এরপর আরেকটি ইলহাম হলো, "মহাপ্রতাপান্বিত খোদা আমাকে জানিয়েছেন, **'ইউসাল্লুনা আলাইকা সুলাহাউল আরাবে ওয়া আবদালুশ শামে ওয়া তুসাল্লি আলাইকাল আরযু ওয়াস সামাউ ওয়া ইয়াহমাদুকাল্লাহু আন আরশিহি'**।" (মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখা থেকে, আগস্ট ১৮৮৮, আল-হাকাম, খণ্ড: ০৫, সংখ্যা: ৩২, ৩১ আগস্ট ১৯০১, তাযকেরা, পৃ. ১৬২, প্রকাশ সন: ১৯৬৯)

সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এর অনুবাদ এভাবে করেছেন যে, 'তোমার প্রতি আরবের পুণ্যবানরা এবং পারস্যের পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা দরূদ প্রেরণ করবে। আকাশ ও পৃথিবী তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে এবং আল্লাহ্ তা'লা আরশ হতে তোমার প্রশংসা করেন।

(৬)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ৩০ মে ২০০৩, মোতাবেক ৩০ হিজরত, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ. وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

(আল-আনআম: ১০৪)

অর্থাৎ "দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না, কিন্তু তিনি নিজেই দৃষ্টিতে ধরা দেন। আর তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সম্যক পরিজ্ঞাত।"

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদা তা'লার সত্তা হলো গোপনের মাঝে লুক্কায়িত, অদৃশ্যের অদৃশ্য এবং মহাপর্দার অন্তরালে। বুদ্ধি তাঁকে আবিষ্কার করতে পারে না। যেমনটি তিনি নিজেই বলেন–

لَاتُدْرِكُهُ الْاَ بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ

অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। এগুলোর সর্বোচ্চ দৌড় কতটুকু তা তিনি অবগত এবং এদের ওপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। অতএব, কেবল বুদ্ধির জোরে তাঁর তওহীদ বা তাঁকে এক বিশ্বাস করা অসম্ভব কেননা, বাস্তবিক অর্থে তওহীদ হলো, মানুষ যেভাবে জগতের মিথ্যা উপাস্যগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অর্থাৎ, প্রতিমা অথবা মানুষ কিংবা চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতির পূজা থেকে যেভাবে বিরত হয় ঠিক সেভাবে অভ্যন্তরীণ মিথ্যা উপাস্যগুলিকে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ নিজের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের ওপর ভরসা করে আর এদের মাধ্যমে আক্রান্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা। অতএব, এমতাবস্থায় স্পষ্ট যে, আমিত্ব পরিহার এবং রসূলের আঁচল ধরা ছাড়া পরিপূর্ণ তওহীদ বা খাঁটি একত্ববাদী হওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তি নিজের কোনো শক্তিকে সৃষ্টিকর্তার শরীক সাব্যস্ত করে তাকে কীভাবে একেশ্বরবাদী বা একত্ববাদী বলা যেতে পারে?" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ১৪৭, ১৪৮)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আপন সত্তার বিকাশ না ঘটালে অন্য কোনো উপায় নেই যার মাধ্যমে তাঁর সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত হতে পারে।

لَاتُدرِكُهُ الاَبصَارُ وَ هُوَ يُدرِكُ الاَبصَار

-দ্বারাও এটি বুঝা যায় যে, তিনি নিজে যদি চোখে আলো দেন তবেই দেখা সম্ভব অন্যথায় নিজ যোগ্যতাবলে তাঁকে চেনার সাধ্য চোখের নেই।" (আল-বদর, খণ্ড: ০২, সংখ্যা: ৪৭, ১৬ ডিসেম্বর ১৯০৩, পৃ. ৩৭৩)

এখন আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম "খবীর" সম্পর্কে আরো কিছু আয়াত উপস্থাপন করছি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ. اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

(আল-হাশর: ১৯)

"হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ রাখা উচিত, সে আগামীকালের জন্য কী আগাম প্রেরণ করছে? আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবগত।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! সবসময় খোদাকে ভয় করো এবং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন দৃষ্টি রাখে যে, আমি পরকালের জন্য কোন সম্পদ আগাম প্রেরণ করলাম। সেই খোদাকে ভয় করো যিনি সর্ব অবহিত ও সর্বজ্ঞ। আর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন। অর্থাৎ তিনি খুব ভালোভাবে জানেন এবং (ভালো-মন্দের) পরখকারী, তাই তোমাদের (ত্রুটিপূর্ণ) কর্ম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করবেন না। যারা মন্দ কাজ করেছে, সেসব কাজই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। অতএব তারা কখনো খোদাকে দেখবে না।" (সত্ বচন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১০, পৃ. ২২৫-২২৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করো। আর প্রত্যেকের অত্যন্ত মনোযোগের সাথে যাচাই করে দেখা উচিত যে, আগামীর জন্য সে কী করেছে? আমরা যে-সব কাজ করে বসি সেসবের ফলাফল আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না তাই যে কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হবে না– তা ভীষণ ক্ষতিকর হবে। কিন্তু যে কাজ আল্লাহ্‌র খাতিরে করা হয়, সর্বশক্তিমান ও অদৃশ্যে পরিজ্ঞাত খোদা, যিনি সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার আধার, তিনি সেগুলোকে লাভজনক ও উত্তম ফলবাহী বানিয়ে দেন।" (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৬৬)

এরপর তিনি [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)] আরো বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো এবং প্রত্যেকের সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, আগামীর জন্য সে কী করেছে? অধিকন্তু তাকওয়াকে তার নিজের পরিচিতি বানিয়ে নেওয়া উচিত। তোমরা যা-ই করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

বস্তুত ইহকাল ও পরকালে সফলতার একটি রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে আর তা হলো মানুষের উচিত আগামীকালের চিন্তা আজ করা। নিজের সমস্ত কাজ ও কথাবার্তায় যেন এটি স্মরণ রাখে যে, খোদা তা'লা আমার কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত আছেন। এটিই তাকওয়ার মূল এবং এটিই সকল সফলতায় চলমান মূল প্রেরণা। এর বিপরীতে (মথির) ইনজীলের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৩ নং পদে বর্ণিত শিক্ষা হলো, 'আগামীকালের জন্য চিন্তা কোরো না, কেননা আগামীকাল নিজেই নিজের চিন্তা করবে। আজকের দুঃখ আজকের জন্য যথেষ্ট।"

এই উভয় শিক্ষায় যদি প্রণিধান করেন তাহলে, কেবল এই একটি বিষয় থেকেই

ইসলাম এবং খ্রিষ্ট ধর্মের মাঝে কোনটি সত্য তার মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। একজন পুণ্যবান, পবিত্র, মুক্তিকামী এবং সত্যান্বেষী ব্যক্তি খুব ভালোভাবে বুঝে যে, বাস্তব জীবনে কোন ধর্মটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

আমাদের কথা বাদই দিলাম কেবল ইনজীলের মান্যকারী খ্রিষ্টানরাও যদি এই পদের ওপর আমল করা আরম্ভ করে তবে পৃথিবীর সমস্ত উন্নতি ও অগ্রগতির চাকা থেমে যাবে এবং সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে। কোনো বাজেটও তৈরি হবে না আর সে অনুযায়ী কোনো কাজও সম্পাদিত হবে না। ট্রেন এবং জাহাজের সময়সূচিও আগেভাগে প্রকাশ হবে না। আর কোনো বাণিজ্যিক কারখানাও বিজ্ঞাপন দেবার সুযোগ পাবে না। কোনো বাসায় খাবারের কোনো বস্তুও পাওয়া যাবে না আর হাটে-বাজারেও খুব সম্ভব তা পাওয়া যাবে না। কেননা আগামীকালের তো কোনো চিন্তাই নেই বরং চিন্তা করাও পাপ। এর বিপরীতে কুরআনের শিক্ষা কত-না পবিত্র ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য কল্যাণকর! মজার বিষয় হলো, খ্রিষ্টানরা নিজেরাও (কুরআনের) এ আয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, নইলে আজই সমস্ত ব্যাবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবার কথা আর রাষ্ট্রে কোনো ব্যবস্থাপনা থাকার কথা নয়। পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষা–

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

-এর ওপর আমল করলে মানুষ কেবল পৃথিবীতেই সফল হয় না বরং পরকালেও খোদার কৃপায় সাফল্যমণ্ডিত হবে। আজ থেকেই যদি সেই চিরস্থায়ী নিবাসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করি তবে আমরা কখনো পরকালের মুক্তির জন্য মূলধন বা পুঁজি একত্রিত করতে পারব না। (তাশহীযুল আযহান, খণ্ড: ০৭, সংখ্যা: ০৫, পৃ. ২২৭-২২৮)

পুনরায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, কালকের জন্য সে কী প্রস্তুতি নিয়েছে? মানুষের সাথে একটি নফস বা প্রবৃত্তি রয়েছে যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কেননা মানবদেহ সদাই ক্ষয়িষ্ণু। এমন সত্তা বা দেহ যা প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে আর দেহকণিকা পৃথক হয়ে চলেছে, সেটির জন্য যদি এত প্রস্তুতি ও আয়োজন করা হয় এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি এত উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে সেই আত্মার জন্য কীরূপ প্রস্তুতি নেওয়া উচিত– যার জন্য মৃত্যুপরবর্তী জবাবদিহিতা অনিবার্য। এই ক্ষয়িষ্ণু দেহের জন্য যতটা চিন্তা-ভাবনা করা হয়, হায়! সেই আত্মার জন্য যদি ততটা চিন্তা করা হত যাকে মৃত্যুর পর জবাবদিহি করতে হবে!

ইন্নাল্লাহা খাবীরুম্ বিমা তা'মালুন: আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। এই (অবগত হওয়াকে) গুরুত্ব দিলে অবশেষে কোনো না কোনো সময় মানবপ্রকৃতি জাগ্রত হয়ে মানুষকে ভর্ৎসনা করে এবং পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে।" (আল-বদর, ১৩ ডিসেম্বর ১৯০৬, পৃ. ৯)

আবার 'হাকায়েকুল ফুরকান'-এ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা খবীরুম্ বিমা তা'মালুন: তিনি তাকওয়া অবলম্বনের এই পদ্ধতি

বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলোর খবর রাখার যে একজন আছেন তোমারা সে সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করো।" (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০২, পৃ. ৮৫)

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, "কাজ করার পূর্বে এর পরিণতি সম্পর্কে এক মুমিনের চিন্তা করা উচিত যে, এর পরিণতি কী হতে পারে? মানুষ ক্রোধের বশে খুন করতে চায়, গালি দেয় কিন্তু এর পরিণাম কী হবে– তার ভাবা উচিত। এই মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি থাকলে তাকওয়ার পথ অবলম্বনের সুযোগ লাভ হবে। পরিণামের চিন্তা কীভাবে মাথায় আসতে পারে? এর উপায় হলো 'ওয়াল্লাহু খাবীরুম্ বিমা তা'মালুন' অর্থাৎ, "তোমরা যা-ই করো আল্লাহ্ তা'লা এর খবর রাখেন"-এর প্রতি ঈমান রাখা। মানুষ যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, কোনো 'খবীর' (সর্বজ্ঞ) এবং 'আলীম' (সর্বজ্ঞাত) বাদশা আছেন যিনি সকল পাপাচার, প্রবঞ্চনা, ধোঁকা, অলসতা এবং ঔদাসীন্য দেখেন আর এর প্রতিফল প্রদান করবেন– তবেই সে রক্ষা পেতে পারে। অতএব তোমরা হৃদয়ে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করো। এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের চাকুরি, ব্যাবসাবাণিজ্য কায়িক শ্রম প্রভৃতি আবশ্যিক দায়িত্ব পালনে অলসতা প্রদর্শন করে। এমন করলে উপার্জন হালাল থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে তাকওয়া অবলম্বনের তৌফিক দান করুন।" (আল-হাকাম, ২১-২৮ মে ১৯১১, পৃ. ২৬)

এ বিষয়ে বর্তমানে আরেকটি সমস্যা হলো পারিবারিক সমস্যা। প্রতিদিন মেয়েদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো না কোনোভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, শ্বশুরবাড়ি কিংবা স্বামীর পক্ষ থেকে তারা অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করছে। অনেক সময় ছেলের অবস্থা সম্পর্কে মেয়েকে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয় না অথবা এমন অস্পষ্টভাবে কথা বলা হয়, যেটিকে মেয়ে কিংবা তার মা-বাবা নিতান্তই সামান্য বিষয় মনে করে, কিন্তু আপনি যদি ঘটনা নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক যে, শরীর শিউরে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছেলে ভদ্রভাবে সহানুভূতির সাথে মেয়েকে নিয়ে সংসার করতে চায় কিন্তু শাশুড়ি কিংবা ননদরা এমন কঠোর আচরণ করে এবং নিজের ছেলে বা ভাইকে দিয়ে এমন অত্যাচার করায়, যার ফলে দুর্ভাগা মেয়েটির কেবল দুটি পথই খোলা থাকে। হয় খোলা নিয়ে পৃথক হয়ে যাবে নয়তো সারাজীবন নিপীড়নের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকবে। আবার দেখা গেছে যে, এভাবে অত্যাচার হতে থাকলে বধু হিসেবে মেয়ে যখন কর্তৃত্ব হাতে পায় তখন সে শাশুড়ির ওপরও অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো শুরু করে। এটি একটি শয়তানী চক্র যা এমন পরিবারে আবর্তিত হতে থাকে যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় নেই। অথচ বিয়ের সময় যখন ছেলেমেয়ের সম্মতি নেওয়া হয় তখন তাকওয়া ও সত্য-সঠিক-সরল কথা বলা সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়ে থাকে আর আমাদেরকে বলা হয় যে, এরূপ জান্নাত প্রতিম সমাজ গঠন করো এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করো– যেন অন্যরা তোমাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। যদিও জামা'তের মাঝে এমন দৃষ্টান্ত হাতেগোনা, তবুও তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও কষ্টদায়ক। এখন যে আয়াতটির ব্যাখ্যা চলছে, সেটিও বিয়ের সময় পঠিত আয়াতগুলির একটি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যেভাবে বলেছেন, প্রত্যেক কথা ও কাজের আগে পরিণাম

কী হতে পারে– তা চিন্তা করা উচিত আর তোমরা যা-ই করছ আল্লাহ্ তা'লা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। সীমালঙ্ঘনকারীরা মনে করে, আমাদেরকে কেউ দেখছে না আমরা ঘরে বসে কারো মেয়ের ওপর যেমন খুশি অত্যাচার করে যাব, (কিন্তু) আল্লাহ্ তা'লা এর খবর রাখেন। হৃদয়ে যদি এই চিন্তা-চেতনা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা দেখছেন এবং তিনি এ সম্পর্কে জানেন তবে হুযূর [অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)] বলেন, এসব পাপ থেকে বাঁচা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদী পরিবারের স্বামী, স্ত্রী, শাশুড়ি, বধু, ননদ কিংবা ভাবি সকলকে তাকওয়া অবলম্বন এবং একটি সুন্দর সমাজ গড়ার সামর্থ্য দিন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا. وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

(আল-মুনাফিকূন: ১২)

অর্থ: 'বস্তুত যখন কোনো আত্মার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাকে আদৌ অবকাশ দেবেন না এবং তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন।'

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেছেন, "(আল্লাহ্র দিকে) কপটতাসুলভ প্রত্যাবর্তন সত্যিকার অর্থে কোনো প্রত্যাবর্তন নয়, কিন্তু ভয়ের সময় এক দুর্ভাগার হৃদয়ে বাস্তবিকই এক ত্রস্তভাব ও শঙ্কা বিরাজ করে, সেটিকে খোদা তা'লা (তাঁর দিকে) প্রত্যাবর্তন হিসেবে গণ্য করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার বিধান এমন প্রত্যাবর্তনকে জাগতিক শাস্তি বিলম্বিত হবার কারণ সাব্যস্ত করেছে। যদিও এ ধরনের প্রত্যাবর্তনে পারলৌকিক শাস্তি প্রত্যাহার হতে পারে না, কিন্তু জাগতিক শাস্তি সর্বদা অপসারিত হতে থাকে এবং বিলম্বিত হতে থাকে। কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করো এবং অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বোলো না। আর স্মরণ রেখো! 'লাই ইউওয়াখ্খিরাল্লাহু নাফসান' অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ নির্ধারিত সময় এসে গেলে কাউকে অবকাশ দেন না' (৬৩:১২) আয়াতের সাথে এই অবস্থা বা বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, অটল তকদীর এসে গেলে তা টলা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে পরিবর্তনযোগ্য তকদীরের বিষয়টি আলোচনাধীন রয়েছে– যা শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেখানে কিনা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন শরীফে বলেন, আমি ইস্তিগফার, কাকুতিমিনতি ও ভীতির আধিক্যের সময় অবিশ্বাসীদের ওপর থেকে শাস্তি অপসারণ করে দেই আর অতীতেও এ রীতিই ছিল তাই তাঁর চেয়ে বড়ো সত্য সাক্ষ্যদাতা আর কে হতে পারে যার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে?"
(আনওয়ারুল ইসলাম পুস্তকের পরিশিষ্ট, তিন হাজার রুপি পুরস্কার-সংবলিত বিজ্ঞাপন, পৃ. ১০, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৯, পৃ. ৮০)

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন,

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

(আত-তাগাবূন: ৯)

অর্থ: "সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং সেই নূরের প্রতিও (অর্থাৎ কুরআনের প্রতি)– যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সদা অবহিত।"

আল্লামা ইবনে জারির আত্ তাবারী আয়াত 'ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা খবীর'-এর তফসীরে বলেন, "আয়াতের এ অংশে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

তোমাদের মধ্য থেকে নিজ প্রভুর আনুগত্যকারী এবং অবাধ্য কেউই তাঁর কাছে গুপ্ত নয়। তিনি তোমাদের সকলকে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন। পুণ্যকর্মশীলকে তার পুণ্যকর্ম অনুযায়ী এবং অবাধ্যকে তার অবস্থা অনুযায়ী (প্রতিদান দেবেন) অথবা তিনি ক্ষমা করে দেবেন।" (তফসীরে তাবারী) তিনি সর্বশক্তিমান, বাদশা ও মালিক, যেমন পছন্দ তেমনই করেন।

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন,

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ. وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ

(আল-আদিয়াত: ১০-১২)

অর্থ: "তবে কি সে জানে না, কবরে যা আছে তা যে-দিন উৎপাটিত করা হবে, আর অন্তরে যা আছে তা-ও উদ্‌ঘাটন করা হবে? নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক-প্রভু সে-দিন তাদের সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন।"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছেন, আমি সব সময় বলে থাকি, 'বাসীর' (সর্বদ্রষ্টা) এবং 'আলীম' (সর্বজান্তা) শব্দদ্বয় কেবল আল্লাহ্ তা'লার সর্বজ্ঞ হবার পরিচয় বহন করে কিন্তু 'খবীর' শব্দটি সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করাকেও বুঝায়। অর্থাৎ 'খবীর' শব্দে খবর রাখার পাশাপাশি অপরাধীদের শাস্তিপ্রদান এবং তাদেরকে দেখে নেবার প্রতিও ইঙ্গিত থাকে। এই আয়াত আমার সেই দাবির সত্যায়নকারী। 'ইয়াওমাইযিন' (সেই দিন) শব্দটিও এর প্রমাণ বহন করে কেননা শুধু জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লা সবসময় রাখেন আর সেই দিন শুধু জ্ঞানী হবার কোনো অর্থই হয় না। তাই বুঝা গেল 'খবীর' শব্দে (মূলত) দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথমত, তোমাদের কোনো অপরাধ তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না এবং দ্বিতীয়ত, এই বিশদ জ্ঞান অনুযায়ী সেই দিন (অর্থাৎ বিচার দিবসে) তিনি শাস্তি-পুরস্কারও দেবেন। কুরআন করীমে 'ইয়াওমাইযিন' শব্দের সাথে কেবল 'খবীর' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, 'আলীম' এবং 'বাসীর' শব্দের ব্যবহার নেই। উর্দুতে বলা হয় 'খবর নেব' যা হয়ত 'খবীর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। একইভাবে পাঞ্জাবী ভাষায় বলা হয়, 'ম্যায় তেরী খবর লাঙ্গা' আর এর অর্থ হলো, আমি তোকে তোর কৃতকর্মের প্রতিফল দেবো। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, 'ইন্না রাব্বাহুম বিহিম ইয়াওমাইযিল্ লাখবীর'। সেই দিন তাদের প্রভু হবেন তাদের খবীর অর্থাৎ, কেবল তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবেন না, বরং সে অনুযায়ী তাদের শাস্তি-পুরস্কারও দেবেন।

সুতরাং কুরআন করীমে সবক্ষেত্রে 'ইয়াওমাইযিল্ লাখবীর'-ই ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইয়াওমাইযিল্ লাআলীম' কিংবা 'ইয়াওমাইযিল্ লাবাসীর' ব্যবহার হয় নি। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে 'খবীর' শব্দের অর্থ কেবল জ্ঞান রাখাটাই উদ্দেশ্য নয় বরং তাদের শাস্তি দেওয়াও বটে। আর 'ইন্না রাব্বাহুম বিহিম ইয়াওমাইযিল্ লাখবীর'-এর অর্থ হলো, সেই দিন তাদের প্রতিপালক-প্রভু তাদের দেখে ছাড়বেন অর্থাৎ তাদের শাস্তি দেবেন।

এটিও স্মরণ রাখা উচিত, এই সূরার শেষে এই শব্দগুলি দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব কিন্তু আগেই নয় বরং 'হুসসিলা মা ফিস্ সুদুর' (অর্থাৎ, তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা বের করে আনা হবে)-এর পরে। যতক্ষণ না তাদের লুক্কায়িত নোংরামি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে– আমরা তাদেরকে শাস্তি দেবো না। এটি অপরাধীদের শাস্তি সম্পর্কিত এমন এক নীতি যা না জানার কারণে অনেকেই এটিকে অবজ্ঞা করে এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্টদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলে, আপনি যদি সত্য হয়ে থাকেন তবে বিরোধিতা করার পর মানুষের ওপর সাথে সাথেই কেন শাস্তি নেমে আসে না? এই আয়াতে এ সন্দেহের অবসান ঘটেছে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর শত্রুদেরকে উদ্দেশ্য করে এখানে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। ... আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ইন্না রাব্বাহুম বিহিম ইয়াওমাইযিল্ লাখবীর'- আমি 'খবীর' (সর্বজ্ঞ), এই লোকদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানি, কিন্তু ষোলোকলা পূর্ণ হলে পরেই আমরা তাদের শাস্তি দেবো। প্রথমে তাদের নোংরামি প্রকাশ করব এবং মুসলমানদের দ্বারা আক্রমণ করাবো। নিঃসন্দেহে আমি 'খবীর' (সর্বজ্ঞ) এবং আগেও তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতাম কিন্তু আমি চাইতাম না যে, তাদের পবিত্র বা নেক হওয়া সংক্রান্ত বিন্দুমাত্র ধারণা যেন লোকদের মনে অবশিষ্ট না থাকে। আমরা সেই সময় তাদের শাস্তি দেবো যখন 'হুসসিলা মা ফিস্ সুদুর' (তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা উদ্‌ঘাটন করা হবে) হয়ে যাবে এবং তাদের নোংরামি মানুষের সামনে ভালোভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে। (তফসীরে কবীর, সূরা আল-আদিয়াত, পৃ. ৫০৩-৫০৪)

আল্লাহ্ তা'লা চাইলে আপনারা দেখবেন যে, তাঁর (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও দাসের শত্রু এবং তার সাথে ঠাট্টাবিদ্রুপকারীদের ক্ষেত্রেও এমনটিই হবে।

অতঃপর পবিত্র কুরআনে অনাগত ভবিষ্যতের কিছু সংবাদ রয়েছে যাতে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ওয়া ইযান্ নুফুসু যুভ্যিজাত'। অর্থ: এবং বিভিন্ন জাতির লোকদের যখন একত্রিত করে দেওয়া হবে (আত-তাকভীর: ৮)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এ সম্পর্কে তফসীরমূলক একটি নোটে বলেন, এটি সেই যুগ হবে যখন অসংখ্য চিড়িয়াখানা বানানো হবে। এটি স্পষ্ট যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এ যুগের চিড়িয়াখানাগুলোও এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অনেক বড়ো বড়ো প্রাণী সামুদ্রিক জাহাজ অথবা প্লেনে করে সেসব চিড়িয়াখানায় আনা হচ্ছে যে, তৎকালীন লোকেরা এটি কল্পনাও করতে পারত না। হুযূর বলেন, এছাড়া খুব সম্ভব সামুদ্রিক যুদ্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে; যখন কিনা সমুদ্রে অধিক

হারে জাহাজ চলাচল করবে এবং এর ফলে দূরদূরান্তের লোকদেরকে পরস্পর একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ কেবল প্রাণীদেরকেই একত্রিত করা হবে না বরং মানবকুলের মাঝেও মিলন ঘটানো হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "ওয়া ইযান্ নুফুসু যুভ্যিজাত (আত-তাকভীর: ৮) অর্থাৎ এমন যানবাহন সামনে আসবে যে, জাতিসমূহ বহুদূরে থাকা সত্ত্বেও পরস্পর মিলিত হবে, এমনকি নতুন ভূমি পুরাতনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে।... নবী করীম (সা.)-এর যুগে সফরের সমস্ত মাধ্যম আবিষ্কৃত হয় নি। তফসীরে কবীরে লেখা আছে যে, কিছু এমন স্থানও রয়েছে যেখানে মহানবী (সা.)-এর বাণী পৌঁছায় নি কিন্তু বর্তমানে ডাক, টেলিগ্রাম এবং ট্রেনের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সংবাদ পৌঁছানো সম্ভব। আরবের হেজাযে যে রেললাইন স্থাপিত হচ্ছে তা-ও এই ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত।" (আল-বদর, খণ্ড: ০৭, সংখ্যা: ০৩, ২৩ জানুয়ারি ১৯০৮, পৃ. ০৩) এটি ১৯০৮ সালে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন: "মানুষকে একত্রিত করার লক্ষণ কয়েকভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। সেগুলোর মধ্যে একটির ইঙ্গিত রয়েছে টেলিগ্রাফের প্রতি যা প্রত্যেক বিপদের মুহূর্তে মানুষের কাজে আসে আর পৃথিবীর দূরদূরান্তে বসবাসকারী আত্মীয়স্বজনদের সংবাদ নিয়ে আসে। সন্ধানী স্বীয় অবস্থান ত্যাগ করার পূর্বেই টেলিগ্রাফ তার আত্মীয়স্বজনের সংবাদ দিয়ে দেয় আর পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যের মানুষের মাঝে পারস্পরিক আলাপচারিতার ধারা চালু করে দেয়, যেন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করছে। অতঃপর এটি সেসব অস্থির ও নিরুপায় লোকদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে স্বল্পতম সময়ে অবগত করে– যাদের ব্যাপারে উদ্‌বিগ্ন থাকে। অতএব এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী লোকদের মিলিত করে এবং তারা পরস্পরের সাথে এভাবে কথা বলে যেন তাদের মাঝে কোনো বাঁধা নেই আর তারা একে অপরের একেবারেই কাছে। লোকদের পরস্পর মিলিত করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, জল ও স্থলপথ নিরাপদ হবে এবং সফরের কাঠিন্য দূর হয়ে যাবে। লোকেরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে কোনো ভয়ভীতি ছাড়াই সফর করতে পারবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে এক দেশের সাথে আরেক দেশের সম্পর্ক বেড়ে গেছে এবং লোকদের পারস্পরিক পরিচিতির গণ্ডি সম্প্রসারিত হয়েছে। এমন মনে হয় যেন প্রতিদিনই তাদেরকে পরস্পরের সাথে মিলানো হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসায়ীদের সাথে, এক সীমান্তে বসবাসকারীদের অপর সীমান্তবাসীদের সাথে এবং এক পেশাজীবীদেরকে অন্য পেশাজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছেন। তারা লাভবান হওয়া ও ক্ষতি এড়ানোর ক্ষেত্রে পরস্পর অংশীদার হয়ে গেছে এবং তারা প্রত্যেক নিয়ামত, আনন্দ, পোশাক, খাবার এবং স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণের বিষয়ে একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে গেছে। এক অঞ্চল থেকে অন্যাঞ্চলে প্রতিটি জিনিস আমদানী করা হয়। অতএব দেখো কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে মিলিয়ে দিয়েছেন মনে হয় যেন তারা সকলে এক নৌকায় আরোহী। একইভাবে একে অন্যের সাথে মিলিত করার এসব উপকরণের মধ্যে জল-স্থলের যানবাহনে করে মানুষের সফর করাও অন্তর্ভুক্ত। তারা এই সফরের সময় পরস্পরের সাথে পরিচিত হয়।

মিলিত করার উপকরণগুলোর মধ্যে পত্রের আদান-প্রদানও একটি মাধ্যম, যেগুলো প্রেরণের জন্য অনেক ভালো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, কীভাবে চিঠিপত্র পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পাঠানো সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে? তোমরা যদি এ বিষয়ে প্রণিধান করো [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,] তবে এর প্রেরণের আধিক্য তোমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করবে এবং তোমরা এর দৃষ্টান্ত পূর্বের যুগে খুঁজে পাবে না। একইভাবে পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদের আধিক্যও তোমাদেরকে অবাক করবে। অতএব এ সবই লোকদের পরস্পর মেলানো এবং পরিচিতির বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম যার নামগন্ধও ইতিপূর্বে ছিল না। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা কি ইতিপূর্বে কখনো এমনটি দেখেছ অথবা কোনো বইয়ে এসব কথা পড়েছ?" (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৪৭০-৪৭৩)

এখন দেখুন, বর্তমানে আপনারা টেলিফোন, টিভি, কম্পিউটারে, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের ঘরে বসেই একইসাথে কথা বলছেন, লিখিত বার্তা পাঠাচ্ছেন এবং ছবিও প্রেরণ করছেন। অতএব বর্তমান যুগের এসব আবিষ্কারাদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতারই প্রমাণ।

তিনি (আ.) বলেন: "...ওয়া ইযান্ নুফুসু যুভ্যিজাত-ও আমারই জন্য। ... আল্লাহ্ তা'লা তবলীগের সমস্ত উপকরণ একত্র করে দিয়েছেন, এটিও এক ধরনের একত্রিকরণ; যেমন ছাপাখানার উপকরণ আর কাগজের আধিক্য। ডাক বিভাগ, তার (তথা টেলিফোন), রেলগাড়ি এবং সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী যেন একটি বিশ্বপল্লীতে রূপ নিয়েছে। এছাড়া নিত্যনতুন আবিষ্কারাদি মিলিত করণের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করছে, কেননা তবলীগের উপকরণ একত্রিত হচ্ছে। বর্তমানে ফোনোগ্রাফের মাধ্যমেও তবলীগ করা যায় এবং এর ফলে আশ্চর্যজনকভাবে কাজ হয়। সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা; সর্বোপরি এত অধিক পরিমাণে তবলীগের উপকরণ একত্রিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী যুগে এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই নি।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৬, সংখ্যা: ৪৩, ৩০ নভেম্বর ১৯০২, পৃ. ১-২)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে মক্কায় পুনরাগমনের সংবাদ দেন এবং হিজরতের পূর্বে প্রদত্ত এ সংবাদটি হলো, 'লা উকসিমু বিহাযাল বালাদি ওয়া আনতা হিল্লু বিহাযাল বালাদ' (আল-বালাদ: ২-৩)।

অর্থ: 'শোনো! আমি এ শহর (মক্কাকে তোমার সত্যতার) সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি; এবং তুমি (একদিন বিজয়ীর বেশে) এ শহরে আসবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এটি মক্কী সূরা এবং (নবুওয়তের) তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বছরে নাযিল হয়েছে। কারো কারো এই ধারণা রয়েছে যে, এটি হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৮, পৃ. ৫৭৭)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَآدُّكَ إِلٰى مَعَادٍ

(আল-কাসাস: ৮৬)

অর্থ: "নিশ্চয় তিনিই সেই মহান অস্তিত্ব– যিনি তোমার জন্য কুরআনকে অত্যাবশ্যক করেছেন, তিনি (অবশ্যই) তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে আনবেন।"

এই সূরা সম্পর্কে উমর বিন মুহাম্মদের মতামত হলো, এ আয়াতটি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাবার সময় অবতীর্ণ হয়েছে। সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "এই ধারণাকে যদি সঠিক মনে করা হয় তবুও এটি মক্কী সূরা।"

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন: "আমরা বলি, মক্কী সূরা হিসেবে স্বীকৃত একটি সূরায় 'লা-রাদ্দুকা ইলা মাআদ' কথাটি আসায় (অর্থাৎ তিনি অবশ্যই তোমাকে (সেই) স্থানে ফিরিয়ে আনবেন যেখানে লোকেরা ফিরে ফিরে আসে) বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) তখন মক্কাতেই ছিলেন যখনকিনা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) হিজরত এবং মক্কা বিজয়ের সংবাদ দেন।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৭, পৃ. ৪৫৯)

অতঃপর এই ঐশী সংবাদ অনুযায়ী ৮ হিজরী সনের রমযান মাসে তিনি (সা.) এক বিজয়ী জেনারেলের মতো ১০ হাজার পবিত্রাত্মার সাথে মক্কায় প্রবেশ করেন।

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, "ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ (আল-বালাদ: ৩) এবং তুমি পরম মর্যাদা ও প্রতাপের সাথে এ শহরে বিজয়ীর বেশে আসবে অর্থাৎ, অবতরণ করবে।" (পরিশিষ্ট: বদর পত্রিকা কাদিয়ান, ৪ আগস্ট ১৯১২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ সম্পর্কে বলেন: "লা-রাদ্দুকা ইলা মাআদ: কুরআন যখন কোনো বড়ো দাবি করে তখন এর সাথে অনেক শক্তিশালী প্রমাণও দিয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে, আমার অনুসারীরা বাদশা হবে; এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, এই কুরআন যাতে লেখা আছে যে, তোমার সাথিরা বাদশা হবে, তাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, সেই মক্কা যেখান থেকে তোমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, যেখানকার লোকদের সামনে (মুসলমানদের কোনো) পরিকল্পনা বা কৌশল কাজে আসে নি, এমন এক সময় আসবে যখন সেই মক্কাতেই তোমরা বিজয়ীরূপে প্রবেশ করবে। অতএব এমনটিই হয়েছে।" (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩২৭)

অতঃপর মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত ভবিষ্যতের কিছু সংবাদ রয়েছে। এর মধ্য থেকে এখানে আমি সর্বপ্রথম খিলাফতে রাশেদা, রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সংবাদ আর পরবর্তীতে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার সংবাদ উপস্থাপন করব।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই নিয়ামত ততদিন থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা

তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর ঐশী তকদীর অনুযায়ী উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। এই ধারার অবসানে তার অপর নিয়তি অনুযায়ী এর চেয়ে বেশি স্বৈরাচারিতামূলক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা উথলে উঠবে এবং এই অত্যাচার নিপীড়নের অবসান ঘটবে। অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি উল্লেখ করে মহানবী (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ০৫, পৃ. ২৭৩, বৈরুতে প্রকাশিত, মিশকাত, বাব আল ইনযার ওয়াত্ তাহযীর)

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে মহানবী (সা.) যে সংবাদ দিয়েছিলেন ঠিক তদনুযায়ী তাঁর (সা.) তিরোধানের পর খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয় যা হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর নিপীড়নমূলক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। তারপর সত্য সংবাদদাতা মহানবী (সা.)-এর সংবাদ অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হোন আর তাঁর ইন্তেকালের পর নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

আরেকটি সংবাদ ছিল চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ সম্পর্কিত। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রেক্ষিতে বলেন: "সহীহ দারকুতনী-তে একটি হাদীস রয়েছে, ইমাম মুহাম্মদ বাকের বলেন, ইন্না লিমাহদিয়্যিনা আয়াতাইনে, লাম তাকুনা মুনযু খালকাস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরয, ইয়ানকাসিফুল কামারু লি আওউয়ালি লাইলাতিম্ মিন রমাযানা ওয়া তানকাশিফুস্ শামসু ফিন্নিসফি মিনহু। অর্থাৎ আমাদের মাহদীর জন্য দুটি নিদর্শন রয়েছে। যখন থেকে খোদা তা'লা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন, এই দুটি নিদর্শন অন্য কোনো প্রত্যাদিষ্ট ও রসূলের যুগে প্রকাশিত হয় নি। এর মাঝে একটি হলো প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ হবে এর প্রথম রাতে, অর্থাৎ তেরো তারিখে আর সূর্যগ্রহণ তার (নির্ধারিত) দিনগুলোর মাঝে মধ্যবর্তী দিনে হবে, অর্থাৎ সেই রমযান মাসেরই আটাশ তারিখে। আর এমন ঘটনা পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে কোনো রসূল অথবা নবীর যুগে কখনো ঘটে নি। শুধুমাত্র প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে এটি সংঘটিত হওয়া নির্ধারিত। এখন সমস্ত ইংরেজি এবং উর্দূ পত্রিকা এবং সকল দক্ষ জ্যোতির্বিদরা একথার সাক্ষী যে, প্রায় বারো বছর পূর্বে আমার যুগেই রমযান মাসে এরূপ চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২০২)

অতএব যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, ১৮৯৪ সনে এই গ্রহণ হয় চন্দ্র গ্রহণের তারিখগুলোর মধ্য থেকে ১৩ তারিখে, কেননা চন্দ্রগ্রহণ হয় ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে । আর একই মাসে ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়, যা সূর্যগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখের মাঝে মধ্যবর্তী তারিখ। আর পশ্চিমা জাতিগুলোর সামনে সত্যের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে পরবর্তী বছর পশ্চিমা (বিশ্বও) এই দৃশ্য দেখেছে।

পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় এবং প্লেগ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামতের লক্ষণাবলি হিসেবে এ নিদর্শনগুলো আগে দেখা দেবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া এবং পূর্বাহ্নের সময়

এক অদ্ভুত কীটের মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল ফিতান, বাব তুলুইশ্ শামসে মিন মাগরেবেহা)

কীটের আধিপত্য বিস্তার বলতে হয়ত প্লেগ অথবা অন্যান্য জীবাণুবাহিত রোগ কিংবা যুদ্ধবিগ্রহের কারণে সৃষ্ট রোগবালাইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়ের বিষয়ে আমরা অবশ্যই ঈমান রাখি, কিন্তু এই অধমের কাছে এক স্বপ্নে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের অর্থ, পশ্চিমা দেশসমূহ, যারা প্রাচীনকাল থেকেই অস্বীকার এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদেরকে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করা হবে এবং তারা ইসলাম থেকে অংশ পাবে। আমি দেখেছি যে, আমি লন্ডন শহরে একটি মিম্বরে দণ্ডায়মান এবং ইংরেজি ভাষায় একটি নিতান্ত যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করছি। এরপর আমি অনেকগুলো পাখি ধরি যেগুলো ছোটো ছোটো গাছে বসা ছিল এবং সেগুলোর রং ছিল সাদা। আর সেগুলোর শরীর সম্ভবত তিতির পাখির দেহের মতো হবে। অতএব আমি এর যে ব্যাখ্যা করেছি তা হলো, আমি না হলেও আমার লেখনী তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে আর বহু পুণ্য প্রকৃতির ইংরেজ সত্যের ছায়ায় আসবে। প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলোর ধর্মীয় সত্যের সাথে সামঞ্জস্য বা সংস্রব খুব কমই চলে আসছে, যেন খোদা তা'লা ধর্মীয় জ্ঞান-বুদ্ধি পুরোটাই এশিয়াকে দিয়ে দিয়েছেন আর জাগতিক জ্ঞান পুরোটাই ইউরোপ ও আমেরিকাকে। ধারাবাহিকভাবে নবীগণও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এশিয়ার ভাগ্যেই জোটেন আর ওলীদের সকল উৎকর্ষও এরাই লাভ করেছে। এখন খোদা তা'লা তাদের (অর্থাৎ পশ্চিমাদের) প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিতে চান। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৭৬, ৩৭৭)

এখন এটি আপনাদের কাজ যারা এখানে অর্থাৎ ইউরোপে বসবাস করছেন। এই বাণী প্রচার করুন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করুন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) কতিপয় সংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন: "বারাহীনে আহমদীয়ায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, সুবহানাল্লাহি তাবারাকা ওয়া তা'লা, যাদা মাজদুকা, ইয়ানকাতাউ আবাউকা ওয়া ইয়াবদাউ মিনকা।" (দেখুন বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ৪৯০)

খোদা তা'লা সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং অনেক কল্যাণের অধিকারী। তিনি তোমার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। তোমার পিতা-পিতামহের নাম মুছে যাবে আর খোদা এই বংশের সম্মানের ভিত্তি তোমার মাধ্যমে রাখবেন। এটি তখনকার ভবিষ্যদ্বাণী যখন কোনো প্রকার মাহাত্ম্য আমাকে দেওয়া হতো না। আমি এমন অজ্ঞাত-অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় ছিলাম যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে না থাকার মতো। এই ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন দেখা উচিত যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী কত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ এখন হাজার হাজার মানুষ আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত। এর পূর্বে কে জানত যে, পৃথিবীতে আমার মাহাত্ম্য এভাবে ছড়িয়ে পড়বে। অতএব তাদের

জন্য আক্ষেপ– যারা খোদা তা'লার নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করে না। এছাড়া এই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে বংশধরদের সংখ্যাধিক্যের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তারও ভিত্তি রাখা হয়েছে, কেননা এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর পর চারজন পুত্রসন্তান এবং একজন পৌত্র আর দুইজন কন্যাসন্তান আমার ঘরে জন্ম নেয় যারা তখন ছিল না। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২৬৪-২৬৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী-সংবলিত ইলহাম লাভের সময় তাঁর পৈত্রিক পরিবারের প্রায় সত্তরজন পুরুষ জীবিত ছিল। আর এর পর তারা সবাই মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের কোনো বংশ চলে নি। শুধুমাত্র তারা জীবিত থাকে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁকে গ্রহণ করে আর পরবর্তীতে তাদের বংশধারাই অব্যাহত থাকে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এমন ঘটনা দুই হাজারের চেয়েও অধিকবার ঘটেছে যে, খোদা তা'লা আমার প্রয়োজনের সময় আমাকে স্বীয় ইলহাম অথবা কাশফে এই সংবাদ প্রদান করেছেন যে, শীঘ্রই কিছু অর্থ আসতে যাচ্ছে। কোনো কোনো সময় যে অর্থ আসতে যাচ্ছে তার পরিমাণও জানানো হয়েছে এবং কোনো কোনো সময় এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এত পরিমাণ অর্থ অমুক তারিখে অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে আসতে যাচ্ছে। বাস্তবে তা-ই ঘটেছে এবং এ কথার সাক্ষী কাদিয়ানের কতিপয় হিন্দু ও কয়েকশ মুসলমানও হবে যারা শপথ করে এর সাক্ষ্য দিতে পারে। কীভাবে খোদা তা'লা প্রয়োজনের সময় সর্বদা আমার অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান করে থাকেন এটি সেকথারও প্রমাণ বহন করে। অধিকাংশ সময় আমার ক্ষেত্রে খোদা তা'লার রীতি হলো, তিনি সময়ের পূর্বেই আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি জাগতিক পুরস্কারসমূহের মাঝে কোন ধরনের পুরস্কারে আমাকে ভূষিত করতে চান। এছাড়া অধিকাংশ সময় তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আগামীকাল তুমি এটি আহার করবে এবং এটি পান করবে আর এটি তোমাকে দেওয়া হবে। আর তিনি আমাকে যা অবহিত করেন, বাস্তবে তা-ই ঘটে। আমার সান্নিধ্যে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করলে প্রত্যেকেই একথার সত্যায়ন করতে পারবে।" (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৫, পৃ. ১৯৯, ২০০)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমার জন্য আমি ধরায় অবতীর্ণ হয়েছি এবং তোমার জন্য আমার খ্যাতি সমুজ্জ্বল হয়েছে আর তোমাকে আমি সমগ্র মানবজাতির মধ্য হতে মনোনীত করেছি। তিনি আরো বলেন, 'ক্বালা রাব্বুকা ইন্নাহু নাযিলুম্ মিনাস্ সামায়ে মা ইউরযিকা' অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক-প্রভু বলেন, আকাশ হতে এমন জোরালো অলৌকিক নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ হবে যার ফলে তুমি সন্তুষ্ট হবে। ... বড়োই পরিতাপের বিষয়! বর্তমান যুগের গণক ও জ্যোতিষীরা আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলির ঠিক সেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে যেমনটি মূসা (আ.)-এর সাথে জাদুকররা করেছিল। অপরদিকে কতক অজ্ঞ ইলহামের দাবিদার, যারা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত, তারা বালআম-এর মতো আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে সত্যকে

পরিত্যাগ করে আর পথভ্রষ্টদের সহায়তা করে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লা বলেছেন, আমি সবাইকে লজ্জিত করব এবং কিছুতেই অন্য কাউকে এই সম্মান দেবো না। তাদের সবার জন্য নিজেদের জ্যোতির্বিদ্যা অথবা দৈববাণীর মাধ্যমে আমার মোকাবিলা করার এটিই মোক্ষম সময়, আর আক্রমণের কোনো পন্থা যদি এখন তারা বাকি রাখে তবে তারা ব্যর্থ হলো। খোদা তা'লা বলেন, আমি তাদের সবাইকে পরাজিত করব এবং আমি তার শত্রু হয়ে যাব, যে তোমার শত্রু। তিনি আরো বলেন, আমার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আমি তোমাকেই মনোনীত করেছি। আর আকাশ ও পৃথিবী সেভাবে তোমার সাথে আছে যেভাবে আমার সাথে আছে।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৯৭-৯৮)

তিনি (আ.) বলেন, "বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে যে,

يُرِيدُونَ اَن يُّطفِئُوا نُورَاللّٰهِ بِاَفوَاهِهِم وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهٖ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ

অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের মুখের ফুৎকারে খোদার জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চাইবে কিন্তু অস্বীকারকারীরা অপছন্দ করলেও খোদা স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণ করবেন। এটি সেই সময়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন কোনো বিরুদ্ধবাদী ছিল না, বরং কেউ আমার নামের সাথেও পরিচিত ছিল না। এরপর ভবিষ্যদ্‌বাণীর বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে সম্মানের সাথে আমি খ্যাতি লাভ করি এবং হাজার হাজার ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করে। তখন এমন বিরোধিতা হয় যে, মক্কাবাসীদের নিকট বাস্তব পরিপন্থি কথা বলে মক্কা মুয়ায্‌যামা হতে আমার জন্য কুফরী ফতোয়া আনানো হয় এবং পৃথিবীতে আমাকে কাফির আখ্যা দেবার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। (আমাকে) হত্যার ফতোয়া দেওয়া হয়। শাসকগোষ্ঠীকে উসকে দেওয়া হয়। সাধারণ জনগণকে আমার এবং আমার জামা'তের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করা হয়। বস্তুত আমাকে ধ্বংস করার সকল প্রকার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী এই সকল মৌলবি এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ ও বিফলমনোরথ থেকে যায়। পরিতাপ! বিরুদ্ধবাদীরা কতটা অন্ধ! তারা এ সকল ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাহাত্ম্যকে দেখে না যে, এগুলো কোন সময়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং কত মহিমা ও প্রতাপের সাথে সেগুলো পূর্ণ হয়েছে! এগুলো কি খোদা তা'লা ছাড়া আর কারো কাজ (হতে পারে)? যদি (অন্য কারো কাজ) হয়ে থাকে তবে এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো। তারা চিন্তা করে না যে, এটি যদি মানুষের কাজ হতো এবং খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হতো তাহলে তারা নিজেদের চেষ্টায় ব্যর্থ হতো না। কে তাদেরকে ব্যর্থ করল? সেই খোদা-ই ব্যর্থ করেছেন, যিনি আমার সাথে আছেন।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২৪১, ২৪২)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সমর্থন এবং নিদর্শনাবলির প্রদর্শন এখনো শেষ করেন নি। আমি তাঁর সত্তার কসম খেয়ে বলছি, তিনি ক্ষান্ত হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সত্যতা পৃথিবীতে প্রকাশ না করবেন। অতএব হে মানবমণ্ডলী! যারা আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো, আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সীমালঙ্ঘন কোরো না। এই পরিকল্পনা যদি মানুষের হতো তবে খোদা আমাকে ধ্বংস করে দিতেন এবং এ সমস্ত কার্যক্রমের চিহ্ন

পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকত না, কিন্তু তোমরা দেখেছ যে, কীভাবে আমি খোদা তা'লার সাহায্য লাভ করে আসছি আর এত নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে যা গণনাতীত। দেখো! কত শত্রু আমার সাথে মুবাহালা করে ধ্বংস হয়ে গেছে। হে খোদার বান্দারা! একটু চিন্তা করে দেখো, খোদা তা'লা কি মিথ্যাবাদীদের সাথে এমন ব্যবহার করেন?" (পরিশিষ্ট হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ৫৫৪)

তাঁর (আ.) আরো কিছু ইলহাম রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন: "দ্বিতীয় মসীহ্‌র তরবারি নিয়ে না আসা এবং তার রাজত্ব কেবল আকাশেই হওয়া আবশ্যক ছিল, আর এমনটিই হয়েছে। খোদা আমাকে তরবারিসহ পাঠান নি এবং আমাকে জিহাদের আদেশও দেন নি, বরং আমাকে জানিয়েছেন, তোমার মাধ্যমে সন্ধি এবং শান্তি স্থাপিত হবে। একটি হিংস্র প্রাণী ছাগলের সাথে আপোশ করবে এবং একটি সাপ বাচ্চাদের সাথে খেলবে। লোকেরা যতই অবাক দৃষ্টিতে দেখুক না কেন এটিই খোদা তা'লার অভিপ্রায়। এককথায় আমি যুদ্ধের ময়দান গরম করতে আসি নি, বরং প্রথম মসীহ্‌র মতো শান্তি ও সন্ধির দ্বার উন্মোচনের জন্যই আমি এসেছি। শান্তি প্রতিষ্ঠা যদি মূল উদ্দেশ্য না হয় তবে আমাদের জামা'ত বৃথা এবং এর প্রতি ঈমান আনাও অর্থহীন।" (আল-ইশতেহার ওয়াজিবুল ইযহার, পরিশিষ্ট: তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৫, পৃ. ৫২১)

অতঃপর ১৮৯৮ সালের ইলহামগুলোতে উল্লিখিত একটি ইলহাম হলো, "আমি যুগ-ইমাম আর খোদা আমার সাহায্যকারী এবং তিনি আমার পক্ষে শাণিত তরবারির ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যে আমার বিরুদ্ধে দুষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে দণ্ডায়মান হবে তাকে লাঞ্ছিত এবং লজ্জিত করা হবে। দেখো! আমি সেই আদেশ পৌঁছে দিলাম যা আমার ওপর ন্যস্ত ছিল।" (জরুরতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৩, পৃ. ৪৯৭)

একটি উদ্ধৃতি রয়েছে যাতে তিনি (আ.) বলেন, "প্রতিটি পদক্ষেপেই আমার খোদা আমার সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সাথে আছি আর আমার অন্তরের খবর তিনি যতটা জানেন অন্য কেউ তা জানে না। সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে তবে খোদা আরেকটি জাতি সৃষ্টি করবেন– যারা আমার সঙ্গী হবে। নির্বোধ বিরোধী মনে করে যে, তার ষড়যন্ত্র ও অসৎ পরিকল্পনার ফলে আমার এ সমস্ত বিষয় ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এ জামা'ত ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু এ নির্বোধরা জানে না যে, স্বর্গে যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সেটিকে ধ্বংস করার সাধ্য ভূপৃষ্ঠের কারো নেই। আমার খোদার সামনে পৃথিবী ও আকাশ কম্পমান। প্রকৃত খোদা তিনিই– যিনি আমার প্রতি তার পবিত্র বাণী (ওহী) নাযিল করেন এবং অদৃশ্যের রহস্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। তিনি ছাড়া কোনো খোদা নেই। যতক্ষণ না তিনি পবিত্র ও অপবিত্রের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করবেন এই জামা'তকে কর্মতৎপর রাখা, বিস্তৃত করা ও উন্নতি দেওয়া একটি অবধারিত বিষয়। প্রত্যেক বিরোধী সর্বশক্তি নিয়োগ করে হলেও এই জামা'তকে ধ্বংস করার যথাসম্ভব চেষ্টা করুক। তারপর দেখুক পরিণতিতে বিজয়ী হলো সে– নাকি খোদা। এর পূর্বে আবু জাহল, আবু লাহাব এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সত্যকে ধ্বংস করার জন্য কত-না শক্তি ব্যয় করেছিল, কিন্তু তারা আজ

কোথায়? যে ফেরাউন মূসা (আ.)-কে ধ্বংস করতে উদ্যত ছিল– তার কি এখন কোনো খবর আছে? অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো! সত্যবাদী কখনো বিনষ্ট হতে পারে না। সে ফেরিশতাবাহিনীর মাঝে ঘুরে বেড়ায়। হতভাগা সেই ব্যক্তি– যে তাকে শনাক্ত করতে পারে না।" (পরিশিষ্ট: বারাহীনে আহমদীয়া, খণ্ড: ০৫, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২১, পৃ. ২৯৪-২৯৫)

(৭)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ৬ জুন ২০০৩, মোতাবেক ৬ এহসান ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۸﴾

(আল-বাকারা: ১২৮)

তারপর হুযূর (আই.) বলেন, আজ থেকে আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম **"সামীউন"** সম্পর্কে খুতবা আরম্ভ হবে। যে আয়াতটি আমি এইমাত্র পাঠ করেছি তার অর্থ হলো, **"আর (স্মরণ করো!) ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন সেই ঘরের ভিত উঠাচ্ছিল (এবং তারা দোয়া করছিল), 'হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! তুমি আমাদের পক্ষ থেকে (এ সেবা) গ্রহণ করো। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"**

আল্লাহ্ তা'লার জন্য **'সামী'** শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া প্রসঙ্গে আল্লামা রাগেব লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন **'আস-সামউ'** শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন এর অর্থ হলো, যে-সব বিষয় তাঁকে শোনানোর থাকে তা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার অবগত থাকা এবং সেগুলোর প্রতিদান দেবার ইচ্ছা পোষণ করাকে বুঝায়। এ সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, কতক ত্বরাপরায়ণ লোক অনেক সময় ধোঁকা খেয়ে বলে বসে, আল্লাহ্ তা'লাকে আমি অনেক ডেকেছি এবং তার কাছে অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু আমার দোয়া গৃহীত হয় নি। আমাদের কোনো জিনিসের প্রয়োজন, সেটা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া করা বা ডাকার আগেই জানেন। তিনি এটিও জানেন যে, আমরা যা চাচ্ছি, যে জিনিসের জন্য আমরা দোয়া করছি তা ঐ মুহূর্তে আমাদের আদৌ প্রয়োজন আছে নাকি নেই। আমরা যদি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দাদের মাঝে গণ্য হই আর খোদা করুন যেন তা-ই হই, তবে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন যে, এই সময় কোনো জিনিসের কতটা চাহিদা রয়েছে। অতএব দোয়া করার সময় একথা সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা **'সামী'** (বা সর্বশ্রোতা) হবার পাশাপাশি **'আলীম'** (বা সর্বজ্ঞ)-ও বটে। আমাদের কাজ কেবল যাচনা করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করে থাকেন সেখানে নিজ বান্দার কোনো দোয়া যদি সেভাবে গ্রহণ না-ও করেন যেভাবে সে চায়, তবে তার হতাশ হওয়া উচিত নয়। এক পুণ্যবান ব্যক্তির সে ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ যা আপনারা প্রায়শই শুনে থাকেন। এক পুণ্যবান ব্যক্তি ত্রিশ বছর ধরে দোয়া করছিলেন আর প্রতিদিন তিনি একই উত্তর পেতেন যে, তার দোয়া গৃহীত হয় নি। তার এক শিষ্য মাত্র তিন দিন

তার সাথে থেকেই অধৈর্য হয়ে পড়লে তিনি কাঁদতে শুরু করেন এবং বলেন, আমি এতদিন ধরে দোয়া করে যাচ্ছি এবং এই উত্তরই পাচ্ছি। আমার কাজ কেবল যাচনা করা আর আমি এভাবেই চাইতে থাকব। এরপর পুনরায় সেই অবস্থার অবতারণা হলো আর শিষ্যও সেই দৃশ্য দেখল যে, আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তিকে উত্তরে বললেন, "এ পুরো সময়ে যত দোয়া তুমি করেছ তার সবই গৃহীত হয়েছে।"

অতএব দোয়া করার মূল শর্ত হলো, ধৈর্য। স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের জন্য কী প্রয়োজন তা খোদা তা'লাই সবচেয়ে ভালো জানেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে বলেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে একটি বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরে হযরত ইসমাঈল (আ.) বলেন, আপনার প্রতিপালক-প্রভু আপনাকে যে আদেশ দিয়েছেন তা আপনি বাস্তবায়ন করুন। তিনি (আ.) বলেন, তুমি কি এ কাজে আমাকে সহযোগিতা করবে? হযরত ইসমাঈল (আ.) উত্তর দিলেন, অবশ্যই করব। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লা এখানে আমাকে তাঁর একটি গৃহ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি একটি টিলাসদৃশ জায়গার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা দুইজন মিলে বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি দাঁড় করতে আরম্ভ করেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) পাথর আনেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) (দেয়াল) নির্মাণ করেন। গৃহটির নির্মাণকাজ যখন এক বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে তখন হযরত ইসমাঈল (আ.) এই পাথর (অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ) নিয়ে আসেন এবং তাঁর [অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)] জন্য সেটিকে নীচে রাখেন। হযরত ইবরাহীম) (আ.) এই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে যখন নির্মাণ কাজ করতেন তখন হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁর হাতে পাথর তুলে দিতেন আর একই সাথে তাঁরা উভয়েই এই দোয়াও করতেন, **"হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে (এই সেবা) গ্রহণ করো, নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।"** (বুখারী, কিতাব আহাদীসুল আম্বিয়া, বাব কওলুল্লাহু তা'লা ওয়াত্তাখিযুল্লাহু ইবরাহীমা ...)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, **"রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম"**– এটি নবীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, তাঁরা কাজের পাশাপাশি দোয়াও করতে থাকেন। মানুষ সামান্য কাজ করেই গর্ববোধ করতে থাকে এবং বলে যে, আমরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি লক্ষ করুন, তিনি তার একমাত্র ছেলেকে জবাই করার জন্য প্রস্তুত। তারপর সেই ছেলে বড়ো হলে তাকে তিনি (আ.) এমন একটি জঙ্গলে রেখে আসেন যেখানে খাদ্য বা পানীয়ের কোনোকিছুই ছিল না। কা'বাঘর নির্মাণের মাধ্যমে তিনি তার (পুত্রের) চিরস্থায়ী মৃত্যুকে মাথা পেতে নেন। **'চিরস্থায়ী মৃত্যু'** শব্দটি আমি এ কারণে ব্যবহার করেছি যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ফেরত যাবার পর হযরত ইসমাঈল (আ.) সেখান থেকে অন্য কোনো জায়গায় চলে যেতে পারতেন, কিন্তু বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের সাথে সাথে তিনি কা'বাঘরের বাগডোরে বাঁধা পড়লেন। মনে হচ্ছিল যেন কা'বাঘরের প্রতিটি ইট হযরত

ইসমাঈল (আ.)-কে বাস্তব অবস্থার নিরিখে জানান দিচ্ছিল যে, সারাটা জীবন তোমাকে এই মরুতেই কাটাতে হবে। হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর এই কুরবানী কত-না মহৎ ছিল! কিন্তু এরপরও দেখুন! তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে নতশিরে বলেন, **'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না'** অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! আমরা একটি সামান্য উপহার তোমার দরবারে উপস্থাপন করছি; তুমি দয়া করে নিজ অনুগ্রহে আমাদের দুর্বলতা উপেক্ষা করে এই উপহার গ্রহণ করো। দেখুন! কত বিনয়ের সাথে কাকুতিমিনতি করে তারা (উপহার) গ্রহণের অনুরোধ করেছেন!

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, **'তাকাব্বাল'** শব্দটি বাব **'তাফাউল'** থেকে এসেছে আর **'তাফাউল'** শব্দের মধ্যে **অসাধারণ চেষ্টা বা সাধারণ রীতির বাইরে গিয়ে চেষ্টার** অর্থ রয়েছে। অতএব তারা বলেন যে, তুমি নিজ অনুগ্রহে এই কুরবানী কবুল করো। অথচ এটি এত বৃহৎ এক কুরবানী ছিল যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া ভার। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে কুরবানী করছিল এবং কা'বাঘরের প্রতিটি ইট তাদেরকে বিরান প্রান্তরের সাথে একপ্রকার বেঁধে রাখছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বয়ং প্রতিটি ইট ভিত্তিতে গাঁথছিলেন, এর সাথে নিজের সকল আবেগ ও অনুভূতির সমাধি রচনা করছিলেন আর সেই সাথে এ দোয়াও করেছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! তোমার দরবারে এটি উপস্থাপনের যোগ্য নয়, তবুও তুমি একে গ্রহণ করো। এটি সেই বিনয়ের পরাকাষ্ঠা যা হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রদর্শন করেছেন আর হৃদয়ের এমন অবস্থাই প্রকৃত অর্থে মানুষকে মহীয়ান করে তোলে। অন্যথায় ইট তো প্রত্যেকেই গাঁথতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের অবস্থা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো হলেই সেই পুরস্কার পাওয়া যাবে যে (পুরস্কারে) খোদা তা'লা তাকে ভূষিত করেছেন। অতএব মানুষের **'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম'** পড়া উচিত। বড়োই পরিতাপের বিষয়! লোকেরা **'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না'** পড়ার পরিবর্তে এটি বলে যে, আমাদের মূল্যায়ন করা হয় না অথচ সে সবকিছুই করে অন্যের অনুকরণে। অথচ হযরত ইবরাহীম (আ.) কাউকে অনুকরণ করে ত্যাগস্বীকার করেন নি, বরং একদিকে খোদা আদেশ দিয়েছেন আর অপরদিকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। এমন লোকেরাই জগতের জন্য খুঁটি হয়ে থাকে এবং তাদের কল্যাণময় সত্তা বিপদের সময় রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে থাকে। তারা ত্যাগস্বীকারও করেন আবার সাথে সাথে এটিও বলতে থাকেন, হে খোদা! আমাদের এই কুরবানী তোমার সামনে উপস্থিত করার যোগ্য নয়। তোমার সত্তা অতি উচ্চ ও অতীব মহান। হ্যাঁ, আমরা আশা রাখি যে, তুমি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে সেগুলো গ্রহণ করবে, কেননা তোমার নাম **'সামী'** (সর্বশ্রোতা) এবং তুমি প্রার্থনাসমূহ গ্রহণ করে থাকো। আমাদের এই কুরবানী গ্রহণ করার যোগ্য নয় বটে, তবুও তুমি জানো যে, তোমার সমীপে উপস্থাপনের জন্য আমাদের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু নেই। একদিকে তোমার **'সামী'** (সর্বশ্রোতা) হবার দাবি হলো, আমাদের প্রতি কৃপা করা অন্যদিকে তোমার **'আলীম'** হওয়া থেকে প্রমাণিত হয়, তুমি জানো, আমাদের মতো দুর্বল মানুষ আর কী ত্যাগস্বীকার করবে? হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) এ প্রেরণার স্বাক্ষরই রেখেছেন। আর যখন তারা দুইজন মিলে বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি দাঁড় করাচ্ছিলেন, সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'লার

নিকট এই দোয়াও করছিলেন যে, **'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না'** অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা কেবল তোমার তওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তোমার ভালোবাসার কারণে এই ঘর নির্মাণ করেছি। তুমি নিজ অনুগ্রহে এটিকে গ্রহণ করো এবং সর্বদা এটিকে তোমার স্মরণের জন্য বিশেষত্ব প্রদান করো আর কল্যাণময় স্থান বানিয়ে দাও। **'ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম'** অর্থাৎ, তুমি আমাদের বেদনাবিধুর দোয়া গ্রহণ করে থাকো এবং আমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তুমি যদি এই সিদ্ধান্ত দিয়ে দাও যে, চিরকাল তোমার যিকর বা স্মরণের জন্য এই ঘর নিবেদিত থাকবে, তবে কে এটি পরিবর্তন করতে পারে? (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ১৭৭-১৮০)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আরো বলেন, এ আয়াত থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের মূলত দুটি দিক রয়েছে। এর একটি বান্দার সাথে এবং অপরটি খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে ঘরটিকে আমরা বায়তুল্লাহ্ (তথা আল্লাহ্‌র ঘর) বলি, সেটি ইট ও চুনসুরকি দিয়েই তৈরি হয়। এই কাজ খোদা নয় বরং মানুষ করে থাকে। কিন্তু মানুষ নির্মাণ করলেই কি কোনো ঘর 'আল্লাহ্‌র ঘর' হতে পারে? মানুষ তো কেবল কাঠামো তৈরি করে আর তাতে প্রাণসঞ্চার করেন খোদা তা'লা। এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন, কাঠামো তো আমি এবং ইসমাঈল নির্মাণ করে দিয়েছি কিন্তু আমাদের এই নির্মাণে কী যায়-আসে? বহু এমন মসজিদ রয়েছে যেগুলো বাদশা এবং শাহজাদারা বানিয়েছে, কিন্তু বর্তমানে তা বিরান পড়ে আছে। এর কারণ হলো, মানুষ মসজিদ বানিয়েছে ঠিকই কিন্তু খোদা সেগুলোকে গ্রহণ করেন নি। অতএব হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.) বলেন, হে খোদা! আমরা তোমার ঘর নির্মাণ করেছি আর এটিকে তুমি গ্রহণ করো এবং তুমি সত্যি সত্যি এতে অবস্থান করো। খোদা যদি কোনো জায়গায় বসতি গড়েন তবে কীভাবে সেটি বিরান হতে পারে? গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর উজাড় হতে পারে, কিন্তু সেই স্থান কখনো উজাড় হতে পারে না যেখানে খোদা বাস করেন। (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ১৮১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, **"আস সামীউল আলীম"** অর্থাৎ, আমি দোয়া শুনে থাকি। তিনি মানব অন্তরের রহস্য বা লুক্কায়িত চিন্তাধারা, প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তরিকতা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০১, পৃ. ২২৮, প্রকাশ-রাবওয়া)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "এটি এমন একটি দোয়া, যা হযরত ইবরাহীম (আ.) সেই মহাসম্মানিত ও বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র সকাশে করেছেন যিনি মহাপ্রতাপান্বিত। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই পৃথিবীতে ইসলামের আগমন এবং এর ফলাফল প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে দোয়ার একটি আনুষ্ঠানিকতা বা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অর্থ হলো, (হে আল্লাহ্!) তুমি আমাদের প্রভু তত্ত্বাবধায়ক এবং অনুগ্রহকারী। তোমার দৈহিক প্রতিপালনের মাধ্যমে যেভাবে দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিপালিত হয় এবং উন্নত ও উত্তম চরিত্রে মানুষ সজ্জিত হয় ঠিক তেমনই তুমি আমাদের আত্মারও প্রতিপালন করো এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকেও এর চূড়ান্ত

মার্গে উপনীত করো। হে আল্লাহ্! তোমার প্রতিপালনরূপী মহিমার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাদের মাঝে একজন রসূল প্রেরণ করো, যে-কিনা **'মিনহুম'** অর্থাৎ, তাদের মধ্য থেকে হবে আর তার কাজ হবে, সে কেবল তোমার (অর্থাৎ তার নিজের নয়) বাণী পড়বে এবং পড়াবে আর কেবল এটিই নয় বরং তাদেরকে তা বোঝাবে এবং শেখাবেও। (হে আল্লাহ্!) কেবল এটিই নয় বরং তাকে এমন শক্তি ও আকর্ষণ দান করো, যার কল্যাণে লোকেরা সেই শিক্ষা অনুসরণ করে পবিত্র এবং নিষ্পাপ হয়ে যাবে। এতে তোমার নাম সম্মানিত হয়, কেননা তুমি মহাসম্মানিত এবং তোমার বাণী সত্য ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। সেই দোয়া কীভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে তা তোমাদের সকলেরই জানা। এটি কেবল সেই দোয়ারই ফল যা থেকে আজ আমরা উপকৃত হচ্ছি।" (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০১, পৃ. ২৩৩-২৩৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) এই মসজিদ (কা'বাঘর) নির্মাণের সময় সাতটি দোয়া করেছিলেন। এক: **"রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না"**। দুই: **"রাব্বানা ওয়াজয়ালনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়া মিন যুররিয়্যাতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল লাকা ওয়া আরিনা মানাসিকানা"** অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! তুমি আমাদেরকে তোমার অনুগত বানিয়ে দাও এবং আমাদের বংশধরদের মাঝেও একটি দল যেন তোমার অনুগত **'মুয়াল্লিমুল খাইর'** (কল্যাণের শিক্ষাদাতা) হয়। তুমি আমাদেরকে ইবাদতের স্থান ও এর নিয়মপদ্ধতি শিক্ষা দাও। তিন: **"ওয়াজনুবনী ওয়া বানিয়্যা আন না'বুদাল আসনাম"** (ইবরাহীম: ৩৬), অর্থাৎ আমাকে এবং আমার সন্তানসন্ততিকে তুমি প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করো। চার: **"ওয়ারযুক আহলাহু মিনাস সামারাত"** অর্থাৎ এবং ফলফলাদি থেকে মক্কাবাসীদের রিযক দান করো। পাঁচ: **"ফাজয়াল আফইদাতাম মিনান নাসি তাহভি ইলাইহিম"** (ইবরাহীম: ৩৮) অর্থাৎ কিছু লোকের হৃদয়কে তুমি এই শহরের দিকে আকৃষ্ট করো। ছয়: **"ওয়াবয়াস ফিহিম রাসূলান"** অর্থাৎ তুমি তাদের মাঝে এক মহান রসূল প্রেরণ করো। সাত: **"ইজয়াল হাযাল বালাদা আমিনা"** (ইবরাহীম: ৩৬) অর্থাৎ এই শহরকে তুমি শান্তিধাম বানিয়ে দাও।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "এই দোয়াসমূহ গৃহীত হবার কথা কুরআন করীমের নিম্নোক্ত সাতটি আয়াতে বিদ্যমান। প্রথমে যে দোয়া করেছিলেন তার উত্তর হলো, **'জায়ালাল্লাহুল কা'বাতাল বাইতাল হারাম'** (আল-মায়েদা: ৯৮) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা কা'বাঘরকে সম্মানিত এবং মর্যাদাসম্পন্ন বানিয়েছেন। দুই: **'ওয়া লাকাদিস তাফাইনাহু ফিদ দুনিয়া ওয়া ইন্নাহু ফিল আখিরাতি লামিনাস সালিহীন'** (আল-বাকারা: ১৩১) অর্থাৎ আর নিশ্চয় আমরা তাকে (ইবরাহীমকে) ইহজগতে মনোনীত করেছিলাম এবং পরজগতেও সে অবশ্যই পুণ্যবানদের একজন হবে। তিন: **'তাহহিরা বাইতিয়া লিততাইফিনা ওয়াল আকিফিনা ওয়ার রুক্কাইস সুজুদ'** (আল-বাকারা: ১২৬) অর্থাৎ, তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকূকারী ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে তোমরা উভয়েই পবিত্র রেখো। আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন, **'ওয়া হুদাল্লিন্নাস'** অর্থাৎ মানুষের জন্য এটি হিদায়াতের স্থান। চার: **'আতয়ামাহুম মিন জু'** (কুরাইশ: ৫) অর্থাৎ ক্ষুধায় তাদেরকে আহার করিয়েছেন।

এখন লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, মক্কা যেখানে অবস্থিত সেখানে এমন কোনো খেতখামার ছিল না যা থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন হবে কিন্তু এই দোয়া গৃহীত হবার ফলে কেবল বর্তমানেই নয় বরং সে যুগেও বাণিজ্য-কাফেলা সব ধরনের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে সেখানে আসত আর আজও সেখানে সব জিনিস সহজলভ্য।

পাঁচ: **'ওয়া ইয জায়ালনাল বাইতা মাসাবাতাল লিন্নাস'** (আল-বাকারা: ১২৬) অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌কে আমরা দলে দলে মানুষের আসার স্থানস্বরূপ বানিয়েছি। বর্তমানে দেখুন, প্রতি বছর হজ্জের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে একত্রিত হয়। এছাড়া সারা বছরই লোকেরা উমরা করার জন্য যেতে থাকে। ছয়: **'হুয়াল্লাযি বায়াসা ফিল উম্মিয়্যিনা রাসূলাম মিনহুম'** (আল-জুমুআ: ৩) অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্, যিনি মক্কাবাসীদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি (সা.) তাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াত পড়ে শুনান। তাদেরকে তিনি [অর্থাৎ মহানবী (সা.)] পবিত্র করেন এবং কুরআন ও প্রজ্ঞা শিখান। সাত: **'ওয়া মান দাখালাহু কানা আমিনা'** (আলে ইমরান: ৯৮) অর্থাৎ আর মক্কায় যে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ।

অতএব হুযূর (রা.) বলেন, "হযরত ইবরাহীম (আ.) সাতটি দোয়া করেছিলেন এবং সাতটিই গৃহীত হয়েছে।" (নূরুদ্দীন, পৃ. ২৪৯-২৫০)

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন: "দোয়া করতে গিয়ে অধৈর্য হওয়া উচিত নয়। বহুকাল পরে হলেও দোয়ার ফলাফল প্রকাশিত হয়। তাই একজন প্রকৃত মুমিন কখনো ক্লান্ত হয় না বা মনোবল হারায় না। কুরআন শরীফে দোয়ার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। সেগুলোর মধ্যে একটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া। তিনি তাঁর সন্তানসন্ততির জন্য যা চেয়েছিলেন তা হলো, **'রাব্বানা ওয়াবয়াস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম'**। এই দোয়ায় প্রণিধান করো। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ায় আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা, তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার সম্পর্ক এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁর কতটা আবেগ-উচ্ছ্বাস কাজ করছিল তা এ থেকে বুঝা যায়। তিনি এই দোয়াও করতে পারতেন যে, আমার সন্তানসন্ততিকে বাদশা বানিয়ে দাও। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! আমার সন্তানসন্ততির মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করো। তাঁর কাজ কী হবে? তিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবেন এবং তাঁর মাঝে এমন পবিত্রকরণ শক্তি দিও যে, তিনি তাদেরকে পবিত্র ও নিষ্পাপ বানিয়ে দেবেন, তাদেরকে কুরআনের গূঢ়তত্ত্ব ও প্রজ্ঞা শেখাবেন আর শরীয়তের গূঢ়রহস্য তাদের নিকট উন্মোচন করবেন।

অতএব এটি এরূপ মহান এক দোয়া যে, অন্য কোনো দোয়া এর বিপরীতে দাঁড়াতেই পারে না এবং পৃথিবী সৃষ্টি অবধি যত লোকের জীবনী আমরা দেখতে পাই তাদের কারো জীবনীতেই এমন দোয়া পাওয়া যায় না। এ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহান সংকল্প ও মনমানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর এই দোয়ার ফলাফল কী হলো এবং কবে তা প্রকাশিত হলো? দীর্ঘকাল

অতিবাহিত হবার পর এই দোয়ার ফলে মহানবী (সা.)-এর মতো মানুষ জন্ম নিলেন আর তিনি (সা.) সমগ্র জগদ্‌বাসীর জন্য পথপ্রদর্শক এবং সংশোধনকারী সাব্যস্ত হলেন। কিয়ামত পর্যন্ত (আগত সকল যুগের জন্য) তিনিই একমাত্র রসূল হলেন এবং সেই ঐশী গ্রন্থ আনলেন যার নাম কুরআন, আর এর চেয়ে অধিক হিদায়াত, জ্যোতি ও আরোগ্য অন্য কোথাও নেই।" (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০১, পৃ. ২৩৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হযরত ইবরাহীম (আ.) যেহেতু অত্যন্ত সত্যবাদী এবং আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত বান্দা ছিলেন, সেজন্য প্রত্যেক বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করেছেন। যখনকিনা তাকে অন্যায়ভাবে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'লা আগুনকে তার জন্য ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন ...। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার আদেশে তার প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে এমন এক পাহাড়ি অঞ্চলে রেখে আসলেন যেখানে কোনো খাবার বা পানীয় ছিল না তখন খোদা তা'লা তার জন্য অদৃশ্য হতে পানি এবং খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করলেন।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খায়াযেন, খণ্ড: ২২, পৃ. ৫২)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা অনেক কল্যাণে ভূষিত করেছিলেন। তিনি সর্বদা শত্রুদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। অতএব আমার নাম ইবরাহীম রেখে আল্লাহ্ তা'লা এই ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, একইভাবে এই ইবরাহীমকেও কল্যাণমণ্ডিত করা হবে এবং বিরোধীরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ... হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এমন নিবিড় ভালোবাসা ছিল যে, তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য বড়ো বড়ো নিদর্শন দেখিয়েছেন এবং দুঃখের সময় তিনি নিজে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।" (বারাহীনে আহমদীয়া, খণ্ড: ০৫, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২১, পৃ. ১১৪-১১৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আর আমাদের নবী করীম (সা.) কা'বাঘরের সামনে সমগ্র পৃথিবীকে বিনত করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) খোদার প্রতি অবনত হবার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কিন্তু আমাদের মহানবী (সা.) এই ভিত্তির ওপর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি খোদার অনুগ্রহ ও কৃপার প্রতি এরূপ আস্থা রেখেছিলেন যে, প্রত্যেক সত্যান্বেষীর উচিত, তাঁর (সা.) কাছ থেকে খোদার ওপর নির্ভর করা শেখা। হযরত ইবরাহীম (আ.) সে জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাদের মাঝে তওহীদের নামগন্ধও ছিল না এবং কোনো ঐশী গ্রন্থও ছিল না। একইভাবে, আমাদের নবী করীম (সা.) এমন জাতির মাঝে জন্ম নিলেন যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিল আর খোদাপ্রদত্ত কোনো কিতাব তাদের হস্তগত হয় নি। আরো একটি সাদৃশ্য হলো, খোদা তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হৃদয়কে ধুয়েমুছে এতটাই পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, তিনি খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিকটাত্মীয় ও আপনজনের প্রতিও বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে খোদা ব্যতীত তার আর কেউ ছিল না। অনুরূপ ঘটনা বরং এর চেয়ে বড়ো ঘটনা আমাদের নবী করীম (সা.)-এর জীবনে ঘটেছিল। যদিও মক্কার এমন কোনো পরিবার ছিল না যাদের সাথে মহানবী (সা.)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু কেবল খোদার দিকে আহ্বান করার কারণে সবাই শত্রু হয়ে যায় এবং খোদা ব্যতীত একজনও তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন না। অতঃপর ইবরাহীম

(আ.)-কে একা ও নিঃসঙ্গ পেয়ে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে আকাশের তারকারাজির ন্যায় অগণিত সন্তানাদি দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবে মহানবী (সা.)-কে একা পেয়ে তিনি অশেষ দানে ধন্য করেছেন আর সেসব সাহাবীকে তাঁর (সা.) সাহচর্যে দিয়েছিলেন যারা আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায় কেবল অগণিতই ছিলেন না বরং তাদের হৃদয় তওহীদের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল।" (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৫, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭, টীকা)

আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলি **"আস সামী"** সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস এবং উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার একটি উপত্যকার নিকটে পৌঁছলে আমরা উচ্চৈঃস্বরে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** এবং **'আল্লাহু আকবর'** বলতে লাগলাম। তখন রসূলে করীম (সা.) বললেন, হে লোকসকল! তোমরা নীচুস্বরে (যিকর) করো, কেননা তোমরা কোনো বধির এবং অদৃশ্য সত্তাকে ডাকছ না বরং **'ইন্নাহু মায়াকুম ওয়া ইন্নাহু সামীউন কারীব'** অর্থাৎ তিনি তোমাদের সাথেই আছেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব মা ইয়াকরাহু মির রাফেয়াস সাওতি ফিত তাকবীর)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) রাতের বেলা নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার পর বলতেন, **"হে আল্লাহ্! তুমি স্বীয় প্রশংসার সাথে পবিত্র, তোমার নাম কল্যাণময়, তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"** এরপর তিনি (সা.) তিন বার যথাক্রমে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** ও **'আল্লাহু আকবর কাবীরা'** পড়ার পর এই দোয়া করতেন: "আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং এর সন্দেহ সৃষ্টি করা থেকে **'সামী'** (অর্থাৎ সর্বশ্রোতা) ও **'আলীম'** (অর্থাৎ সর্বজ্ঞ) খোদার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব মান রায়াল ইসতিফতাহ বিসুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, "আমার মা মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করলেন যে, আনাস আপনার সেবক। আপনি তার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন। অতঃপর তিনি (সা.) তার জন্য এই বলে দোয়া করলেন, **"আল্লাহুম্মা আকসির মালাহু ওয়া ওয়ালাদাহু ওয়া বারিক লাহু ফি মা আ'তাইতাহু"** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি তার সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে প্রাচুর্য দাও এবং যা কিছু তুমি তাকে দিয়েছ তা আশিসময় করো।" [সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত বাব দাওয়াতুন নবী (সা.) লিখাদিমিহি বিতওলিল উমরি ওয়া বিকাসরাতি মালিহি]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজর (রহ.) বর্ণনা করেন, সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.)-এর নিজের বর্ণনা রয়েছে যে, "খোদার কসম! আজ আমার নিকট অনেক ধনসম্পদ আছে আর আমার সন্তান এবং সন্তানদের সন্তানরা শতাধিক।" [ফাতহুল বারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত বাব দাওয়াতুন নবী (সা.) লিখাদিমিহি বিতওলিল উমরি ওয়া বিকাসরাতি মালিহি]

অতঃপর হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর জন্য মহানবী (সা.) একটি দোয়া করেছিলেন। তিনি [অর্থাৎ হযরত জাবের (রা.)] বলেন, তার পিতা আব্দুল্লাহ্ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট গেলাম এবং নিবেদন করলাম, আমার পিতা ঋণী ছিলেন আর আমার নিকট তার খেজুরের আমদানি ব্যতীত (ঋণ

পরিশোধ করার মতো) কিছু নেই। তার যে ঋণ ছিল তা আমি কয়েক বছর পর্যন্ত শোধ করতে থাকব। অতঃপর তিনি (সা.) আমার সাথে গেলেন যেন ঋণদাতারা আমার সাথে খারাপ আচরণ না করে। তারপর মহানবী (সা.) খেজুরের একটি স্তূপের চারদিকে দোয়ারত অবস্থায় প্রদক্ষিণ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় স্তূপের চারপাশে দোয়া করতে করতে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তারপর এর ওপর বসে গেলেন আর বললেন, "এখন এগুলো মাপো"। অতঃপর পাওনাদারদের অংশ পুরোটাই দিয়ে দিলেন এবং যতটা খেজুর তিনি (সা.) দিয়েছিলেন (তাঁর দোয়া কবুলিয়তের কল্যাণে) ততটুকুই অবশিষ্ট রয়ে গেল। (বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, বাব এলামাতুন নবুওয়াতি ফিল ইসলাম)

আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। এটি তায়েফের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেন, আমাকে উরওয়াহ (রা.) বলেছেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) তাকে বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করলাম, আপনার জীবনে কি উহুদের চেয়েও কঠিন দিন এসেছিল? এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, তোমার জাতির হাতে আমি বহু কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি এবং সেগুলোর মধ্যে আকাবার দিনগুলোতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম (এতে তায়েফের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে)। যখন আমি আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কুলালের সামনে নিজের (দাবিসমূহ) উপস্থাপন করলাম আর সে আমার কথার কোনো উত্তর দিল না তখন আমি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরছিলাম আর কারনুস সায়ালিব পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছার পর মাথা উঁচু করে দেখলাম, একখণ্ড মেঘ আমার ওপর ছায়া বিস্তৃত করে চলেছে। আমি দেখলাম, তাতে জিবরাঈল (আ.) ছিলেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করে ডাকলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার সম্পর্কে আপনার জাতির মনোবৃত্তি অনুধাবন করেছেন ও শুনেছেন আর তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন যাতে আপনি স্বজাতির বিষয়ে তাকে তার কাজ করার আদেশ দিতে পারেন। অতএব আমাকে পাহাড়ের ফেরেশতা ডেকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। আপনি চাইলে আমি এখনই এই দুটি পাহাড় দ্বারা তাদেরকে পিষে ফেলব। এর প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের ঔরস থেকে এমন বংশধর সৃষ্টি করেন যারা এক খোদার ইবাদত করবে এবং আল্লাহ্র সাথে আর কাউকে অংশীদার স্থির করবে না। (বুখারী, কিতাব বাদউল খালক, বাব যাকারাল মালাইকা)

অতএব এই দোয়ার কল্যাণেই পরবর্তীতে বনূ সাকীফ তথা তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া গৃহীত হবার কতিপয় নিদর্শন উপস্থাপন করা হলো, তিনি (আ.) বলেন, মালীর কোটলার জমিদার সর্দার নবাব মুহাম্মদ আলী খানের ছেলে আবদুর রহীম খান তীব্র টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার বাঁচার কোনো লক্ষণই ছিল না এবং তিনি মৃতবৎ হয়ে পড়েছিলেন। সেসময় আমি তার জন্য দোয়া করলাম। এতে আমি বুঝতে পারলাম, তকদীর অলঙ্ঘনীয়। তখন আমি খোদার দরবারে নিবেদন করলাম, হে খোদা! আমি এর জন্য সুপারিশ করছি। এর উত্তরে

খোদা তা'লা বলেন, **'মান যাল্লাযি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি'** অর্থাৎ কার এ স্পর্ধা আছে যে, খোদার অনুমতি ছাড়া কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে? তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। এরপর সাথে সাথে এই ইলহাম হলো, **'ইন্নাকা আনতাল মাজায'** অর্থাৎ তোমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হলো। তখন আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে আরম্ভ করলাম। খোদা তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করলেন আর ছেলেটি যেন কবর হতে বেরিয়ে আসল এবং তার সুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেল। সে এতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তার পূর্বের চেহারা ফিরে পেতে দীর্ঘদিন সময় লাগল। সে সুস্থ হয়ে গেল আর এখনো জীবিত আছে। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২২৯-২৩০)

পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

তারপর তিনি (আ.) বলেন, "হুশিয়ারপুর নিবাসী শেখ মেহের আলী সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখলাম, তার ঘরে আগুন লেগেছে এবং আমি তা নিভিয়ে দিয়েছি। এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, অবশেষে সে আমার দোয়ায় মুক্তি লাভ করবে। পুরো ভবিষ্যদ্বাণীটি আমি চিঠির মাধ্যমে শেখ মেহের আলীকে জানিয়ে দিলাম। এরপর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার কারাজীবনের কষ্ট আরম্ভ হয় এবং তারপর ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী সে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেল।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ২৩৩)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "রাওয়ালপিন্ডির অধিবাসী হাকীম শাহ নেওয়ায খানের ভাই সর্দার খান আমাকে লিখেন যে, বিরোধী দলের দায়েরকৃত এক মোকাদ্দমায় আদালত হতে তার ভাই শাহ নেওয়ায খানের জামানত নেওয়া হয়েছিল, যেখানে আপিলের পরে আমার কাছ থেকে দোয়া করানো হয়েছিল। দুটি দলই আপিল করেছিল। অতঃপর দোয়ার কল্যাণে শাহ নেওয়ায খানের আপিল কবুল হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় পক্ষের আপিল খারিজ হয়ে গেল। আইনজীবীরা বলছিল, আপিল করা নিষ্ফল হবে, কেননা এর বিপরীতে জামানত রয়েছে। শত্রুর জামানত বজায় রইল এবং শাহ নেওয়ায়কে জামানত থেকে মুক্ত করা হলো। এটিই ছিল দোয়ার প্রভাব।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ৩৩৭)

অতঃপর দোয়া গৃহীত হবার বিষয়ে নিজের এক ছেলে সম্বন্ধে তিনি (আ.) বলেন, "আমার ছেলে বশীর আহমদ চোখের পীড়ায় এমনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে, কোনো ঔষধই কাজ করছিল না এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। রোগের ভয়াবহতা চরম রূপধারণ করলে আমি দোয়া করলাম। এ সময় ইলহাম হলো, **'বার্‌রাকা তিফলি বশীর'** অর্থাৎ আমার ছেলে বশীর দেখা শুরু করল। সে দিনই অথবা পরের দিন সে সুস্থ হয়ে গেল। এ ঘটনাটিও প্রায় একশ মানুষের জানা আছে।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন; খণ্ড: ২২, পৃ. ২৪০)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় ইলহাম:

১৮৮৩ সালের একটি ইলহাম রয়েছে আর তা হলো, **"সালামুন আলাইকা জুয়িলতা**

মুবারাকান সামিয়াল্লাহু ইন্নাহু সামীউদ দুআ।" (বারাহীনে আহমদীয়া, খণ্ড: ০৪, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০১, পৃ. ৬২০)

অর্থাৎ তোমার প্রতি সালাম। তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করা হয়েছে। খোদা তোমার দোয়া শুনেছেন। তিনি দোয়াসমূহ গ্রহণ করে থাকেন। (তাযকেরা, পৃ. ৯৬)

তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা আমাকে বার বার সম্বোধন করে বলেছেন, "তুমি দোয়া করলে আমি গ্রহণ করব।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৮, সংখ্যা: ১৮, ২৪ মে ১৯০৪, পৃ. ০৪; তাযকেরা, পৃ. ৫১৫, প্রকাশ সন: ১৯৬৯)

পুনরায় আরেকটি ইলহাম হলো, **"কাদ সামিয়াল্লাহু উজিবাত দা'ওয়াতুকা। ইন্নাল্লাহা মায়াল্লাযিনাত তাকাও ওয়াল্লাযিনা হুম মুহসিনুন।"** (তাযকেরা, পৃ. ৬৭৩, প্রকাশ সন: ১৯৬৯) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা তোমার দোয়া শুনেছেন আর তোমার দোয়া গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং নেক কাজ করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এমন দোয়া করার তৌফিক দিন যা গৃহীত হয় আর আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ইসলামের বিজয়ের জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি দোয়া করা উচিত যেন অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র পৃথিবীকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাতলে স্থান দেন।

পরিশেষে আরো একটি বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। এডিশনাল উকিলুল মাল সাহেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এটি অর্থবছরের শেষ মাস। তাই জামা'তের সদস্যদের যেন চাঁদায়ে আম এবং জলসার চাঁদার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সামগ্রিকভাবে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথে ইতিপূর্বে যে (সদয়) ব্যবহার করেছেন, ভবিষ্যতেও তেমনটি করবেন এবং তিনি নিজেই আমাদের পৃষ্ঠপোষক হবেন আর আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন পূর্ণ করবেন, ইনশাআল্লাহ্। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই। কিন্তু অল্প কয়েকজন ব্যক্তিকেই স্মরণ করানোর প্রয়োজন পড়ে। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, এর তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে। **প্রথমত,** কিছু মানুষ শুরুতে সঠিক আয় লেখান না আর তারা কেন তা করেন তা তারাই ভালো বলতে পারবেন। আমি কারো ওপর কুধারণা পোষণ করতে চাই না। এমতাবস্থায় তাদের নিকট আমার আহ্বান হলো, তারা যেন বছরের এই শেষ মাসে এসে হলেও নিজেদের সঠিক আয় অনুযায়ী বাজেট লেখান।

দ্বিতীয়ত, কিছু লোক এমন রয়েছেন যারা সঠিক বাজেট লেখান ঠিকই, কিন্তু কোনো পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন বা এমন কোনো সংকটে পতিত হয়েছেন, যে-কারণে তারা চাঁদা পরিশোধ করতে পারেন নি। এ সত্ত্বেও তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং তাদের সদিচ্ছাও ছিল। প্রকৃতই তারা কঠিন সমস্যায় নিপতিত। অতএব এমন লোকদের প্রতি আমার আহ্বান হলো, যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও বলেছিলেন, আপনারা জামা'তের ব্যবস্থাপনা তথা যুগ-খলীফার কাছে আবেদন করুন। যারা এরূপ অবস্থায় রয়েছেন তারা যে হারেই পরিশোধ করতে চান সে হারেই পরিশোধের সুযোগ

তাদেরকে দেওয়া হবে অথবা যদি মাফ করাতে চান তবে মাফও হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, সততা অবলম্বন করতে হবে। আমিও এখন এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, যে-সব আবেদনই আসবে সেগুলোর সমাধান আপনাদের ইচ্ছা ও অবস্থা অনুযায়ীই করা হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

তৃতীয় অবস্থা হলো, শুরুতে বাজেট যা লেখানো হয় পরবর্তীতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও কেবল লিখিত বাজেট অনুযায়ীই তারা চাঁদা আদায় করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে অনুগ্রহ করেন সেভাবে চাঁদা পরিশোধ করার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করুন, কেননা আল্লাহ্ তা'লার সাথে যদি আমাদের লেনদেন পরিষ্কার থাকে তাহলে (জেনে রাখুন)! তিনি **'সামী'** (সর্বশ্রোতা) ও **'আলীম'** (সর্বজ্ঞ) খোদা। আমাদের অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। আমাদের সদিচ্ছা দেখে তিনি আমাদের দোয়া অধিকহারে শুনবেন। এখন এই যুগে আমাদের নিজেদের যদি কোনোকিছুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন থেকে থাকে, তবে তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও তাঁর অনুগ্রহ। তাঁর সমীপে বিগলিত চিত্তের দোয়াই কেবল গৃহীত হতে পারে। অতএব আমার আহ্বান, খোদার সাথে আপনাদের সকল প্রকার লেনদেন স্বচ্ছ রাখুন, কেননা দোয়া গৃহীত হবার জন্য এটি অত্যাবশ্যকীয়।

(৮)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৩ জুন ২০০৩, মোতাবেক ১৩ এহসান ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٨﴾

(আল-বাকারা: ১৩৮)

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, "অতএব তারা যদি সেভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা এর প্রতি ঈমান এনেছ তাহলে নিশ্চয় তারা হিদায়াত পেয়ে গেছে। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (জেনে রাখো,) তারা (স্বভাবসুলভ) বিরুদ্ধাচরণেই লিপ্ত। অতএব তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

এ আয়াতের তফসীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, "তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বিচলিত হয়ো না। তাদের এহেন আচরণের একমাত্র কারণ হলো, তারা বিবাদে বদ্ধপরিকর আর কোনোভাবেই তোমাদের সাথে ঐক্য গড়তে প্রস্তুত নয়। এ বাক্যাংশটি হলো মূলত **'ইন হুম ইল্লা ফি শিকাক'** অর্থাৎ, তাদের মুখ ফিরিয়ে নেবার ফলে তোমরা চিন্তিত হয়ো না। যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে দুর্বলচিত্তের কিছু মুসলমান হয়ত ভাবতে পারত যে, এরা তো আমাদের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাবে। তিনি (সা.) বলেন, এরা পূর্বেই তোমাদের কাছ থেকে দূরে আছে আর সেসব বিষয়ের কাছেও আসতে প্রস্তুত নয় যা খোদা তা'লার নিকটতর করে। যেখানে তাদের মনে এত বিদ্বেষ এবং পূর্বেই তারা তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন সেখানে ঐক্য কীভাবে সম্ভব? অতএব তোমরা এতে ভীত হয়ো না যে, পৃথক হবার কারণে তাদের পক্ষ থেকে আমরা কষ্ট পাবো আর যুদ্ধবিগ্রহ হবে।

'ফাসাইয়াকফীকাহুমুল্লাহ্' অর্থাৎ তাদের মোকাবিলায় তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লাই যথেষ্ট। তিনি স্বয়ং তাদের আক্রমণসমূহ থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন এবং নিরাপত্তা দান করবেন। এ মর্যাদা লাভ না করা পর্যন্ত মানুষ প্রকৃত মুমিন আখ্যায়িত হতে পারে না। **ফাসাইয়াকফীকাহুমুল্লাহ্**-এর অধীনে যে পদমর্যাদা লাভ হয় তা-ই ঈমানের মর্যাদা। অর্থাৎ, সে এমন মর্যাদায় উপনীত থাকবে যখনকিনা শত্রুরা তার যতই ক্ষতি করার চেষ্টা করুক না কেন সে বিশ্বাস রাখবে যে, আমার সাথে আমার খোদা আছেন এবং তিনি আমার বিরুদ্ধে শত্রুকে জয়যুক্ত হতে দেবেন না। এই যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু নির্ধারিত থাকে তবুও কোনো দুঃখ নেই, কেননা মৃত্যুর পর আমরা খোদার কাছেই যাব। ... আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান এনে থাকো তবে তিনিই তোমাদের নিরাপত্তা বিধান করবেন এবং তিনিই তোমাদেরকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।

মোটকথা, এরা যদি ঈমান না আনে তবে তোমরা জেনে রাখো, তাদের হৃদয়ে তোমাদের চরম শত্রুতা ও বৈরিতা বিদ্যমান। আর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিমূলক কার্যক্রমের আশ্রয় নেবে, কিন্তু এদের মোকাবিলায় আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তিনি তাদের আক্রমণ থেকে স্বয়ং তোমাদের রক্ষা করবেন। তাদের চক্রান্ত বা দুষ্কৃতি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আরো বলেন, "এটি মনে কোরো না যে, খোদা তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিধায় আমাদের আর কিছুই করার প্রয়োজন নেই, বরং দোয়া করো যেন এমনটিই হয়। খোদা তা'লা সর্বশ্রোতা। যে বিষয়সমূহ সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই সেগুলো তিনি ভালোভাবে জানেন। তিনি স্বয়ং সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন।

মানুষের অবস্থা দু-ধরনের হয়ে থাকে। **প্রথমত,** মানুষের ওপর যদি তার শত্রু আক্রমণ করে আর সে সম্পর্কে তার জানা থাকে তাহলে যথাসম্ভব মানুষ তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে আর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। **দ্বিতীয় অবস্থা হলো,** তার শত্রুরা এমন সময় আক্রমণ করে যা তার জানা থাকে না কিংবা এমন উপায়ে আক্রমণ করে, যে সম্পর্কে সে অনবহিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, তার কোনো বন্ধুকে কিনে নেয় আর তার মাধ্যমে তার ক্ষতিসাধন করে অথবা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তার ওপর আক্রমণ করে বসে অথবা পথিমধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থেকে এবং অন্ধকারে আক্রমণ করে। কিংবা সে তাকে তিরবিদ্ধ করে অথবা খাবারে বিষ মিশিয়ে তাকে খাইয়ে দেয় অথবা তার ধনসম্পদ বা গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে যায়। এগুলো এমন আক্রমণ যার সম্বন্ধে মানুষ অনবহিত থাকে আর এ সবই তার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়। এই উভয় প্রকার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি জানি শত্রুরা কীভাবে এবং কোনো ধরনের আক্রমণ করবে? তুমি যদি এই আক্রমণ সম্বন্ধে অবগত থাকো আর তা প্রতিহত করার সাধ্য তোমার না থাকে তবে (জেনে রেখো!) এক **'সামী'** (সর্বশ্রোতা) ও **'আলীম'** (সর্বজ্ঞ) খোদা রয়েছেন। তিনি জানেন, শত্রুরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে আর তা প্রতিহত করার শক্তি তোমাদের নেই। অতএব তোমরা বিচলিত হয়ো না। তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসব। যদি তোমরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকো অথবা পথিমধ্যে থাকো কিংবা অন্ধকারে সফরকালীন সময়ে শত্রুরা অতর্কিত হামলা করে বসে অথবা খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয় কিংবা ধনসম্পদ চুরি করে নিয়ে যায় অথবা তোমার কোনো বন্ধুর সাথে আঁতাত করে সে তোমার অজ্ঞাতে তোমার ওপর আক্রমণ করে বসে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি **'আলীম'** (সর্বজ্ঞ)। আমি ভালোভাবে জানি এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতা আমার রয়েছে তাই এমন পরিস্থিতিতেও তোমরা বিচলিত হয়ো না, বরং আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকো এবং তাঁর নিকট দোয়া করো। তিনি

তোমাদের সকল বিপদাপদ দূর করে দেবেন এবং তোমাদের শত্রুদের ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত করবেন।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ২১৫-২১৬)

মানুষ যখন কোনো ধরনের বিপদাপদে নিপতিত হয় তখন সে খোদাকে ডাকে। এটি স্বাভাবিক একটি বিষয় আর এক্ষেত্রে মুমিন-কাফিরে কোনো পার্থক্য নেই। যারা খোদাতে বিশ্বাস করে না তারা এবং নাস্তিকও তখন আল্লাহ্‌কে ডাকে। উৎকণ্ঠিত অবস্থায় খোদা তা'লা দোয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু মুমিনের কাজ হলো সুখের দিনেও নিজের নিরাপত্তা ও জামা'তের উন্নতির জন্য খোদার দরবারে দোয়া করতে থাকা, যেন কঠিন সময় এলে পূর্বে কৃত দোয়ার প্রভাব দেখা যায় আর যেন খোদা তা'লা যথাশীঘ্র দোয়া গৃহীত হবার প্রমাণ দেন। এ কারণে কেবল সমস্যা কিংবা বিপদাপদের সম্মুখীন হলেই আমরা দোয়া করব– তা নয় বরং প্রত্যেক আহমদীর সবসময় আবশ্যক হলো বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য দোয়া করতে থাকা। সুতরাং আমাদের সবার জন্য আবশ্যক হলো, দোয়ার প্রতি জোর দেওয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি স্থায়ীভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "অতএব ইসলাম বিরোধীরাও যদি একইভাবে ঈমান আনয়ন করে এবং খোদার পক্ষ থেকে আগত কোনো নবীকেই প্রত্যাখ্যান না করে তবে নিঃসন্দেহে তারাও হিদায়াত পেয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তারা যদি অবাধ্যতা করে কোনো কোনো নবীকে মানে আর কোনো কোনো নবীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তারা সত্যের বিরোধিতা করেছে এবং খোদার পথে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। অতএব তুমি দৃঢ়বিশ্বাস রেখো যে, তারা জয়ী হতে পারবে না এবং তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য খোদা-ই যথেষ্ট। এছাড়া যা কিছু তারা বলে তা খোদা শুনছেন এবং তাদের এসব কথা খোদার অজানা নয়।" (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২৩, পৃ. ৩৭৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "তারা যদি তোমাদের মতোই ঈমান আনে তবে তারা হিদায়াত পেয়ে গেছে আর যদি অনুরূপ ঈমান না আনে তবে তারা এমন জাতি, যারা বিরোধিতা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় আর সন্ধির মানসিকতা রাখে না।" (পাদটীকা-বারাহীনে আহমদীয়া, খণ্ড: ০৫; রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২১, পৃ. ৪১৭)

"ফাসাইয়াকফীকাহুমুল্লাহু ওয়া হুয়াস সামীউল আলীম। অতএব তাদের দুষ্কৃতি প্রতিহত করতে খোদা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট আর তিনি **'সামী'** (বা সর্বশ্রোতা) ও **'আলীম'** (সর্বজ্ঞ)।" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০১, অবশিষ্ট টীকা নম্বর: ১১)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "যারা এ কাজে বাধা দিচ্ছে তাদের সবাইকে উত্তর দিতে খোদা তা'লা তোমাদের সাহায্যকারী হবেন।" (তবলীগে রিসালত, মজমুয়া ইশতেহারাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ১১৬)

অতএব আজকাল যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে কোনো আহমদীরই নিরাশ হবার কিছু নেই, কেননা ঐশী প্রতিশ্রুতি রয়েছে। খোদা সর্বদা আমাদের সাহায্যকারী ছিলেন এবং আগামীতেও থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু তিনি যেমন বিরোধীদের অশালীন বক্তব্য শুনছেন সেখানে তিনি একথাও জানেন, এসব লোক আহমদীদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন করে যাচ্ছে। বর্তমানে পাকিস্তানে আবারো অনেক হট্টগোল চলছে। স্বীয় তকদীর অনুসারে

খোদা এমন লোকদের ধৃত করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, অতীতে বরং নিকট অতীতেও পাকড়াও করার এমন দৃশ্য আল্লাহ্ আমাদের দেখিয়েছেন এবং স্বীয় মহাশক্তি প্রদর্শন করে এসেছেন। কাজেই আমাদের মনে নৈরাশ্যের লেশমাত্রও থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমাদেরও দায়িত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করছেন যে, তোমরা আমার প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করো বা আমার দিকে ফিরে আসো এবং আমার কাছে যাচনা করো যেন সেই ঐশী নিয়তি যা অবশ্যই জয়যুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ্, সেক্ষেত্রে তোমাদের যেন এ উপলব্ধি জন্মায় যে, তোমাদের দোয়ারও এতে কিছুটা ভূমিকা রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের দোয়া শুনেছেন। অতএব এ দিনগুলোতে আমাদের দোয়া করার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(আল-বাকারা: ১৮২)

অর্থ: "কিন্তু যে ব্যক্তি এটি (অর্থাৎ ওসিয়্যত) শোনার পর তা পরিবর্তন করে, সেক্ষেত্রে যারা তা পরিবর্তন করে তাদের ওপরই কেবল এর পাপ বর্তাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

এ আয়াতের বিষয়বস্তু হলো, ওসিয়্যত। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, 'কোনো ব্যক্তির ওসিয়্যত করার পর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যদি তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বা রহিত করে তবে এমতাবস্থায় সমস্ত পাপ ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপরই বর্তাবে। এই পরিবর্তন দুভাবে হতে পারে। একটি হলো, ওসিয়্যতকারী লেখান একরকম কিন্তু কুটিলতাবশত লেখক লিখে দেয় অন্য কিছু। অর্থাৎ ওসিয়্যতকারীর উপস্থিতিতে তার সামনেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। দ্বিতীয়টি হলো, ওসিয়্যতকারীর মৃত্যুর পর তাতে পরিবর্তন সাধন করে অর্থাৎ ওসিয়্যতে যা লেখা হয়েছিল সে অনুযায়ী কাজ না করে ওসিয়্যতবিরুদ্ধ কাজ করে। এ উভয় অবস্থায় পাপ কেবল পরিবর্তনকারীর ওপরই বর্তাবে। (**ইসমুহু** শব্দে এ পাপের জন্য যে দায়ী তার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ পাপের বোঝা তাকে বহন করতে হবে।) এই শব্দ অর্থাৎ ইসমুহু হতে স্পষ্ট যে, এতে কুরআনের কোনো আদেশের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে আর তা হলো উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিধান। নতুবা ওসিয়্যত পরিবর্তনের পাপ ওসিয়্যতকারীর ওপর না বর্তে পরিবর্তনকারীর ওপর বর্তাবে কেন? তার গুনাহগার হবার প্রশ্ন তখনই হতে পারে যখনকিনা শরীয়তের বিধান বিরোধী কোনো কাজ হবে। আর এটি এভাবে হতে পারে যে, মৃত্যুবরণকারী ওসিয়্যত করে গেল যে, আমার সহায়সম্পত্তি ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক বণ্টন করা হবে কিন্তু উত্তরাধিকারী সে অনুযায়ী কাজ করল না। এমতাবস্থায় ওসিয়্যতকারী গুনাহ থেকে রেহাই পাবে ঠিকই, কিন্তু ওসিয়্যত পরিবর্তনকারী উত্তরাধিকারী পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত হবে।" (তফসীরে কবীর; খণ্ড: ০২, পৃ. ৩৬৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, **ইন্নাল্লাহা সামীউন আলীম**। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি **'আলীম'** (সর্বশ্রোতা) খোদা। সবকিছু জেনেই প্রাপ্য অংশ

নির্ধারণ করেছি এবং ওসিয়্যত পরিবর্তন করার বিষয়টিও আমি জানি। উপরন্তু তিনি বলেন, **ওয়া মাইয়্যা'সিল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়া ইয়াতায়াদ্দা হুদুদাহু ইউদখিলহু নারান খালিদান ফীহা** (আন-নিসা: ১৫)। **ফামান বাদ্দালাহু** (অর্থাৎ যে এটিকে পরিবর্তন করে) এখন শোনো! কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে? সর্বপ্রথম হলো, কন্যাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়া হয় না। আল্লাহ্ তা'লা নারী জাতি এবং ভূপৃষ্ঠ উভয়কেই **'হারস'** (ক্ষেত) আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপভাবে জমি এবং নারী উভয়কে **'আরয'** (ভূমি) বলেও আখ্যায়িত করেছেন। **ফাইন্নামা ইসমুহু:** এর পরিণতি দেখো! যখন থেকে তারা মেয়েদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তখন থেকে তাদের জমি হিন্দুদের দখলে চলে গেছে। যারা একসময় শত শত বিঘার মালিক ছিল তাদের এখন দুই বিঘা সম্পত্তিও নেই। এর কারণ হলো, সূরা আন-নিসার ১৫ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, **ওয়া লাহু আযাবুম মুহীন,** নারীদের ওপর অত্যাচার অনেক বেড়ে গেছে– এর চেয়ে অধিক লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **ওয়া লা তুমসিকুহুন্না যিরারা** (আল-বাকারা: ২৩২); দ্বিতীয়ত, **ওয়া আশিরুহুন্না বিল মা'রুফ** (আন-নিসা: ২০); তৃতীয়ত, **ওয়া লা তুযার্‌রুহুন্না** (আত তালাক: ৭); চতুর্থত, **ফাইন কারিহ তুমুহুন্না** (আন-নিসা: ২০); পঞ্চমত, **ওয়া লাহুন্না মিসলুল্লাযি আলাইহিন্না** (আল-বাকারা: ২২৯)। এসব (আদেশাবলি থাকা) সত্ত্বেও উত্তরাধিকার (অর্থাৎ ওয়ারিশী সম্পত্তি না দেবার ক্ষেত্রে) অনাচার অনেক বেড়ে গেছে। এছাড়া কতক সীমালঙ্ঘনকারী পুরুষ স্ত্রীদেরকে ঠিকভাবে রাখেও না আবার তালাকও দেয় না।" (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩০০)

এই আয়াতের তফসীরে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "ওসিয়্যত শোনার পর ইচ্ছাকৃতভাবে যারা এটি বদলে দেয় এর পাপ তাদের ওপরই বর্তাবে। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা শোনেন এবং জানেন অর্থাৎ এসব পরামর্শ তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারে না আর এসব কথা জানার ক্ষেত্রে তিনি অক্ষমও নন।" (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২৩, পৃ. ২১০)

যেমন- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, লোকেরা নারীদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করে না আর শরীয়ত অনুসারে তাদের প্রাপ্য অংশ দেয় না। এখনো এই উপমহাদেশে এবং বিভিন্ন স্থানে এ দৃশ্য দেখা যায় যে, নারীদেরকে শরীয়তসম্মত প্রাপ্য অংশ দেওয়া হয় না। তাদের যে উত্তরাধিকার পাবার থাকে তাদেরকে দেওয়া হয় না। আর একথা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সামনে তখনই আসে যখন কতক মহিলা ওসিয়্যত করার সময় লেখে যে, উত্তরাধিকারসূত্রে আমি এই পরিমাণ সম্পত্তি পেয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু আমি আমার ভাই অথবা ভাইদেরকে তা দিয়ে দিয়েছি আর বর্তমানে আমার কাছে কিছুই নেই। এখন আপনি যদি গভীরে গিয়ে খতিয়ে দেখেন, যখনই তদন্ত করা হয়েছে এটিই সামনে এসেছে যে, ভাই কিংবা ভাইয়েরা সম্পত্তি দেয় নি, শুধু নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে একথা বলা হয় যে, দিয়ে দিয়েছি, অথবা কখনো এমনও হয়, ভাই কিংবা অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা প্রাপ্য সম্পত্তির বিপরীতে অতি সামান্য পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অথচ সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য অনেক বেশি। যাহোক, প্রথম কথা হলো, ওসিয়্যতকারী তথা

ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকওয়ার উন্নত মানে অধিষ্ঠিত থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এজন্য তাদের সর্বদা সহজ-সরল-সত্য কথা বলা উচিত। প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা উচিত, কেননা তাকওয়ার উন্নত মানদণ্ড এবং শরীয়তের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তদের ওপর বেশি বর্তায়। এজন্য নিজের ভাইয়ের অসম্মান ও তাঁর অসন্তুষ্টির কথা না দেখে প্রকৃত অবস্থাই প্রকাশ করা উচিত। এতে করে প্রথমত, কারো অধিকার হরণ করা হলে জামা'ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে এবং অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যা দিয়েছেন তা থেকে তারা নিজেদেরকে কেন বঞ্চিত করছে। আর কেবল নিজেদেরকেই বঞ্চিত করছে না বরং ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার অধীনে এসে তার সম্পদের যে অংশ খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে দিতে চায় তা-ও ভুল বিবৃতি দিয়ে সঠিকভাবে আদায় করছে না। তাই এক্ষেত্রে অনেক সাবধানতার প্রয়োজন রয়েছে। ওসিয়্যত করার সময় এসব কথা চিন্তাভাবনা করে স্পষ্টভাবে কথা লিখে দেওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম **'সামী'** সম্পর্কে আরো একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

(আল-বাকারা: ২২৫)

অর্থ: "আর সৎকাজ করা, তাকওয়া অবলম্বন এবং মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের শপথের লক্ষ্যস্থলে পরিণত কোরো না। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: "আল্লাহ্ তা'লাকে তোমরা নিজেদের কসমের লক্ষ্যস্থল বানিও না। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যেভাবে বার বার লক্ষ্য বরাবর তির ছুড়তে থাকে তেমনই তোমরা বার বার একথা বোলো না যে, খোদা তা'লার কসম! আমরা এটি করে দেবো, সেটি করে দেবো। **আন তাবাররু ওয়া তাত্তাকু ওয়া তুসলিহু বাইনান নাস**– এটি একটি নতুন ও পৃথক বাক্য এবং এটি উহ্য খবরের মুবতাদা (অর্থাৎ, এটি উহ্য বিধেয়-এর 'উদ্দেশ্য')। আর এখানে লুক্কায়িত সংবাদটি হলো, **'আমসালু ওয়া আওলা'**। অর্থাৎ **বিররুকুম ওয়া তাক্বওয়াকুম ওয়া ইসলাহুকুম বাইনান নাসি আমসালু ওয়া আওলা**। এর অর্থ হলো, তোমাদের সৎকাজ করা, তাকওয়া অবলম্বন করা এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করা সর্বাধিক উত্তম। কেবল এ ধরনের বুলি আওড়ানো ও কসম খাওয়া যে, আমরা এই করব সেই করব– মোটেও ঠিক নয়। কসম খাওয়ার পরিবর্তে তোমাদের উচিত, কাজের বাস্তবায়ন করা। আগেভাগে কসম খাবার কী দরকার? যুজাজ এ অর্থই করেছেন যিনি একজন বিখ্যাত নহভী (আরবী ব্যাকরণবিদ) এবং সাহিত্যিক ছিলেন।

অতঃপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এর আরেকটি অর্থ হলো, তোমরা যে-সব বিষয়ের জন্য কসম খাও অর্থাৎ সৎকাজ করা, তাকওয়া অবলম্বন করা এবং মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপন করা, এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম ব্যবহার কোরো না। এক্ষেত্রে এই তিনটিই 'আইমান'-এর অব্যয় হিসাবে এসেছে আর **'আইমান'** শব্দের অর্থ কসম নয় বরং সেসব জিনিসকে বুঝায় যেগুলো নিয়ে কসম খাওয়া হয়। এর অর্থ হলো, দায়িত্ব এড়াতে তোমরা নেক কাজের কসম খেয়ো না যাতে বলতে পারো, যেহেতু কসম খেয়ে ফেলেছি তাই করতে পারছি না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো অভাবী এসে টাকা চাইলে তুমি তাকে বলে দিলে যে, আমি তো আগামীতে কাউকে ঋণ দেবো না বলে কসম খেয়েছি।

তিনি (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো, কেউ যদি তোমাকে সৎকাজ, তাকওয়া অবলম্বন এবং মানুষের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠামূলক কাজের কথা বলে তবে তুমি এটি বোলো না যে, কসম খেয়েছি বিধায় এ কাজ আমি করতে পারব না।

আবার তিনি (রা.) বলেন, তৃতীয় অর্থ হলো, তোমাদেরকে নেকী করতে হবে এই ভয়ে খোদা তা'লাকে নিজেদের কসমের লক্ষ্যস্থল বানিও না। এমতাবস্থায় **'আন তাবাররু'** হলো মাফয়ুলে লেআজলিহি (কারণ-নির্দেশক কর্ম) আর এর পূর্বে **'কারাহাতান'** শব্দটি উহ্য আছে। আর অর্থ হলো, ভালো কথা না বলার কসম খেলে এসব গুণাবলি থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এজন্য সৎকাজ, তাকওয়া অবলম্বন এবং মানুষের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই বাজে পন্থা এড়িয়ে চলো।

আসলে এ সকল অর্থই পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেবল কঠিন আরবী অংশগুলোকে বিভিন্নভাবে সমাধান করা হয়েছে। সকল তফসীরকারক যে বিষয়ে একমত তা হলো, এই আয়াতে এটি বলা হয়েছে যে, খোদা তা'লাকে নিজেদের কসমসমূহের লক্ষ্যস্থলে পরিণত কোরো না। অর্থাৎ বিনা কারণে কসম খেয়ে নিলে- এটি শিষ্টাচারবিরোধী কাজ এবং যারা এ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায় তারা প্রায়শ নেক কাজের ব্যাপারেও কসম খায় যে, আমি এমনটি করব না। এভাবে হয় সে শিষ্টাচার বিবর্জিত কাজ করে অথবা পুণ্যকর্ম থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। কিংবা এটি যে, কতক ভালোকাজের বিষয়ে কসম খেয়ে খোদা তা'লাকে সেগুলোর জন্য প্রতিবন্ধক বানিও না। এসব অর্থের নিরিখে এর মূল অর্থ দাঁড়ায় 'ছলচাতুরি'। অর্থাৎ কতক লোক দানখয়রাত দেওয়া এড়াতে ছলচাতুরি করে, চালাকির আশ্রয় নেয় এবং কতক লোক পুণ্য এড়ানোর জন্য খোদা তা'লার কসমকে ব্যবহার করে। এককথায় অন্যকে এড়াতে এবং তাকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে যে ছলনার আশ্রয় নেওয়া হয় তার মধ্যে একটি হলো খোদা তা'লার কসম খাওয়া। অতএব তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নামকে এমন নীচ প্রবঞ্চনার মাধ্যমরূপে ব্যবহার কোরো না। আমার কাছে আল্লামা আবু হায়ান-এর এই ব্যাখ্যা সবচেয়ে উত্তম বলে মনে হয়েছে যে, খোদা তা'লাকে নিজের দয়া, পুণ্য প্রভৃতি করার পথে প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড় কোরো না।

"ওয়াল্লাহু সামীউল আলীম"-এ বলা হয়েছে যে, সৎকাজ, তাকওয়া অবলম্বন এবং মানুষের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করতে যদি তোমরা সমস্যার সম্মুখীন হও তবে খোদা তা'লার

নিকট সমাধান চাও এবং সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে কাজ আদায় করো, কেননা এ কাজ দোয়া ব্যতীত সম্পন্ন হতে পারে না। আর এটিও স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্ তা'লা আলীম (সর্বশ্রোতা)। তোমরা যদি তাঁর দিকে বিনত হও তবে তিনি নিজের জ্ঞান থেকে তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন এবং সৎকাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের বিষয়ে তোমাদের পদক্ষেপ কেবল প্রথম সিঁড়িতেই থেমে থাকবে না, বরং ইলমে লাদুন্নি (ঐশী জ্ঞান) থেকেও তোমাদেরকে দান করা হবে।" (তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৬-৫০৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, **'উরযাতান':** তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নামকে পুণ্য করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসাবে ব্যবহার কোরো না। উদাহরণস্বরূপ, খোদার কসম খেয়ে এটি বলে দিলে যে, আমি অমুকের সাথে নেকী করব না, অমুকের বাড়িতে যাব না প্রভৃতি। (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩৬১-৩৬২)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন অনুসারে বাজে বা মিথ্যা কসম খাওয়া নিষিদ্ধ, কেননা তা খোদার সাথে হাসিঠাট্টার নামান্তর এবং তাঁর অবমাননা বইকি। আর এমন কসম খাওয়াও বারণ যা পুণ্য হতে বঞ্চিত রাখে যেমন- আবু বকর (রা.) শপথ করে বলেছিলেন, আমি ভবিষ্যতে সাহাবী মেসতাহ (রা.)-কে দানখয়রাত করব না। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, **'ওয়ালা তাজয়ালুল্লাহা উরযাতাল লিআইমানিকুম আন তাবাররু ওয়াত্তাকু'**। অর্থাৎ এমন শপথ করবে না যা সৎকাজ থেকে বিরত রাখে। ... তফসীরে মুফতী আবু মাসউদ মুফতী রূম-এর মধ্যে আয়াত **'ওয়ালা তাজয়ালুল্লাহা উরযাতাল লিআইমানিকুম'**-এর ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, উরযাতুন শব্দের অর্থ হলো, যে বিষয় একটি কথার প্রেক্ষিতে অকেজো এবং নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর লেখা আছে যে, এই আয়াত হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যখনকিনা মেসতাহ নামক সাহাবীর ইফক-এর ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কারণে তিনি শপথ করে বলেছিলেন যে, আমি একে আর কোনো দানখয়রাত করব না। অতএব খোদা তা'লা এই আয়াতে বলেন, এমন শপথ করবে না যা তোমাকে পুণ্য এবং সৎকর্ম থেকে বিরত রাখে। এমন শপথ করতে বারণ করা হচ্ছে না যার ফলে বিতণ্ডার মীমাংসা হতে পারে। (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৮, সংখ্যা: ২২, ১০ জুলাই ১৯০৪, পৃ. ০৭)

এখন আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম **'সামী'** সম্পর্কে কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া গৃহীত হবার বিষয়ে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জুমুআর দিনে মসজিদে নববীতে সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল যা মিম্বরের বিপরীতে ছিল। মহানবী (সা.) তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! গবাদি পশু মারা যাচ্ছে, রাস্তা ফেটে চৌচির; আপনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন যেন তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর মহানবী (সা.) দোয়া করার জন্য দুই হাত তুললেন এবং দোয়া করতে করতে তিন বার বললেন, **'আল্লাহুম্মাসক্বিনা'** অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করো।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা সেই সময় আকাশে কোনো মেঘ বা মেঘখণ্ড দেখি নি। তখন পর্যন্ত সুলা পাহাড়ে কোনো বাড়িঘর নির্মিত হয় নি। হঠাৎ সুলা পাহাড়ের পেছন থেকে ঢালসদৃশ একখণ্ড মেঘ দৃষ্টিগোচর হলো আর সেটি মধ্যগগনে এসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর বৃষ্টি শুরু হলো।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা ছয় দিন পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখি নি। তারপর এক ব্যক্তি পরবর্তী জুমুআর দিনে ঠিক সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল এবং তখনো মহানবী (সা.) খুতবা দিচ্ছিলেন। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে (সা.) উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মালামাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা ভেঙে গেছে। আপনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন তিনি যেন বৃষ্টি থামিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সা.) তাঁর দু-হাত তুলে দোয়া করলেন, **'আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়া লা আলাইনা'** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের চারপাশে বৃষ্টি বর্ষিত হোক, কিন্তু আমাদের ওপর যেন না হয়। হে আল্লাহ্! উঁচু জায়গা, পাহাড়পর্বত, মাঠঘাট, উপত্যকা এবং বনজঙ্গলে তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) দোয়া করা মাত্র বৃষ্টি থেমে গেল। জুমুআর নামায পড়ে যখন বের হলাম তখন দেখি রোদ ঝলমল করছে। (বুখারী, কিতাবুল জুমুআ, বাব আল ইসতিসকা ফিল মাসজিদিল জামে)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কিত অনুরূপ একটি ঘটনা রয়েছে। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব বলেন, ১৯০৯ সালের বর্ষাকালে একবার একাধারে আট দিন বৃষ্টি হতে থাকে, যার ফলে কাদিয়ানের অনেক ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ল। অষ্টম বা নবম দিনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বললেন, আমি দোয়া করছি আর আপনারা সবাই আমীন বলুন। দোয়া শেষ করে তিনি (রা.) বলেন, আজকে আমি সেই দোয়া করেছি যা মহানবী (সা.) সারাজীবনে মাত্র একবার করেছিলেন। এটি ছিল বৃষ্টি বন্ধ হবার দোয়া। দোয়া করার সময় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। দোয়া শেষে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল আর আসরের নামাযের সময় আকাশ একেবারে পরিষ্কার ছিল আর রোদ ওঠে।

বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) যখন প্রাণ বিসর্জনকারী বীর (সাহাবীদের) নিয়ে শত্রুদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঐশী সাহায্যের লক্ষণাবলি প্রকাশ পাচ্ছিল, কাফির বাহিনী নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য শক্ত মাটিতে ছাউনি গেঁড়েছিল আর মুসলমানদের জন্য বালুকাময় স্থান ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু খোদা তা'লা বৃষ্টি বর্ষণ করে কাফিরদের তাঁবু গাঁড়ার স্থানকে কর্দমাক্ত করে দিলেন পক্ষান্তরে মুসলমানদের অবস্থানস্থল শক্ত হয়ে গেল। অনুরূপ আরো (অনেক) ঐশী সমর্থন প্রকাশিত হচ্ছিল কিন্তু এসব সত্ত্বেও মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন যে, সকল প্রতিশ্রুতি এবং নিদর্শন সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ভ্রুক্ষেপহীনতা দৃষ্টিতে রেখে শঙ্কিত ছিলেন আর ব্যাকুলচিত্তে তাঁর দরবারে দোয়া করছিলেন– যেন মুসলমানদের বিজয় হয়। তিনি (সা.) এতটাই ব্যাকুলচিত্তে দোয়া করছিলেন যে, তাঁর (সা.) কাঁধের চাদর বার বার পিছলে পড়ছিল আর বলছিলেন, হে আমার খোদা! তুমি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো এবং সাহায্য প্রদান করো। হে আমার

আল্লাহ্! মুসলমানদের এই জামা'ত যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না।

সেই সময় তিনি (সা.) এতটাই ছটফট করছিলেন আর কাতর ছিলেন যে, কখনো সিজদাবনত হয়ে আবার কখনো দাঁড়িয়ে খোদাকে ডাকতে থাকেন আর তাঁর (সা.) চাদর কাঁধ থেকে পড়ে যেতে থাকে। হযরত আলী (রা.) বলেন, যুদ্ধ করতে করতে মহানবী (সা.)-এর কথা আমার স্মরণ হতো এবং আমি দৌড়ে তাঁর (সা.) কাছে চলে যেতাম আর দেখতাম যে, তিনি (সা.) সিজদায় পড়ে আছেন এবং তিনি লাগাতার **'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম'** পড়ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর এ অবস্থা দেখে তাঁর প্রতি আত্মনিবেদনের আতিশয্যে ব্যাকুল হয়ে বলতে থাকেন, **'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি দয়া করে শঙ্কিত হবেন না। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।'** কিন্তু প্রবাদবাক্য **'যে ব্যক্তি খোদাকে যতবেশি চেনে সে ততবেশি ভয় পায়'**– অনুসারে তিনি লাগাতার দোয়া এবং কান্নাকাটিতে নিমজ্জিত ছিলেন। তাঁর (সা.) হৃদয়ে খোদাভীতির এই গভীর অনুভূতি প্রচ্ছন্ন ছিল যে, খোদার প্রতিশ্রুতিতে কোথাও এমন দিক লুক্কায়িত নয় তো– যা না জানার কারণে তকদীর বদলে যেতে পারে। [সীরাতে খাতামান নাবিয়্যীন– হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.), পৃ. ৩৬১, নতুন সংস্করণ]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.) একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন এবং বার বার এ দোয়া করছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমার প্রতিশ্রুতির দোহাই দিচ্ছি, তোমার প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হে আমার খোদা! তুমি যদি চাও আজকের পর থেকে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না তবে নিঃসন্দেহে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কোরো না। অর্থাৎ মুসলমানদের এই জামা'ত যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না। হুযূর (সা.) এতটাই বিনয় এবং আহাজারির সাথে বার বার দোয়া করছিলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) আর আত্মসংবরণ করতে পারেন নি এবং শঙ্কিত হয়ে তাঁর (সা.) হাত ধরে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! যথেষ্ট হয়েছে, এ আহাজারি যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'লা আপনার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন। হুযূর (সা.) তখন লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। অতঃপর সে অবস্থাতেই তিনি (সা.) তাঁবুর বাইরে আসলেন এবং মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে, শত্রুবাহিনী পরাজিত হবে। তাদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে বরং এই মুহূর্ত তাদের জন্য ভয়ংকর, ধ্বংসাত্মক এবং তিক্ত হবে। [বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব মা কীলা ফি দারয়িন নাবী (সা.) ...]

অতএব দেখুন, শত্রুরা বদরের যুদ্ধে কীভাবে লাঞ্ছনাদায়ক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়!

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার মা মুশরিক ছিলেন এবং আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম। একদিন আমি যখন তাকে ইসলামের তবলীগ করলাম তখন তিনি মহানবী (সা.) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন যা আমি সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে মহানবী (সা.)-এর দরবারে হাজির হলাম এবং নিবেদন করলাম, আমি

আমার মাকে ইসলামের তবলীগ করতাম আর তিনি অস্বীকার করতেন। আজকে যখন আমি তাকে তবলীগ করলাম তখন তিনি আপনার সম্বন্ধে এমন কথা আমাকে বলেছেন যা আমার অপছন্দ। আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দেন। অতঃপর রসূলে করীম (সা.) এই বলে দোয়া করলেন, **'আল্লাহুম্মা ইহদি উম্মি আবি হুরায়রা'** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আবু হুরায়রার মাকে তুমি হিদায়াত দাও।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর এই দোয়া করার কারণে আমি খুশিমনে বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলাম। ঘরের দরজার সামনে যখন পৌঁছালাম তখন দেখলাম তা বন্ধ। আমার মা আমার পদধ্বনি শুনে বললেন, হে আবু হুরায়রা! ওখানেই দাঁড়াও। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি পানির শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি (রা.) বর্ণনা করছেন, তিনি (অর্থাৎ মা) গোসল করলেন, কাপড় পালটালেন এবং ওড়না গায়ে পেঁচিয়ে দরজা খুললেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা! **'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'**

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ আনন্দে অশ্রুসিক্ত নয়নে মহানবী (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম, মোবারক হোক! আল্লাহ্ তা'লা আপনার দোয়া শুনেছেন এবং আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দিয়েছেন। এতে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাকীর্তন করলেন এবং বললেন, খুবই ভালো হয়েছে। তখন আমি আবেদন জানালাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়াও করুন যেন তিনি আমাকে এবং আমার মাকে মুমিনদের প্রিয় বানিয়ে দেন আর তারা যেন আমাদের কাছে প্রিয় হন। অতঃপর তিনি (সা.) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তোমার এই বান্দা আবু হুরায়রা এবং তার মাকে মুমিনদের আর মুমিনদেরকে তাদের প্রিয় বানিয়ে দাও।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, যে মুমিন আমাকে দেখেও নি কেবল আমার সম্বন্ধে শুনেছে, সে-ও আমাকে ভালোবাসে। (সহীহ মুসলিম, কিতাব ফাযায়েলু সাহাবা, বাব মিন ফাযায়েলে আবি হুরায়রা ...)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া গৃহীত হবার কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)-এর ছোটোবেলার একটি ঘটনা রয়েছে। একবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন আর অবস্থা শোচনীয় ছিল। ডাক্তাররা হতাশা ব্যক্ত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার জন্য দোয়া করলেন আর ঠিক দোয়া করার সময়ই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম হলো, **'সালামুন ক্বওলাম মির রাব্বি রাহীম'** অর্থাৎ তোমার দোয়া গৃহীত হয়েছে আর রহীম ও করীম খোদা তোমাকে এই শিশু সম্পর্কে নিরাপত্তার সুসংবাদ দিচ্ছেন। এরপর হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.) অপ্রত্যাশিত ভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন এবং খোদা তা'লা স্বীয় মসীহ্র দোয়ায় তাকে আরোগ্য দান করলেন। (সীরাতে তাইয়্যেবা, পৃ. ২৬৭, ২৮৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত আরো একটি অসাধারণ নিদর্শন তুলে ধরছি। কপুরথলার কিছু অআহমদী বিরোধীরা সেখানকার আহমদীয়া মসজিদ

জবরদখল করে স্থানীয় আহমদীদের উচ্ছেদ করার হীন চেষ্টা চালিয়েছিল। পরিশেষে এই মোকাদ্দমা আদালত পর্যন্ত গড়ালো এবং বহুদিন যাবৎ কেস চলল। কপুরথলার বেশ কিছু আহমদী বন্ধু চিন্তিত ছিলেন এবং ভীষণ অস্থিরচিত্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য আবেদন জানাতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই বন্ধুদের দুশ্চিন্তা এবং নিষ্ঠায় প্রভাবিত হয়ে একদিন তাদের দোয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে গভীর আত্মাভিমান প্রদর্শনপূর্বক বলেন, তোমরা ঘাবড়াবে না! আমি যদি সত্য হই তবে তোমরা মসজিদ পাবেই পাবে। কিন্তু আদালতের দুরভিসন্ধি ছিল এবং বিচারকের আচরণও ছিল যথারীতি বৈরী। অবশেষে সে আদালতে প্রকাশ্যে বলে উঠল যে, 'তোমরা নতুন ধর্ম বানিয়েছ বিধায় এখন মসজিদও তোমাদেরকে নতুন করে বানাতে হবে আর আমরা সেই অনুযায়ী রায় প্রদান করব।' বিচারক তখনো রায় লেখে নি এবং তার মাথায় ছিল যে, আদালতে গিয়েই লিখব। সেই সময় সে নিজ বাংলোর বারান্দায় বসে চাকরকে জুতা পরিয়ে দিতে বলল। চাকর বুট পরিয়ে দিচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ বিচারকের হার্ট এ্যাটাক হলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। তার স্থানে দ্বিতীয় বিচারক এসে মামলার নথি দেখল এবং আহমদীদেরকে ন্যায়ের ওপর পেল আর মসজিদ আহমদীদেরকে দিয়ে দিল। [সীরাতে তাইয়্যেবা, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.), পৃ. ১২৫-১২৬]

আরো একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) **'চশমায়ে মারেফাত'** পুস্তকে এটি বর্ণনা করেছেন।

দর্শক-শ্রোতাদের সুবিধার্থে এখানে দোয়া গৃহীত হবার একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি যা এর পূর্বে কোনো বইয়ে উল্লেখ করা হয় নি, তা হলো, মালিরকোটলার রইস নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব তার ভাইদেরসহ অনেক কঠিন বিপদের সম্মুখীন ছিলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো মর্যাদায় তাদেরকে গভর্নরের অধীনস্থ প্রজায় অবনমিত করে দেওয়া হয়। তারা অনেক চেষ্টা তদবির করেছিল কিন্তু ব্যর্থ হন। নবাব সাহেবের শেষ চেষ্টা বলতে কেবল গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের কাছে সাহায্য চাওয়াই বাকি ছিল আর তাতেও তেমন আশা ছিল না, কেননা অধীনস্থ কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছিল। মানুষের স্বভাব অনুযায়ী দুঃখবেদনার এই ঝঞ্ঝায় তিনি আমার নিকট কেবল দোয়ার আবেদনই করেন নি বরং এই ওয়াদাও করেছেন যে, খোদা তা'লা তাদের প্রতি যদি দয়া করেন এবং এই বিপদ থেকে রক্ষা করেন তবে তারা লঙ্গরখানার সাহায্য বাবদ তাৎক্ষণিকভাবে নগদ ৩ হাজার রুপি প্রদান করবেন। অতএব অনেক দোয়া করার পর আমার প্রতি ইলহাম হলো, 'হে তরবারি! তুমি তোমার মুখ এদিকে ঘুরিয়ে নাও।' তখন আমি নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবকে এই ঐশী ইলহামের কথা জানালাম। অতঃপর খোদা তা'লা তার প্রতি দয়ার্দ্র হন এবং সাহেব বাহাদুর ভাইসরয়ের আদালত থেকে তাদের আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছানুযায়ী আদেশ জারি হয়। তখন তিনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অনতিবিলম্বে ৩ হাজার রুপির নোট আমাকে প্রদান করলেন আর এটি একটি উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল যা প্রকাশ পায়। (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২৩, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পঞ্চম নিদর্শন যা এই দিনগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে তা একটি দোয়া গৃহীত হবার নিদর্শন যা সত্যিকার অর্থে মৃতকে জীবিত করার শামিল। এই সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তারিত বিবরণ হলো, হায়দ্রাবাদ নিবাসী আমাদের মাদ্রাসার এক ছাত্র আব্দুল করীম, পিতা আবদুর রহমানকে দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন এক বাওলা কুকুর কামড় দেয়। আমরা তাকে চিকিৎসার জন্য কসৌলি পাঠালাম। কয়েকদিন পর্যন্ত কসৌলিতে তার চিকিৎসার পর সে কাদিয়ানে ফিরে এলো। কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর তার মধ্যে পাগলামির সেসব লক্ষণাবলি প্রকাশিত হয় যা পাগলা কুকুর কামড়ানোর পর প্রকাশিত হয়ে থাকে। সে পানি দেখলে ভয় পেতে লাগল এবং অবস্থা বড়োই ভয়ংকর রূপধারণ করল। তখন সেই প্রবাসী ছেলেটির জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে আর দোয়া করার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। প্রত্যেকেই ধরে নেয় যে, সেই প্রবাসী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে। নিরুপায় হয়ে তাকে বোর্ডিং থেকে বাইরে বের করে আলাদা একটি ঘরে অন্যদের থেকে পৃথক করে সকল প্রকার সাবধানতার সাথে রাখা হয় আর কসৌলিতে ইংরেজ ডাক্তারদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এমতাবস্থায় তার চিকিৎসার আর কোনো সুযোগ আছে কি? ওদিক থেকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে উত্তর আসে, এখন তার কোনো চিকিৎসা নেই। কিন্তু এই নিরুপায় প্রবাসী ছেলেটির জন্য আমার হৃদয়ে দোয়ার গভীর প্রেরণা সৃষ্টি হলো আর আমার বন্ধুরাও অনেক করে তার জন্য দোয়া করতে বলল, কেননা এমন প্রবাসে সেই ছেলেটির এ অবস্থা সত্যিই হৃদয়বিদারক ছিল। এছাড়া হৃদয়ে এ ভয়ও সৃষ্টি হলো যে, ছেলেটি যদি এমন খারাপ অবস্থায় মারা যায় তবে তা শত্রুদের হাসিবিদ্রুপের খোরাক যোগাবে। এটি ভেবে আমার হৃদয় ছেলেটির জন্য আরো অধিক বেদনা ও ব্যাকুলতায় বিহ্বল হয়ে পড়ল এবং অলৌকিকভাবে (দোয়ার প্রতি) মনোযোগ নিবদ্ধ হলো যা নিজের পক্ষ থেকে হওয়া সম্ভব নয়, বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। একবার যদি তা সৃষ্টি হয়ে যায় তবে খোদা তা'লার আদেশে তা এমন কার্যকারিতা প্রদর্শন করে যে, এর দ্বারা মৃত জীবিত হয়ে যেতে পারে। বস্তুত তার জন্য খোদার দরবারে যাবার সুযোগ সৃষ্টি হলো আর মনোযোগ যখন চূড়ান্তে পৌঁছালো আর দুঃখ যখন আমার হৃদয়ের ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করল তখন যে-কিনা প্রকৃতঅর্থে মৃত ছিল সেই অসুস্থ রোগীর মাঝে সেই বিশেষ দোয়ার ফলাফল প্রকাশ পেল। যে-কিনা পূর্বে পানি দেখলে ভয় পেত এবং আলো দেখলে দৌড়ে পালাতো সে হঠাৎ করে সুস্থ হতে শুরু করল আর সে বলতে লাগলো, এখন আমার পানি দেখলে ভয় করে না। অতঃপর তাকে পানি দেওয়া হলে সে কোনো ভয় ছাড়াই পানি পান করল, বরং পানি দিয়ে ওযু করে নামাযও পড়ল। আর সারারাত ঘুমালো এবং ভয়ংকর ভীতিপূর্ণ অবস্থা অপসৃত হতে থাকে এমনকি কয়েকদিনের মধ্যে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ৪৮০-৪৮১)

এরকম ঘটনা এর পূর্বে বা পরে কখনোই ঘটে নি, কেননা একবার লক্ষণ ফিরে এলে ডাক্তার এটিই বলে যে, এর কোনো চিকিৎসা নেই।

গুজরাটের রাজেকী নামক স্থানের অধিবাসী মিয়াঁ করমউদ্দীন সাহেবের পুত্র হযরত

মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, হাফেযাবাদ এলাকার একটি গ্রামে এলাহি বখশ নামে এক ব্যক্তি বসবাস করতেন। তাকে একবার কিছু আহমদী কাদিয়ান আনতে সম্মত করেন। সে প্রস্তুত হয়ে গেল। বাটালায় গাড়ি থেকে নামার পূর্বে তার জ্বর আসে। জ্বর নিয়ে সে বাটালা স্টেশনে নামল। সামনে এগোতেই মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালবির সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে দেখল, এই ব্যক্তি জ্বর নিয়ে কাদিয়ানে যাচ্ছে। সে তার মনে কুমন্ত্রণা সঞ্চার করল যে, মির্যা সাহেব যদি সত্য হতেন তবে রাস্তায় তোমার গায়ে জ্বর আসত না। সে আরো বলল, ওখানে দোকানদারি বা ব্যাবসা ছাড়া আর কিছু নেই; সেখানে মোটেও যেও না। কিন্তু সে ব্যক্তি বলল, একবার তো আমি অবশ্যই যাব। অতএব সে কাদিয়ান এলো। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে বসেছিল মাত্র। তখন তিনি (আ.) বললেন, আমাদের কতক বিরোধী এ-ও বলে যে, সেখানে দোকানদারি ছাড়া আর কিছু নেই। নিঃসন্দেহে এটি দোকানদারি বইকি, কিন্তু এখানে খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) সংক্রান্ত ব্যাবসা হয়। একথা শুনে তার চোখ খুলে গেল আর ঈমান তাজা হলো; এছাড়া সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও নেমে গেল। (রেজিস্টার, বর্ণনা নম্বর: ১২; পৃ. ১৪০)

এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহামের কথা উল্লেখ করি। ১৮৮৩ সালের ইলহাম:

"ইয়া আবদাল ক্বাদের ইন্নি মায়াকা আসমাউ ওয়া আরা" অর্থাৎ হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার সাথে আছি, শুনি এবং দেখি। (বারাহীনে আহমদীয়া, খণ্ড: ০৪, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০১, পৃ. ৬১৩-৬১৪ এর টীকা পাদটীকা নম্বর: ৩-এর অনুবাদ পর্যন্ত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেও দেখছি যে, দোয়ার প্রভাব ও কার্যকারিতা পানি ও আগুনের প্রভাবের চেয়েও অধিক, বরং প্রাকৃতিক উপকরণসমূহের মাঝে দোয়ার সমতুল্য মহান প্রভাবশালী জিনিস আর একটিও নেই।" (বারাকাতুদ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৬, পৃ. ১১)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "দোয়ার মাঝে খোদা তা'লা অসাধারণ সব শক্তি রেখেছেন। খোদা তা'লা আমাকে বার বার ইলহামসমূহের মাধ্যমে এটি বলেছেন যে, যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমেই হবে।" [সীরাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), হযরত ইয়াকূব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) কর্তৃক রচিত, পৃ. ৫১৮]

(৯)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২০ জুন ২০০৩, মোতাবেক ২০ এহসান ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۟ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(আল-বাকারা: ২৫৭)

বর্তমানে গোটা পশ্চিমা বিশ্ব ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করছে যে, ইসলাম উগ্রবাদী ধর্ম। মূলত এই সহিংস শিক্ষার কারণেই মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন জিহাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে। এটি একটি চরম মিথ্যা ও ন্যাক্কারজনক অপবাদ ইসলামী শিক্ষার প্রতি আরোপ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক আহমদী ভালোভাবে অবগত আছে। ইসলাম ধর্ম শান্তি, প্রেম, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়ে থাকে। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্ব ইসলামী শিক্ষামালায় রয়েছে এর উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত অন্য কোনো শিক্ষায় নেই। পাশাপাশি আমি এটিকে দুর্ভাগ্যই বলব যে, কতক উগ্রপন্থি দল যাদের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই, তারা নিজেদের আমিত্বের পিপাসা নিবারণের জন্য এবং নিজেদের জাহির করার মানসে জিহাদী সংগঠনগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামী শিক্ষাকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে, যার ফলে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর এই শিক্ষার ভয়ংকর চিত্র ফুঁটে ওঠে। এটি ইসলামের কোনো সেবা নয়, বরং ইসলামকে দুর্নাম করারই নামান্তর। এইমাত্র যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ (বা জোরজবরদস্তি) নাই। নিশ্চয় সৎপথ ভ্রান্তপথের বিপরীতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে যা ভাঙার নয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, অদ্ভুত বিষয় হলো, ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হয়, এটি নাকি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের শিক্ষা দেয়। অথচ ইসলাম যদি জিহাদের জন্য একদিকে মুসলমানদের প্রস্তুত করে থাকে যেমনটি কিনা তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) বলেন,

قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

(আল-বাকারা: ১৯১)

অর্থাৎ আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ

করো; পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লা এটিও বলেন যে, لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ যুদ্ধের যে নির্দেশ তোমাদের দেওয়া হয়েছে তাতে এটি মনে করা উচিত নয় যে, লোকদের মুসলমান বানানোর জন্য বলপ্রয়োগ করা বৈধ হয়ে গেছে, বরং যুদ্ধের এই নির্দেশ কেবল শত্রুদের দুষ্কৃতি থেকে নিরাপত্তার জন্য এবং তাদের নৈরাজ্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। ইসলামে যদি বলপ্রয়োগ বৈধ হতো তবে এটি কীভাবে সম্ভব যে, একদিকে পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছে আবার অপরদিকে ঐ একই সূরাতে বলছে যে, ধর্মের বিষয়ে বলপ্রয়োগ কোরো না! এর স্পষ্ট অর্থ কি এটিই নয় যে, ধর্মের বিষয়ে অন্যের ওপর কোনো অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ করাকে ইসলাম বৈধ জ্ঞান করে না? অতএব এই আয়াত ধর্মের বিষয়ে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগকে কেবল অবৈধই আখ্যা দেয় না, বরং যে স্থানে এই আয়াত বিদ্যমান তা থেকেও স্পষ্ট যে, ইসলাম বলপ্রয়োগের সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদদের এই আপত্তি একেবারেই ভিত্তিহীন যে, ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিধর্মীদের ইসলামভুক্ত করানোর নির্দেশ দেয়। প্রকৃত বিষয় হলো, ইসলামই সেই সর্বপ্রথম ধর্ম যা পৃথিবীর সামনে এই শিক্ষা উপস্থাপন করে যে, ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন এবং ধর্মের বিষয়ে কারো ওপর কোনো বলপ্রয়োগের সুযোগ নেই।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৫৮৫-৫৮৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন, "লা ইকরাহা ফিদ দীন। নবীদের পথ ও মত এক ধরনের হয় আর বাদশাদের পথ ও মত ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। জোরজবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ এবং অন্যায়ভাবে কার্যসাধন করা নবীদের শিক্ষা পরিপন্থি। হ্যাঁ, বাদশা বলপ্রয়োগ করে কাজ আদায় করে থাকে। পুলিশ তখনই কাউকে গ্রেফতার করে যখন কোনো ব্যক্তি অন্যায় করে, কিন্তু ধর্ম পাপকর্ম করার বাসনা পোষণ করা থেকেও বারণ করে। অতএব মানুষ যখন ধর্মের অনুশাসন মেনে নেয় তখন তার সংশোধনের জন্য পুলিশের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ধর্মের সাথে বলপ্রয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব বাহুবলে কাউকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করবে না, কেননা হৃদয় থেকে যে প্রকৃত মুমিন হয় না, সে নিঃসন্দেহে মুনাফিক। ইসলামী শরীয়তে মুনাফিক এবং কাফিরকে একই কাতারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভুলবশত এমন কাহিনি প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, ইসলাম নাকি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে।"

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, "বাদশা আলমগীরের বিরুদ্ধেও এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তিনি নাকি অত্যাচারী ছিলেন এবং জোরপূর্বক মানুষকে মুসলমান বানাতেন। এটি একেবারেই অবান্তর কথা! তার সেনাপতি হিন্দু ছিল। তার জীবনের একটি বৃহৎ অংশ নিজ ভাইদের সাথে যুদ্ধ করে কেটেছে। তার মৃত্যুও হয়েছে তানা শাহ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে।" অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, "বাদশাদের কৃতকর্মের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করা যায় না। মুসলমানরা এটিই ভুল করেছে যে, তারা আপত্তিকারীদের মিথ্যা অপবাদগুলো মাথা পেতে নিয়েছে, যেখানে কিনা আন্তরিক ভালোবাসা ও উত্তম চরিত্র প্রদর্শনপূর্বক সত্যকে মেনে নেবার নামই হলো ইসলাম। মোটকথা, ইসলামে কোনো বলপ্রয়োগের সুযোগই নেই।" (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩৯১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো বলেন, কিতাবুল মাগাযীতে মহানবী (সা.) কোনো ব্যক্তি, বংশ বা কোনো গোত্রকে তরবারির জোরে এবং বলপ্রয়োগ করে মুসলমান বানিয়েছেন বলে একটি উপমাও চোখে পড়ে না (এমনকি অগ্রহণযোগ্য ও দুর্বল হাদীসও নেই)। স্যার উইলিয়াম ম্যুর সাহেবের ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভাষায় বলে, মদীনা শহরের হাজার হাজার মুসলমানের মধ্য থেকে একজনকেও বলপ্রয়োগ করে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানো হয় নি এবং মক্কাতেও মহানবী (সা.)-এর একই আচরণ ও একই ব্যবহার ছিল। বরং সেসব মহান রাজা-বাদশা (মাহমুদ গযনবী, সুলতান সালাহউদ্দিন এবং আওরঙ্গজেব) প্রমুখদের সত্য ও সঠিক ইতিহাসে এমন উদাহরণ একটিও নেই যার এ অর্থ করা যেতে পারে যে, তারা কোনো ব্যক্তিকে বাহুবলে মুসলমান বানিয়েছেন। হ্যাঁ, আমরা তাদের যুগে বিজাতীয়দেরকে উচ্চপদ এবং উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে দেখেছি। সুতরাং এটি অনেক বড়ো প্রমাণ যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছাড়া মুসলমানরা কখনো ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য তরবারি ধারণ করে নি।"

তিনি (রা.) আরো বলেন, "ইসলামী আইনকানুন অনুসারে ধর্মের সেসব অনুসারীদের সকল প্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যকারী ও নির্দেশ মান্যকারী। লা ইকরাহা ফিদ্ দীন অর্থাৎ ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নেই; এই আয়াতটি এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলাম ধর্মে সকল ধর্মাবলম্বীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ রয়েছে।" (ফাসলুল খেতাব, খণ্ড: ০১, পৃ. ৯৮-৯৯)

অতএব আজ আহমদীয়া জামা'তের কর্তব্য হলো, ইসলামের শান্তি ও সম্প্রীতির অনিন্দ্য সুন্দর এবং চমৎকার শিক্ষা জগতের সামনে তুলে ধরার একটি অভিযান হাতে নেওয়া। জগদ্‌বাসীর সামনে সুস্পষ্ট করে দিন যে, ইসলাম হলো, ন্যায় ও শান্তিময় শিক্ষার পতাকাবাহী। যার দৃষ্টান্ত আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বেকার ঘটনাবলিতে বিদ্যমান। বনূ নযীর গোত্রকে মদীনা থেকে দেশান্তরিত করার ঘটনাটি সম্পর্কে চিন্তা করুন, তাদের মাঝে আনসারদের সন্তানসন্ততিরাও ছিল। আনসারগণ তাদেরকে নিজেদের কাছে আটকে রাখতে চাইলেন, কিন্তু ধর্মের বিষয়ে যেহেতু কোনো বলপ্রয়োগ নেই তাই মহানবী (সা.) তাদেরকে আটকাতে বারণ করলেন। অজ্ঞতার যুগে যখন কারো ছেলে সন্তান হতো না, তখন সে এই মানত করত যে, আমার ছেলে হলে আমি তাকে ইহুদী বানাবো আর এভাবে ছেলেদের জন্মের পর তারা নিজেদের সন্তানদের ইহুদীদের হাতে সঁপে দিত। অতএব ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা হলো, তোমরা তোমাদের কলিজার টুকরা সন্তানকেও যদি একবার কাউকে দিয়ে দাও এবং তারা যখন তাকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলে, তখন বলপ্রয়োগে তাদের ফিরিয়ে আনা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়।

এছাড়া এমন একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যা পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না আর তা হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধি। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কী হয়েছিল? কুরাইশদের কঠিন এবং তিক্ত একতরফা শর্তসমূহের কারণে মুসলমানরা অপমান বোধ করছিল কেউ কেউ প্রকাশ্যে বলছিল আমরা এই শর্তসমূহ মানি না। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, বিজয়

মুসলমানদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্। এটি সেই সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ খোদার প্রতিশ্রুতি যিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! তোমার বিজয় অবধারিত। আল্লাহ্ তা'লা তোমার দোয়া শুনেছেন এবং সেই দোয়াসমূহ গৃহীত হবার সময় সন্নিকটে। মহানবী (সা.) সেসব শর্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং সাহাবীদেরকেও এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের মাধ্যমে নয় বরং সন্ধিস্থাপন ও খোদা তা'লার আদেশাবলি শিরোধার্য করেই ইসলামের বিজয় হবে।

এ যুগেও ইনশাআল্লাহ্ এভাবেই (বিজয় অর্জিত) হবে কিন্তু মুসলমানদের একথা বুঝা উচিত যে, ইসলামের বিজয় অবশ্যই হবে কিন্তু তা বাহুবলে নয় বরং তা হবে খোদা তা'লার অনুগ্রহের মাধ্যমে এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে এই আয়াতে বলেন, তোমরা যদি ভ্রষ্টতাকে ত্যাগ করে ঈমান এনে থাকো তবে (জেনে রাখো) তোমরা একটি মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরেছ যা কখনো ভাঙবে না কিন্তু ঈমানের মৌখিক দাবি যথেষ্ট নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশাবলিকে সুদৃঢ় হাতলের ন্যায় আঁকড়ে ধরলে তবেই সফল হবে। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহ্ মওউদ-ই হলেন এ যুগের সেই সুদৃঢ় হাতল যিনি ঐশী নির্দেশাবলির সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন আর তিনি যেভাবে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালাকে উপস্থাপন করেন– সেটিই প্রকৃত শিক্ষা। অতএব উক্ত শিক্ষা অনুযায়ী চললেই সফল হবে।

দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলমানেরা নিজেদের শোচনীয় অবস্থার কারণে অস্থির ছিল আর শীঘ্রই মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিল যেন তাঁকে আঁকড়ে ধরে ইসলামের উন্নতি দেখতে পায় আর ইসলামের দরদিরা তো এজন্য দোয়াও করছিল। কিন্তু সেই 'প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ' যখন আবির্ভূত হলেন তখন কী হলো? এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী শুধু এ কারণে অস্বীকার করে বসল যে, তিনি শান্তি, সম্প্রীতি এবং সন্ধির শিক্ষা নিয়ে এসেছেন।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আরো বলেন, "এ আয়াতে অঙ্গীকার এবং ঈমান শব্দের অর্থ হলো, সে শয়তানের কথাগুলো প্রত্যাখ্যান করে এবং খোদা তা'লার আদেশাবলি মান্য করে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'ফাক্বাদিস্ তামসাকা বিলউরওয়াতিল্ উসক্বা'**। 'উরওয়া' শব্দটি হাতল অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে যা দ্বারা কোনো জিনিসকে ধরা হয় আর উরওয়া সেই জিনিসকে বলা হয় যার ওপর নির্ভর করা যায়। আবার উরওয়া শব্দ দ্বারা এমন জিনিসকে বুঝায় যার কাছে মানুষ প্রয়োজনের সময় ফিরে আসে। সেই জিনিসকেও উরওয়া বলে যা চিরস্থায়ী এবং যা কখনো বিনষ্ট হয় না, এছাড়া সর্বোত্তম সম্পদকেও উরওয়া বলা হয়।

তিনি (রা.) বলেন, যদি 'উরওয়া' শব্দের অর্থ হাতল করা হয় তবে এ আয়াতের অর্থ হবে, খোদা তা'লা ধর্মকে এমন একটি সূক্ষ্ম জিনিস আখ্যা দিয়েছেন যা কোনো পাত্রে পড়ে আছে এবং সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে; মানুষ সেই পাত্রের হাতল ধরে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে।

অতঃপর উরওয়া বলে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, ধর্ম এমন একটি জিনিস যাকে মানুষ অবলম্বন হিসেবে নিতে পারে, যেন তার পড়ে যাবার আশঙ্কা না থাকে। যেমন- সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মানুষের রশির প্রয়োজন পড়ে আর সে সেটিকে শক্ত করে ধরে রাখে, একইভাবে ধর্মও সেই রশির মতো একটি অবলম্বন যাকে শক্ত করে ধরলে পড়ে যাবার ভয় থাকে না।

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, উরওয়া শব্দটির মাধ্যমে এ-ও বলা হয়েছে যে, মানুষ যদি এটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তবে প্রত্যেক বিপদের সময় এটি তার কাজে আসে।

উরওয়া শব্দের মাঝে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই জগতে এবং পরকালে কেবল ধর্মই কাজে আসবে। বাকি সমস্ত সম্পর্ক সাময়িক এবং বিপদাবলি আসার সাথে সাথে একে একে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মানুষ নিঃসন্দেহে নিজ সঙ্গীসাথি এবং আত্মীয়স্বজনদেরকেও উত্তম সাথি আখ্যা দিয়ে থাকে কিন্তু অনেক সময় তাদের পক্ষ থেকে দুর্বলতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পায় এবং এর ফলে বুঝা যায় যে, প্রকৃত সম্পর্ক তা-ই যা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয় আর এতেই কল্যাণ নিহিত।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৫৮৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মসীহ্ ইবনে মরিয়ম যে কাজের জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন অর্থাৎ, মাহদীর হাতে হাত রেখে লোকদেরকে জোর করে মুসলমান বানানোর জন্য যুদ্ধ করবেন, তা এমন একটি বিশ্বাস যা ইসলামকে দুর্নাম করে। কুরআন শরীফের কোথায় লেখা আছে যে, ধর্মে বলপ্রয়োগ করা বৈধ? বরং আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, লা ইকরাহা ফিদ্ দীন অর্থাৎ ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নেই। তাহলে ঈসা ইবনে মরিয়মকে কীভাবে এরূপ বলপ্রয়োগের অধিকার প্রদান করা হবে যে, হয় ইসলাম গ্রহণ করো নয়তো হত্যা করা হবে, আর 'কর'-ও গ্রহণ করা হবে না?। এই শিক্ষা পবিত্র কুরআনের কোন জায়গায় এবং কত পারার কোন সূরায় রয়েছে? সমস্ত কুরআন বার বার একথারই পুনরাবৃত্তি করছে যে ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নেই আর পরিষ্কারভাবে এটি প্রকাশ করছে, মহানবী (সা.)-এর যুগে যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছিল তা ধর্মকে তরবারির জোরে প্রচার করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং শাস্তিস্বরূপ ছিল। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যারা বহুসংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করেছিল, কতককে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং নির্মম অত্যাচার করেছিল; যেমন- আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **উযিনা লিল্লাযীনা ইউক্বাতিলুনা বিআন্নাহুম যুলিমু ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহিম লাক্বাদীর** (আল-হাজ্জ: ৪০)। অর্থাৎ সেসব মুসলমান যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করছে তাদের অত্যাচারিত হবার কারণে মোকাবিলা করার অনুমতি দেওয়া হলো আর খোদা তাদের সাহায্য করার বিষয়ে সর্বশক্তিমান। অতএব এগুলো ছিল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ অর্থাৎ যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রথমে হামলা করত অথবা নিজেদের দেশে ইসলাম প্রচারে জোরপূর্বক বাঁধা দিত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা বা দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হতো। এই তিনটি কারণ ছাড়া মহানবী (সা.) এবং তাঁর পবিত্র খলীফাগণ কোনো যুদ্ধ করেন নি, বরং 'ইসলাম'

বিজাতীয়দের অত্যাচার এত বেশি সহ্য করেছে যে, এর উদাহরণ অন্য কোনো জাতির মাঝে খুঁজে পাওয়া ভার।

অতঃপর এই ঈসা মসীহ্ এবং মাহদী সাহেব কেমন হবেন যিনি আসতে না আসতেই হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেবেন এমনকি কোনো আহলে কিতাবের কাছ থেকে জিযিয়াও গ্রহণ করবেন না এবং উক্ত আয়াত **হাত্তা ইউ'তুল জিযইয়াতা আন ইয়াদিন ওয়া হুম সাগিরুন** [অর্থ: তারা (নতি ও) অধীনস্থতা স্বীকার করে স্বেচ্ছায় 'জিযিয়া' না দেওয়া পর্যন্ত (আত-তওবা: ২৯) –অনুবাদক]-কেও রহিত করবেন! তিনি ইসলাম ধর্মের কেমন সাহায্যকারী হবেন যে, আসতে না আসতেই কুরআন করীমের আয়াতসমূহ রহিত করে দেবেন যা মহানবী (সা.)-এর যুগেও রহিত হয় নি। এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সত্ত্বেও খতমে নবুওয়তের ওপর কোনো আঁচ আসবে না! আজ মহানবী (সা.)-এর যুগের পর তেরোশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, ইসলাম অভ্যন্তরীণভাবে ৭৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সত্য মসীহ্র কাজ হওয়া উচিত দলিলপ্রমাণের মাধ্যমে মন জয় করা, তরবারির মাধ্যমে নয় আর অকাট্য দলিলপ্রমাণ দ্বারা ক্রুশীয় মতবাদ ধ্বংস করা, ঘুরে ঘুরে সোনা, রুপা, পিতল বা কাঠের তৈরি ক্রুশগুলো ধ্বংস করা নয়। তোমরা যদি বলপ্রয়োগ করো তবে তোমাদের বলপ্রয়োগ একথার যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে যে তোমাদের নিকট স্বীয় সত্যতার পক্ষে কোনো যুক্তিপ্রমাণ নেই। প্রত্যেক নির্বোধ এবং সীমালঙ্ঘনকারী যখন দলিলপ্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় তখন তরবারি কিংবা বন্দুকের আশ্রয় নেয় কিন্তু এমন ধর্ম কখনো খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হতে পারে না যা তরবারির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় প্রসার লাভ করতে পারে না। তোমরা যদি এরূপ জিহাদ থেকে বিরত হতে না পার এবং এ কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ন্যায়পরায়ণ মানুষদের নামও দাজ্জাল ও মুলহিদ (ধর্মহীন) রাখো, তবে আমরা কেবল দুটি বাক্যের মাধ্যমে বিষয়ের ইতি টানছি যে, **কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন লা আ'বুদু মা তা'বুদুন** (আল-কাফিরূন: ৪)। [অর্থ: তুমি বলো, হে অস্বীকারকারীরা! তোমরা যার উপাসনা করো আমি তার উপাসনা করব না।] [তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ৭৪৭-৭৪৮]

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু করেন তা তালীম-তরবিয়তের জন্যই বা মানুষের শিক্ষার জন্যই করেন। যেহেতু (মানুষের মনে) ঐশ্বর্যের কথা বহুদিন বিরাজমান থাকে আর ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি শত শত বছর ধরে বিদ্যমান ছিল এবং এর বিজয়যাত্রা দূরদূরান্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, এজন্য কতক নির্বোধ এটি মনে করে নিয়েছে যে, ইসলামকে গায়ের জোরে বিস্তৃত করা হয়েছে; অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো, **লা ইকরাহা ফিদ্ দীন**। ইসলাম যে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে নি তা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'লা **খাতামুল খুলাফা**-কে আবির্ভূত করেছেন। তাঁর (একটি) কাজ **'ইয়াযাউল হারব'** (অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন) নির্ধারণ করে দিয়ে অপরদিকে (আরেকটি কাজ) **'লিইউযহিরাহু আলাদ্ দীনি কুল্লিহি'** আখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে তিনি অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করবেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করবেন। যারা খুনী মাহদী এবং খুনী মসীহ্-র অপেক্ষায় আছে তারা মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৬, সংখ্যা: ২৪, ১০ জুলাই ১৯০২, পৃ. ০৩)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'লা ইকরাহা ফিদ্ দীন'** অর্থাৎ ধর্মে কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ নেই– এ ধরনের বাক্য ইনজীলের কোথাও নেই। যুদ্ধের মূল কারণ কী ছিল তা বুঝতে সেই লোকদের ভুল হয়েছে। যদি যুদ্ধেরই আদেশ থাকত তবে তো রসূলে করীম (সা.)-এর **১৩**টি বছর নষ্ট হয়ে গেছে কেননা আবির্ভূত হবার সাথে সাথেই তিনি (সা.) তরবারি হাতে নেন নি, যারা অস্ত্রধারণ করে– কেবল তাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণের অনুমতি রয়েছে। ইসলাম ধর্ম কখনো যুদ্ধের সূচনা করার নীতিতে বিশ্বাসী নয়। (মুসলমানদের) যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী ছিল– তা খোদা নিজেই বলেছেন যে, **'যুলিমু'** (অর্থাৎ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখলেন, এ লোকেরা অত্যাচারিত তখন তিনি এই অনুমতি দিয়েছেন যে, এখন তোমরাও যুদ্ধ করো। এই আদেশ দেন নি যে, এখন সময় তরবারির, তোমরা জোরপূর্বক তরবারির মাধ্যমে লোকদের মুসলমান বানাও বরং এটি বলা হয়েছে যে, তোমরা অত্যাচারিত; এখন মোকাবিলা করো। অত্যাচারিতকে প্রত্যেক আইনই প্রাণ রক্ষার্থে লড়াই করার অনুমতি দিয়ে থাকে।" (আল-বদর, খণ্ড: ০২, সংখ্যা: ১-২, ২৩ জানুয়ারি ১৯০৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান-এর এ ধারণা সঠিক নয় যে, মাহ্দীর যুগে বলপ্রয়োগ করে লোকদের মুসলমান বানানো হবে। খোদা তা'লা বলেন, **লা ইকরাহা ফিদ্ দীন** (আল-বাকারা: ২৫৭) অর্থাৎ, ইসলাম ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই। অবশ্য খ্রিষ্টানরা এক সময় জোরপূর্বক লোকদের খ্রিষ্টান বানাতো কিন্তু যখন থেকে ইসলামের আত্মপ্রকাশ হয়েছে তখন থেকেই এটি বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে। বলপ্রয়োগ করা তাদের কাজ যাদের নিকট ঐশী নিদর্শন নেই কিন্তু ইসলাম তো ঐশী নিদর্শনের এক মহাসমুদ্র। কোনো নবীর মাধ্যমে এত নিদর্শন প্রকাশিত হয় নি যা আমাদের নবী (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কেননা পূর্ববর্তী নবীদের মুজিযা বা নিদর্শন তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের নবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলি আজও প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। আমার সমর্থনে যা কিছু প্রকাশিত হয় তার সবই প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলি কিন্তু কোথায় সেসব পাদরি, ইহুদী কিংবা অন্যান্য জাতি যারা এ নিদর্শনাবলির বিপরীতে নিদর্শন দেখাতে পারে? কখনোই নয়! কখনোই নয়!! কখনোই নয়!!! তারা যদি চেষ্টা করতে করতে মরেও যায় তবুও একটি নিদর্শনও দেখাতে পারবে না, কেননা তাদের খোদা কৃত্রিম খোদা। তারা সত্যিকার খোদার অনুসারী নয়। ইসলাম নিদর্শনাবলির সমুদ্র। এটি কখনো বলপ্রয়োগ করে নি এবং এর বলপ্রয়োগের কোনো প্রয়োজনও নেই।" (হাকীকাতুল ওহী পুস্তকের পরিশিষ্ট, পৃ. ৩৫-৩৬, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ৪৬৮-৪৬৯)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "এ যুগের নিম মোল্লারা চট করে বলে দেয়, মহানবী (সা.) জোর করে মুসলমান বানানোর জন্য তরবারি হাতে নিয়েছিলেন– এটি চরম মূর্খতা এবং নির্বুদ্ধিতার নামান্তর আর ঐ একই সন্দেহে নির্বোধ পাদরিরাও নিপতিত। যে ধর্মের প্রথম নির্দেশনাই হলো, **লা ইকরাহা ফিদ্ দীন** (আল-বাকারা: ২৫৭) অর্থাৎ ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই, সে ধর্মের প্রতি এই জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের অপবাদ

আরোপ করার চেয়ে বড়ো মিথ্যা কথা আর কিছুই হবে না। সত্য কথা হলো, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এবং তাঁর বুযূর্গ সাহাবীগণের যুদ্ধ ছিল কেবল কাফিরদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে; অথবা শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং তরবারির মাধ্যমে ধর্মকে যারা বাধাগ্রস্ত করতে চায় তাদেরকে তরবারির মাধ্যমেই পিছু হটানোর জন্য। (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৫, পৃ. ১৫৭)

তিনি (আ.) বলেন, সকল সত্যিকার মুসলমান যারা পৃথিবী থেকে চলে গেছেন তাদের কেউই তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে বিশ্বাসী ছিলেন না বরং ইসলাম সর্বদা স্বীয় গুণাবলির বলে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। অতএব যে-সব লোক মুসলমান হিসেবে কেবল এ কথাই জানে যে, তরবারির মাধ্যমেই ইসলাম প্রচার করা উচিত তারা ইসলামের নিজস্ব গুণাবলি সম্বন্ধে অবহিত নয় এবং তাদের আচরণ হিংস্র জন্তুর ন্যায়।" (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৫, টীকা, পৃ. ১৬৭)

অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীর অবশ্যকর্তব্য হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং যে শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে ইসলামের শান্তি, সম্প্রীতি, মীমাংসা ও সন্ধির বাণীকে সকল স্থানে পৌঁছে দেওয়া আর জগতের সামনে এই ঘোষণা দেওয়া যে, ইসলাম তরবারির জোরে নয় বরং অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। পাশাপাশি যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হবার দাবি করছে তাদেরকে এটি বলা যে, তোমরা কোনো ভুল পথে এগোচ্ছ। আপনারা তাদের বুঝান, তাদের জন্য দোয়া করুন কেননা এরাও **"ইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন"**-এর দলভুক্ত। জগৎকে এটি বোঝানো প্রয়োজন যে, মহানবী (সা.)-এর যুগেও ইসলামের উন্নতি খোদার সত্তায় বিলীন সেই মানুষটির [তথা মহানবী (সা.)-এর] দোয়ারই ফলাফল ছিল আর এ যুগেও হবে তাঁর (সা.) সত্যিকার প্রেমিক ও দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া আর এর পাশাপাশি ইসলামের সঠিক চিত্র জগতের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমেই, ইনশাআল্লাহ্।

(১০)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৭ জুন ২০০৩, মোতাবেক ২৭ এহসান ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٤﴾
ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾
اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ
مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾

(আলে ইমরান: ৩৪-৩৬)

অনুবাদ: "নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম ও নূহ আর ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে (সমসাময়িক) জগদ্বাসীর মাঝ থেকে মনোনীত করেছিলেন। এ বংশধারা একে অন্যের সাথে সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (স্মরণ করো!) ইমরানের (পরিবারভুক্ত) এক মহিলা যখন বলল, 'হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! আমার গর্ভে যা আছে তাকে নিশ্চয় আমি (সংসার)মুক্ত করে তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে (একে) গ্রহণ করো। নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।"

জিহাদের একটি ভ্রান্ত বা বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের প্রতি আরোপ করা হয়, যাতে কতক স্বার্থান্বেষী মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে ইসলামের একান্ত ভালোবাসাপূর্ণ সুন্দর শিক্ষাকে ভীতিপ্রদ এবং ভয়ংকররূপে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছে; এ বিষয়ে আমি গত জুমুআয় উল্লেখ করেছিলাম। তাদের দাম্ভিকতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, কেউ যদি তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে তবে তারা বলে, এরা ইসলামের শত্রু এবং অমুক দলের এজেন্ট। বিবেকহীন এসব মানুষের এ চেতনা নেই যে, এরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা ইসলামকে দুর্নাম করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ধ্বংস করছে। মায়েদের কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিচ্ছে, বোনদের কাছ থেকে ভাইদের পৃথক করছে এবং পিতার কাছ থেকে তাদের বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বনকে আলাদা করে তাদেরকে দ্বারে দ্বারে হোঁচট খেতে বাধ্য করছে। কেননা প্রথমে তারা কমবয়সী শিশু-কিশোর এবং অল্পবয়সী তরুণদের ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের বিষয়ে প্ররোচিত করে মাদ্রাসায় ভর্তি করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং স্থায়ী জান্নাতের লোভ দেখিয়ে পুরোপুরি মগজধোলাই করে তাদেরকে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করে। এ ধরনের নেতাদেরকে কখনোই নিজেদের বাচ্চাদেরকে এসব কাজের জন্য পাঠাতে দেখবেন না। তাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই।

এর বিপরীতে এমন একটি দলও আছে যারা ইসলামের প্রকৃত ও সুন্দর শিক্ষাকে জগতের সামনে উপস্থাপন করে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী এ যুগে আগত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার অনুসরণে বলে–

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دیں گے کئے حرام ہے اب جنگ اور قتال

হে বন্ধুগণ! জিহাদের ধারণা এখন পরিত্যাগ করো,
ধর্মের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্তমানে নিষিদ্ধ। [দুররে সামীন (উর্দু)]

হত্যাযজ্ঞ এবং তরবারির জিহাদকে অবৈধ ঘোষণা করে তিনি (আ.) বলেন, এর চেয়ে বড়ো জিহাদে শামিল হও এবং জগতের সামনে ইসলামের আকর্ষণীয় গুণাবলি প্রকাশ করো। কুরআন-উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণ জগদ্‌বাসীর সামনে উপস্থাপন করো। যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে (বিরোধী) মানুষের মুখ বন্ধ করো। ভালোবাসা এবং যুক্তির মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মন জয় করো। এটি কেবল কথার কথা নয় বরং পৃথিবীর সামনে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বর্তমানে ইসলামের অস্তিত্ব এবং উন্নতি সেই মুহাম্মদী মসীহ্-র সাথে সম্পৃক্ত যিনি দলিলপ্রমাণের মাধ্যমে লোকদের হৃদয় জয় করে নিজের বশে এনেছেন আর এই ঘোষণা দিয়েছেন যে–

سیف کا کام قلم سے ہے دکھایا ہم نے

অনুবাদ: "তরবারির কাজ আমরা কলমের মাধ্যমে সাধন করে দেখিয়েছি।"

অতএব মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী পিতামাতারা নবীগণ এবং পুণ্যবানদের রীতির অনুসরণে আজ যুগ-খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত করতে নিজ নিজ সন্তানদেরকে তাদের জন্মের পূর্বেই উপস্থাপন করেছেন এবং করে চলেছেন। এ সম্পর্কে বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, হযরত মরিয়মের মা যেভাবে খোদার নিকট আকুতি জানিয়েছিলেন, **রাব্বি ইন্নী নাযারতু লাকা মা ফী বাতনী মুহার্‌রারান ফাতাকাব্বাল মিন্নী-ইন্নাকা আনতাস্ সামীউল আলীম** (আলে ইমরান: ৩৬)। অর্থাৎ হে আমার খোদা! আমার গর্ভে যা-ই আছে তা আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য উপস্থাপন করছি। আমি জানি না কী রয়েছে? মেয়ে নাকি ছেলে? ভালো নাকি মন্দ? কিন্তু যা-ই আছে তা আমি তোমাকে দিচ্ছি। **ফাতাকাব্বাল মিন্নী**– অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে একে গ্রহণ করো। **ইন্নাকা আনতাস্ সামীউল আলীম**– কেননা তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। ... এই দোয়া খোদা তা'লার এতটাই পছন্দ হলো যে, সেটিকে পবিত্র কুরআন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে দিলেন। একইভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং অন্যান্য নবীর নিজ সন্তানদের জন্য কৃত সমস্ত দোয়া পবিত্র কুরআনে সংরক্ষিত রয়েছে। কোনো কোনো স্থানে স্পষ্টভাবে ওয়াকফ (বা জীবন উৎসর্গ) করার বিষয়টি দৃষ্টিতে আসে আবার কতক স্থানে আসে না। যেমন- এখানে **মুহার্‌রারান** শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ হে খোদা! আমি তোমার নিরাপত্তার ছায়ায় এই সন্তানকে উৎসর্গ করছি।

কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি এই দোয়া দেখতে পাবেন যে, হে খোদা! আমাকে তুমি যে নিয়ামত দিয়েছ তা তুমি আমার সন্তানসন্ততিকেও দাও এবং তাদের মধ্যেও এই পুরস্কারের ধারা অব্যাহত রাখো। ... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে চিল্লাকাশী (অর্থাৎ চল্লিশ দিন নিভৃতে দোয়া) করেছিলেন তা-ও এ বিষয়ের অধীনে আসে। তিনি (আ.) চল্লিশ দিন পর্যন্ত দিনরাত কাকুতিমিনতি করে দোয়া করেন যে, হে খোদা! আমাকে সন্তান দান করো এবং এমন এক সন্তান দান করো যে তোমার (নিবেদিতপ্রাণ) দাস হয়ে যাবে আর সে হবে আমার পক্ষ থেকে তোমার চরণে উপহারস্বরূপ। এককথায় এটিই হলো, নবী-রসূল এবং পুণ্যবানদের সুন্নত।

উক্ত রীতি অনুযায়ী এ যুগেও যে পিতামাতারা নিজ সন্তানকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করছেন– এটি নিঃসন্দেহে অতি উত্তম একটি কাজ। তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করছেন আর সে জিহাদ হচ্ছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জ্ঞান এবং কলমের জিহাদ। যাদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত আছে, তারাই বিজয় লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্; এছাড়া অন্য কোনো পন্থা সফল হবে না। লোক-দেখানো নামাযের মাঝে যেভাবে ধ্বংস নিহিত, ঠিক সেভাবে লোক-দেখানো জিহাদের মাঝেও ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধি হবে না। কিন্তু যে-সব বাবা-মা কুরবানীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ সন্তানদেরকে ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেছেন তাদের ওপর কতক দায়িত্বও বর্তায়, কেননা কিছুদিন মনোযোগ আকর্ষণ না করলেই কতক পিতামাতা তাদের দায়িত্বের কথা ভুলে যান। এ কারণে ওয়াকফে নও দপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে কিন্তু তারপরও আমি অনুভব করেছি যে, এ বিষয়ে কিছু বলা উচিত। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন তা আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ভাষায় উপস্থাপন করছি। তিনি (রাহে.) বলেন, "আমরা যদি এই ওয়াকফে নও সন্তানদের লালনপালন এবং সুশিক্ষার প্রতি উদাসীন হই তবে খোদা তা'লার দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হবো। কখনো এটি বলা যাবে না যে, দৈবাৎ এমন ঘটনা ঘটে গেছে। এ কারণে সর্বপ্রথম এই সন্তানদের প্রতি পিতামাতার গভীর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কোনোক্রমে তারা যদি এটি বুঝেন যে, তাদের সন্তান প্রকৃতিগতভাবে ওয়াকফের যোগ্য নয় তবে সততা এবং তাকওয়ার সাথে তাদের উচিত জামা'তকে অবগত করা যে, আমি তো স্বচ্ছ চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে খোদার দরবারে একটি উপহার উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সন্তানের মাঝে এসব দোষত্রুটি আছে। এরপরও যদি জামা'ত তাকে গ্রহণে প্রস্তুত থাকে তবে আমার কোনো আপত্তি নেই। অন্যথায় এই ওয়াকফ বাতিল করা হোক।" (জুমুআর খুতবা, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯)

পিতামাতা তো তাদের সন্তানকে ধর্মসেবার নিমিত্তে উপস্থাপন করলো। জামা'তও তাদের যথাযথ শিক্ষাদীক্ষা এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য কর্মসূচি হাতে নিল। কিন্তু জামা'তের তরবিয়তী ব্যবস্থাপনার অধীনে একজন সন্তান সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘণ্টাই অতিবাহিত করে থাকে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের তরবিয়তের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নয়। তাই সন্তানের তরবিয়তের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া পিতামাতারই দায়িত্ব। এর পাশাপাশি জন্মের

পূর্বে যে নিষ্ঠা এবং দোয়ার সাথে সন্তানকে উপস্থাপন করেছিলেন সেই দোয়ার ধারা স্থায়ীভাবে অব্যাহত রাখুন যতক্ষণ না সন্তান একটি কল্যাণকর সত্তা হয়ে জামা'তের ব্যবস্থাপনায় একাকার হয়ে যায়। বরং এরপরও জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তাদের জন্য দোয়া করতে থাকা উচিত কেননা কে বিপথগামী হয় তা বলা যায় না। এ কারণে সর্বদা শুভ পরিণাম এবং ওয়াকফ-এর এই দায়িত্ব যাতে শেষ পর্যন্ত পালন করে যেতে পারে সেজন্য পিতামাতার দোয়া করতে থাকা উচিত।

ওয়াকফে নও সন্তানদের তরবিয়তের জন্য পিতামাতার অবশ্যকরণীয় বিষয়গুলো এখন আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থান করছি।

অবশ্যকরণীয় বিষয়গুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূণ বিষয় হলো, বিশ্বস্ততা রক্ষা করা ছাড়া কোনো আত্মত্যাগই আত্মত্যাগ বলে গণ্য হতে পারে না। এ সম্পর্কে আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ভাষায় কিছু বলব। পিতামাতাকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ওয়াকফে নও সন্তানদেরকে বিশ্বস্ততা শেখান। জীবন উৎসর্গ করার সাথে বিশ্বস্ততার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যে **ওয়াকেফে যিন্দেগী জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াকফের ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে বরং ছেড়ে দেয়, সেক্ষেত্রে জামা'ত তাকে শাস্তি দিক বা না দিক সে নিজের আত্মার ওপর বিশ্বাসঘাতকতার কালিমা লেপন করে যা অনেক বড়ো কলঙ্ক।** এ কারণে আপনারা সন্তানদের উৎসর্গ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা অনেক বড়ো একটি সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের কারণে হয় এই সন্তান বড়ো আওলিয়া হবে অথবা সাধারণ অবস্থার চেয়েও অধঃপতিত হবে এবং তাদের মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যেখানে উচ্চতা যত বেশি সেখান থেকে পড়ার শঙ্কাও তত বেশি থাকে। তাই অনেক সাবধানতার সাথে তাদের তরবিয়ত করুন এবং তাদেরকে বিশ্বস্ততার শিক্ষা দিন আর বার বার দিন। নিজ সন্তানদেরকে ছোটোখাটো চালাকি করা থেকেও বিরত রাখুন। কতক বাচ্চা ঔদ্ধত্য দেখায় ও চালাকি করে থাকে আর এভাবে তাদের মাঝে চালাকি করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায়। পরে তারা ধর্মের ক্ষেত্রেও এমন ধৃষ্টতা ও চালাকির আশ্রয় নিতে থাকে আর এর ফলে অনেক সময় এসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ তাদের আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণে ওয়াকফ-এর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদেরকে এটি বুঝান যে, খোদা তা'লার সাথে পরম নিষ্ঠার সাথে আমরা একটি অঙ্গীকার করেছি কিন্তু তোমরা যদি এই বিষয়ের সাথে একমত পোষণ না করো তবে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আছে। আরো একটি গেইট আসবে অর্থাৎ এই সন্তানরা যখন সাবালক হবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাবে তখন জামা'ত তাদেরকে দ্বিতীয়বারের মতো জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমরা কি ওয়াকফ থাকতে চাও, নাকি চাও না? ওয়াকফ সেটিকে বলা হয় যার ওপর মানুষ আমৃত্যু বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সব ধরনের কষ্ট ও আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ এই পথে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সামনে এগিয়ে যায়, কখনো পশ্চাৎপদ হয় না।"
(জুমুআর খুতবা, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯)

এছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে আর আমার নিকট এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোর মাঝে একটি বরং এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা হলো, সন্তানদের

মাঝে পাঁচ বেলার নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন কেননা যে ধর্মে ইবাদত নেই সেটি ধর্মই নয়। সন্তানদের মাঝে নামাযের অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক আর এক্ষেত্রে পিতামাতার আদর্শই সবচেয়ে কার্যকর। তারা নিজেরা যদি নামাযী হন তবে সন্তানরাও নামাযী হবে। অন্যথায় তাদের অন্তঃসারশূন্য উপদেশ সন্তানদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, বাল্যকাল থেকেই তরবিয়তের প্রয়োজন পড়ে। হঠাৎ করে সন্তানদের মাঝে এই অভ্যাস গড়ে ওঠে না। এজন্য মহানবী (সা.) যে রীতি শিখিয়েছেন তা হলো, সাত বছর বয়স থেকে তাকে সাথে নিয়ে নামায পড়া শুরু করুন আর তা করুন আদর ও স্নেহের সাথে। কোনো ধরনের কঠোরতার প্রয়োজন নেই, কোনো প্রকার প্রহারের প্রয়োজন নেই। আদর ও ভালোবাসার মাধ্যমে তাকে নামায পড়ান আর এর ফলে সে নামাযে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সত্যিকার অর্থে যে-সব বাবা-মা নামায পড়ে তাদের সাথে সাত বছরের কম বয়সী সন্তানরাও নামায পড়া শুরু করে দেয়। আমরা ঘরে আমাদের দৌহিত্রদের দেখেছি, তারা একেবারে শৈশবে অর্থাৎ এক-দুই বছর বয়স থেকেই আমাদের সাথে এসে নিয়ত করে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায় কেননা এটি দেখতে তাদের ভালো লাগে। খোদার দরবারে উঠতে, বসতে এবং বিনত হতে তাদের খুব ভালো লাগে আর তাই তারা একসাথে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু সেটি নামায নয় বরং কেবল একপ্রকার অনুকরণ মাত্র তবে উত্তম অনুকরণ। সন্তান যখন সাত বছরে উপনীত হয় তখন তাকে নিয়মিত নামায শিক্ষা দিন। তাকে বলুন যে, এভাবে ওযু করতে হয়, এভাবে দাঁড়াতে হয়। দাঁড়ানো, বসা, সিজদা করা প্রভৃতি তাকে বুঝান। এভাবে সন্তান যদি স্নেহ-মমতার মাঝে দশ বছর পর্যন্ত শিখতে থাকে তখন দশ-বারো বছরের মাঝামাঝি সময়ে তার সাথে কিছুটা কঠোরতা প্রদর্শন করুন। কেননা খেলাধুলার এই বয়সটা এমনই যে, এ সময় সন্তানদের সুশিক্ষার জন্য সামান্য শাস্তি কিংবা একটু শক্ত ভাষা প্রয়োগ করা অবশ্যক হয়ে যায়। তারপর সে যখন সাবালক হয়ে যায় অর্থাৎ বারো বছর বয়সে উপনীত হয় তখন তার প্রতি কোনো ধরনের কঠোরতার অনুমতি নেই। তখন সেটি হয়ে যায় আল্লাহ্ ও তার মধ্যকার বিষয়। তিনি যেভাবে চাইবেন সেভাবেই তার সাথে আচরণ করবেন। মানুষের তরবিয়তের গণ্ডি সাত বছর থেকে নিয়ে বারো বছর অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বরং আমি যেভাবে বলেছি, শৈশব থেকেই তা শুরু হয়ে যায়। এরপরেও তরবিয়ত অব্যাহত থাকে কিন্তু তা হয়ে থাকে ভিন্নরূপে। বারো বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ সাবালক হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিজের সন্তানের সুশিক্ষার জন্য দায়ী থাকে।

ছোটো ছোটো কিছু কথা রয়েছে যা আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হয় কিন্তু উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য তা খুবই জরুরি। যেমন- খাবারের আদবকায়দা সবারই শেখা উচিত। এটি এমন একটি বিষয় যা কেবল বাড়িতে বাবা-মা-ই শেখাতে পারেন কিংবা স্কুল-কলেজের আবাসিক হোস্টেল যেখানে কঠোর ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেখানে এসব আদবকায়দা বাচ্চাদের শেখানো হয় কিন্তু সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ স্কুল এমন যেখানে এসব বিষয়ের প্রতি ততটা দৃষ্টি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পিতামাতার স্কন্ধেই বর্তায়।

প্রসঙ্গক্রমে আমি এখানে এটি উল্লেখ করতে চাইব যে, রাবওয়ার মাদরাসাতুল হিফয-এর একটি উদাহরণ রয়েছে, যেখানে ছেলেরা পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর ভর্তি হয়। বিভিন্ন পরিবার, বংশ, পরিবেশ, গ্রাম বা শহর থেকে বাচ্চারা আসে কিন্তু আমি সেখানে দেখেছি, তাদের তরবিয়ত মাশাআল্লাহ্ এত ভালো এবং তাদের এত ভালো তত্ত্বাবধান করা হয় আর তাদেরকে কুরআন হিফযের পাশাপাশি এত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলিতে সজ্জিত করা হয় যে, তাদের নিজস্ব পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা এত সুন্দর করে বসে খাবার খায়– যা দেখলে অবাক হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিসমিল্লাহ্ পড়ে খাও, নিজের সামনে থেকে খাও, তরকারির পাত্র থেকে যদি নিজের প্লেটে তরকারি নিতে হয় তবে ততটুকু নাও যতটুকু খেয়ে শেষ করা যায়। প্রয়োজন পড়লে আবার দেওয়া যেতে পারে। ডান হাত দিয়ে খাবার খাওয়া, খাবার শেষের দোয়া পড়া ইত্যাদি। এগুলো ছোটো ছোটো বিষয় যা সর্বোপরি বাল্যকাল থেকেই বিশেষভাবে ওয়াকফে নও বাচ্চাদের এবং মোটের ওপর প্রত্যেকের শেখানো উচিত। যাহোক, আমি মাদরাসাতুল হিফয-এর যে উদাহরণ দিয়েছি, আশা করি তারা সুশিক্ষা বা তরবিয়তের যে কার্যক্রম শুরু করেছে তা অব্যাহত থাকবে; আর পিতামাতারাও সন্তানদের এভাবে সুশিক্ষা প্রদান করুন।

এছাড়া কোনো কোনো বাচ্চার শৈশব থেকেই খাবার খাওয়া শেষে ময়লা হাতেই বিভিন্ন জিনিস ধরার অভ্যাস হয়ে যায়। এটি এমন একটি ছোটো বিষয় যার প্রতি অনেক সময় পিতামাতা দৃষ্টিই দেন না– কিন্তু তাকে স্নেহের সাথে বুঝান। মোটকথা, এগুলো এমন অভ্যাস যা ছোটোবেলাতেই শুধরানো যায় আর বড়ো হয়ে তা উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির মাঝে গণ্য হয়।

শিশুদের উত্তম চরিত্র গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, প্রত্যেক ওয়াকেফে যিন্দেগী সন্তান, যে ওয়াকফে নও স্কিমের অন্তর্ভুক্ত, শৈশব থেকেই তার সত্যের প্রতি ভালোবাসা এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত। এই ঘৃণা মায়ের দুধের সাথেই তার লাভ হওয়া উচিত। যেভাবে রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়তা কোনো কিছুতে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক সেভাবে প্রতিপালনকারী পিতার বাহুডোরে থাকা অবস্থায় বাচ্চার হৃদয়ে সততা প্রবেশ করা উচিত। এর অর্থ হলো, পিতামাতাকে আগে থেকেই অনেক বেশি সৎ হতে হবে। ওয়াকেফীনে নও সন্তানদের পিতামাতার জন্য নোট করার মতো বিষয় হলো, পিতামাতাকে আগের চেয়ে বেশি সত্যবাদী হতে হবে। উচ্চাঙ্গের মুমিনদের সততার যে উন্নতমানে উপনীত হওয়া আবশ্যক; সকল ওয়াকেফে যিন্দেগী শিশুর পিতামাতা সেই মানে উপনীত থাকবেন, এটি নিশ্চিত নয়। তাই এখন সেই বাচ্চাদের খাতিরে তাদের নিজেদের তরবিয়তের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। ঘরে কথাবার্তা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সাবধানতার সাথে বলতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে যেন বৃথা আলাপচারিতা কিংবা হাসির ছলেও ভবিষ্যতে কখনো মিথ্যা না বলেন, কেননা খোদার এই পবিত্র আমানত আপনার ঘরে লালিতপালিত হচ্ছে আর এই পবিত্র আমানতের কিছু দাবি আছে যা আপনাকে অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। অতএব সত্য বলার দৃষ্টিকোণ থেকে এমন ঘরের পরিবেশ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র হওয়া উচিত।

অতঃপর তিনি (রাহে.) বলেন, কৃচ্ছ্রতা সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে, ওয়াকফের সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বাল্যকাল থেকেই এই বাচ্চাদের স্বল্পেতুষ্ট বানানো উচিত এবং লোভ-লালসা হতে মুক্ত থাকার অভ্যাস সৃষ্টি করা উচিত। পিতামাতা যদি বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার সাথে প্রথম থেকেই প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন তবে এমনটি হওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। সর্বোপরি সততা এবং বিশ্বস্ততার চরম মার্গে এই বাচ্চাদেরকে উপনীত করা একান্ত আবশ্যক।

এছাড়া বাল্যকাল থেকেই এমন সন্তানদের মাঝে হাস্যবদনে কথা বলার অভ্যাস সৃষ্টি করা উচিত কেননা ওয়াকফ এবং রুক্ষতা সমান্তরালে চলতে পারে না। খিটখিটে স্বভাবের ওয়াকেফে যিন্দেগী জামা'তের মধ্যে সর্বদা সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে আর কোনো কোনো সময় ভয়ংকর ফিতনাও সৃষ্টি করে। তাই ওয়াকফে নও সন্তানদের মাঝে দুটি গুণ অর্থাৎ সদা প্রফুল্লচিত্ত বা হাসিখুশি থাকা এবং এরই সাথে সহনশীলতা অর্থাৎ কারো কথা সহ্য করার ক্ষমতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

তাছাড়া ওয়াকফে নও সন্তানদের মাঝে কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস সৃষ্টি করা, বাল্যকাল থেকেই জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করার অভ্যাস সৃষ্টি করা আর শ্রেণিভেদে আতফালুল আহমদীয়া, নাসেরাতুল আহমদীয়া অথবা খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ত রাখাও খুবই জরুরি। [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জুমুআর খুতবা, ১০ জানুয়ারি ১৯৮৯]

অদ্ভুত বিষয় হলো কোনো কোনো ওয়াকফে নও মনে করে, আমাদের সংগঠনটি পৃথক কোনো ব্যবস্থাপনা। কিন্তু জামা'তে যে অঙ্গসংগঠনসমূহ রয়েছে ওয়াকফে নও সন্তানরাও যথারীতি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর ছোটোবেলা থেকেই ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর (রাহে.) বলেন, আমি হুযূর (রাহে.)-এর উদ্ধৃতিও পাশাপাশি উল্লেখ করছি কেননা এটি তাঁরই গঠিত এক মহান স্কিম ছিল। এর কল্যাণ এখনই সামনে আসা শুরু হয়ে গেছে আর ভবিষ্যতে আপনারা অধিকহারে ও ব্যাপকভাবে এর কল্যাণরাজি দেখতে পাবেন, ইনশাআল্লাহ্।

তিনি (রাহে.) বলেন, "বাল্যকালেই চরিত্র গঠন করতে হয়। সত্য কথা হলো, এ কাজে দেরি হয়ে গেলে পরে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কথায় বলে, লোহা গরম থাকতেই হাতুড়ি ধরতে হয়। কিন্তু এটি হচ্ছে শৈশবের লোহা যা খোদা তা'লা একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নরম রাখেন এবং নরম থাকাকালীন অবস্থায় আপনি এর ওপর যে ছাপ অঙ্কন করবেন তা চিরস্থায়ী রূপ লাভ করবে; এ কারণে এটিই তরবিয়তের আসল সময়। তরবিয়তের বিষয়সমূহের মাঝে এটি স্মরণ রাখবেন যে, বাবা-মা যতই মৌখিক তরবিয়ত করুন না কেন, তাদের কথা ও কাজে যদি মিল না থাকে তবে বাচ্চারা নেতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করবে এবং ভালো দিকগুলো বর্জন করবে। এখানে আবারো পিতামাতার জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে যে, এই দুই প্রজন্মের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়ার (interaction) ক্ষেত্রে এমন একটি নীতি রয়েছে যা ভুলে গেলে গোটা জাতিই ধ্বংস হতে পারে আর তা স্মরণ রাখলে (গোটা জাতিই) উন্নতি করতে পারে। এক প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মের ওপর যে

প্রভাব বিস্তার করে তাতে সাধারণত যে নীতি কাজ করে তা হলো, সন্তানরা পিতামাতার দুর্বল দিকগুলো খুব দ্রুত আত্মস্থ করে এবং তাদের কথার প্রতি তারা কম মনোযোগ দেয়। মহান আদর্শের কথা বলা হলেও তাদের মাঝে দুর্বলতা থাকলে সে সেই দুর্বলতাকেই অবলম্বন করবে। তাই স্মরণ রাখুন! সন্তানদের তরবিয়তের জন্য অবশ্যই আপনার নিজের তরবিয়ত করা প্রয়োজন। এই বাচ্চাদেরকে আপনারা এটি বলতে পারেন না যে, বাচ্চারা! তোমরা সত্য কথা বলো কেননা তোমাদের মুবাল্লেগ হতে হবে। তোমরা অসৎপন্থা অবলম্বন কোরো না কেননা তোমাদের মুবাল্লেগ হতে হবে। তোমরা পরচর্চা কোরো না, ঝগড়াবিবাদ কোরো না কেননা তোমরা ওয়াকফে নও। হুযূর (রাহে.) বলেন, এসব কথা বলার পর পিতামাতারা ঘৃণ্য ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হয়, পরস্পরের বিরুদ্ধে নোংরা কথাবার্তা বলে, অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণ করে আর বলে যে, আমরা তো বাচ্চাদেরকে নসীহত করে দিয়েছি আর এখন আমরা নিজেদের মতো করে জীবনযাপন করছি; এমনটি কখনোই হতে পারে না। তাদের নিজেদের যে জীবন বাচ্চাদের জীবনও তাই হবে। তারা কল্পনিকভাবে ধরে নিয়েছেন যে, বাচ্চাদেরকে বলব এটি করো সেটি করো! বাচ্চারা বিন্দুমাত্র এসবের পরোয়া করে না। যে-সব পিতামাতা মিথ্যা বলে তারা যদি লক্ষবারও সন্তানকে বলে যে, তুমি মিথ্যা বললে কষ্ট লাগে, খোদার খাতিরে তুমি সত্য বলো কেননা সত্যের মাঝেই জীবন নিহিত। তখন সন্তান বলে, কথা তো সঠিক কিন্তু তার মন বলে যে, বাবা-মা মিথ্যাবাদী আর এ কারণে সে-ও অকপটে মিথ্যা বলে। সুতরাং দু-প্রজন্মের মাঝে যোগসূত্র স্থাপিত হবে এর (অর্থাৎ কথাকর্মের মিলের) মাধ্যমে আর একে উপেক্ষা করার ফলে দু-প্রজন্মের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়।" [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জুমুআর খুতবা, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯]

ওয়াকফে নও বাচ্চাদের পিতামাতার (সঠিক আচরণের) গুরুত্ব কতটুকু তা নিশ্চয় এ থেকে উপলব্ধি করে থাকবেন অর্থাৎ সন্তানদের সুশিক্ষার জন্য পিতামাতার নিজেদের তরবিয়তের প্রতি কতটা দৃষ্টি দেওয়া উচিত!

অতঃপর যেভাবে আমি হুযূরের ভাষায় বলেছি, নিজেদের ঘরের পরিবেশ এতটাই শান্তিপূর্ণ এবং ভালোবাসায় পূর্ণ করে তুলুন যাতে অবসর সময়ে সন্তানরা ঘরের বাইরে যাবার পরিবর্তে বাবা-মায়ের সাথে সময় কাটানো পছন্দ করে। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে যেখানে বাচ্চারা মন খুলে বাবা-মায়ের কাছে প্রশ্নও করবে আবার শিষ্টাচারের গণ্ডিতে থেকে সব ধরনের কথাও বলতে পারবে। এজন্য মা-বাবা উভয়কেই যে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'লার সাথে যে অঙ্গীকার পিতামাতারা করেছে তা পূর্ণ করার জন্য তাদেরকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এসব কথা আপনারা পূর্বেও শুনেছেন এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও পিতামাতাদের উদ্দেশ্যে এ নসীহতই করেছেন আর আমিও এগুলোই বলছি। অনেক সময় কোনো কোনো পিতামাতা নিজেদের অধিকার তো ছাড়েই না বরং অন্যের অধিকার অবৈধভাবে হরণ করার চেষ্টা করে থাকে আর জোর গলায় বলে, আমাদের সন্তান ওয়াকফে নও। তাই আমরা যদি কোনো ভুল করেও থাকি তবে আমাদের ছাড় দেওয়া উচিত! এটি তো হতে পারে না।

এছাড়া একথা স্পষ্ট করে বলছি যে, কোনো মন্দকর্ম তখনই হৃদয়ে স্থান পায় যখন ভালো কিংবা মন্দের পার্থক্যশক্তি হারিয়ে যায়। কোনো কোনো সময় এক ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে সব ধরনের পুণ্যকর্ম করে, নামাযও পড়ে, মসজিদেও যায়, লোকদের সাথে সদ্ব্যবহারও করে কিন্তু জামা'তী ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তির সাথে যদি ছোটোখাটো মনোমালিন্যও হয় অথবা নিজের কোনো সিদ্ধান্ত তার মনমতো না হয় তখন সেই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তার ভেতর এক ধরনের ক্ষোভ দানা বাধে। ফলে সেই কর্মকর্তার কারণে কোনো কোনো স্থানে জামা'তের ব্যবস্থাপনা নিয়ে হালকা খোঁচা মেরেও কথা বলে বসে। অতঃপর বাড়িতে সন্তানদের সামনে, স্ত্রীর সাথে কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়ের সাথে অনুরূপ কথা বলে বসে। এভাবে এই পরিবেশের কারণে বাচ্চাদের ভেতর থেকে জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উঠে যায়। এই মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আপনাদের সামনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ভাষায় নিম্নোক্ত নসীহত উপস্থাপন করছি।

"(ওয়াকফে নও সন্তানদেরকে) জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া খুবই জরুরি। এছাড়া কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যদি অভিযোগও থাকে আর তা সত্যও হয় তবুও নিজের বাড়িতে কখনো এমন কোনো কথা বলা উচিত নয় যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার অসম্মান হয়। নিজের বাড়িতে এমন আলোচনার কারণে আপনার সন্তানদের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যাবে। অভিযোগ করার পরও আপনি নিজের ঈমানের হেফাজত করতে পারবেন কিন্তু আপনার সন্তানরা এতে সাংঘাতিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হবে। এটি এমন এক আঘাত – যার লাগে তার কম লাগে কিন্তু যে পাশে থেকে দেখে তার বেশি লাগে। এজন্য যারা জামা'তী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে না, বেশিরভাগ এমন মানুষের সন্তানেরা অবশ্যই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর কতক চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ের এটি বুঝানো উচিত যে, কারো বিরুদ্ধে যদি তোমাদের কোনো অভিযোগ থাকে তার সম্পর্কে তোমাদের যতই উচ্চধারণা থাকুক না কেন, সেটির কারণে নিজেদের আত্মার ক্ষতি হতে দেওয়া উচিত নয়। ... তাদেরকে বুঝান যে, প্রকৃত ভালোবাসা খোদা এবং তাঁর ধর্মের সাথেই থাকা উচিত। এমন কোনো কথা বলা উচিত নয় যাতে ঐশী জামা'তের কোনো ক্ষতি হয়। কোনো ব্যক্তির কারণে আপনি যদি কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন কিংবা আপনার কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তার মানে কখনোই এটি হতে পারে না যে, নিজ সমাজ, বন্ধুবান্ধব, সন্তানসন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত করার অধিকারও আপনার আছে। নিজের কষ্ট নিজের ভিতরে রাখুন আর উদার মনের পরিচয় দিন এবং তা নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিরসনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা যে মাধ্যম দিয়েছেন তা কাজে লাগান।" (জুমুআর খুতবা; ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯)

সাধারণ একটি বিষয়ের প্রতিও পিতামাতাকে দৃষ্টি দিতে হবে আর তা হলো নিজেদের সন্তানদের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি করুন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হিসেবে গড়ে তুলুন। কিন্তু এটি ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না পিতামাতা স্বয়ং মুত্তাকী হবার চেষ্টা করবেন। কেননা আমল না করা পর্যন্ত মুখের কথায় কাজ হয় না। ছেলেমেয়েরা যদি দেখে যে, আমার

পিতামাতা নিজেদের প্রতিবেশীদের প্রাপ্য প্রদান করছে না, নিজ ভাইবোনদের অধিকার হরণ করছেন, ছোটো ছোটো কথায় স্বামী-স্ত্রীর অর্থাৎ বাবা-মায়ের মধ্যে বিরোধ ও ঝগড়া শুরু হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে সন্তানদের তরবিয়ত প্রদান এবং তাদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করা কঠিন। এ জন্য সন্তানদের সুশিক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের নিজেদের সংশোধনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের মাঝে তাকওয়া কীভাবে সৃষ্টি করা যাবে, এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, "ওয়াকফে নও সন্তানদের বাল্যকাল থেকেই মুত্তাকী হিসেবে গড়ে তুলুন এবং তাদের পরিবেশ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন রাখুন। তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন না যাতে তাদের হৃদয় ধর্মবিমুখ হয়ে পার্থিবতায় আকৃষ্ট হয়। তাদের প্রতি এমনভাবে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করুন যেন প্রতিভাত হয় যে, অনেক প্রিয় একটি জিনিসকে কোন মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। তাদের হৃদয় যদি এভাবে তাকওয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তারা আপনার হাতে খেলার পরিবর্তে খোদা তা'লার হাতে খেলবে। একটি জিনিস যেভাবে অন্যের হাতে অর্পণ করা হয়, তদ্রূপ তাকওয়াও এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে আপনি এই ছেলেমেয়েদের প্রথম থেকেই খোদার নিকট সঁপে দিতে পারবেন এবং মধ্যবর্তী সমস্ত বাধা-বিপত্তি নিজ থেকেই উবে যাবে। নিয়ম অনুযায়ী তাহরীকে জাদীদ অর্থাৎ ওকালতে ওয়াকফে নও-এর সাথেও সম্পর্ক থাকবে আবার জামা'তী ব্যবস্থাপনার সাথেও সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে যে-সব শিশুকে আপনি শৈশবেই খোদার কোলে সমর্পণ করবেন, খোদা তাদেরকে আগলে রাখবেন। তিনি নিজেই তাদের কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ও দেখাশোনা করেন যেমনটি কিনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ক্ষেত্রে করেছিলেন। তিনি (আ.) লিখেন–

ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے
گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار

শুরু থেকেই তোমার ছায়ায় আমার দিন কেটেছে,
আমি তোমার কোলে দুধের শিশুর মতো ছিলাম।

অতএব পথ কেবল একটিই আর তা হলো, আমাদের নিজেদের এবং আমাদের ওয়াকফে নও সন্তানদের খোদার সমীপে সঁপে দেওয়া যেন আমরা খোদার হাতের খেলনা হয়ে যাই।" (জুমুআর খুতবা, ১ ডিসেম্বর ১৯৮৯)

অতঃপর সন্তানদের মাঝে এ চেতনাবোধ জাগ্রত করুন যে, তোমরা ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং বর্তমানে এর চেয়ে বড়ো সৌভাগ্যের বিষয় আর নেই। নিজেদের মাঝে কৃচ্ছ্রতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করো, পুণ্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই বড়োদেরকে অনুসরণ করো এবং (তাদের চেয়ে) অগ্রসর হবার চেষ্টা করো। কিন্তু পার্থিব ধনসম্পদ কিংবা কারো বড়ো হওয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে বরং এক্ষেত্রে নিজেদের তুলনায় অভাবীদের প্রতি দৃষ্টি দাও আর আনন্দিত হও যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে ধর্মসেবার সৌভাগ্য দিয়েছেন এবং এই সম্পদে সম্পদশালী করেছেন। কারো কাছে কোনো প্রত্যাশা রেখো না। নিজের প্রতিটি চাহিদা প্রিয় খোদার কাছে নিবেদন করো। ওয়াকফে নও ছেলেমেয়েদের একটি বড়ো

সংখ্যা মাশাআল্লাহ্ প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়েছে। তাদের নিজেদেরও এখন এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলে রাখি যে, ওয়াকফে নও ছেলেমেয়েদের একটি বৃহৎ অংশের তরবিয়ত (ভবিষ্যৎ মুবাল্লেগের প্রয়োজনীতাকে সামনে রেখে) করতে হবে, হুযূর (রাহে.)-ও একবার এই ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছিলেন। একথাও তাদের মাথায় গেঁথে দিতে হবে যে, তাদেরকে মুবাল্লেগ হতে হবে। ভবিষ্যৎ চাহিদার নিরিখে অনেক বৃহৎ সংখ্যায় মুবাল্লেগের প্রয়োজন। তাই এ আঙ্গিকে তরবিয়ত করুন যেন সন্তানদের জানা থাকে, তাদের অধিকাংশই তবলীগের ময়দানে যাবে আর এ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই তাদের তরবিয়ত হওয়া উচিত।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি (আ.) বলেন, "ইসলাম (গ্রহণের) প্রকৃত মর্ম হলো, খোদা তা'লার পথে জীবন উৎসর্গ করা। এটি দু'ভাবে হয়ে থাকে। একটি হলো, খোদা তা'লাকেই নিজের একমাত্র উপাস্য, লক্ষ্য এবং প্রেমাস্পদ জ্ঞান করা আর তাঁর ইবাদত, ভালোবাসা, ভয় ও আশায় অন্য কোনো শরীক না থাকা। আবার তাঁর পবিত্রতা ও মহিমাকীর্তন, ইবাদত-বন্দেগির নিয়মনীতি, আদেশ-নিষেধ এবং শাস্তি-সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা আর ঐশী নিয়তি-সংক্রান্ত বিষয়াদি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা। এছাড়া পরম আত্মবিলুপ্তির চেতনায় একান্ত হীন হয়ে, পরম নম্রতা ও বিনয়ের সাথে সেসব আদেশ ও সীমারেখা এবং আইন ও নিয়তিকে পূর্ণ ভালোবাসার সাথে শিরোধার্য করা। এর পাশাপাশি সেসব পবিত্র সত্য বিষয়াদি ও পবিত্র তত্ত্বজ্ঞান খুব ভালোভাবে উদ্‌ঘাটন করা যা তাঁর মহাবিস্তৃত শক্তিমত্তার জ্ঞান লাভের মাধ্যম হয় এবং তাঁর রাজত্ব ও আধিপত্যের মহান মর্যাদা অনুধাবনের এক উপায় হয় আর তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজি চেনানোর এক শক্তিশালী পথদিশারী হয়।

আল্লাহ্ তা'লার পথে জীবন উৎসর্গ করার দ্বিতীয় প্রকারটি হলো, তাঁর বান্দাদের সেবা করা, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, সাহায্য-সহযোগিতা, বোঝা লাঘব এবং তাদের প্রতি সত্যিকার সহমর্মিতা প্রদর্শনের মাঝে জীবন উৎসর্গ করা। অন্যদের আরাম-আয়েশের জন্য নিজে কষ্ট ভোগ করা এবং অন্যদের সুখের জন্য নিজে দুঃখ বরণ করা।" (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৬০)

অতঃপর হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মুসলমান সে– যে খোদা তা'লার পথে নিজের পুরো সত্তাকে সমর্পণ করে অর্থাৎ, স্বীয় সত্তাকে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে, তাঁর ইচ্ছার অনুসরণে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। এছাড়া কেবল খোদার জন্যই পুণ্যকর্মে অবিচল হয় এবং নিজের সকল কর্মশক্তি তাঁর পথে ব্যয় করে। এক কথায় বিশ্বাস ও কর্মে সম্পূর্ণভাবে খোদারই হয়ে যায়।

বিশ্বাসগত দিকটি হলো, নিজ সমস্ত সত্তাকে প্রকৃতপক্ষে এমন জিনিস মনে করা, যার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো খোদা তা'লাকে চেনা, তাঁর আনুগত্য করা তাঁর প্রেম, ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন।

অপরদিকে কর্মের ক্ষেত্রে তা এভাবে যে, খোদাপ্রদত্ত সকল শক্তিবৃত্তি ও সামর্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত সত্যিকার পুণ্যরাজি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা– কিন্তু তা এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা, আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে করতে হবে যেন স্বীয় আনুগত্যের দর্পণে সে নিজের সত্যিকার উপাস্যের চেহারা দেখতে পাচ্ছে।" (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৫৭-৫৮)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "আমি আমার জামা'তকে এ ওসিয়্যত করা এবং একথা পৌঁছানো আবশ্যক বলে মনে করছি; সেটি শোনা বা না শোনার বিষয়ে প্রত্যেকের স্বাধীনতা রয়েছে। কেউ যদি মুক্তি চায় এবং পবিত্র ও চিরস্থায়ী জীবনের সন্ধানী হয় তবে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তার নিজের জীবন উৎসর্গ করা উচিত। সেই মর্যাদা ও মানে উপনীত হবার জন্য প্রত্যেকের মাঝে এমন প্রচেষ্টা ও উৎকণ্ঠা থাকা উচিত যেন সে বলতে পারে, আমার জীবন, মরণ, কুরবানী ও নামায বা ইবাদত-বন্দেগি সবই আল্লাহ্র জন্য। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো যেন তার আত্মাও বলে ওঠে, 'আসলামতু লিরাব্বিল আলামীন'। খোদা তা'লার মাঝে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত এবং খোদার জন্য মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত মানুষ নতুন জীবন লাভ করতে পারে না। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখো তারা আমাকে দেখছ যে, খোদার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করাকে আমি নিজ জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মনে করি। সুতরাং তোমাদের কয়জন এমন আছে যারা নিজেদের জন্য আমার এই কর্মকে পছন্দ করে এবং খোদার সন্তুষ্টির জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে প্রিয়জ্ঞান করে তা তোমরা নিজেদের মাঝে লক্ষ করে দেখো।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৪, সংখ্যা: ৩১, ৩১ আগস্ট ১৯০০, পৃ. ০৪)

তিনি (আ.) আরো বলেন, পরম শান্তির পথ হলো, মানুষের নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে স্বচ্ছ রাখা এবং নিষ্ঠার সাথে খোদামুখী হওয়া। তাঁর সাথে নিজের সম্পর্ক পরিষ্কার রাখা ও দৃঢ় করা এবং আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হওয়া। তিনিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও প্রেমাস্পদ হওয়া আর তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুণ্যকাজ করা। এমনটি হলেই আল্লাহ্র সুন্নত বা বিধান স্বীয় কার্যকারিতা প্রদর্শন করবে। তার দৃষ্টি যেন কেবল ফলাফলে নিবদ্ধ না থাকে বরং সেই একমাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু সেই গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বে যদি এই শর্ত দেওয়া হয় যে, সেখানে পৌঁছার পর সবচেয়ে বেশি শান্তি পাবে তাহলেও যেন সে তাঁর দিকেই অগ্রসর হয়। অর্থাৎ কোনো শান্তি বা পুরস্কার যেন তাঁর দিকে অগ্রসর হবার মূল উদ্দেশ্য না হয় বরং কেবল খোদা তা'লাই যেন আসল উদ্দেশ্য হন। কেউ যদি বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর দিকে অগ্রসর হয় এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করে তাহলে সে সেই সবকিছু দেখবে যা তার কাছে অকল্পনীয়। (এমতাবস্থায়) দিব্যদর্শন ও সত্যস্বপ্ন তার কাছে কিছুই নয়। অতএব আমি এই পথেই চালাতে চাই এবং এটিই আমার মূল উদ্দেশ্য।"

(১১)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ০৪ জুলাই ২০০৩, মোতাবেক ০৪ ওয়াফা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝

(আলে ইমরান: ৩৯)

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, আমি যে আয়াত পাঠ করেছি এর অনুবাদ হলো, "সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালক-প্রভুর কাছে দোয়া করল (এবং) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র বংশধর দান করো। নিশ্চয় তুমি অনেক বেশি দোয়া গ্রহণকারী'।"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ আয়াতের তফসীরে লেখেন, হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মুখে এ কথা শুনে যে, 'আল্লাহ্ই সবকিছু দিয়ে থাকেন আর এসব নিয়ামতও তিনিই দিয়েছেন– যাকারিয়া (আ.)-এর হৃদয় বেদনায় ভরে গেল এবং তিনি ভাবলেন, ঘটনা যেখানে এটিই যে, সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে থাকেন আর একটি বাচ্চা মেয়েও এ কথাই বলছে, তাহলে আমি, যে একজন বিবেকবান ও অভিজ্ঞ মানুষ; আমি কেন এটি বিশ্বাস করব না যে, সবকিছু আল্লাহ্ তা'লাই দিয়ে থাকে। অতএব هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ। উত্তর শুনে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হলো যে, আমিও নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস খোদার কাছেই চাইব। আমার ঘরেও কোনো সন্তান নেই। মরিয়মের মত আমার ঘরেও যদি সন্তান হতো আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম যে, এই জিনিস তোমাকে কে দিয়েছে আর সে বলত, খোদা দিয়েছেন; মরিয়মের কথা শুনে যেভাবে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে গিয়েছে, একইভাবে নিজের সন্তানের কথা শুনেও আমার হৃদয় প্রফুল্ল হতো। অতএব হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মলাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করানোর একটি মাধ্যম হয়ে গেলেন হযরত মরিয়ম (আ.)। এভাবে যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সরাসরি হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পূর্বসংবাদবাহী হয়ে এসেছেন, সেখানে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদদাতা হয়ে গেলেন হযরত ঈসা (আ.)-এর মা হযরত মরিয়ম (আ.)। অতএব আল্লাহ্ তা'লা হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করেন এবং তার ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করে।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৫, পৃ. ১১৯)

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর এই দোয়াটি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন-এর সূরা আম্বিয়ার ৯০ নং আয়াতে চিরতরে সংরক্ষিত করে দিলেন আর সে দোয়াটি হলো–

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۚ

(আল-আম্বিয়া: ৯০)

অর্থ: "আর (স্মরণ করো!) যাকারিয়াকেও– সে যখন তার প্রতিপালক-প্রভুকে ডেকে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! তুমি আমায় নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ কোরো না। আর উত্তরাধিকারীদের মাঝে তুমিই সর্বোত্তম'।"

তাঁর এই দোয়া গৃহীত হবার কথা সূরা মারইয়ামের ৮নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

(মারইয়াম: ৮)

অর্থাৎ (আল্লাহ্ বললেন,) "হে যাকারিয়া! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক মহান পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। এর পূর্বে আমরা তার নামে কারো নাম রাখি নি।"

অতঃপর এ দোয়ার কল্যাণে যে পুত্রসন্তান লাভ হয়, তার গুণাবলির কথা সূরা মারইয়ামের ১৩-১৬ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যার অনুবাদ হলো–

"(আল্লাহ বললেন,) 'হে ইয়াহইয়া! তুমি এ কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।' আর আমরা তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। আর আমাদের পক্ষ থেকে (তাকে) হৃদয়ের কোমলতা এবং পবিত্রতাও (দান করেছিলাম)। আর সে ছিল মুত্তাকী। আর (সে) তার পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল এবং কখনো উগ্র (ও) অবাধ্য ছিল না। আর তার প্রতি শান্তি (বর্ষিত হয়েছিল) যে-দিন সে জন্মেছিল এবং (সে-দিনও তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে) যে-দিন সে মৃত্যুবরণ করবে আর যে-দিন তাকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে।"
(মারইয়াম: ১৩-১৬)

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "এটি কত-না সূক্ষ্ম এক দোয়া আর দোয়ার মূল চারটি দিককে এতে কত চমৎকারভাবেই না পরম মার্গে পৌঁছানো হয়েছে! এ দোয়াটি যদি আমরা নিজেদের ভাষায় ব্যক্ত করি তাহলে যা দাঁড়ায় তা হলো 'হে আমার খোদা! আমার অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে গেছে, আমার বাহ্যিক চেহারাও বদলে গেছে আর আমি তো তোমার কাছ থেকে সর্বদাই রাজকীয় স্নেহ পেয়ে অভ্যস্ত। এ কারণে আমি কখনো হতাশা বা ব্যর্থতা দেখি নি। আমার মাঝে আহ্লাদের অভ্যাস গড়ে উঠেছে। আমার আত্মীয়রা দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ। আমার মৃত্যুর পর তারা সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবার অপেক্ষায় রয়েছে। আমার স্ত্রী অক্ষম। এ সবকিছু সামনে রেখেই আমি তোমার দরবারে হাত পাততে এসেছি। কী যাচনা করার জন্য এসেছি? এ ভিক্ষা চাইতে এসেছি যে, হে আমার খোদা! তুমি আমাকে পুত্রসন্তান দান করো। এমন পুত্র দান করো, যে আমার সমমনা এবং আমার বন্ধু হবে। এমন পুত্র দান করো, যে আমার মৃত্যুর পরও দীর্ঘায়ু পাবে

এবং আমার বংশের দেখাশোনা করবে। এমন পুত্র দান করো, যে আমার এবং ইয়াকূবের বংশের নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক হবে। এককথায়, সে কেবল আমার নামকেই জীবিত করবে না বরং তার পিতাপিতামহের নামকেও জীবিত করবে। অধিকন্তু সে যেন কেবল মানুষের জন্য আনন্দের কারণ না হয় বরং হে আমার খোদা! তোমার জন্যও খুশির কারণ হয়।" (তফসীরে কবীর; খণ্ড: ০৫, পৃ. ১২৫)

এটি এমন একটি দোয়া, যা আমাদের প্রত্যেকেরই করা উচিত বরং প্রত্যেক হৃদয় এ দোয়া করা পছন্দ করবে এবং চাইবে যে, তার যেন পুণ্যবান সন্তান লাভ হয়। এছাড়া সন্তানসন্ততির জন্মের সময় এবং জন্মের পরেও এ দোয়া অব্যাহত রাখা উচিত, যাতে তারা পুণ্যবান, সৎকর্মপরায়ণ ও ধার্মিক হয়, কেননা সন্তানসন্ততির পক্ষে পিতামাতার দোয়া গৃহীত হয়ে থাকে। এটাই হলো আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা এবং উপদেশ। এখানে এর পাশাপাশি আমি একথাও বলে রাখি, যদিও প্রসঙ্গক্রমে বলছি তবুও আমার মতে এটি এ দোয়ার অংশ; সন্তানদের স্বপক্ষে পিতামাতার দোয়া যেখানে ইতিবাচক অর্থে গৃহীত হয়ে থাকে সেখানে তারা যদি পিতামাতার আনুগত্য না করে তবে তা নেতিবাচকভাবেও গৃহীত হতে পারে। তাই পিতামাতার এরূপ দোয়াকে ভয় করা উচিত। কতক সন্তান সম্পত্তি কিংবা অন্য কোনো কারণে পিতামাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে যায়। বিভিন্ন মানুষ আমার কাছে এটি লিখে থাকে, এ কারণে অনেক সময় এই অদ্ভুত ও ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা আমার সামনে এসে যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এমন সন্তানদের এই শিক্ষা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, মহানবী (সা.) মায়ের সাথে বিশেষভাবে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমাদের সর্বোত্তম ব্যবহার লাভের অধিকার রাখেন 'মা'। 'পিতামাতাকে উফ্ বোলো না'– কুরআন করীমের এই যে শিক্ষা তা এজন্য যে, তোমাদের যদি কোনো কষ্ট হয় আর মনে হয় যে, তোমাদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে কিংবা তোমাদের সাথে বাবা-মা অন্যায় করেছেন, তাহলেও তাদের সামনে (অসম্মানজনক) কিছু বলবে না। অন্যথায় কারো মাথা খারাপ হয়ে যায় নি যে, তারা পিতামাতা প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে আর বাবা-মা সন্তানদের ইচ্ছা পূরণ করবে– তা সত্ত্বেও তারা তাদের অবাধ্যতা করবে এবং তাদের সাথে কোনো অপ্রীতিকর কথা বলবে! যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, অনেক পিতামাতা নিজেদের সন্তানদের অবাধ্য হবার কথা তাদের চিঠিতে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে পিতামাতার দায়িত্ব, বরং সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, জন্ম থেকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সন্তানের জন্য দোয়া করতে থাকা, যেন তারা সৎ প্রকৃতির অধিকারী ও পুণ্যবান হয়। তাদের বৈধ ও অবৈধ সকল আবদার সর্বদা রক্ষা করবেন না আর 'সন্তান আমাদের সম্পত্তির মালিক হবে'– কেবল এই উদ্দেশ্যে সন্তানদের তরবিয়ত এবং লালন-পালন করবেন না। আমি একটু পরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিমূলে এ বিষয়ে কিছু কথা বলব। কিন্তু এর পাশাপাশি সন্তানদের মাঝেও খোদাভীতি থাকা উচিত আর পিতামাতার অধিকারের বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। কোথাও যেন এমন না হয় যে, আগামীকাল তাদের সন্তান তাদের বিরুদ্ধে এভাবেই মাথাচাড়া দেবে। কেননা আজ যদি তারা উপলব্ধি না করে এবং এমন বিষয় থেকে বিরত না হয়, তবে এই শয়তানী চক্র কোথাও থামবে না আর এই একই ব্যবহার কাল তাদের সাথেও হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এ থেকে নিরাপদ

রাখুন। আমার দোয়া থাকবে, আহমদীয়াতের পরবর্তী প্রজন্ম ধর্মের ওপর পূর্বের চেয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক আর অধিকার প্রদানকারী প্রজন্ম হোক।

নিজ সন্তানদের পক্ষে দোয়া করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–

میری اولاد جو تری عطا ہے
ہر اک کو دیکھ لوں وہ پارسا ہے

আমার সন্তানরা তোমার দান,
তাদের প্রত্যেককে যেন পবিত্র দেখতে পাই।

জাগতিক কল্যাণ লাভের দোয়াও তিনি করেছেন কিন্তু যে দোয়া সবচেয়ে বেশি করেছেন তা হলো,

یہ ہو میں دیکھ لوں تقوی سبھی کا
جب آوے وقت میری واپسی کا

(এমন যেন হয়, আমি দেখি তাকওয়া সবার,
সময় যখন আসবে আমার চলে যাবার)

[দুররে সামীন (উর্দু), পৃ. ৪৮-৪৯]

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই দোয়াসমূহ আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেছেন এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর এই দোয়া তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে দুবার শেখানো হয়েছে। প্রথম ইলহাম হয় মার্চ ১৮৮২ সালে এবং দ্বিতীয়বার একই ইলহাম হয় ১৮৯৩ সালে। যেমন, **"রাব্বিগফির ওয়ারহাম্ মিনাস্ সামা। রাব্বি লা তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিসীন। রাব্বি আসলিহ্ উম্মাতা মুহাম্মাদ। রাব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনা ক্বওমিনা বিলহাক্কি ওয়া আনতা খাইরুল ফাতিহীন।"**

অর্থ: "হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করো এবং ঊর্ধ্বলোক থেকে দয়া প্রদর্শন করো। হে আমার আল্লাহ্! আমাকে একা ছেড়ে দিও না এবং তুমি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। হে আমার আল্লাহ্! তুমি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংশোধন করো। হে আমার আল্লাহ্! আমাদের এবং আমাদের জাতির মাঝে সঠিক মীমাংসা প্রদান করো আর তুমিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।" (তাযকেরা; পৃ. ৪৭, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত)

অতঃপর নভেম্বর, ১৯০৭ সালে তাঁর (আ.) প্রতি একটি ইলহাম হয়। এটি আরবী ভাষার বেশ দীর্ঘ একটি ইলহাম যার একাংশ আমি পড়ছি–

"سَأَهَبُ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. رَبِّ هَبْ لِيْ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اسْمُهُ يَحْيٰى"

"আমি একজন পাক-পবিত্র পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। হে আমার খোদা! তুমি আমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করো। আমি তোমাকে এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি যার নাম হবে ইয়াহইয়া।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি দেখি যে, মানুষ যা কিছুই করে তা কেবল বস্তুজগতের জন্য করে। জাগতিক মোহই তাদেরকে এমনটি করায়। খোদার খাতিরে করে না। সন্তানের আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে তবে তা এই উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত যে, **'ওয়াজআলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা'** (আল-ফুরকান: ৭৫) অর্থাৎ এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করা উচিত যেন এমন কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, যে হবে ইসলামের নাম সমুন্নত করার মাধ্যম। এমন পবিত্র আকাঙ্ক্ষা যদি হৃদয়ে থাকে তবে মহান আল্লাহ্, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যাকারিয়া (আ.)-এর মতো সন্তান দিতে পারেন। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ করছি যে, মানুষের দৃষ্টি এর ঊর্ধ্বে যায় না যে, আমাদের বাগান কিংবা সহায়সম্পদ যা রয়েছে, সে সেগুলোর উত্তরাধিকারী হবে আর অন্য কেউ যেন তা কুক্ষিগত করতে না পারে। অথচ তারা একবারের জন্যও এটি ভাবে না যে, হায়রে হতভাগা! তুই যখন দেহ ত্যাগ করবি তখন তোর জন্য শত্রু-মিত্র, আপন-পর সবই সমান। আমি এমন অনেক মানুষ দেখেছি এবং বলতে শুনেছি যে, দোয়া করো যেন সন্তান হয়, যারা এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এমন যেন না হয় যে, মৃত্যুর পর কোনো অংশীদার তা নিয়ে যাবে। পাপিষ্ঠ-লম্পট হলেও কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু সন্তান হওয়া চাই! ইসলাম সম্পর্কে এ হলো (মানুষের অবশিষ্ট) রয়ে যাওয়া এক তত্ত্বজ্ঞান ...!

অতএব স্মরণ রেখো! মুমিনের সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সকল কথাকর্ম, গতি-স্থিতি এবং কারো আপাত সমালোচনার বিষয় হলেও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ইবাদত। অনেক কাজ (তাদের) এমন হয়ে থাকে যেগুলোকে অজ্ঞরা আপত্তিকর মনে করে, কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে তা হয়ে থাকে ইবাদত। কিন্তু যদি নিষ্ঠাপূর্ণ অভিপ্রায় না থাকে তবে নামাযও অভিশাপরূপী বেড়ি হয়ে যায়।" (আল-বদর, ৮ মার্চ ১৯০৪, মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫৭৮-৫৭৯)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্তে বিলীন হওয়া এবং নিজের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করে কেবল আল্লাহ্র ইচ্ছা ও নির্দেশাবলির অনুসারী হয়ে যাওয়া উচিত যাতে নিজের জন্য এবং নিজের সন্তানসন্ততি, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন এবং আমাদের জন্যও তা আশীর্বাদ হয়ে যায়। বিরুদ্ধবাদীদেরকে কখনো কোনো ধরনের আপত্তির সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। ... [তিনি (আ.) বলেন,] খোদা তা'লার সাহায্য তারা লাভ করে যারা একস্থানে থেমে থাকে না বরং পুণ্যের ক্ষেত্রে সর্বদা সামনে অগ্রসরমান থাকে। এরাই তারা– যাদের পরিণতি শুভ হয়ে থাকে। কিছু লোককে দেখেছি, তাদের মাঝে গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং প্রবল ভাবাবেগ কাজ করে কিন্তু কিছুটা সামনে এগিয়ে সম্পূর্ণভাবে স্থির-স্থবির হয়ে যায়; তাদের চূড়ান্ত পরিণতি শুভ হয় না। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে দোয়া শিখিয়েছেন যে, **'আসলিহ্ লি ফি যুর্‌রিয়্যাতি'** (আল-আহকাফ: ১৬) অর্থাৎ তুমি আমার স্ত্রী-সন্তানদের সংশোধন করো। নিজের অবস্থার পবিত্র পরিবর্তনের জন্য দোয়ার পাশাপাশি নিজের সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত, কেননা মানুষ সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় পড়ে। দেখো! হযরত আদম সর্বপ্রথম যে পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছিলেন তা-ও একজন মহিলার কারণেই। হযরত মূসা (আ.)-এর বিপরীতে বালআমের ঈমান নষ্ট করে দেবার প্রেক্ষাপটে তওরাত

থেকে যা জানা যায় তা হলো, তার স্ত্রীকে বাদশা কিছু গহনার প্রলোভন দেখিয়েছিল আর এতে সে হযরত মূসা (আ.)-কে অভিশাপ দেবার জন্য বালআমকে উসকে দিয়েছিল। সর্বোপরি তাদের কারণেও প্রায়শ মানুষের ওপর ভয়াবহ বিপদাপদ এসে থাকে। তাই তাদের সংশোধনের প্রতিও পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত এবং তাদের জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত।" (আল-হাকাম, ২ মার্চ ১৯০৮, মলফুযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭, নব মুদ্রণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন, সন্তানসন্ততি এবং আত্মীয়স্বজনরা মানুষের তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে তাই তাদের খোঁজখবর রাখা নিষেধ নয় বরং তা বৈধ, এটা পুণ্য এবং ইবাদত আর খোদার নির্দেশের অধীনস্থ কাজ। ...

মোটকথা, তাদের সকলের প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণে লিপ্ত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত জ্ঞান করুন আর শুধু উত্তরাধিকারী বানানোর জন্যই তাদেরকে প্রতিপালন না করে কেবল স্নেহ ও কৃপার দৃষ্টিকোণ থেকে করুন বরং তা হওয়া উচিত **'ওয়াজআলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা'**-এর প্রেরণায় যেন এই সন্তানসন্ততি ধর্মের সেবক হয়। কিন্তু কতজন এমন আছে যারা সন্তানসন্ততির ধর্মের পাহলোয়ান হবার জন্য দোয়া করে? অনেক কম সংখ্যক লোকই হবে যারা এমনটি করে থাকে। অধিকাংশ তো এমন যে, তারা এটি জানেই না, কেন তারা সন্তানদের জন্য এত চেষ্টাসাধনা করছে? আবার অধিকাংশ এমন, যাদের কেবল উত্তরাধিকারী বানানোর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। তাদের কেবল এটিই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, কোনো অংশীদার বা অন্য কেউ যেন তাদের সম্পত্তির মালিক না হয়ে যায়। কিন্তু স্মরণ রেখো! এভাবে ধর্ম একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়।

অতএব সন্তানদের বিষয়ে কেবল এ আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করা উচিত যে, তারা ধর্মের সেবক হবে। একইভাবে বিয়ের উদ্দেশ্য রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত থাকার পাশাপাশি এটি হওয়া উচিত যে, স্ত্রীর মাধ্যমে অধিক সন্তানসন্ততি জন্ম নেবে আর তারা সত্যিকার অর্থে ধর্মের সেবক হবে। এগুলো ব্যতীত সমস্ত চিন্তাধারা অর্থহীন। দয়ামায়া এবং তাকওয়া যদি দৃষ্টিপটে থাকে তবে কতক বিষয় বৈধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সন্তানদের জন্য যদি টাকা-পয়সা ও সম্পদ রেখে যাওয়া হয় তবে তাতে পুণ্য অর্জন হয়। কিন্তু যদি কেবল উত্তরাধিকারী বানানোর চিন্তা থাকে আর এই নিয়তেই সমস্ত চেষ্টাসাধনা করা হয় তবে তা পাপ বইকি।" (আল-হাকাম, ১০ মার্চ ১৯০৪, মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫৯৯-৬০০)

অতঃপর হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তান লাভের বাসনা কেবল এ উদ্দেশ্যে পোষণ না করা হবে যে, তারা ধার্মিক ও মুত্তাকী হবে এবং খোদা তা'লার আনুগত্যকারী হয়ে ধর্মের সেবক হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবই অনর্থক বরং এটি এক ধরনের পাপ ও গুনাহ। তাদের নাম পুণ্যবান উত্তরসূরি না রেখে এর পরিবর্তে 'বাকীয়াতে সাইয়্যিআত' বা পাপিষ্ঠ উত্তরসূরি রাখাই শ্রেয় হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি এটি বলে যে, আমি এক পুণ্যবান, খোদাভীরু এবং ধর্মের সেবক সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করছি, তবে তার এটি বলাও দাবিসর্বস্ব হবে যতক্ষণ না সে নিজের (বাস্তব) অবস্থায় এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে।" (আল-হাকাম, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০১, মলফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৫৬০)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সন্তানের সৎ ও পুণ্যবান হবার জন্য দোয়াও করুন কিন্তু দোয়া করার পাশাপাশি মানুষের নিজের কর্ম যদি সঠিক না হয় তবে কোনো লাভ হবে না। তাই নিজের সংশোধনের প্রতিও একইভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি সন্তানসন্ততি বা পিতামাতা কিংবা অন্য কোনো জিনিসকে এতটাই ভালোবাসে যে, সে সার্বক্ষণিক সেগুলোর চিন্তাই করে, তবে সেটিও একপ্রকার প্রতিমাপূজা। ... তিনি (আ.) বলেন, সন্তান এমন কী জিনিস? বাল্যকাল থেকেই মা তার জন্য প্রাণ উজাড় করে সবকিছু করেন, কিন্তু দেখা যায়, অনেক ছেলে বড়ো হয়ে মায়ের অবাধ্য হয়ে যায় এবং তার সাথে অবমাননাকর আচরণ করে। কিন্তু অনুগত হলেও তার দুঃখকষ্টের সময় সে তা দূর করতে পারে না। সামান্য পেটে ব্যথা হলেই সবাই অপারগ হয়ে যায়। এ অবস্থায় কোনো ছেলে, পিতামাতা বা অন্য কোনো আত্মীয়স্বজন কাজে আসতে পারে না। যদি কেউ কাজে আসেন তবে তিনি হলেন **খোদা**। তাই তাদেরকে এতটা ভালোবেসে ও স্নেহ দিয়ে লাভ কী, যার ফলে শিরক হয়? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'ইন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনাহ্'** (আত-তাগাবুন: ১৬) অর্থাৎ সন্তান ও সম্পদ মানুষের জন্য ফিতনাস্বরূপ। দেখুন! খোদা যদি কাউকে বলেন যে, আমি তোমার মারা যাওয়া সকল সন্তানকে জীবিত করে দেবো, কিন্তু (বিনিময়ে) আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না, তবে যে নিজের সন্তানের দিকে যাবার চিন্তা করবে সে কি বুদ্ধিমান হবে?

অতএব সকল জিনিসের ওপর খোদাকে প্রাধান্য দেবার মাঝেই মানুষের পরম সৌভাগ্য নিহিত। যে ব্যক্তি নিজের সন্তানের মৃত্যুতে অসন্তুষ্ট হয় সে-ও কৃপণ হয়ে থাকে কেননা খোদা তা'লা তার হাতে যে আমানত ন্যস্ত করেছেন তা ফিরিয়ে দিতে সে কৃপণতা করে। কৃপণ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সে যদি জঙ্গলের নদীনালার সমানও ইবাদাত করে তবুও সে জান্নাতে যাবে না। অতএব যে ব্যক্তি খোদার চেয়ে অন্য কাউকে বেশি ভালোবাসে তার ইবাদাত এবং নামায-রোযা কোনো কাজে আসবে না।" (আল-হাকাম, ২২ আগস্ট ১৯০৮, মলফুযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৬০২-৬০৩)

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেসব দোয়া যা তিনি নিজের সাহাবী কিংবা বন্ধুদের সন্তানসন্ততির জন্য করেছেন, তার মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করব যা থেকে বুঝা যায় যে, সর্বশ্রোতা খোদা কীভাবে দোয়া কবুল করেছেন। কিন্তু এসব ঘটনা শুনতে গিয়ে এখানেও আপনারা দেখতে পাবেন যে, যার জন্যই তিনি দোয়া করেছেন তাকে তার নিজের মাঝে এক বিশেষ পরিবর্তন সাধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এর সাথে সৌভাগ্যবান সন্তান জন্ম নেওয়াকে শর্তযুক্ত করেছেন এবং সাহাবী ও বন্ধুবরদের জন্য সন্তান লাভের দোয়া করেছেন। নেক, পুণ্যবান ও ধার্মিক সন্তান লাভের জন্য স্বীয় খোদার দরবারে যাচনার হাত প্রসারিত করেছেন। এসব ঘটনার আলোকে আপনারা দেখবেন, সেই দোয়াসমূহ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কত মহিমার সাথে গৃহীত হয়েছে।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেছেন, "মুন্সি আতা মুহাম্মদ পাটওয়ারী সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 'আমি যখন অআহমদী ছিলাম এবং গুরুদাসপুর জেলার ওয়ানজওয়াঁ নামক স্থানে পাটওয়ারীর কাজ করতাম, তখন বাটালার খতিব কাযী নিয়ামতউল্লাহ্ সাহেব যার সাথে আমার ওঠাবসা ছিল, তিনি আমাকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি সম্পর্কে অনেক তবলীগ করতেন কিন্তু আমি এর পতি ভ্রুক্ষেপ করতাম না। একদিন তিনি আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। আমি তাকে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তোমার মির্যাকে চিঠি লিখে একটি বিষয়ের জন্য দোয়া করতে বলছি। সেই কাজ যদি হয়ে যায় তবে আমি বুঝব, তিনি সত্য'। এরপর আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই বলে চিঠি লিখলাম যে, 'আপনি মসীহ্ মওউদ এবং আল্লাহ্র ওলী হবার দাবি করে থাকেন আর ওলীদের দোয়া গৃহীত হয়ে থাকে। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আমি যে স্ত্রীর মাধ্যমে চাই, খোদা যেন তার মাধ্যমে আমাকে একজন সুশ্রী ও সৌভাগ্যবান পুত্রসন্তান দান করেন। নীচে আমি লিখে দিলাম– আমার তিনজন স্ত্রী আছে, অনেক বছর হয়ে গেল কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো ঘরে কোনো সন্তান হয় নি। আমি আমার বড়ো স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তান চাই'। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে মরহুম মৌলবি আব্দুল করীম সাহেবের হাতে লেখা একটি চিঠি এলো যাতে লেখা ছিল, 'আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করা হয়েছে। তিনি আপনাকে যে স্ত্রীর গর্ভে চান সুশ্রী ও সৌভাগ্যবান পুত্র দান করবেন কিন্তু শর্ত হলো, আপনি যাকারিয়া (আ.)-এর মতো তওবা করুন'।

মুন্সি আতা মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন, 'আমি সে সময় চরম অধার্মিক, মাদকাসক্ত এবং ঘুষ প্রদান ও গ্রহণে খুবই আসক্ত ছিলাম, কিন্তু আমি যখন মসজিদে গিয়ে মোল্লাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, যাকারিয়া (আ.)-এর তওবা কেমন ছিল? তখন লোকেরা এটি ভেবে বিস্মিত হলো যে, এই শয়তান মসজিদে এলো কীভাবে? কিন্তু মোল্লা আমাকে জবাব দিতে পারল না। তারপর আমি ধরমকোটের মরহুম মৌলবি ফাতাহ্ দীন সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যিনি আহমদী ছিলেন। তিনি বললেন, যাকারিয়া (আ.)-এর তওবা হলো, তুমি ধর্মহীনতা পরিত্যাগ করো, হালাল খাও, নিয়মিত নামায ও রোযা পালনে অভ্যস্ত হয়ে যাও এবং বেশি বেশি মসজিদে যাতায়াত করো। এটি শুনে আমি এমনটিই করা শুরু করে দিলাম। মদ প্রভৃতি ছেড়ে দিলাম, ঘুষ খাওয়াও একেবারে বাদ দিলাম এবং নামায-রোযা পালন করতে শুরু করলাম। এ অবস্থায় চার-পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়ে থাকবে, হঠাৎ একদিন আমি বাড়ি গিয়ে দেখি আমার বড়ো স্ত্রী কাঁদছে। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, পূর্বে আমার এ সমস্যা ছিল যে, আমার সন্তান হতো না। এজন্য আমার পরে আপনি আরো দুটি বিয়ে করেছেন। কিন্তু এখন তো আমার এই সমস্যা হচ্ছে, ... (অর্থাৎ সন্তান হবার কোনো আশাই আর থাকল না)। সে সময় তার এক ভাই অমৃতসরে থানা-কর্মকর্তা ছিল। সে আমাকে বলল, আমাকে আমার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও যেন আমি কিছু চিকিৎসা করাতে পারি। আমি বললাম, সেখানে কী করতে যাবে? এখানে দাঈকে ডেকে দেখাও এবং তার কাছ থেকে চিকিৎসা নাও। অতঃপর সে এক দাঈকে ডেকে বলল, আমাকে কিছু ঔষধ দাও। দাঈ মহিলা ভাসা ভাসা দেখে বলল, আমি তোমাকে ঔষধও

দেবো না আর হাতও লাগাবো না। কেননা মনে হয় খোদা তোমার বেলায় ভুল করেছেন। কিন্তু আমি তাকে বললাম, এমনটি বলো না। আমি মির্যা সাহেবকে দিয়ে দোয়া করিয়েছিলাম। তারপর মুন্সি সাহেব বর্ণনা করেন, কিছুদিন পরে গর্ভবতী হবার পুরো লক্ষণ প্রকাশ পেল আর আমি আশপাশের সবাইকে বলতে শুরু করলাম যে, তোমরা দেখো! আমার পুত্রসন্তান হবে এবং সে দেখতেও খুব সুন্দর হবে। কিন্তু লোকেরা অবাক হতো আর বলত যে, সত্যিই যদি এমনটি হয় তাহলে এটি অনেক বড়ো একটি কেরামত। পরিশেষে এক রাতে খুব সুন্দর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই সময়ই আমি দ্রুত ধরমকোট গেলাম যেখানে আমার কতক আত্মীয়স্বজন বসবাস করত আর তাদেরকে সন্তান জন্মের সংবাদ দিলাম। এরপর কিছু লোক ঐ মূহূর্তেই বয়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান রওয়ানা হয়ে গেল, কিন্তু কিছু লোক গেল না। এ ঘটনার জের হিসেবে ওয়ানজওয়াঁর অনেকেই বয়আত করল এবং আমিও বয়আত করলাম আর ছেলের নাম রাখলাম আব্দুল হক্ব।" (সীরাতুল মাহ্দী, খণ্ড: ০১, পৃ. ২২০, ২৪১ নম্বর ঘটনা, সংস্করণ: ২০০৮)

আরেকটি ঘটনা হলো, হযরত মৌলবি কুদরতউল্লাহ্ সান্নোরী সাহেবের প্রথম স্ত্রী বিয়ের চার বছর পর মৃত্যুবরণ করেন, যখনকিনা দ্বিতীয় স্ত্রীর ব্যাপারে ডাক্তার এবং হাকীমরা একমত ছিল যে, তার সন্তান হবে না। অতঃপর ডাক্তার আব্দুল হাকীম যখন মুরতাদ হয়ে গেলো তখন সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলল, "কুদরতউল্লাহ্র জন্য আপনি নিঃসন্দেহে দোয়া করুন কিন্তু তার কখনো সন্তান হবে না।" হুযূর (আ.) দোয়া করলেন এবং হযরত মৌলবি সাহেব (রা.)-এর হাতে লিখালেন, "আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তোমার এত বেশি সন্তান হবে যে, তুমি তাদেরকে সামলাতে পারবে না।" এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে (রা.) ১৪জন সন্তান দান করেন যাদের মধ্যে ৫জনকে তিনি সামলাতে পারেন নি (অর্থাৎ মারা গিয়েছে) আর বাকি ৯জন সন্তান খোদার কৃপায় জীবিত ছিল এবং উন্নতি করেছে। (রেজিস্টার রেওয়ায়াত)

অতঃপর দোয়া গৃহীত হবার নিদর্শনস্বরূপ সন্তান লাভ হওয়া সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা রয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার মুবাল্লেগ হেকীম ফযলুর রহমান সাহেবের পিতা হাফেয নবী বখশ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "১৯০৬ সালের ঘটনা। আমার ছেলে আব্দুর রহমান হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিল। মে মাসে তিন-চার দিন টাইফয়েড জ্বর ও cerebrities আক্রান্ত হয়ে সে কাদিয়ানে মারা গেল। আমি তখন চাকরি করতাম কিন্তু ছুটিতে ফয়েয উল্লাহ্ চকে অর্থাৎ বাড়িতে এসেছিলাম। ফয়েয উল্লাহ্ চকে বসে যখন তার অসুস্থতার কথা শুনলাম তখন আমি দ্রুত কাদিয়ান চলে এলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তার চিকিৎসা করছিলেন। ছেলের অবস্থা দেখে আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘরে গেলাম। দরজার কড়া নাড়লে হুযূর (আ.) বাইরে আসলেন। আমি ছেলের অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবগত করলাম। হুযূর (আ.) তৎক্ষণাৎ ভিতরে চলে গেলেন এবং চার-পাঁচটি বড়ি এনে আমাকে দিয়ে বললেন, এখনই গিয়ে একটি বড়ি পানিতে মিশিয়ে খাইয়ে দাও আর তারপর আমাকে জানাও, আমি দোয়াও করব। অতঃপর আমি সঙ্গে সঙ্গে এসে

বড়িটি পানিতে মিশালাম এবং তাকে খাওয়ালাম। বাচ্চা যেহেতু খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল তাই ঔষধ ভিতরেই গেল না বরং মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আর বাচ্চাটি মারা গেল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) জানাযার নামায পড়ালেন। তারপর আমি ফয়েয উল্লাহ্ চকে লাশ নিয়ে যাবার অনুমতি চাইলে অনুমতি দেওয়া হলো। আমি এবং আমার সাথে যারা উপস্থিত ছিল সবাই ফয়েয উল্লাহ্ চকে ফিরে গেলাম। পরবর্তী জুমুআর দিনে জুমুআর নামায পড়তে আমি আবার কাদিয়ান এলাম। হুযূর (আ.)-এর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আমার প্রতি পড়ল এবং আমাকে বললেন, সামনে আসো। সেখানে বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্বরা হুযূর (আ.)-এর সান্নিধ্যে বসে ছিলেন। হুযূর (আ.) বলার সাথে সাথে সবাই আমাকে সামনে আসার জন্য পথ করে দিল। আমি বসতেই হুযূর (আ.) বললেন, আমি জানতে পেরেছি, আপনি আপনার সন্তানের মৃত্যুতে অনেক ধৈর্যধারণ করেছেন। আমার কোমরে হাত বোলালেন এবং বললেন, আমি দোয়া করব, খোদা যেন আপনাকে সন্তান দান করেন। অতঃপর হুযূরের ঐকান্তিক দোয়ার বরকতে প্রয়াত পুত্রের বিকল্প হিসেবে আমার এক পুত্রসন্তান লাভ হয় যার নাম ফযলুর রহমান হাকীম। সে বর্তমানে মুবাল্লেগ হিসেবে গোল্ডকোস্টের সল্টপন্ড এবং লিগুস নামক স্থানে তবলীগের কাজ করছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সন্তানকেও প্রকৃত কুরবানী করার সৌভাগ্য দান করুন।" (তিনি এখন প্রয়াত। মৃত্যুর আগে তিনি ঘানা এবং নাইজেরিয়ার প্রাথমিক মুবাল্লেগদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর তার এতটাই প্রভাব ছিল যে, যারাই বয়আত করত, তাদেরকে অন্য মুসলমানরা আহমদী বলার পরিবর্তে হাকীম বলতো। যাহোক, এভাবে তিনি অনেক কঠিন পরিস্থিতিতে সেখানে তবলীগের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন)। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ১৩, পৃ. ২৬১-২৬২)

পরিশেষে আমি আপনাদেরকে এমটিএ সম্পর্কে একটি খুশির সংবাদ শোনাচ্ছি। পাকিস্তান, উপমহাদেশ এবং এশিয়ার অধিকাংশ দেশে এমটিএ-এর প্রচার Asia Sat 2-এর মাধ্যমে হতো যার সেটিং যথেষ্ট কঠিন এবং তাতে অনেক কম চ্যানেল আসত। বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা গত ১০-১২ দিন যাবৎ Asia Sat 3-তে সম্প্রচারণা শুরু করেছি। এই স্যাটেলাইটে সাধারণত উর্দু, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল আছে সবগুলোই আসে আর এ কারণে যখনই কেউ তার টিভি টিউন করবে এমটিএ-ও সাথেই টিউন হবে। এভাবে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ যেটি অনেক দীর্ঘ সময় যাবৎ এমটিএ-র আলো থেকে বঞ্চিত ছিল, এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই নতুন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তে অর্থাৎ তাইউনি দ্বীপেও স্পষ্ট সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্; একইভাবে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে। এখন এটি Main Stream-এ এসে গেছে। খুশির বিষয় হলো, অনেক দিন যাবৎ তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে, আশ্চর্যজনকভাবে অনেক কম খরচে এই স্যাটেলাইটে স্থান পাওয়া গেছে আলহামদুলিল্লাহ্, পূর্বে যার কোনো ধারণাই ছিল না।

(১২)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১১ জুলাই ২০০৩, মোতাবেক ১১ ওয়াফা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۳﴾

(আলে ইমরান: ১২২)

অনুবাদ: "আর (সেই সময়কে স্মরণ করো!) যখন তুমি যুদ্ধের জন্য মুমিনদের যথাস্থানে মোতায়েন করতে তোমার পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে ভোরবেলায় বের হয়েছিলে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

এ আয়াতটি উহুদের যুদ্ধ-সম্পর্কিত। এ যুদ্ধে মুসলমানদের যে ভুলগুলো হয়েছিল উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিকভাবে কতক যুবক সাহাবী মহানবী (সা.)-এর মতের বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে একটি গিরিপথ পাহারা দেবার জন্য মহানবী (সা.) ৫০জন তিরন্দাজ নিযুক্ত করেছিলেন আর তারা যুদ্ধের চিত্রপট মুসলমানদের অনুকূলে এসে গেছে দেখে এবং বিজয় আসন্ন মনে করে মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের মোহে অবাধ্য হয়ে স্থান ত্যাগ করে অথচ মহানবী (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞা ছিল যে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন তোমরা গিরিপথ ত্যাগ করবে না। এর ফলাফল যা হবার ছিল তা জানা অর্থাৎ মুসলমানদের ক্ষতি হয় আর এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে একটি স্বপ্নযোগেও বলা হয়েছিল যে, যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষতি হবে। জানা কথা যে, এই যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা.) অনেক দোয়াও করে থাকবেন। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে (দোয়ার প্রেক্ষাপটে) অনেক উদ্ধৃতিও রয়েছে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা সেসব দোয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু এমন অবস্থায় (অর্থাৎ উহুদে) বাহ্যিক যে ফলাফল প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক (তা পায় নি)। মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়েছে দেখে গিরিপথে নিযুক্ত মুসলমানরা অবাধ্যতা করে সেই স্থান পরিত্যাগ করে আর কাফিররা পুনরায় পালটা আক্রমণ করে এবং মুসলমানদের সীমাহীন ক্ষতিসাধন করে। কাজেই উক্ত পরিস্থিতিতে পরিণতি অত্যন্ত ভয়ংকর হবারই কথা কিন্তু [মহানবী (সা.)-এর] সেসব দোয়ার কল্যাণে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও শত্রুরা যেভাবে বিজয় লাভ করতে চেয়েছিল সে বিজয় তাদের অর্জিত হয় নি। অনেক সাহাবী শহীদ হন এবং স্বয়ং মহানবী (সা.) গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও শত্রুরা বিজয়ীবেশে ফিরে যেতে পারে নি। কেননা সে সময় যুদ্ধের যে রীতি ছিল তা হলো, মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করা হতো এবং অনেক সম্পদ লুটেও নেওয়া হতো যার কিছুই তারা করতে পারে নি।

এর ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন– وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ (আলে ইমরান: ১২২)-এর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا অর্থাৎ তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সাহায্য এবং সমর্থন প্রদানের রীতি বর্ণনা করেছেন। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। পক্ষান্তরে বদরের যুদ্ধে সংখ্যা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করায় শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

পরাজয়ের একটি কারণ এটিও ছিল যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নিজের লোকদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুনাফিকদের প্রতি আস্থা রাখা উচিত নয়।" (তফসীরে কবীর, ইমাম রাযী, খণ্ড: ০৮, পৃ. ২০৪)

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) 'দীবাচা তফসীরুল কুরআন' পুস্তকে অনেক বিশদ যে আলোচনা করেছেন, আমি তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তিনি (রা.) বলেন, কাফির সৈন্যরা বদরের প্রান্তর থেকে পলায়ন করার সময় এই ঘোষণা দিয়েছিল যে, আগামী বছর আমরা মদীনার ওপর আবার আক্রমণ করব এবং মুসলমানদের থেকে আমাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব। সে অনুসারে তারা এক বছর পর পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে মদীনায় আক্রমণ করে। বদরের যুদ্ধের পর মক্কাবাসীরা এতটাই ক্রোধান্বিত ছিল যে, তারা ঘোষণা দিয়ে দেয়, স্বজনের মৃত্যুতে কারো ক্রন্দনের অনুমতি নেই আর যে বাণিজ্য কাফেলাই আসবে তাদের অর্জিত সম্পদ আগামী যুদ্ধের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হবে। অতএব বিশাল প্রস্তুতি নিয়ে তিন সহস্রাধিক সৈন্যের একটি বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনায় আক্রমণ হানে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের এ মর্মে পরামর্শ নেন যে, আমাদের কি মদীনার ভিতরে অবস্থান করে যুদ্ধ করা উচিত নাকি বাইরে গিয়ে? মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত মতামত ছিল, শত্রুদেরকে আক্রমণ করতে দেওয়া হোক যাতে যুদ্ধ শুরু করার জন্য তারাই দায়ী থাকে এবং মুসলমানরা যেন নিজেদের ঘরে বসে সহজেই তা মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় নি আর যাদের হৃদয়ে এই আক্ষেপ ছিল যে, হায়! আমরাও যদি খোদার পথে শহীদ হবার সুযোগ পেতাম, তারা পুনঃপুন জোর দিয়ে বলে, আমাদেরকে শাহাদাত থেকে কেন বঞ্চিত রাখা হবে? কাজেই তিনি (সা.) তাদের কথা মেনে নেন এবং পরামর্শ নেবার সময় তাদেরকে নিজের স্বপ্নও শুনান। তিনি (সা.) বলেন, আমি একটি গাভি স্বপ্নে দেখলাম এবং দেখলাম আমার তরবারির অগ্রভাগ ভেঙে গেছে আর আমি আরো দেখলাম, সেই গাভি জবাই করা হচ্ছে। অতঃপর আমি আমার হাত একটি শক্তিশালী ও সুরক্ষিত বর্মের ভেতর ঢুকালাম। এছাড়া আমি এ-ও দেখলাম যে, আমি একটি দুম্বার পিঠে আরোহণ করে আছি।

সাহাবীরা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এই স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, গাভি জবাইয়ের ব্যাখ্যা হলো, আমার কতক সাহাবী শহীদ হবে। তরবারির অগ্রভাগ ভেঙে যাওয়া দ্বারা আমার মনে হচ্ছে, আমার স্বজনদের মাঝ

থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শহীদ হবে কিংবা এই অভিযানে সম্ভবত আমাকেই কোনো কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। বর্মে হাত ঢুকানোর অর্থ আমি এটি মনে করি যে, মদীনাতে অবস্থান করাই আমাদের জন্য বেশি উত্তম। দুম্বায় আরোহণের ব্যাখ্যা হলো, কাফির সৈন্যদের নেতার বিরুদ্ধে আমরা জয়ী হবো অর্থাৎ সে মুসলমানদের হাতে মারা যাবে। এই স্বপ্নে যদিও মুসলমানদের এটি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, মদীনায় অবস্থান করাই তাদের জন্য শ্রেয়, কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেহেতু মহানবী (সা.)-এর একান্তই নিজের ছিল আর ইলহামী ছিল না তাই তিনি (সা.) সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত মেনে নেন এবং যুদ্ধের জন্য (মদীনার) বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তিনি (সা.) যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন তখন যুবকরা কিছুটা অনুতপ্ত হয় এবং তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার পরামর্শই সঠিক। মদীনাতে অবস্থান করেই আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করা উচিত। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী একবার বর্ম পরিধান করলে তা আর তিনি খুলেন না। এখন যা-ই ঘটুক না কেন আমরা সামনে অগ্রসর হবো। তোমরা যদি ধৈর্যসহকারে কাজ করো তাহলে খোদার সাহায্য তোমরা লাভ করবে। একথা বলে তিনি (সা.) এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং কিছু দূর গিয়ে রাত্রিযাপনের জন্য তাঁবু খাটান। মহানবী (সা.)-এর স্থায়ী রীতি ছিল, শত্রুদের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি (সা.) নিজের সৈন্যদের কিছুটা বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিতেন যাতে করে তারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে নিতে পারে। ভোরে নামাযের জন্য বের হলে তিনি (সা.) জানতে পারেন যে, কিছু ইহুদীও তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর সাহায্যের বাহানায় সাথে এসেছে। যেহেতু ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি (সা.) অবগত ছিলেন তাই তিনি (সা.) তাদেরকে ফেরত পাঠাতে বলেন। এর ফলে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল-ও নিজের ৩০০ সঙ্গী নিয়ে এ কথা বলতে বলতে ফিরে যায় যে, এটিতে কোনো যুদ্ধ হলো না বরং জেনেশুনে ধ্বংসের মুখে নিপতিত হওয়া; কেননা এখানে তো নিজেদের সাহায্যকারীদের যুদ্ধ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কেবল ৭০০ মুসলমান বাকি রয়ে যায় যা কাফিরদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিল আর রণসরঞ্জামের দিক থেকে তো আরো দুর্বল, কেননা কাফিরদের মাঝে কেবল বর্মধারী সৈন্যই ছিল ৭০০; কিন্তু মুসলমানদের ছিল কেবল ১০০। এছাড়া কাফিরদের অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল ২০০, পক্ষান্তরে মুসলমানদের ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া। অবশেষে তিনি (সা.) উহুদের ময়দানে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে তিনি (সা.) একটি পাহাড়ি গিরিপথ সুরক্ষার জন্য পঞ্চাশজন সৈন্য নিযুক্ত করেন এবং তাদের দলপতিকে জোরালো নির্দেশ দিয়ে বলেন, এই গিরিপথ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা নিহত হই বা বিজয় লাভ করি, তোমরা এখান থেকে নড়বে না। এরপর তিনি (সা.) অবশিষ্ট সাড়ে ছয়শ সৈন্য নিয়ে শত্রুর মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন যা শত্রুদের সংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছিল। যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে স্বল্প সময়ের মধ্যেই সাড়ে ছয়শত মুসলমানের বিপরীতে মক্কার তিন হাজার অভিজ্ঞ সৈন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করে। এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত হাদীস রয়েছে, এখানে আমি তা পড়ে দিচ্ছি। (দীবাচা তফসীরুল কুরআন, পৃ. ১৫১-১৫২)

বারা বিন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)-কে পঞ্চাশজন পদাতিক সৈন্যের দলনেতা নিযুক্ত করেন এবং তাকে গিরিপথে মোতায়েন করে বলেন, তোমরা যদি দেখো, পক্ষীকুল আমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের মাংস খাচ্ছে তবুও তোমরা সেই গিরিপথ ছাড়বে না যেখানে আমি তোমাদের নিযুক্ত করছি। আর যদি তোমরা দেখো, আমরা শত্রুদের পরাস্ত করেছি এবং তাদেরকে পদদলিত করছি তখনও তোমরা এই স্থান ছাড়বে না যতক্ষণ না আমি তোমাদের ফিরে আসার বার্তা পাঠাই। যুদ্ধ যখন শুরু হয় এবং মুসলমানরা কাফিরদের পরাস্ত করে আর মুশরিক মহিলাদের পায়ের গোছা উদাম করে পলায়ন করতে দেখা যায়। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)-এর অধীনস্থ সৈন্যদল এটি দেখে বলে, এখন আর কীসের অপেক্ষা? মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছে, তাই আমাদেরও চলে যাওয়া উচিত। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) উত্তরে বলেন, তোমরা কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই নির্দেশ ভুলে গেছ যে, যতক্ষণ না আমি তোমাদের ফিরে আসার নির্দেশ দেবো ততক্ষণ তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না? কিন্তু তারা বলল, বিজয় লাভ হয়েছে। এখন আমাদেরও গনিমতের মাল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করা উচিত। সুতরাং তারা গিরিপথ ছেড়ে নীচে নেমে আসে। কিন্তু শত্রুরা যখন গিরিপথ খালি থাকার এই ভুলটি লক্ষ করে, তখন তারা গিরিপথের বিপরীত দিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। এ কারণে মুসলমানদের সূচিত বিজয় পরাজয়ে রূপ নেয়। (এই ঘটনারই উল্লেখ পবিত্র কুরআনে রয়েছে যে,) রসূল তাদেরকে পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। ঘটনার এক পর্যায়ে এমন সময়ও আসে যখন কেবল ১২জন সাহাবী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে অবশিষ্ট ছিলেন আর প্রায় ৭০জন সাহাবী (রা.) লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। পক্ষান্তরে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে ১৪০জন কাফির আহত হয়েছিল, ৭০জন হয়েছিল বন্দি এবং আরো ৭০জন মারা গিয়েছিল। তখন আবু সুফিয়ান পর পর তিন বার চিৎকার করে বলে, তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ জীবিত আছে? মহানবী (সা.) উত্তর দিতে বারণ করেন। অতঃপর সে বলে, তোমাদের মধ্যে কি আবু কুহাফার পুত্র আবু বকর জীবিত আছে? পুনরায় সে তিন বার বলে, তোমাদের মাঝে কি খাত্তাবের পুত্র উমর জীবিত আছে? কোনো উত্তর না পেয়ে নিজ সৈন্যদের দিকে ফিরে সে বলে, এরা সবাই মারা গেছে। হযরত উমর (রা.) এই কথা সহ্য করতে না পেরে বজ্রকণ্ঠে বলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! খোদার কসম! তুমি যাদের নাম নিয়েছ তারা সকলেই জীবিত আছেন এবং তোমাদের জন্য লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। এটি শুনে আবু সুফিয়ান বলল, বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে আর যুদ্ধ তো দোদুল্যমান বালতির ন্যায় হয়ে থাকে, কখনো এদিকে দোলে তো কখনো ওদিকে। তোমরা মানুষের মাঝে কতক লাশ অঙ্গহীন ও বিকৃত দেখতে পাবে, যদিও এর আদেশ আমি দেই নি, কিন্তু এর জন্য আমার কোনো আক্ষেপও নেই। এরপর সে রণসঙ্গীত গাইতে থাকে, **"ও'লু হুবাল! ও'লু হুবাল!"** অর্থাৎ হুবাল প্রতিমার জয় হোক এবং তার (মর্যাদা) উন্নীত হোক।

তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা এর উত্তর কেন দিচ্ছ না? সাহাবীরা (রা.) জিজ্ঞেস

করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কী উত্তর দেবো? মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা বলো, **"আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল"** অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ এবং সর্বমহান সত্তা আর তাঁর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার কেউ নেই। আবু সুফিয়ান এই উত্তর শুনে বলে, **'লানাল উয্‌যা ওয়া লা উয্‌যা লাকুম'** অর্থাৎ আমরা উয্‌যা প্রতিমার সাহায্য লাভ করি কিন্তু তোমরা কোনো দেব-দেবীর সাহায্য পাও না। মহানবী (সা.) বলেন, উত্তর দাও। সাহাবীরা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! উত্তরে আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা বলো, **"আল্লাহু মাওলানা ওয়া লা মাওলা লাকুম"** অর্থাৎ আল্লাহ্‌ আমাদের অভিভাবক এবং প্রভু আর তোমাদের এমন কোনো অভিভাবক ও প্রভু নেই যিনি তাঁর বিপরীতে তোমাদের সাহায্য করতে পারে। (সহীহ্‌ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্‌সিয়ার, বাব ইয়াকরাহু মিনাত্‌ তানাযুয়ে ওয়াল ইখতিলাফি ফিল হারব)

এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যা বর্ণনা করেছেন তা আমি পড়ছি। তিনি (রা.) বলেন, কাফিরদের পিছু ধাওয়া করার কারণে মুসলমানরা চারদিকে এতটাই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো মুসলমানদের কোনো সুসংগঠিত বাহিনী ছিল না। যুদ্ধের ময়দানে কোনো কোনো সৈন্যকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল, যাদের মধ্যে কতককে তারা হত্যা করেছিল আর বাকিরা, এটি কী হয়ে গেল– ভেবে হতভম্ব হয়ে পেছন দিকে ছুটতে থাকে। কতক সাহাবী দৌড়ে মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে একত্রিত হন যাদের সংখ্যা খুব বেশি হলে ২০জন হবে। কাফিররা সেই স্থানে প্রবল আক্রমণ করে যেখানে মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর (সা.) সুরক্ষার্থে একের পর এক সাহাবী শহীদ হতে থাকেন। তরবারি পরিচালনাকারীরা ছাড়াও তিরন্দাজরা উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-কে লক্ষ করে অগণিত তির নিক্ষেপ করছিল। সে সময় হযরত তালহা (রা.), যিনি কুরাইশ ছিলেন এবং মক্কার মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, দেখতে পান যে, শত্রুরা সমস্ত তির মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ বরাবর নিক্ষেপ করছে, তিনি (রা.) নিজের হাত তাঁর (সা.) পবিত্র মুখের সামনে বিছিয়ে দিয়ে রাখেন। উপর্যুপরি তির হযরত তালহা (রা.)-এর হাতকে লক্ষ্যে পরিণত করছিল। কিন্তু প্রাণবাজ বিশ্বস্ত এই সাহাবী (রা.) নিজের হাত একটুও নড়চড় করেন নি। এভাবে তির বিদ্ধ হতে থাকে আর হযরত তালহা (রা.)-এর কেবল একটি হাতই থেকে যায়। অপর হাতটি আঘাতের তীব্রতার কারণে সম্পূর্ণরূপে বিকল হয়ে যায়। ....উহুদের যুদ্ধের পর কোনো এক ব্যক্তি হযরত তালহা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার হাতে যখন তির এসে বিদ্ধ হতো তখন আপনি কি ব্যথা পেতেন না এবং আপনার মুখ থেকে কি উফ্‌ শব্দ বের হতো না? হযরত তালহা (রা.) উত্তর দেন, ব্যথাও লাগত এবং উফ্‌ শব্দও বের হতে চাইত কিন্তু আমি উফ্‌ শব্দ করতাম না এই ভেবে যে, উফ্‌ শব্দ করতে গিয়ে আমার হাত সরে গেলে তির এসে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় লাগবে।

গুটি কতক লোক এত বড়ো সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা কতক্ষণইবা করতে পারত! কাফিরদের একটি সৈন্যদল সামনে অগ্রসর হয় এবং মহানবী (সা.)-এর আশপাশের সৈন্যদেরকে ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরিয়ে দেয়। মহানবী (সা.) সেখানে একা পাহাড়ের মতো

দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ একটি পাথর সজোরে তাঁর (সা.) শিরস্ত্রাণে লাগে এবং শিরস্ত্রাণের কীলক মহানবী (সা.)-এর মাথায় ঢুকে যায় আর তিনি (সা.) অচেতন হয়ে সেই সাহাবীদের (রা.) লাশের ওপর পড়ে যান যারা তাঁর (সা.) আশেপাশে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন। এরপর আরো কয়েকজন সাহাবী (রা.) মহানবী (সা.)-কে রক্ষার জন্য শহীদ হন আর তাদের লাশও মহানবী (সা.)-এর দেহের ওপর এসে পড়ে। কাফিররা মহানবী (সা.)-এর দেহ লাশের নীচে চাপা পড়া অবস্থায় দেখে ভাবল, তিনি (সা.) মারা গেছেন। অতঃপর মক্কার সৈন্যরা সারিবদ্ধ হবার জন্য পশ্চাদপসরণ করে। যে-সব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর আশপাশে ছিলেন এবং যাদেরকে কাফির সৈন্যরা ধাক্কা দিয়ে পিছু হটিয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত উমর (রা.)-ও ছিলেন। তিনি (রা.) যখন দেখেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইরত সৈন্যবাহিনীর কেউ নেই তখন তাঁরও (রা.) দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। সে ব্যক্তি যিনি একইসাথে কায়সার ও কিসরার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং যিনি কখনো বিচলিত হন নি আর কখনো ভয়ও পান নি, সেই ব্যক্তি একটি পাথরের ওপর বসে শিশুদের ন্যায় কাঁদতে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত মালেক (রা.) নামক একজন সাহাবী যিনি রাত থেকে কিছু না খাবার কারণে ক্ষুধার্ত ছিলেন আর যিনি মুসলমান সৈন্যদের বিজয় লাভ হয়েছে দেখে কিছু খেজুর নিয়ে পেছনে চলে গিয়েছিলেন, যাতে সেগুলো খেয়ে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারেন তিনি বিজয়ের আনন্দে ঘুরতে ঘুরতে হযরত উমর (রা.)-এর নিকট পৌঁছান এবং হযরত উমর (রা.)-কে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে উমর! আপনার কী হয়েছে? ইসলামের বিজয়ে আপনার খুশি হওয়া উচিত নাকি কান্না করা উচিত? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, হে মালেক (রা.)! তুমি সম্ভবত বিজয়ের পরপরই পেছনে চলে গিয়েছিলে। তোমার জানা নেই যে, কাফির বাহিনী পাহাড়ের পেছন দিয়ে ঘুরে এসে মুসলমান বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়, আর মুসলমানরা যেহেতু বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাই কেউই তাদের মোকাবিলা করতে পারে নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) কতক সাহাবীসহ তাদের মোকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছেন। মালেক (রা.) বলেন, হে উমর (রা.)! এই ঘটনা যদি সঠিক হয় তবে আপনি এখানে বসে কাঁদছেন কেন? আমাদের প্রিয়তম যে জগতে চলে গেছেন আমাদেরও তো সেখানেই যাওয়া উচিত। একথা বলার পর শেষ যে খেজুরটি মুখে পুরতে যাচ্ছিলেন সেটি এ বলে মটিতে ছুড়ে ফেলে দেন যে, হে খেজুর! মালেক এবং জান্নাতের মাঝে তুই ছাড়া আর কোনো প্রতিবন্ধক নেই? এটি বলেই তরবারি নিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েন। তিন হাজার লোকের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি কিবা করতে পারে, কিন্তু একজন খোদার বান্দা অনেক সময় একাই একশ হয়ে থাকে। মালেক (রা.) এতটা সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন যে, শত্রুরা অবাক হয়ে যায়। অবশেষে তিনি আহত হয়ে পড়ে যান এবং পড়ে গিয়েও শত্রুসেনার ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। যে কারণে মক্কার কাফিররা তার ওপর এতটাই নৃশংস আক্রমণ চালায় যে, যুদ্ধের পর তার লাশের সত্তরটি টুকরা পাওয়া যায়, এমনকি তার লাশ চেনাই যাচ্ছিল না। অবশেষে একটি আঙুল দেখে তার বোন চিনতে পেরে বলেন, এটি আমার ভাই মালেক (রা.)-এর লাশ।

মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে যে-সব সাহাবী (রা.) ছিলেন এবং যারা কাফির সৈন্যদের ধাক্কায় পেছনে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, কাফিররা সরে যেতেই পুনরায় তারা মহানবী (সা.)-কে ঘিরে একত্রিত হন। তারা তাঁর (সা.) পবিত্র দেহ উঠিয়ে আনেন এবং উবায়দুল্লাহ্ বিন আল জাররাহ্ নামের একজন সাহাবী তার দাঁত দিয়ে মহানবী (সা.)-এর মাথায় ঢুকে পড়া কীলকটি সজোরে টেনে বের করতে গিয়ে তার দুটি দাঁত ভেঙে যায়। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.)-এর জ্ঞান ফিরে আসে এবং সাহাবীরা ময়দানের চতুর্দিকে লোক পাঠায়, যেন মুসলমানরা পুনরায় একত্রিত হয়। বিক্ষিপ্ত মুসলিম যোদ্ধারা পুনরায় একত্রিত হতে থাকে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, ... আর শত্রুরা পেছনে সরে যায়। মহানবী (সা.) তখন কতক সাহাবীকে (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহতদের খোঁজ-খবর নেবার আদেশ দেন। এক সাহাবী মাঠে খোঁজ করতে করতে একজন আহত আনসারীর কাছে পৌঁছান। লক্ষ করুন, সেই অবস্থায়ও সাহাবীদের আদর্শ দেখুন! তিনি দেখেন যে, তার অবস্থা মুমূর্ষু, তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছিলেন, এই সাহাবী তার কাছে পৌঁছে আসসালামু আলাইকুম বলেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন এবং তার হাত ধরে বলেন, আমি অপেক্ষা করছিলাম যেন কোনো ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তিনি সেই সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার তো খুবই করুণ অবস্থা, এমতাবস্থায় আপনি কি আপনার আত্মীয়স্বজনের উদ্দেশ্যে কোনো বার্তা দিতে চান? সেই মৃত্যু পথযাত্রী সাহাবী বলেন, হ্যাঁ, আমার পক্ষ থেকে আমার আত্মীয়স্বজনকে সালাম দেবেন এবং তাদেরকে বলবেন, আমি তো চলে যাচ্ছি, কিন্তু খোদা তা'লার এক পবিত্র আমানত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তাকে তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি। হে আমার ভাই এবং আত্মীয়স্বজন! তিনি খোদার সত্য রসূল (সা.)। আমি আশা রাখি, তোমরা তাঁর (সা.) রক্ষণাবেক্ষণে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না আর আমার এই ওসিয়্যতকে সর্বদা স্মরণ রাখবে। [মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহ.) এবং যুরকানী, বাব তারগীব ফিল জিহাদ]

মহানবী (সা.) যখন শহীদদের দাফন করে মদীনায় ফেরেন তখন নারী ও শিশুরা তাঁকে (সা.) স্বাগত জানাতে মদীনার বাইরে চলে আসে। মদীনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সা'দ বিন মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর উটের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং সগৌরবে সামনে সামনে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। সম্ভবত জগদ্‌বাসীকে তিনি এটি জানান দিচ্ছিলেন যে, দেখে নাও! আমরা মহানবী (সা.)-কে সুস্থ অবস্থায় তাঁর (সা.) ঘরে ফিরিয়ে এনেছি। শহরের নিকটে তিনি (রা.) তার বৃদ্ধা মাকে দেখতে পান যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে তার এক ছেলে আমর বিন মুআয (রা.) শহীদ হয়েছিলেন। মাকে দেখে সা'দ বিন মুআয (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা আসছেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার বরকত নিয়ে এসেছেন। বৃদ্ধা সামনে এগিয়ে আসেন এবং ক্ষীণ দৃষ্টিতে এদিক-সেদিক তাকিয়ে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা খুঁজতে থাকেন। অবশেষে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা চিনতে পেরে আনন্দিত হন। মহানবী (সা.) বলেন, মা! তোমার পুত্রের শাহাদাতে আমি সমব্যথী। এটি শুনে সেই পুণ্যবতী মহিলা বলেন, হুযূর! আপনাকে সুস্থ দেখেই আমি আমার সমস্ত দুঃখ-বেদনা ভুলে গেছি।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, মোটকথা মহানবী (সা.) নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যান। সেই যুদ্ধে যদিও অনেক মুসলমান নিহত এবং অনেকেই আহত হয়েছিল তারপরও উহুদের যুদ্ধকে পরাজয় বলা যাবে না। আমি ওপরে যে ঘটনা বর্ণনা করেছি সেটি দৃষ্টিপটে থাকলে দেখা যায়, এটি অনেক বড়ো বিজয় ছিল। আর এটি এমন এক বিজয় ছিল যা স্মরণ করে মুসলমানরা কিয়ামত পর্যন্ত নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করতে পারে এবং বৃদ্ধি করতে থাকবে। (দীবাচা তফসীরুল কুরআন, পৃ. ১৫১-১৫৭)

এ সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর জীবনের শেষ কথাগুলো (এতে বর্ণিত হয়েছে)। তিনি (রা.) উহুদের যুদ্ধে ইসলামের পতাকাবাহক ছিলেন। হঠাৎ যখন যুদ্ধের অবস্থা পালটে যায় তখন তিনিও কাফিরদের লক্ষ্যে পরিণত হন। মুশরিক অশ্বারোহী ইবনে কামেয়া সামনে এগিয়ে তরবারি দ্বারা আঘাত করলে তাঁর (রা.) ডান হাত শহীদ হয়ে যায়, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ বাম হাত দিয়ে পতাকাটি ধরে ফেলেন। তখন তিনি (রা.) এই আয়াত পড়ছিলেন, **ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রুসুল**। ইবনে কামেয়া দ্বিতীয় বার আঘাত করলে তাঁর (রা.) বাম হাতও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন তিনি (রা.) পাঞ্জাবিহীন দুই বাহু দিয়ে পতাকাটি বুকে চেপে ধরেন। ইবনে কামেয়া তরবারি ফেলে বর্শা দিয়ে তাঁকে (রা.) সজোরে আঘাত করে, যার ফলে বল্লমের অগ্রভাগ ভেঙে বুকেই রয়ে যায় আর ইসলামের নিষ্ঠাবান-নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক সেই আয়াতটি যপতে যপতে নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হন। (আত-তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, যিকর মুসআব বিন উমায়ের, দ্বার আহইয়াউত তুরাসিলিল আরাবী, বৈরুত-লেবানন থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, আমার চাচা আনাস বিন নযর (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি, যে-কারণে তার অনেক আক্ষেপ ছিল। একবার তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি মুশরিকদের সাথে প্রথম যে যুদ্ধ করেছিলেন তাতে আমি অংশ নিতে পারি নি। আল্লাহ্ তা'লা যদি ভবিষ্যতে কখনো আমাকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ দান করেন তবে আমি আল্লাহ্ তা'লাকে দেখাবো, আমি কী করি? মানুষ তাঁর (রা.) একথা শুনে অবাক হতো।

অতঃপর যখন উহুদের যুদ্ধ হয় তখন এমন এক মূহূর্ত আসে যখন মুসলমানরা সারিবদ্ধ থাকতে পারে নি, ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তখন হযরত আনাস (রা.) বলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে সেই লোকদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং শত্রু তথা মুশরিকদের বর্বর আচরণের সাথে আমার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। [এর অর্থ ছিল, সাহাবীদের (রা.) দ্বারা যে ভুল হয়েছে সেজন্য তাঁদের ক্ষমা করে দাও]। তারপর তিনি (রা.) সামনে অগ্রসর হলে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত আনাস বিন নযর (রা.) তাঁকে বলেন, হে সা'দ! দেখো জান্নাত কত নিকটে। কা'বার প্রভুর কসম! আমি উহুদের ওপাশ থেকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি।

মহানবী (সা.)-এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আনাস (রা.) বলেছেন এবং করে দেখিয়েছেন কিন্তু আমি এমনটি করতে পারি নি।

এই ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা আমাদের চাচা (আনাস)-কে এমন অবস্থায় শহীদ হিসেবে পেয়েছি যে তাঁর গায়ে আশিটির অধিক তরবারি, বল্লম কিংবা তিরের আঘাত ছিল। মুশরিকরা তার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিল। তার বোন ব্যতীত কেউই তার লাশ শনাক্ত করতে পারে নি, যিনি আঙুলের চিহ্ন দেখে তাকে চিনতে পেরেছিলেন। আমরা মনে করি, আয়াত 'মুমিনদের মাঝে কিছু এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে আর তারা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষায় সত্য প্রমাণিত হয়েছেন'– সেই ধরনের মানুষের পক্ষে এবং সম্মানার্থে অবতীর্ণ হয়েছে। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব কাওলিল্লাহি তা'লা মিনাল মু'মিনীনা রিজালুন সাদাকু ...)

মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর এই সংবাদ আসে যে, কাফির সৈন্যরা পথিমধ্যে আবার একত্রিত হয়ে মদীনার ওপর আক্রমণ করতে চায়। শনিবার সন্ধ্যায় উহুদের ময়দান থেকে ফেরার পর মহানবী (সা.) ও তাঁর (সা.) সাহাবীরা মদীনায় রাত্রিযাপন করেন আর মুসলমানরা সারারাত তাদের ক্ষত নিরাময়ের চেষ্টায় লেগে থাকেন। অর্থাৎ যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তারাও গুরুতর আহত ছিলেন। ফজরের নামায আদায়ের পর মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে লোকদের ডেকে একথা বলতে বলেন যে, তিনি (সা.) শত্রুদের পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। শত্রুদের মদীনার ওপর আক্রমণ করার পূর্বেই তিনি (সা.) আদেশ দিয়ে বলেন আমাদের যাওয়া উচিত আর আমাদের সাথে কেবল তারাই যাবে যারা গতকাল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তিনি (সা.) তাঁর পতাকা আনিয়ে নেন এবং না খুলেই হযরত আলী (রা.)-এর হাতে তুলে দেন। মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা চরম আহত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থাতেই শত্রুর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বের হন। তারা হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে (মদীনা থেকে যা দশ মাইল দূরে অবস্থিত) অনেক বড়ো করে শিবিরাগ্নি প্রজ্বলিত করে যা অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল আর এমন মনে হচ্ছিল যেন বিশাল এক জনগোষ্ঠী সমবেত হয়েছে। ... আল্লাহ্ তা'লা কাফিরদের হৃদয়ে এমন ত্রাসের সঞ্চার করেন যে, তারা দ্রুত মক্কায় ফিরে যায়। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে নিয়ে সোম, মঙ্গল এবং বুধবার পর্যন্ত হামরাউল আসাদেই অবস্থান করেন এবং তারপর মদীনায় ফিরে আসেন। (তারীখ আত-তাবারী, খণ্ড: ০২, পৃ. ৭৫)

এটি ছিল এই আয়াতের ঘটনাপট ও ঐতিহাসিক চিত্র, যা আমি আপনাদের সামনে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, **"তুবাভ্যিয়ুল মু'মিনীনা মাক্বায়িদা লিল ক্বিতাল"** অর্থাৎ তুমি মুমিনদেরকে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করছিলে যেখানে তাদের দাঁড়িয়ে লড়াই করা উচিত। এ থেকে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষা হলো, শত্রুর মোকাবিলা, মুনাযেরা ও মুবাহেসা নিঃসন্দেহে করো কিন্তু স্বীয় ইমামের ইচ্ছানুযায়ী কেননা সেই বিন্যাস, যার ফলে বিজয় এবং সৌভাগ্য লাভ হবে তা কেবল আল্লাহ্‌র বান্দারাই জানে। (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০১, পৃ. ৫২৬)

কিছু চিঠিপত্রের কারণে আমি উদ্‌বিগ্ন, যা এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

এক বন্ধু লিখেছেন, শত্রুরা সব সময় অপলাপ করে চলেছে এবং জামা'তের প্রতি ডাহা মিথ্যা ও বাজে কথা আরোপ করা হয়। অতঃপর তিনি তবলীগের কথা বলতে গিয়ে লেখেন, যাদেরকে আমি তবলীগ করে থাকি তাদের মনমস্তিষ্কে কুধারণা সঞ্চার করা হয় এবং আমাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এটি বলা হয় যে, আহমদীরা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আমাদের সাথে মুবাহালা করুক। পত্র লেখক লেখেন, আমি মনে করি, মুবাহালার চ্যালেঞ্জ আমার গ্রহণ করা উচিত এবং এর অনুমতি দেওয়া উচিত। একটি বিচ্ছিন্ন পত্র হলে আমার চিন্তা থাকত না কিন্তু বিভিন্ন স্থান থেকে ধারাবাহিকভাবে এমন পত্র আসা শুরু হয়ে গিয়েছে, এ কারণে আমি চিন্তিত। এ বিষয়ে আপনাদের হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর এ নির্দেশটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, সর্বাবস্থায় ইমামের পেছনে চলুন। আপনাদের কারো নিজ ইমামের সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা অথবা কাউকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দেবার অধিকার নেই, সবার তো প্রশ্নই ওঠে না। এটিরও কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। মহানবী (সা.) যখন খ্রিষ্টান এবং ইহুদীদেরকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন তখন নিজের ইচ্ছায় দেন নি। খোদা তা'লা যতক্ষণ তাঁকে (সা.) বলেন নি এবং পদ্ধতি শিখিয়ে দেন নি ততক্ষণ তিনি কেবল হিদায়াতের জন্য দোয়া-ই করছিলেন। একইভাবে শত্রুদের বিরোধিতা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও কতক লোককে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। অতঃপর এ যুগে আপনারা দেখেছেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, এটিও তিনি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশেই দিয়েছেন। এটি এমন কোনো বিষয় নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যাবে এবং এমন ধ্যানধারণার পেছনে ছুটবে। এমনকি মুনাযারা ও মুবাহাসা প্রভৃতিতেও এ ধরনের শর্ত আরোপের অনুমতি নেই যা থেকে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, আপনি জামা'ত তথা আহমদীয়াতের সত্যতাকে নিজের প্রস্তাবিত শর্তাবলি কিংবা দোয়ার সাথে শর্তযুক্ত করছেন। আহমদীয়াত সত্য আর নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন ঐশী সুসংবাদ এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঘটেছে।

এছাড়া আহমদীয়াতের শতাধিক বছরের ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন মানুষ এবং ধর্মের অনুসারীদেরকে যে-সব চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন আর তাঁর বিপরীতে যে-ই তাঁর (আ.) মোকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়েছে তাকে ধূলিসাৎ হতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। খোদা স্বয়ং আমাদের হয়ে প্রতিশোধ নেন এবং নিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে আপনাদের কীসের ভয় এবং চিন্তা! তাই আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে ইমামরূপী যে ঢাল সরবরাহ করেছেন এর পেছনে অবস্থান করুন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বাণী পৌঁছানোর যে পদ্ধতি এবং দলিলপ্রমাণাদি আমাদের দিয়ে গেছেন সে অনুযায়ী তবলীগ করতে থাকুন। যেভাবে তিনি (আ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্য প্রকৃতির সে অবশেষে আসবেই। আর সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো, দোয়া করুন এবং দোয়ার মাধ্যমেই সাহায্য করুন। আমাদের খোদা জীবন্ত খোদা, যিনি আজ অবধি খোদা হিসেবে স্বীয় বিকাশ আমাদের জন্য ঘটিয়ে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও প্রদর্শন করে যাবেন,

ইনশাআল্লাহ্। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে হ্যাঁ, একটি শর্ত হলো, নিষ্ঠার সাথে খোদার দরবারে বিনত হোন এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। তিনিই সেই সত্তা– যিনি আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন। তাঁর একত্ববাদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুন। যে-সব বিরুদ্ধবাদী মুবাহালার এতই শখ রাখে তারা তাদের শখ পূরণ করুক। তারা আল্লাহ্ তা'লাকে যত খুশি ডাকুক, নিজেদের নাকে খর দিক কিংবা কপাল ঠুকতে থাকুক না কেন, তাদের সেসব দোয়া কখনো গৃহীত হবে না যা এই জামা'তের বিরুদ্ধে তারা করবে। অপরদিকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামেরই বিজয় হবে, ইনশাআল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্যটি সর্বদা স্মরণ রাখুন যে, **"আমি প্রত্যাদিষ্ট আর আমাকে বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।"**

(১৩)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৮ জুলাই ২০০৩, মোতাবেক ১৮ ওয়াফা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(আল-হাশর: ১০)

[অর্থ: আর (এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা পূর্ব থেকেই (মদীনায়) বসবাস করত এবং তাদের (অর্থাৎ মুহাজিরদের আসার) পূর্বেই ঈমান এনেছিল, তারা তাদের ভালোবাসত যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছিল। আর যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তারা এর (তথা সেই সম্পদের) কোনো আকাঙ্ক্ষা নিজেদের অন্তরে রাখত না। আর নিজেরা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের ওপর অন্যদের (অর্থাৎ মুহাজিরদের) অগ্রাধিকার দিত। আর স্বভাবগত কার্পণ্য থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয়, অবশেষে তারাই সফল হবে।]

আগামী শুক্রবার থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। এটি যদিও যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা কিন্তু এখানে যুগ-খলীফার অবস্থানের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আহমদীরা গভীর আগ্রহের সাথে এতে অংশগ্রহণের জন্য আসেন। যাদের মাঝে বৃদ্ধ এবং অসুস্থরাও অন্তর্ভুক্ত আর অসুস্থতা সত্ত্বেও তারা কষ্ট করে জলসায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া (অংশগ্রহণ করছেন) নানান দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা এবং ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও স্বভাবের মানুষ যাদের পানাহার ও জীবনযাপনের রীতি ভিন্ন ভিন্ন। অতএব এ কারণে স্বভাবতই অতিথি সেবকদের দুশ্চিন্তা থাকে যে, তাদের পক্ষ থেকে কোথাও কোনো ধরনের ত্রুটি বা সেবাদানে ঘাটতি না থেকে যায়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক বছর থেকে যুক্তরাজ্য জামা'ত অতিথিসেবার এই সৌভাগ্য লাভ করে আসছে আর আল্লাহ্র রহমতে তারা অতিথিসেবার এই দায়িত্ব সুচারুরূপেই পালন করে চলেছে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় এখন তাদের এত ভালো প্রশিক্ষণ হয়ে গেছে যে, কর্মীও সহজে পাওয়া যায় আর কর্মীরা একান্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দায়িত্বও পালন করে থাকেন। এই তো মাত্র কয়েক মাস পূর্বে আপনারা দেখে থাকবেন, হুযূর (রাহে.)-এর ইন্তেকালের সময় হাঙ্গামি পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও এসব কর্মী নিখুঁতভাবে পুরো আয়োজন সামলেছেন এবং অতিথি আপ্যায়নও করেছেন। জলসার সময় মেযবানদের যে বিষয়ে চিন্তা থাকে তা হলো, এতে অংশগ্রহণকারী অতিথিরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি এবং তাদের

যথাসম্ভব আরামের বিধান করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার এই চিন্তা থাকে যে, অতিথিসেবা প্রদানকারীরা সকলে যেহেতু স্বেচ্ছাসেবী ও ভিন্ন ভিন্ন মনমানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকেন, তাই কোনো কর্মীর মুখ ফসকে কোনো অতিথি সম্পর্কে কোনো রূঢ় কথা বেরিয়ে যায় কিংবা কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। এ কারণে কর্মীরা কীভাবে অতিথিদের সেবা প্রদান করবে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য জলসার এক জুমুআ পূর্বে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ সম্পর্কে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদানের সাধারণভাবে একটি রীতি চলে আসছে। কিন্তু এর পাশাপাশি অতিথিদেরও এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, এই পুরো ব্যবস্থাপনাটি যেহেতু অস্থায়ী আর কর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করে সেবা প্রদান করে থাকেন, তাই কোথাও যদি কোনো ত্রুটি কিংবা সেবাদানে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় তবে সেগুলো সহ্য করুন বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

কর্মীদের উদ্দেশ্যে এখন আমি কিছু কথা উপস্থাপন করব যাতে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হয় যে, অতিথিসেবার বিষয়ে আমাদের কাছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রত্যাশা কী! এখানে একটি বিষয় আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, জলসায় আগত প্রত্যেক ব্যক্তি যেভাবে সকল কর্মীর দৃষ্টিতে অতিথির মর্যাদা রাখেন, অনুরূপভাবে গোটা যুক্তরাজ্য জামা'তের কাছে অন্যান্য দেশ থেকে আগত সকল আহমদীও অতিথির মর্যাদা রাখেন। অতএব যদি এমন কোনো পরিস্থিতি দেখা দেয় যেখানে আপনাকে কিছুটা কষ্ট স্বীকার করতে হয় তাহলে সেখানে ভিনদেশী এবং বহিরাগত অতিথিদের জন্য ইউকে-র স্থানীয়রা যেন ত্যাগস্বীকার করেন।

এ বিষয়ে একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসেন। তিনি (সা.) তাঁর সহধর্মিণীদের নিকট (আপ্যায়নের জন্য) সংবাদ পাঠান। তাঁর (সা.) স্ত্রীরা বললেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের (রা.) উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের মাঝে কে আছে যে এই অতিথির খাবারের ব্যবস্থা করবে? একজন আনসারী নিবেদন করেন, হুযূর! আমি ব্যবস্থা করছি। অতঃপর সেই ব্যক্তি সেই অতিথিকে সাথে নিয়ে তার বাড়িতে যান এবং স্ত্রীকে বলেন, মহানবী (সা.)-এর অতিথি এসেছেন, আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো। উত্তরে স্ত্রী বললেন, ঘরে তো কেবল বাচ্চাদের জন্য কিছু খাবার রয়েছে। সেই আনসারী বলেন, খাবার প্রস্তুত করো তারপর প্রদীপ জ্বালাও এবং বাচ্চাদের খাবারের সময় হলে তাদেরকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিও। সেই মহিলা খাবার প্রস্তুত করলেন, প্রদীপ জ্বালালেন এবং সন্তানদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। তারপর প্রদীপ ঠিক করার ছুতোয় তিনি উঠে গিয়ে তা নিভিয়ে দিলেন। এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অতিথির সাথে বাহ্যত খাবার খাওয়ার শব্দ করতে থাকেন আর টাক মারতে থাকেন যাতে অতিথি মনে করেন যে, মেযবানও আমার সাথে বসে খাবার খাচ্ছেন। এভাবে অতিথি পেটভরে আহার করেন আর তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে সেই আনসারী সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হলে মহানবী (সা.) বলেন, তোমার রাতের কাজ (অর্থাৎ আতিথেয়তা) দেখে আল্লাহ্ তা'লাও হেসেছেন। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ **নিজেরা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়। প্রবৃত্তিতে নিহিত**

কার্পণ্য থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয় তারাই সফলতা অর্জনকারী। (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব কৃওলুল্লাহ বাব ওয়া ইউ'সিরূনা আলা আনফুসিহিম ...)

এখন দেখুন, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সেই পরিবারের ত্যাগ এতটাই মহান ছিল যে, তিনি আনন্দিত হয়ে তাঁর প্রিয় নবী (সা.)-কেও এই খবর জানিয়ে দিলেন। অতএব এটি অতিথিসেবার সেই মানদণ্ড যা ইসলামী সমাজে দৃশ্যমান হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী সমাজে তা লক্ষ করা যায়। কিন্তু যেহেতু স্মরণ করানো এবং নসীহত করারও নির্দেশ রয়েছে, তাই স্মরণ করানো হয়ে থাকে।

এখন আমি আরো কিছু হাদীসের আলোকে মেহমান এবং মেযবান উভয়কে তাদের দায়দায়িত্বের কথা স্মরণ করাবো। হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.)-এর বরাতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখে, সে হয় উত্তম কথা বলবে, নতুবা চুপ থাকবে। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখে, তার উচিত স্বীয় প্রতিবেশীকে সম্মান করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর ঈমান আনয়ন করে, সে যেন নিজের মেহমানকে সম্মান করে। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব আল হাস্সু আলা ইকরাম ....)

এখানে তিনটি কথা বলা হয়েছে। প্রথম দুটি কথা মেযবান এবং জলসায় আগত মেহমান উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু তৃতীয় কথাটি কেবল মেযবানের জন্য প্রযোজ্য যা আমি সংক্ষেপে বলছি। তিনি (সা.) বলেন, ভালো কথা বলো অথবা চুপ থাকো। মেহমানরাও যদি কোথাও কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করেন, তবে নম্রভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। কোনো রাগ করার প্রয়োজন নেই। বিশাল আয়োজন হবার কারণে কমবেশি ত্রুটিবিচ্যুতি থেকেই যায়, তা সহ্য করা উচিত। ভুলগুলো উপেক্ষা করা উচিত। ক্রোধ দমন করা পুণ্যের কাজ। একইভাবে কর্মীরাও যদি মেহমানদের রাগান্বিত হতে দেখেন তাহলে অতি নম্রতার সাথে ক্ষমা চেয়ে কষ্ট দূর করার চেষ্টা করুন, কিন্তু স্মরণ রাখুন! মেহমানদের সাথে কঠোর বাক্য বিনিময় করবেন না।

অতঃপর (রয়েছে) প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এখানে এই পরিবেশে যারাই কিছুদিনের জন্য অতিথি হিসেবে আসছেন এবং অস্থায়ী আবাসনে একসাথে অবস্থান করেন তারা একে অপরের প্রতিবেশী হয়ে যায়। বিশাল পরিসরে অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা হবার কারণে যেভাবে আমি বলেছি, সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব কোনো ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি যদি থেকেও যায় উদাহরণস্বরূপ- একত্রে থাকতে গেলে খাবারের সময় কিংবা সকালে গোসলখানায় টয়লেট স্বল্পসংখ্যক হবার কারণে বা এ ধরনের অন্য কোনো বিষয়ে যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়ে যায় তবে অতিথিরা একে অপরের প্রতিবেশি হিসেবে পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন ও যথাযথ মর্যাদা প্রদান করুন। কেউ যদি কোনো ধরনের বাড়াবাড়িও করে, অভিযোগ-অনুযোগ করবেন না। অতএব যেখানে মেযবানদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করবেন সেখানে নিজের সহকর্মীদের সাথেও সম্মানজনক ব্যবহার করুন। পারস্পরিক ভালোবাসার সাথে সকল কাজ এবং দায়িত্ব সম্পাদন করুন।

তৃতীয় কথাটি কর্মীদের জন্য অবশ্যপালনীয়। পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, আগতরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমান। ছোটো, বড়ো, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার সাথে সমান ব্যবহার করুন। তাদেরকে সম্মান করুন এবং ব্যবস্থাপনা যতটা অনুমতি দেয় তাদের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করুন। যদি না করতে পারেন তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট সে বার্তা পৌঁছান। কিন্তু মেহমানদের সাথে সর্বাবস্থায় শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ এবং সুন্দরভাবে কথা বলার বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে উত্তম? তিনি (সা.) বলেন, (অভাবীদের) আহার করাও এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দাও। (বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব ওয়া ইতয়ামি মিনাল ইসলাম)

এই হাদীসে একটি আকর্ষণীয় সমাজের চিত্র অঙ্কন করে বলা হয়েছে, আহার করাও। দ্বিতীয়টি হলো, পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সালাম দাও। অতএব জলসার দিনগুলোতে যেখানে একটি ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজ করবে আর দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে, সেখানে মেহমান এবং মেযবান প্রত্যেকেরই সালামের অভ্যাস রপ্ত করা উচিত। ফলে এই তিন দিনে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ এতটাই দৃঢ় হবে যে, এর প্রভাব পরবর্তীতেও দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইনশাআল্লাহ্। দ্বিতীয়ত, কর্মীদের জন্যও এতে উপকারিতা রয়েছে কেননা অত্যধিক কাজ ও বিশ্রামের ঘাটতির কারণে তাদের প্রকৃতিতে অনেক সময় রুক্ষতা ও রূঢ়তা দেখা দেয়, এমন পরিস্থিতিতে তারা যখন একে অপরকে সালাম দেবে তখন তাদের প্রকৃতিতেও নম্রতা সৃষ্টি হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আরো একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু যার গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেন, ভাইয়ের সামনে তোমার হাসিমুখে থাকা তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করাও তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। পথহারাদের পথ দেখানোও তোমার জন্য সদকাস্বরূপ এবং কোনো অন্ধকে রাস্তায় চলতে সাহায্য করাও তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। আবার পাথর, কাঁটা কিংবা হাড়গোড় রাস্তা হতে অপসারণও তোমার জন্য সদকারূপে পরিগণ্য হবে এবং নিজের ঝুলি থেকে স্বীয় ভাইয়ের ঝুলিতে কিছু ঢেলে দেওয়াও তোমার জন্য সদকা (হিসেবে পরিগণিত হবে)। (জামে তিরমিযী)

মোটের ওপর প্রত্যেক আহমদীর এ হাদীসে বর্ণিত নির্দেশাবলি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন যেন একটি সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে। জলসার তিন দিনে যেন অবশ্যই এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, কেননা এর ফলেও তরবিয়তের পথ সুগম হয়। প্রথমে তিনি (সা.) বলেন, হাসি মুখে থেকো। হাস্যবদনে থাকার ফলে তোমাদের কোনো ক্ষতি তো হবে না। পরস্পর হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করো। কোনো মনোমালিন্য যদি থাকে তবে এই তিন দিন হাসিখুশি থাকার মাধ্যমে তা দূর করো। দ্বিতীয় কথা হলো, পুণ্যকর্মসমূহ বিস্তৃত করো, পুণ্যকর্মের নসীহত করো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ। এটি জলসার একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সুতরাং যারা জলসার উদ্দেশ্যে এসেছেন, তারা এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি

না করে জলসার অনুষ্ঠানমালা থেকে পুরো কল্যাণ লুফে নিন, পুরো মনোযোগের সাথে এতে অংশগ্রহণ করুন। এছাড়া রয়েছে খিদমতে খালক বা সেবা প্রদানের কাজ। খিদমতে খালক (অর্থাৎ সৃষ্টিসেবা)-এর জন্য নির্ধারিত কর্মীরাই যে কেবল এই কাজ করবে, তা আবশ্যকীয় নয়। কারো যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে, পথ দেখানোর প্রয়োজন হয়, তবে সকল কর্মীরই এ দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। রাস্তা পরিষ্কার রাখার আদেশ রয়েছে; জলসার দিনগুলোতে মাঠ এবং জলসাগাহকে ছোটো-বড়ো সবাই নোংরা করে তোলে। তাই এগুলো পরিষ্কার করার দায়িত্বে কে আছে সেটি না ভেবে পথ পরিষ্কার করার পাশাপাশি যেখানেই আবর্জনা দেখতে পান, তা তুলে ডাস্টবিন কিংবা ময়লা ফেলার পাত্রে ফেলুন। মেহমান এবং মেযবান উভয়েই এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। অর্থাৎ এটি কেবল কর্মী কিংবা মেযবানদের কাজ নয় বরং জলসায় যোগদানকারী কারো চোখে যদি আবর্জনা পড়ে বা যারাই তা দেখবেন– সেগুলোকে পরিষ্কার করুন। কোনো পাত্র, গ্লাস বা মোড়ক জাতীয় কিছু পড়ে থাকলে তৎক্ষণাৎ তা তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিন।

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু শোরাইহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে, তার জন্য মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এক দিন এক রাত মেহমানের সেবা তার জন্য পুরস্কার বলে গণ্য হবে আর আতিথেয়তা হবে তিন দিন পর্যন্ত। এরপর তার (অতিথিসেবা) সদকা বলে গণ্য হবে। এ কারণে তিন দিনের বেশি তার (অর্থাৎ মেযবানের) ঘরে অবস্থান করা ও তাকে কষ্ট দেওয়া তার (অর্থাৎ অতিথির) জন্য সমীচীন নয়। (আবু দাউদ, কিতাবুল আতয়ামাহ্, বাব মা জাআ ফিয্ যিয়াফাতে)

এখানে যেহেতু দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা এসে থাকে তাই যতদিন থাকতে পারে থাকার চেষ্টা থাকে, কিন্তু যদি আপনারা জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে অবস্থান করে থাকেন তাহলে জলসা শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত চলে যাবার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য, কর্মী তথা মেযবানদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো, যতদিন জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে মেহমানদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা রয়েছে ততদিন পূর্বের মতোই তাদেরকে হাসিমুখে অতিথিসেবা করতে থাকা। এটি হওয়া উচিত নয় যে, একদিকে জলসা শেষ হলো আর অপরদিকে দায়িত্বরত কর্মীরাও উধাও হয়ে গেল। অনেক সময় জানা যায় না যে, কর্মী কোথায়; যার ফলে ব্যবস্থাপনাকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। অতএব যারাই ডিউটি দেবেন, পূর্ণ শ্রম এবং সততার সাথে দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সামর্থ্য দিন। কিন্তু এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে দেই, যে-সব মেহমান তাদের আত্মীয়স্বজনদের বাসায় অবস্থান করে থাকেন, তাদের সাথে নিকটাত্মীয়সুলভ ব্যবহার করা আবশ্যক হবে। তাই আত্মীয়স্বজনদের বাসায় যে-সব মেহমান অবস্থান করবেন তাদের যথাযথভাবে আতিথেয়তা করুন।

সহীহ্ মুসলিম-এর একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, ছোটো পুণ্যকেও তুচ্ছজ্ঞান কোরো না, তা ভাইয়ের সাথে

হাসিমুখে কথা বলার মতো পুণ্যকর্মই হোক না কেন। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ্, বাব ইসতিহাবু তালাকাতিল ওয়াজহি ইনদাল্ লিকাআ)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিসেবা কেমন ছিল সেদিকে আমরা এখন দৃষ্টি দেবো।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তার চিত্র হলো, প্রথম দিকে যখন খুব বেশি মেহমান আসত না আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্বাস্থ্য তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল, তখন তিনি (আ.) প্রায় সময় মেহমানের সাথে ঘরের পুরুষদের জন্য নির্ধারিত অংশে বসে খাবার খেতেন। খাবারের সময় সেখানে সকল প্রকারের অকৃত্রিম আলাপচারিতা চলত আর বাহ্যিক খাবারের সাথে জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক খাবারের দস্তরখানাও লেগে যেত। এমন সময়ে তিনি (আ.) সচরাচর ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মেহমানের যত্ন নিতেন আর দৃষ্টি রাখতেন যে, দস্তরখানায় একাধিক খাবার পরিবেশিত হলে প্রতিটি খাবার যেন প্রত্যেকের সামনে পৌঁছে। সাধারণত অতিথি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন যে, কোনো বিশেষ জিনিস যেমন- দুধ, চা অথবা লাচ্ছি কিংবা পান খাবার অভ্যাস আছে কিনা। যতদূর সম্ভব প্রত্যেকের জন্য তাদের অভ্যাস অনুযায়ী জিনিস সরবরাহ করতেন। কোনো মেহমানের আচার খাবার শখ রয়েছে বলে তাঁর জানা থাকলে আর দস্তরখানায় আচার না থাকলে, তিনি (আ.) খাবারের মাঝে উঠে অন্দরমহলে গিয়ে ঘর থেকে আচার এনে তার সামনে রেখে দিতেন। তিনি যেহেতু খুব অল্প পরিমাণ খাবার খেতেন তাই দ্রুত তাঁর পেট ভরে যেত কিন্তু তাঁর চাহিদা মিটে যাবার পরও তিনি (আ.) রুটির ছোটো ছোটো টুকরো উঠিয়ে মুখে নিতেন যাতে কোনো মেহমান তাঁর (আ.) খাওয়া শেষ হয়ে গেছে দেখে দস্তরখানা থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উঠে না যায়। (সীরাতে তাইয়্যেবা, পৃ. ১১৩)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শাখা হলো, অতিথি ও অভ্যাগত আর সত্যের অন্বেষণে সফরকারী ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিবর্গ, যারা এ স্বর্গীয় ব্যবস্থার সংবাদ পেয়ে স্ব স্ব উদ্দেশ্যে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সাক্ষাতের জন্য এসে থাকেন। এ শাখাও দিন দিন প্রসার লাভ করছে। কোনো কোনো সময় লোক কিছু কম হলেও কখনো কখনো অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে লোক আসতে দেখা যায়। যেমন- এ সাত বছরে ষাট হাজারের অধিক অতিথি এসে থাকবেন। এসব অতিথির মাঝে সোচ্চার ব্যক্তিদের বক্তৃতা বা নসীহতের মাধ্যমে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করা হয়েছে, তাদের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এবং তাদের দুর্বলতা দূর করা হয়েছে, তা খোদা তা'লাই অবগত আছেন। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই, প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তরে যে মৌখিক বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া হয়ে থাকে কিংবা স্থানকালপাত্রভেদে নিজের পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয়ে থাকে তা কোনো কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশনার তুলনায় অধিক কল্যাণকর, কার্যকরী ও দ্রুত হৃদয়গ্রাহী প্রমাণিত হয়েছে।" (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১৪-১৫)

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিসেবার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যথারীতি

অতিথিদের মনজয়ের আয়োজন করতেন। যতদিন পর্যন্ত অতিথি সংখ্যায় কম আসত, ততদিন তিনি (আ.) নিজে তাদের খাবার-দাবার এবং আবাসন প্রভৃতির ব্যবস্থা করতেন। অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া আরম্ভ হলে হাফেয হামেদ আলী সাহেব, মিয়াঁ নিযাম দ্বীন সাহেব প্রমুখ সেবকদের গুরুত্ব সহকারে বলতেন, অতিথিদের যেন কোনো প্রকারের কষ্ট না হয়, তাদের সমস্ত চাহিদা, পানাহার এবং আবাসনের বিষয়ে যত্নবান থাকবে। কতককে তোমরা চেনো আর কেউ কেউ হবে অপরিচিত। তাই সবাইকে সম্মানিত মনে করে তাদের সেবাযত্ন করো। শীতের মৌসুমে তিনি (আ.) বলতেন, অতিথিদের চা পান করাও। তাদের সকলের ভালোভাবে যত্ন নাও। কারো যদি পৃথক কক্ষের কিংবা বাড়ির প্রয়োজন হয় তবে সেটির ব্যবস্থা করো। কারো যদি ঠান্ডা লাগার ভয় থাকে তবে তার জন্য কাঠ কিংবা কয়লার ব্যবস্থা করো। [যিকরে হাবীব, হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.), পৃ. ১৯৫]

একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন, "লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপককে গুরুত্ব সহকারে বলা উচিত যে, তিনি যেন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনকে দৃষ্টিপটে রাখেন। কিন্তু যেহেতু তিনি একা এবং কাজের চাপ রয়েছে, তাই হয়ত তার মনে থাকবে না। এমনটি হলে অন্য কেউ যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কারো ময়লা কাপড়চোপড় দেখে তার সেবাযত্ন করা থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া উচিত নয়, কেননা অতিথি সবাই সমান। যারা নতুন এবং স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত তাদের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হলো, প্রত্যেকের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখা। অনেক সময় এক ব্যক্তি এটিই জানেন না যে, টয়লেট কোন দিকে যার ফলে তার অনেক কষ্ট পোহাতে হয়। এ কারণে অতিথিদের চাহিদার দিকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। আমি তো অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকি, যে কারণে অপারগ, কিন্তু যাদেরকে এমন কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তাদের জন্য আবশ্যক হলো, কোনো ধরনের অভিযোগের সুযোগ না দেওয়া। (আল-হাকাম পত্রিকা, ২৪ নভেম্বর ১৯০৪, পৃ. ১-২; মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ১৭০)

হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মাগরিবের নামাযের পর কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকের ছাদে কতক অতিথির সাথে খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্যে বসেছিলেন। সে সময় লুধিয়ানা নিবাসী এক আহমদী বন্ধু মিয়াঁ নিযাম দ্বীন সাহেব, যিনি ছিলেন নিতান্তই দরিদ্র আর যার কাপড়চোপড়ও ছিল পুরাতন ও ছেঁড়াফাটা; তিনি হুযূর থেকে চার-পাঁচ ব্যক্তির পেছনে ছিলেন। ইতোমধ্যে একে একে কয়েকজন সম্মানিত মেহমান এসে হুযূর (আ.)-এর কাছে বসতে থাকেন আর তাদের কারণে বার বার মিয়াঁ নিযাম দ্বীন সাহেবকে পেছনে সরতে হয় এবং সরতে সরতে তিনি শেষ পর্যন্ত জুতা রাখার জায়গায় চলে গেলেন। এর মধ্যে খাবার পরিবেশন করা হলো। হুযূর (আ.) যিনি এ পুরো দৃশ্য লক্ষ করছিলেন, তিনি (আ.) একটি তরকারির বাটি এবং কিছু রুটি হাতে তুলে নিলেন আর মিয়াঁ নিযাম দ্বীনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আসো মিয়াঁ নিযাম দ্বীন! তুমি আর আমি ভেতরে বসে খাবার খাই।" এটি বলে হুযূর (আ.) মসজিদের পাশের কক্ষে চলে গেলেন এবং মিয়াঁ নিযাম দ্বীন সাহেব ও হুযূর কামরার ভেতর একসাথে একই বাটিতে খাবার খেলেন। সে সময় মিয়াঁ নিযাম দ্বীন সাহেব খুশিতে আত্মহারা হয়ে

গিয়েছিলেন আর যারা মিয়াঁ নিযাম দ্বীন-কে কার্যত ঠেলতে ঠেলতে দূরে সরিয়ে নিজেরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকটে বসে গিয়েছিল তাদের মাথা লজ্জায় হেট হয়ে গেল। [সীরাতে তাইয়্যেবা, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.), পৃ. ১৮৮]

আবার হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "১৯০১ সালে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আমি যখন কাদিয়ান হিজরত করি ... তখনকার এক রাতের ঘটনা। কতক মেহমান এসে উপস্থিত হলেন যাদের থাকার জায়গা নিয়ে হযরত উম্মুল মু'মিনীন চিন্তিত হয়ে পড়লেন কেননা ঘর পুরোটাই নৌকার ন্যায় মানুষে ভর্তি, তাদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হবে? সে সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথির সম্মানের কথা স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত আম্মাজানকে পাখিদের একটি গল্প শুনান। আমি যেহেতু একেবারে পাশের কক্ষে ছিলাম আর দরজাগুলো ছিল পুরোনো ধাঁচের, যার ভেতর থেকে শব্দ সহজে অন্য পাশ থেকে শোনা যাচ্ছিল, এ কারণে আমি পুরো কাহিনি শুনেছি। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! একবার বনের মধ্যে এক মুসাফিরের রাত হয়ে যায়। অন্ধকার রাত ছিল। নিকটে কোনো বসতি দেখতে না পেয়ে অগত্যা সে একটি গাছের তলায় রাত কাটানোর জন্য বসে পড়ল। সেই গাছে একটি পাখির বাসা ছিল। নর পাখিটি মাদি পাখিটিকে বলল, দেখো! যে মুসাফির আমাদের বাসার নীচে মাটিতে এসে বসেছে সে আজ রাতে আমাদের অতিথি, তাই আমাদের কর্তব্য হলো তার আতিথেয়তা করা। মাদি পাখিটি তার সাথে একমত পোষণ করল এবং উভয়ে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, শীতের রাতে আমাদের অতিথির আগুন পোহানোর প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আমাদের কাছে তো কিছুই নেই, তাই আমরা আমাদের বাসাটি ভেঙে নীচে ফেলে দেই যাতে সে এই খড়িগুলিকে পুড়িয়ে আগুন পোহাতে পারে। তারা এমনটিই করল এবং পুরো বাসার সমস্ত খড়কুটো নীচে ফেলে দিল। সেই মুসাফির সেটিকে সুযোগ মনে করে সমস্ত ডাল ও খড়কুটো একত্রিত করে আগুন জ্বালালো আর তাপ পোহালো। তখন গাছের ওপরের সেই পাখি জুটি আবার পরামর্শ করল যে, আগুনের ব্যবস্থা তো আমরা আমাদের অতিথির জন্য করলাম এবং তার উষ্ণতার ব্যবস্থা করলাম, এখন তো তার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থাও আমাদের করা উচিত। কিন্তু আমাদের কাছে তো তেমন কিছুই নেই! তাই আমরা নিজেরাই এই আগুনে গিয়ে ঝাপ দেই যাতে মুসাফির আমাদেরকে পুড়িয়ে আমাদের মাংস খেতে পারে। অতএব সেই পাখিরা এমনটিই করল এবং যথাযথভাবে অতিথিসেবা করল।" [যিকরে হাবীব, পৃ. ৮৫-৮৭, লেখক: হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)]

অতএব এটিই হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তার রীতি ও পদ্ধতি আর এমনটিই আমাদের কাছে প্রত্যাশা। খোদার মসীহ্ আমাদের নিকট ঘরবাড়ির কুরবানীও চাচ্ছেন না আবার প্রাণের কুরবানীও দিতে বলছে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের জন্য আমাদের কেবল কিছুটা সময় এবং কিছুটা আরাম বিসর্জন দিতে হবে। এতটুকু ত্যাগস্বীকার করলেই আপনারা এবং কর্মীরা তাঁর (আ.) আগমনের উদ্দেশ্য পূরণকারী বলে গণ্য হবেন। আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মীকে পূর্বের চেয়ে অধিক অতিথিসেবার সামর্থ্য দান করুন।

এখন মেযবান এবং মেহমান উভয়ের জন্য প্রশাসনিক ও শিক্ষামূলক কিছু নির্দেশনা রয়েছে। আমি সেগুলো আপনাদের বলে দিচ্ছি। সকল বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে এই নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করুন।

প্রথমটি হলো, মসজিদ এবং মসজিদ সন্নিবেশিত স্থানসমূহের পবিত্রতার বিষয়ে যত্নবান হোন। জলসা সালানার দিনগুলিতে সকল ব্যবস্থা ইসলামাবাদেই থাকবে। কাজেই জলসার জন্য যে তাঁবু খাটানো হয় তাতেই নামায হবে। এ কারণে এখনকার মতো এটিকে মসজিদের মর্যাদাই দিতে হবে আর এর পবিত্রতার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

এছাড়া জলসার দিনগুলো বিশেষভাবে খোদার স্মরণ ও দরূদের মাঝে অতিবাহিত করুন আর নামায প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি সচেষ্ট হোন। এত দূর থেকে অতিথিরা এসেছেন! যদি নামায না পড়েন এবং এতে প্রতিষ্ঠিত না হন, তাহলে কোনো লাভ নেই। একইভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য জ্ঞাতব্য হলো, লঙ্গরখানা কিংবা এমন কোনো ডিউটির স্থান যেখান থেকে তাদের এদিক-সেদিক যাওয়া অসম্ভব সেসব স্থানে নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখা। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হলো, এ মর্মে ব্যবস্থা নেওয়া।

ইংল্যান্ডের আহমদীদের উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই জলসায় অংশগ্রহণ করা উচিত। এটি আপনাদের বার্ষিক জলসা। বিশেষ কোনো অপারগতা না থাকলে কেউ অনুপস্থিত থাকবেন না। কিছু লোক তিন দিনের পরিবর্তে কেবল দুই দিন কিংবা এক দিনের জন্য এসে থাকেন আর জলসার মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হবার পরিবর্তে সবার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করাটাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অথচ জলসার কল্যাণরাজি যদি দৃষ্টিপটে রাখা হয়, তাহলে তিন দিনই উপস্থিত থাকা উচিত। আমার বক্তৃতা ও জলসার অন্যান্য অনুষ্ঠান যতটা সম্ভব পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এবং নীরবতার সাথে শুনুন। সময়ের মর্যাদা বুঝুন আর কোনোক্রমেই একে হেলায় নষ্ট করবেন না।

নামাযের সময় কখনো কখনো শিশুরা কেঁদে ওঠে যার ফলে কিছু লোকের নামাযে মনোযোগে ভাটা পড়ে বা মনোযোগ নষ্ট হয় কিংবা নামাযের সাথে যে সম্পর্ক ছিল তা বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এমতাবস্থায় বাচ্চা যদি পিতা কিংবা মাতার কাছে থাকে তবে পিতামাতার উচিত তাদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়া। বাচ্চাদের হট্টগোল কিংবা কান্নার কারণে সমস্ত নামাযীর নামায নষ্ট হবার চেয়ে তার একার নামায নষ্ট হওয়াই শ্রেয়। একইভাবে বাচ্চা যদি একেবারেই শিশু বয়সের হয় আর তারা মা কিংবা বাবার কাছে থাকে এমতাবস্থায় বাবারা প্রথম সারিতে বসার চেষ্টা করবেন না, বরং পেছনে গিয়ে বসুন যেন প্রয়োজনে সহজেই বের হয়ে যেতে পারেন।

একইভাবে নামাযের সময় নিজেদের মোবাইল ফোনও বন্ধ রাখুন। কিছু মানুষের নামাযে ফোন নিয়ে আসার অভ্যাস রয়েছে। রিংটোন বাজা শুরু হলে নামায থেকে মনোযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জলসার বক্তৃতা চলাকালে মায়েরা নিজেদের বাচ্চাদের নীরব রাখার বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন; এক্ষেত্রে আপনাদের জন্য উত্তম হবে পেছনে বসা।

অযথা কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। পরস্পর কথা বলতে হলে নীচুস্বরে এবং ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে কথা বলুন। তিক্ত বাক্য বিনিময় পরিহার করে চলুন। আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, একে অপরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন এবং কোনো প্রকারের তিক্ততা সৃষ্টি হতে দেওয়া যাবে না। মেহমান ও মেযবানদের মাঝেও নয় আর মেযবানদের পরস্পরের মধ্যেও নয়। যাহোক, কোনো অবস্থাতেই যেন তিক্ততা সৃষ্টি না হয়। বরং একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ যেন বজায় থাকে যা প্রত্যেকের চোখে পড়ে। আবার কিছু লোক অভ্যাসবশত তুইতোকারি করে চিৎকার করে কথা বলতে থাকে কিংবা দলবেধে বসে অট্টহাসিতে মেতে ওঠে। এই তিন দিনে যতটা সম্ভব এসব জিনিস থেকে দূরে থাকুন বরং পুরোপুরি এসব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। এমনিতেও এগুলো কোনো ভালো অভ্যাস নয়।

এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মানুষ এখানে এসে থাকে। কেউ কানে খাটো আবার কেউ ভাষা বোঝেন না। একজন মানুষ কখনো তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলে বা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসে, যার ফলে বিনা কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব এসব এড়িয়ে চলা উচিত এবং এসব থেকে দূরে থাকা উচিত।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হলো, জলসা চলাকালীন সময়ে বাজারও বন্ধ থাকবে। সুতরাং অতিথিরা স্মরণ রাখবেন, যারা দোকান বসিয়েছেন কিংবা স্টল দিয়েছেন তাদেরকে কোনো কারণ ছাড়া দোকান খুলতে বাধ্য করবেন না বা আপনি সেখানে বসে থাকবেন না। একান্ত প্রয়োজনে কিছু জিনিস বিক্রি করা যেতে পারে, কিন্তু কতটা অনুমতি দেওয়া যায় তা ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখবে।

এছাড়া ইসলামাবাদের পরিবেশে সরু রাস্তায় সাবধানে চলাচল করুন এবং হইচই করা থেকে বিরত থাকুন। বহিরাগতদের জন্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, আপনারা মনে করবেন না যে, আশপাশে কোনো বসতি নেই। বসতি কমবেশি থেকেই থাকে, তাই অযথা শোরগোল করা উচিত নয়।

গাড়ি পার্কিংয়ের বিষয়ে স্মরণ রাখবেন, মসজিদ ফযলের রাস্তায় বা ইসলামাবাদে মানুষের বাড়ির সামনে কিংবা নিষিদ্ধ স্থানে পার্কিং করবেন না।

ট্রাফিক আইনকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন এবং জলসাগাহে পার্কিং বিভাগের ব্যবস্থাপকদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। এখানে অবস্থানকালে দেশের অন্যান্য আইনকানুন রক্ষা করুন এবং মেনে চলুন। বিশেষ করে ভিসার মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে অবশ্যই ফেরত যাবেন। যে-সব বন্ধু জলসা সালানায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ভিসা নিয়ে এখানে এসেছেন তাদেরকে সর্বাবস্থায় এটি মেনে চলতে হবে।

তারপর রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়মকানুন। টয়লেটের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন থাকুন। স্মরণ রাখুন! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। মহিলাদের জন্য নির্দেশনা হলো, আপনারা ঘোরাফেরার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন এবং দৃষ্টি সংযত

রাখুন। কিন্তু যে-সব মহিলা আহমদী নন এবং যারা এতটা নিয়ম মেনে পর্দা করে না তাদেরকে কেবল পর্দার কথা স্মরণ করানোই যথেষ্ট হবে। কোনোক্রমেই বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই আর তা উচিতও নয়। কোনো কারণে যদি কোনো আহমদী মহিলারও নিকাব পরতে অসুবিধা থাকে তবে সে মহিলার সাজগোজ করা উচিত হবে না। সাদামাটা চলাফেরা করুন, সাজগোজ করা সমীচীন নয়। মাথা ঢাকার অভ্যাসকে উত্তমরূপে প্রচলিত করুন। মহিলাদের পক্ষ থেকে এমন একটি পরিবেশ দৃশ্যমান হওয়া উচিত যাতে বুঝা যায় যে, আমরা একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশে এই দিনগুলি অতিবাহিত করছি। পর্দা না করার জন্য কোনো খোঁড়া যুক্তি খোঁজা উচিত নয়। বাধ্যবাধকতা থাকলেও যতদূর সম্ভব হিজাব নেওয়া উচিত আর এটি আদেশও বটে।

স্থানীয় লোকদের জন্য একটি নির্দেশনা রয়েছে আর তা হলো, কোনো কোনো সময় অতিথিদেরকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবার বিনিময়ে কেউ কেউ টাকা নিয়ে থাকেন, যদিও সচরাচর এটি হয় না বা মাঝেমধ্যে এটি ঘটে থাকে। অতিথিসেবার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি তাদের পরিহার করা উচিত।

অতঃপর মেহমানদের সম্মান, মর্যাদা ও তাদের সেবা করাকে নিজেদের পরিচয় বানিয়ে নিন আর ভালোবাসা, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ এবং কুরবানীর প্রেরণা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে তাদের সেবা করুন। হাদীসের বরাতে এটি পূর্বেও আমি বলে এসেছি। মেহমানদের সাথে কর্মীদের কোমল কণ্ঠে এবং প্রফুল্লচিত্তে কথা বলা উচিত। এ সম্পর্কে পূর্বেও আমি হাদীসের বরাতে কথা বলেছি।

শৃঙ্খলার বিষয়ে যত্নবান থাকুন, জলসার ব্যবস্থাপকদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করুন। এটিও পরিলক্ষিত হয় যে, এই দিনগুলোতে প্রচুর খাবার নষ্ট হয়ে থাকে। খাবার-সংক্রান্ত শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো যতটুকু প্লেটে নেবেন, এর পুরোটাই শেষ করুন। কোনো কিছু নষ্ট হওয়া উচিত নয়। লোভের বশে অকারণে নিজের পাত্রে খাবার বেশি নিয়ে নিলেন কিংবা আরেকজনের দেখাদেখি নিয়ে নিলেন, এমনটি করবেন না। নিজেদের সন্তানদেরকেও এই উপদেশ দিন যে, এমন কোনো আচরণ প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয় যার মন্দ প্রভাব অন্যের ওপর পড়তে পারে। এটিও দেখা যায়, খাবার নষ্ট হবার বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মীদের কোনো দোষ থাকে না বরং যে খাবার নিচ্ছে তার দোষ হয়ে থাকে। আমি পূর্বে যেভাবে বলেছি, ততটুকুই নিন যতটুকু আপনারা শেষ করতে পারবেন। কিন্তু কর্মীদের জন্য সর্বপরিস্থিতিতে নির্দেশ হলো, কেউ যদি বলে যে, আরো দাও এবং বেশি নিয়ে নেয় তবে তাকে নম্রভাবে বুঝান। কঠোরভাবে কোনো অতিথিকে বারণ করা কোনো কর্মীর জন্য সংগত নয়। ভালোবাসার সাথে বলতে পারেন যে, শেষ হয়ে গেলে পুনরায় এসে নিয়ে যাবেন।

পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ইতিপূর্বেও আমি বলেছিলাম। গোসলখানার পরিচ্ছন্নতা বা সার্বিকভাবে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিন। আপনারা যেখানে খাবার খেয়ে থাকেন, কিছু লোক খাবার খেয়ে খালি প্লেট ডাস্টবিনে না ফেলে সেখানেই রেখে চলে যান। এটি নিতান্তই সাধারণ একটি বিষয়। কিন্তু এর ফলে একে তো কর্মীদের কাজ বেড়ে যায় অথচ সেই

সময়ে তারা অন্য কোনো কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়ত আবর্জনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনিতেও বলা আছে যে, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। যাহোক, যেভাবে পূর্বে আমি বলেছিলাম, রাস্তা, মাঠ এবং জলসাগাহ পরিষ্কার রাখুন। এককথায় পুরো পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজন রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন। এখানকার পরিবেশে বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে অনেক দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। অতএব বিনা কারণে ব্যবস্থাপনাকে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ দেবেন না এবং ভালোভাবে একথা মস্তিষ্কে গেঁথে নিন, যে-কোনো মূল্যে আপনাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, এটি জামা'তী জলসা, জাগতিক কোনো মেলা নয় এবং মেলা মনে করে এতে অংশ নেওয়া উচিতও নয়। কেবল পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ, কেনাকাটা কিংবা ফ্যাশন করা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। অনেক সময় মহিলাদের মাঝে এটি দেখা গিয়েছে যে, তারা একত্রিত হলেন, কথাবার্তা বললেন, আর সব শেষ। কিন্তু কী বিষয়ে বক্তৃতা হলো, কী বলা হলো এবং কী ধরনের তরবিয়তী অনুষ্ঠানমালা ছিল তারা এর কিছুই বলতে পারেন না। তাই ব্যবস্থাপনা এ বিষয়টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযোগ আসে যে, জলসায় এই এই অব্যবস্থাপনা ছিল। অতএব আমাদের আহমদী পরিবেশে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই জলসা হচ্ছে সেখানে এ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা হাতে নেওয়া উচিত যে, মহিলারা এবং বাচ্চারা উভয়ে যেন শান্তভাবে বসে জলসা শোনেন এবং এ থেকে পুরোপুরি কল্যাণমণ্ডিত হবার চেষ্টা করেন।

কখনো কখনো এ অভিযোগও আসে যে, বাইরে থেকে আগতরা এখানে এসে নিজেদের প্রিয়জন, ঘনিষ্ঠজন এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কেনাকাটার জন্য ঋণ করা শুরু করেছেন। এটিও কৃচ্ছ্রতার পরিপন্থি কথা। এটি এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার সামর্থ্য যতটুকু রয়েছে, ততটুকুই খরচ করা উচিত। কেনাকাটার উদ্দেশ্যে কেউ তো এখানে আসে নি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন তা হলো, জলসা সালানা। নিজের শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আসেন। তাই সেই আধ্যাত্মিক খাবার থেকে কল্যাণ লাভ করার চেষ্টা করুন এবং জাগতিকতাকে পরিহার করুন।

অতিথিসেবার কথা বলতে গিয়ে আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছিলাম, তিন দিনের আতিথেয়তা তো করতেই হবে কিন্তু যারা নিজেদের প্রিয়জন এবং আত্মীয়স্বজনদের বাসায় অবস্থান করেন, তারা যদি তাদেরকে সাগ্রহে থাকতে দেন তবে সেটি মোটেও (সাধারণ) আতিথেয়তা নয় বরং নিকটাত্মীয়দের প্রাপ্য বইকি। তাদেরকে যতদিন রাখতে পারেন, রাখুন। ব্যবস্থাপনা বলে দিয়েছে, তিন দিনের বেশি থেকো না, তাই বলে নিজেদের সম্পর্কই নষ্ট করে ফেলবেন– এমনটি যেন না হয়।

নিরাপত্তামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, (পরিবেশের ওপর) সজাগ দৃষ্টি রাখা। নিজের চতুর্দিকে গভীর দৃষ্টি রাখুন। অপরিচিত কোনো ব্যক্তিকে দেখলে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক দায়িত্ব। নিজ থেকে

কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত নয়। যারাই জলসায় শামিল হচ্ছেন তারা প্রত্যেকে আশপাশে নজর রাখুন। ব্যবস্থাপনাকে যদি জানাতে চান, তাহলেও সাবধান থাকতে হবে যেন তার প্রতিটি গতিবিধির ওপর আপনার চোখ থাকে, নোট করতে পারেন এবং সাথের কাউকে বলতে পারেন যে-কিনা ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত তা পৌঁছে দেবে। মানুষ বেশিদূর পর্যন্ত নজর রাখতে পারে না কিন্তু এর সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো, নিজের ডানে-বামে তাদের প্রতি নিঃসন্দেহে নজর রাখুন যাদেরকে আপনি চেনেন না। আর এটিই আহমদীয়া জামা'তের অনেক বড়ো নিরাপত্তা।

কোনো কোনো কারণে সম্ভবত এবারকার জলসায় ব্যবস্থাপনা চেকিংয়ের কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাই তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন, বিশেষ করে মহিলারা। তাদের মাঝে ধৈর্য কিছুটা কম হয়ে থাকে, খুব দ্রুত অধৈর্য হয়ে পড়ে। তাদেরও পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত। এটিও আমাদের প্রশিক্ষণের অংশ আর আপনাদের ভালোর জন্যই এটি করা হয়ে থাকে। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ সহযোগিতার আবেদন থাকছে। ইসলামাবাদের সীমানায় প্রবেশ করার পূর্বে নিরাপত্তা কর্মীদের নিকট নিজেই চেকিংয়ের জন্য উপস্থিত হয়ে যান। নিরাপত্তার সবচেয়ে উত্তম পন্থা এটিই। এমন মনে করবেন না যে, আপনাকে বাধ্য করে আনা হয়েছে। সব সময় আইডি কার্ড লাগিয়ে রাখুন। এটি ছাড়া কাউকে যদি দেখা যায় তবে নম্রভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। এর ফলে একে তো ব্যবস্থাপনা বুঝতে পারবে যে, প্রত্যেককে কার্ড দেওয়া হয়েছে কিনা। যদিও এটি জানা আছে যে, প্রত্যেকের জন্য কার্ড জারি করা হয়েছে। এর ফলে যার কাছে কার্ড নেই তাকে চেক করার বিষয়টি সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, জলসায় আগত প্রত্যেক অতিথি কিংবা যে-ই জলসায় যোগদান করছে সে-ও বুঝবে যে, এই ব্যক্তির কাছে কার্ড নেই। তাই তার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

মূল্যবান জিনিস এবং নগদ টাকা-পয়সা ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। এটি আপনার নিজের দায়িত্ব, ব্যবস্থাপনা কখনো এই দায়িত্ব নেবে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, এই জলসাকে যেন সাধারণ পার্থিব জলসা কিংবা মেলার মতো মনে না করা হয়। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এই জলসা এমন নয় যে, জাগতিক বিভিন্ন মেলার মতো অযথা এর আয়োজন করতেই হবে, বরং এর আয়োজনের সফলতা নির্ভর করবে নিয়তের পবিত্রতা ও উত্তম ফলাফলের ওপর।" (মজমুয়া ইশতিহারাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৪৪০)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "এটি কোনো জাগতিক রং-তামাশার বিষয় নয়।" (মজমুয়া ইশতেহারাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৪৪৩)

অতএব এই সমস্ত বিষয় দৃষ্টিপটে রাখুন। অধিকন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দোয়া। দোয়ার প্রতি জোর দিন। জলসায় আসার সময় এবং ফেরত যাবার সময়ও দোয়ার মাধ্যমে সফর আরম্ভ করুন আর সফরেও দোয়া করতে থাকুন। অনেক সময় এমন হয় যে, জলসায় অংশগ্রহণের জন্য বাড়ি থেকে দেরিতে বের হবার ফলে তাড়াহুড়া লেগে যায়। সুতরাং আপনারা যদি ক্লান্ত থাকেন কিংবা বিশ্রাম না নিয়ে থাকেন তবে কোনো অবস্থাতেই

বিশ্রাম না নিয়ে সফর শুরু করবেন না। বিশেষ করে যারা গাড়ি চালিয়ে আসেন তারা অনেক সাবধানতা অবলম্বন করুন। একটুখানি অসাবধানতা সকলের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে যায়। আবার পথিমধ্যে যদি ক্লান্তি চেপে বসে কিংবা তন্দ্রা আসে তাহলে নিকটবর্তী যে সার্ভিস স্টেশন আসবে সেখানে থেমে বিশ্রাম নিন। আমি যেভাবে পূর্বেই বলেছি, ট্রাফিক আইনকানুন মেনে চলুন। গতিসীমা বজায় রেখে গাড়ি চালান। সফরের পূর্বে মহানবী (সা.) যে-সব দোয়া করতেন সেগুলো মুখস্থ রাখুন। হাদীসে রয়েছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন সফরের জন্য উটে আরোহণ করতেন তখন তিনি (সা.) তিন বার তকবীর বলতেন আর তারপর এই দোয়া পড়তেন, **"সুবহানাল্লাযি সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন।"** অর্থাৎ, পবিত্র সেই সত্তা যিনি এটিকে আমাদের অনুগত করেছেন যদিও সেটিকে বশীভূত করার শক্তি আমাদের ছিল না। আমরা স্বীয় প্রভুর দিকেই প্রত্যাগমনকারী। হে আমাদের খোদা! আমরা এই সফরে তোমার নিকট কল্যাণ এবং তাকওয়া কামনা করি। তুমি আমাদেরকে এমন সৎকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য দান করো যা তোমার পছন্দ। হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! আমাদের এই যাত্রাকে তুমি আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে কমিয়ে দাও যেন দ্রুত সফর অতিক্রান্ত হয় (এমনটি করে দাও)। হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! সফরেও তুমি আমাদের সাথে থাকো আবার রেখে আসা ঘরেরও তত্ত্বাবধান করো। হে আমাদের দয়াময় খোদা! সফরের কষ্ট-কাঠিন্য, অপছন্দনীয় ও অশান্তিকর দৃশ্যাবলি, সম্পদ এবং পরিবার পরিজনের মন্দ পরিণতি আর অপছন্দনীয় পরিবর্তন থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাইছি। অতঃপর তিনি (সা.) যখন সফর শেষে ফেরত আসতেন তখনো এই দোয়া করতেন আর এতে শুধু অতিরিক্ত একথা যোগ করতেন যে, আমরা তওবারত অবস্থায়, ইবাদত ও স্বীয় প্রভুর গুণকীর্তন করতে করতে ফেরত এসেছি।

আল্লাহ্ তা'লা এখানে আগত সকল মেহমানকে জলসার সমস্ত বরকত ও কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবার এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক ঝুলি বোঝাই করে ঘরে ফিরে যাবার তৌফিক দিন। আমীন।

(১৪)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৫ জুলাই ২০০৩, মোতাবেক ২৫ ওয়াফা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য তাদের ৩৭শ বার্ষিক জলসার আয়োজন করেছে যা আজ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। একশ বারো বছর পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে জলসার প্রবর্তন করেছিলেন সেভাবেই জলসার ঐতিহ্য সর্বদা বজায় থাকবে খোদার কাছে এটিই আমার প্রার্থনা। এই আধ্যাত্মিক জলসাকে তিনি (আ.) জাগতিক মেলা ও ক্রীড়াকৌতুক হতে ভিন্ন এমন একটি জলসা আখ্যায়িত করেছিলেন, নিয়তের স্বচ্ছতা ও উত্তম ফলাফল লাভের লাভ করাই হলো যা আয়োজনের উদ্দেশ্য। সংক্ষিপ্ত এই ভূমিকার পর এখন আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন কতিপয় দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করছি যাতে এই জলসার উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করে এর ব্যবস্থাপনা ও এতে অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এই জলসা এমন নয় যে, জাগতিক বিভিন্ন মেলার মতো অযথা এর আয়োজন করতেই হবে; বরং এটি আয়োজনের সফলতা নির্ভর করবে নিয়তের পবিত্রতা ও উত্তম ফলাফলের ওপর।" (মজমুয়া ইশতিহারাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৪৪০)

তিনি (আ.) আরো বলেন, **"এটি জাগতিক কোনো তামাশাবিশেষ নয়।"** (মজমুয়া ইশতিহারাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৪৪৩)

তিনি (আ.) বলেন, "বয়আতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাক্ষাতের বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন– এমন বয়আত সম্পূর্ণভাবে কল্যাণশূন্য আর নিছক একটি বাহ্যিক রীতি বা প্রথা সম্পাদন মাত্র। যেহেতু প্রকৃতিগত দুর্বলতা বা সামর্থ্যের অভাব কিংবা দূরত্বের কারণে সবার পক্ষে সান্নিধ্যে এসে অবস্থান করা অথবা কষ্ট করে এসে বছরে কয়েকবার সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না, কেননা বেশিরভাগ মানুষের অন্তরে এমন প্রেমানল এখনও সৃষ্টি হয় নি যার ফলে সে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বড়ো বড়ো কষ্ট এবং বড়ো বড়ো ক্ষয়ক্ষতি মাথাপেতে নেবে। তাই এমন জলসার জন্য বছরে তিন দিন নির্ধারণ করা সমীচীন বলে মনে হয়, যাতে আল্লাহ্ চাইলে সকল নিষ্ঠাবান সদস্য, স্বাস্থ্য ও সময় অনুকূলে থাকলে আর বড়ো ধরনের কোনো বাধা না থাকলে নির্ধারিত তারিখে আসতে পারেন।" (মজমুয়া ইশতিহারাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩০২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "বন্ধুদের উচিত, তারা যেন সাধ্যানুযায়ী কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় ধর্মীয় বক্তৃতা ও বক্তব্য শোনার জন্য এবং সম্মিলিত দোয়াতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এই (নির্ধারিত) তারিখে চলে আসেন। এ জলসায় এমন সব নিগূঢ় সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ বক্তব্য শোনানোর সর্বাত্মক প্রয়াস থাকবে যা ঈমান, বিশ্বাস এবং

তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। একইভাবে সেসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া করা হবে এবং তাদের জন্য বিশেষভাবে ধ্যান নিবদ্ধ করা হবে আর পরম দয়ালু খোদার দরবারে সাধ্যানুযায়ী মিনতি জানানো হবে- যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন আর তাদেরকে আপন করে নেন এবং তাদের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। এছাড়া এসব জলসার একটি তাৎক্ষণিক উপকারিতা হবে, প্রত্যেক বছরে যত নবদীক্ষিত ভাই এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবেন, তারা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পুরোনো ভাইদের মুখ চিনে নেবেন এবং পরিচিত হবার পর তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। ... এ আধ্যাত্মিক সমাবেশের আরো বহুবিধ আত্মিক কল্যাণ থাকবে যা ইনশাআল্লাহ্ কালের প্রবাহে প্রকাশিত হতে থাকবে।" (আসমানী ফয়সালা, ইশতেহার, ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯১, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৩৫১-৩৫২)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "বহু আশিসময় উদ্দেশ্য-সংবলিত, এ জলসায় প্রত্যেক এমন ব্যক্তির অবশ্যই যোগদান করা উচিত যিনি পথ খরচ নির্বাহ করার সামর্থ্য রাখেন। শীতের লেপ-তোশক ইত্যাদিও প্রয়োজন অনুসারে সাথে আনা উচিত আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পথে ছোটোখাটো ক্ষয়ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকারে কুণ্ঠা বোধ করা উচিত নয়।" (ইশতিহার, ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২, মজমুয়া ইশতিহার, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩৪১)

তিনি (আ.) বলেন, "... যাদের সামর্থ্য সীমিত তাদের উচিত হবে প্রথম থেকেই এ জলসায় উপস্থিত হবার চিন্তা মাথায় রাখা। তারা যদি পরিকল্পিতভাবে ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে অল্প বিস্তর অর্থ পথখরচ নির্বাহের জন্য প্রাত্যহিক অথবা মাসিক-হারে সঞ্চয় করতে থাকেন এবং পৃথক করে রাখেন সেক্ষেত্রে অতি সহজেই পথ খরচ জোগাড় হয়ে যাবে। বলতে গেলে এ সফর বিনা পয়সায় সম্পন্ন হয়ে যাবে!" (মজমুয়া ইশতিহারাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩০২-৩০৩, লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

তিনি (আ.) এ সম্বন্ধে আরো বলেন, "আমরা মানুষের মাঝে কী পরিবর্তন দেখতে চাই সে সম্পর্কে তারা এখনও অবগত নয়। যে লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে চাই আর যেজন্য খোদা তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন, তা ততক্ষণ অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষ বার বার এখানে আসবে এবং আসার বিষয়ে আদৌ বিরক্তিবোধ করবে না।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "যে এখানে আসাকে নিজের জন্য বোঝা মনে করে কিংবা এখানে অবস্থান করলে আমার ওপর বোঝা হবে বলে মনে করে, তার ভয় করা উচিত কেননা সে শিরকে লিপ্ত। আমাদের বিশ্বাস হলো, সমগ্র পৃথিবীও যদি আমাদের পরিবার হয়ে যায়, (কোনো ভয় নেই কেননা) আমাদের কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক হলেন খোদা তা'লা। আমাদের কাছে মোটেও বোঝা মনে হয় না। বন্ধুদের মাধ্যমে আমরা পরম প্রশান্তি লাভ করি। এটি একটি কুমন্ত্রণা বা কুধারণা যা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত। আমি অনেককে বলতে শুনেছি, আমরা এখানে বসে হযরত সাহেবকে কেন কষ্ট দেবো? কেননা আমরা তো অকর্মণ্য! অযথা কেন বসে বসে খাবো? তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এটি শয়তানী কুমন্ত্রনা যা শয়তান তাদের হৃদয়ে ফুৎকার করেছে যাতে তারা এখানে অবস্থান না

করেন।" (আল-হাকাম প্রত্রিকায় প্রকাশিত মওলানা আব্দুল করীম সাহেবের চিঠি, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৬-১১, ২ জানুয়ারি ১৯০০, মলফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৪৫৫)

আলহামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত প্রিয় এই জামা'তের লোকেরা তাঁর (আ.) এই প্রেম-ভালোবাসার কারণে এবং তাঁর প্রদত্ত তালীম-তরবিয়তের কল্যাণে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি উদ্দীপনা নিয়ে এই জলসায় অংশগ্রহণের একাগ্র বাসনা রাখেন। খলীফাতুল মসীহ্ যেখানে উপস্থিত থাকেন সেখানে তারা অবশ্যই আসতে চান আর এক আকুল বাসনা নিয়ে অনেক অর্থ ব্যয় করে এসে থাকেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ও আকুল বাসনা সত্ত্বেও লক্ষ-কোটি এমন আহমদীও আছেন যারা নিরুপায় হয়ে নিজেদের বাসনার রাশ টেনে বসে আছেন এবং জলসায় অংশগ্রহণে অপারগ। কিন্তু আমাদের ওপর এটিও আল্লাহ্ তা'লার একান্ত অনুগ্রহ ও কৃপা যে, তিনি এমটিএ-এর মতো নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন, যার ফলে বর্তমানে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আহমদীরা ঘরে বসেই এর সুবিধা ভোগ করছে আর এভাবেই তারা জলসায় অংশ নিচ্ছেন। এ কারণে কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জন্য মন থেকে দোয়া বের হয়, যিনি আমাদেরকে এই নিয়ামতে ধন্য করার জন্য সীমাহীন চেষ্টা করেছেন আর এটিকে সফল করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের প্রতি জামা'তের সদস্যদের ভালোবাসার এই প্রেরণাকে স্থায়ী করুন যা কেবল খোদা ও তাঁর রসূল (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই লাভ হয়েছে। এই ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন, এতে কখনো যেন ভাটা না আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন এবং দোয়াও করেছেন যে, এ জলসা যেন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় যেখানে আমাদের আধ্যাত্মিকতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি তরবিয়তি বিষয়াবলির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী এ জলসার একটি মহৎ উদ্দেশ্য হলো, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন গড়া এবং পরস্পরের প্রতি যত্নবান হওয়া। প্রয়োজনে নিজ ভাইয়ের জন্য নিজেদের অধিকার বিসর্জন দেবার মতো হৃদয়ের অধিকারী হওয়া পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করার অন্যতম মাধ্যম। গত খুতবাতেও আমি এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে, মেহমান ও মেযবান উভয়কেই উত্তম নৈতিক গুণ ও উত্তম ব্যবহারের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত আর এর বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত। একে অপরের কষ্টের বিষয়ে সংবেদনশীল হওয়া উচিত এবং নিজের ভেতর সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বেশি বেশি চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার দোয়া থাকবে যেন এই মান অর্জন হয়। কিন্তু এটি কীভাবে হতে পারে? কীভাবে একে অপরের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করা যেতে পারে? সে বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেন, "... আমি সত্যি সত্যি বলছি, নিজ ভাইয়ের আরাম-আয়েশকে নিজের আরাম-আয়েশের ওপর যথাসম্ভব প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত মানুষ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না। আমার এক ভাই যদি দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার সামনে মাটিতে ঘুমায় আর সে যেন খাটে বসে না পড়ে সে আশঙ্কায় আমি যদি খাট দখল করে রাখি এবং

না উঠি আর ভালোবাসা ও সহানুভূতির চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আমার খাটটি তাকে দিয়ে না দেই, এছাড়া নিজের জন্য মেঝে পছন্দ না করি তাহলে আমার এ অবস্থার জন্য পরিতাপ! আমার ভাই যদি অসুস্থ ও কোনো ব্যথার কারণে নিরুপায় অবস্থায় পড়ে থাকে আর আমি যদি তার সামনে আরামে শুয়ে থাকি এবং তার জন্য সাধ্যমতো আরামের কোনো ব্যবস্থা না করি তাহলে আমার এ অবস্থার জন্য বড়োই পরিতাপ! আমার কোনো ধর্মীয় ভাই যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় আমার সাথে রুক্ষ আচরণ করে আর আমিও যদি তার সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ আচরণ করি তাহলে আমার এ অবস্থার জন্য পরিতাপ! বরং আমার তো তার কথায় ধৈর্যধারণ করা এবং তার জন্য নামাযে কেঁদে কেঁদে দোয়া করা উচিত ছিল। কেননা সে আমার ভাই আর সে আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ। আমার ভাই যদি সরল প্রকৃতির হয় অথবা জ্ঞানের স্বল্পতা বা সরলতাবশত কোনো ভুল করে বসে তাহলে তার সাথে ঠাট্টা করা বা ভ্রুকুঞ্চিত করে রাগের বহিঃপ্রকাশ করা কিংবা অসৎ উদ্দেশ্যে তার ছিদ্রান্বেষণ করা আমার জন্য ঠিক না, কেননা এ সবই ধ্বংসের পথ। কারো হৃদয় কোমল না হওয়া পর্যন্ত, নিজেকে অন্য সবার চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান না করা পর্যন্ত এবং সকল দাম্ভিকতা দূর না করা পর্যন্ত কেউ সত্যিকার মু'মিন হতে পারে না। জাতির সেবক হওয়া সেবা পাবার যোগ্য হবার চিহ্ন এবং দরিদ্র মানুষের সাথে বিনীত হয়ে নম্র স্বরে কথা বলা আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবার লক্ষণ আর মন্দের বিপরীতে ভালো করা সৌভাগ্যের প্রতীক, এছাড়া ক্রোধ ও কটুবাক্য হজম করা চরম বীরত্বের পরিচায়ক। কিন্তু আমি লক্ষ করছি, আমাদের জামা'তের কতিপয় লোকের মাঝে এসব বিষয় অনুপস্থিত।..." (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৬, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নসীহত অনুযায়ী আমল করার এবং সে অনুযায়ী নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনার তৌফিক দান করুন।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ১৯০৩ সালের কিছু ইলহাম উপস্থাপন করছি যাতে জামা'তের উন্নতির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা একান্ত নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে উন্নতির দৃশ্য দেখাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখাবেন, ইনশাআল্লাহ্। প্রতিটি ইলহাম এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে যার কল্যাণে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন দেখেছি আর ভবিষ্যতেও দেখব, ইনশাআল্লাহ্। এটি ঐশী নিয়তি আর সর্বাবস্থায় এটিই জয়যুক্ত হবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাসদের হাতেই ইসলামের বিজয় আসবে, ইনশাআল্লাহ্। অতএব এ সুসংবাদের পাশাপাশি কর্তব্য পালনের জন্য পুরো প্রস্তুতি গ্রহণ করুন আর দোয়ার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করুন, কেননা আমাদের ওপর অনেক বড়ো দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে।

১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের একটি ইলহাম রয়েছে, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "প্রথমে দিব্যদর্শনতুল্য একটি ছোটো স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে যে আমি একটি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত রয়েছি আর আমার চেহারা দীপ্তিমান। অতঃপর সেই কাশফী অবস্থা ওহীতে রূপ নিল। সেই সম্পূর্ণ ওহী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো যার কিছু অংশ কাশফের পূর্বে এবং কিছু পরে হয়েছিল। আর তা হলো–

يُبْدِىْ لَكَ الرَّحْمٰنُ شَيْئًا اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ بِشَارَةٌ تَلَقَّاهَا النَّبِيُّوْنَ.

অর্থাৎ রহমান খোদা তোমার সত্যতা প্রকাশের জন্য কোনো কিছু প্রকাশ করবেন। খোদার নির্দেশ আসছে। তোমরা তাড়াহুড়া কোরো না। এটি একটি সুসংবাদ যা নবীদেরকে দেওয়া হয়। তিনি (আ.) বলেন, এটি ছিল ১৯০৩ সনের ১ জানুয়ারি মোতাবেক ১ শাওয়াল ১৩২০ হিজরী ঈদের দিন ভোর ৫টা, যখন আমার খোদা আমাকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন। (তাযকেরা, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯, সংস্করণ: ১৯৬৯)

অতঃপর জানুয়ারি মাসেরই আরেকটি ইলহাম:

جَآءَ نِيْ آئِلٌ وَّاخْتَارَ. وَاَدَارَ اِصْبَعَهٗ وَاَشَارَ. يَعْصِمُكَ اللّٰهُ مِنَ الْعِدَا.
وَيَسْطُوْ بِكُلِّ مَنْ سَطَا.

তিনি (আ.) বলেন, আয়েল হলো জিবরাঈল যিনি সুসংবাদদাতা ফেরেশতা। এর অনুবাদ হলো, আয়েল আমার কাছে আসলেন, আর তিনি মনোনীত করলেন (অর্থাৎ তোমাকে মনোনীত করলেন) এবং তার আঙুল ঘুরিয়ে ইশারা করলেন, খোদা তোমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। যে তোমার ওপর আক্রমণ করবে; তার ওপর খোদা ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আয়েল' শব্দটি মূলত 'আয়ালাত' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 'সংশোধনকারী'। যিনি অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে রক্ষা করেন। এখানে জিবরাঈল বলা হয় নি, বরং আয়েল বলা হয়েছে। অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে বাঁচানোর বিষয়টি স্পষ্ট করাই এই শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য। এ কারণে ফেরেশতার নামই আয়েল রাখা হয়েছে। অতঃপর তার আঙুল ঘোরানো দ্বারা চারদিকের শত্রুদেরকে বুঝানো হয়েছে আর ইয়া'সিমুকাল্লাহু মিনাল ইদা-র মতো বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এটিও পূর্ববর্তী ইলহামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

اِنَّهٗ كَرِيْمٌ تَمَشّٰى اَمَامَكَ وَعَادٰى كُلَّ مَنْ عَادٰى

ইন্নাহু কারীমুন তামাশ্শা আমামাকা ওয়া আদা কুল্লা মান আদা। তিনি পরম সম্মানিত এবং সর্বদা তোমার সম্মুখে চলেন। যে ব্যক্তি তোমার সাথে শত্রুতা করবে তিনিও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবেন। আয়েল শব্দটি যেহেতু অভিধানে পাওয়া যায় না কিংবা ভাষায় কম ব্যবহৃত হয়, এজন্য ইলহাম নিজেই এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছে।" (তাযকেরা, পৃ. ৪৪৯-৪৫০, সংস্করণ: ১৯৬৯)

এরপর ১৯০৩ সনেরই আরো একটি ইলহাম রয়েছে আর তা হলো–

وَاِنَّهٗ بَشَّرَنِيْ وَقَالَ "لَا اُبْقِيْ لَكَ فِي الْمُخْزِيَاتِ ذِكْرًا. وَقَالَ يَعْصِمُكَ اللّٰهُ مِنْ عِنْدِهٖ
وَهُوَالْوَلِيُّ الرَّحْمٰنُ

অর্থাৎ আর খোদা তা'লা আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, আমি তোমার সম্পর্কে কোনো অসম্মানজনক কথার উল্লেখটি পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখব না। আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নিজের পক্ষ থেকে তোমার নিরাপত্তা বিধান করবেন এবং তিনিই পরম দয়ালু বন্ধু। (তাযকেরা, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪, সংস্করণ: ১৯৬৯)

জানুয়ারি মাসেরই আরেকটি ইলহাম হলো–

اِنِّی مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ. اَلَیْسَ اللّٰہُ بِکَافٍ عَبْدَہٗ. یَاجِبَالُ اَوِّبِیْ مَعَہٗ وَالطَّیْرَ.

অর্থাৎ 'আমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে তোমার কাছে আসব। আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? হে পর্বতমালা ও পক্ষীকুল! তোমরাও তার সাথে খোদার দরবারে বিনত হও।' (তাযকেরা, পৃ. ৫৪৫, সংস্করণ: ১৯৬৯)

১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের একটি স্বপ্ন যার উল্লেখ এভাবে রয়েছে, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এশার নামাযের পূর্বে এই স্বপ্ন শুনালেন যে, আমি মিশরের নীলনদের তীরে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার সাথে অনেক বনী ইসরাঈলী রয়েছে। আমি নিজেকে হযরত মূসা (আ.) মনে করি। এমন মনে হচ্ছে যেন আমরা কোথাও ছুটে চলেছি। পেছনে তাকিয়ে দেখি, বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফেরাউন আমাদের পিছু ধাওয়া করছে আর অনেক সাজসরঞ্জাম যেমন- ঘোড়া, গাড়ি এবং রথ প্রভৃতির ওপর ভর করে সে আমাদের খুব কাছে এসে গেছে। আমার সহযাত্রী বনী ইসরাঈলীরা ভীত-ত্রস্ত আর তাদের অধিকাংশই মনোবল হারিয়ে বসেছে। তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলল, হে মূসা! আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। তখন আমি বজ্রকণ্ঠে বললাম, **'কাল্লা ইন্না মায়িয়া রাব্বি সাইয়াহ্দীন।'** ততক্ষণে আমার ঘুম ভেঙে গেল এবং তখনো আমার মুখে এই শব্দগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল।" অর্থাৎ এর অনুবাদ হলো, না না, এমনটি হতে পারে না। আমার খোদা আমার সাথে আছেন এবং তিনি অবশ্যই আমার জন্য পথ বের করবেন। (তাযকেরা, পৃ. ৪৫৪)

১৯০৩ সালের জানুয়ারির কথা। তিনি (আ.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করছি। সম্ভবত তা করম দীনের মোকদ্দমার শেষ পরিণতি কী হয়েছে সে সম্বন্ধে। এ বিষয়ে আমি এই শিরোনাম লিখতে চাচ্ছি যে–

تَفْصِیْلُ مَا صَنَعَ اللّٰہُ فِی ھٰذَا الْبَاْسِ بَعْدَ مَا اَشْعَنَاہُ فِی النَّاسِ. قَدْ بَعُدُوْا مِنْ مَّآءِ الْحَیَاۃِ. وَسَحِّقْھُمْ تَسْحِیْقًا.

অর্থাৎ জনগণের মাঝে আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করার পর খোদা তা'লা এ যুদ্ধে যে অবদান রেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ। তারা জীবনসুধা থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে। অতএব তুমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পিষে ফেলো। (তাযকেরা, পৃ. ৪৫৬)

২৮ জানুয়ারি ১৯০৩ সালে তিনি (আ.) বলেন, "আজ সকালে ইলহাম হলো–

"سَاُکْرِمُکَ اِکْرَامًا عَجَبًا"

'সাউকরিমুকা ইকরামান আজাবান।' এরপর একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় একটি স্বপ্নও দেখলাম, সোনালি রঙের খুব সুন্দর একটি জুব্বা। আমি বললাম, ঈদের দিন পরব। তিনি

(আ.) বলেন, ইলহামে 'আজাবান' শব্দটি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী বা কার্যকরী কোনো কথা বুঝানো হয়েছে।" (তাযকেরা, পৃ. ৪৫৮, সংস্করণ: ১৯৬৯)

এ ইলহামটি ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের।

''اِنِّی مَعَ الرَّسُوْلِ اَقُوْمُ. اُصَلِّیْ وَاَصُوْمُ. یَاجِبَالُ اَوِّبِیْ مَعَهٗ وَالطَّیْرَ. قَدْ بَعُدُوْا مِنْ مَّآءِ الْحَیَاةِ. وَصَحِّقْهُمْ تَسْحِیْقًا''

এর অর্থ হলো, "আমি আমার রসূলের সাথে দাঁড়াবো। আমি অশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করব এবং আযাব প্রতিহত করব। হে পর্বতমালা ও পক্ষীকুল! তোমরা আমার এই বান্দার সাথে ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ও বিগলিত চিত্তে আমাকে স্মরণ করো। তারা জীবনসুধা থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে, অতএব তুমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পিষে ফেলো।" (তাযকেরা, পৃ. ৪৫৮, সংস্করণ: ১৯৬৯)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "১৯০৩ সালের ৩০ জানুয়ারির কথা। সে রাতেই স্বপ্নে দেখলাম, রাশিয়ার শাসক জারের রাজদণ্ড যেন আমার হাতে এবং তাতে বন্দুকের নল লুকানো আছে যা দ্বারা উভয় কাজ হয়। অতঃপর আমি দেখলাম, সেই বাদশা যার কাছে আবু আলী সিনা ছিলেন তার ধনুক আমার কাছে। আমি সেই ধনুক থেকে একটি বাঘকে লক্ষ করে তির ছুড়লাম এবং সম্ভবত আবু আলী সিনা ও সেই বাদশা, উভয়েই আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।" (তাযকেরা, পৃ. ৪৫৮-৪৫৯, সংস্করণ: ১৯৬৯)

১৯০৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের এক প্রাতঃভ্রমণকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিম্নের এই ইলহামগুলি শোনান যা কিনা রাতেই তাঁর (আ.) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।

''سَنُنْجِیْكَ. سَنُعْلِیْكَ. اِنِّی مَعَكَ وَ مَعَ اَهْلِكَ. سَاُكْرِمُكَ اِكْرَامًا عَجَبًا. سُمِعَ الدُّعَاءُ. اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْكَ بَغْتَةً. دُعَاءُكَ مُسْتَجَابٌ. اِنِّیْ مَعَ الرَّسُوْلِ اَقُوْمُ. وَاُصَلِّیْ وَاَصُوْمُ. وَاُعْطِیْكَ مَا یَدُوْمُ''

অর্থাৎ "আমি তোমাকে মুক্তি দেবো। আমি তোমাকে বিজয়ী করব। আমি তোমার সাথে আছি এবং তোমার পরিবার-পরিজনের সাথে আছি। আর আমি তোমাকে এত সম্মান ও মর্যাদা দান করব যা দেখে লোকেরা অবাক হয়ে যাবে। আমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে অতর্কিতে আসব। আমি স্বীয় রসূলের সাথে দাঁড়াবো আর তোমাকে এমন জিনিস দান করব যা চিরস্থায়ী।" (তাযকেরা, পৃ. ৪৫৯-৪৬০, সংস্করণ: ১৯৬৯)

ফেব্রুয়ারি মাসের আরেকটি ইলহাম:

''اِنِّیْ مَعَ الْاَسْبَابِ اٰتِیْكَ بَغْتَةً. اِنِّیْ مَعَ الرَّسُوْلِ اُجِیْبُ. اُخْطِیْ وَاُصِیْبُ. اِنِّیْ مَعَ الرَّسُوْلِ مُحِیْطٌ''.

এর অনুবাদ হলো, আমি রসূলের সাথে মিলে উত্তর দেবো। স্বীয় উদ্দেশ্য কখনো

পরিত্যাগ করব আবার কখনো বাস্তব করব। কিছু অংশের অনুবাদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে করেছেন। অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ হলো, আমি বিশেষ উপকরণসহ হঠাৎ তোমার কাছে আসব। আমি স্বীয় রসূলের সমর্থনে (তাদের) পরিবেষ্টনকারী। (তাযকেরা, পৃ. ৪৬২, সংস্করণ: ১৯৬৯)

১৯০৩ সালেরই একটি ইলহাম যাতে বলা হয়েছে–

'يُرِيْدُوْنَ اَنْ لَّا يَتِمَّ اَمْرُكَ. وَاللّٰهِ يَاْبٰى اِلَّا اَنْ يُّتِمَّ اَمْرَكَ'

অর্থাৎ তারা চাইবে তোমার কাজ যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যায় পক্ষান্তরে খোদা তোমার সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত তোমাকে পরিত্যাগ করতে চাইবেন না। (তাযকেরা, পৃ. ৪৬৬, সংস্করণ: ১৯৬৯)

আবার ১৯০৩ সালের মার্চ মাসের একটি ইলহাম রয়েছে, তা হলো–

''اِنَّا نَرِثُ الْاَرْضَ نَاْكُلُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا''

অর্থাৎ আমরা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবো এবং এক প্রান্ত থেকে একে গ্রাস করতে থাকব। (তাযকেরা, পৃ. ৪৬৬, সংস্করণ: ১৯৬৯)

১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে আবার এ ইলহাম হলো–

''رَبِّ اِنِّىْ مَظْلُوْمٌ فَانْتَصِرْ فَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا''

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! আমি নির্যাতিত। আমাকে সাহায্য করো আর তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পিষে ফেলো। (তাযকেরা, পৃ. ৪৭০, সংস্করণ: ১৯৬৯)

এই দোয়াটি বর্তমানে প্রত্যেক আহমদীর করা উচিত। এর প্রতি মনোযোগ দিন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, একবার একটি কাশফে আমি আল্লাহ্ তা'লাকে রূপকভাবে দেখেছি। আমার ঘাড়ে হাত রেখে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

"তুমি যদি আমার হয়ে যাও তাহলে সারা বিশ্ব তোমার হয়ে যাবে।" (তাযকেরা, পৃ. ৪৭১, সংস্করণ: ১৯৬৯)

১৯০৩ সালের আগস্ট মাসের একটি ইলহাম হলো–

''يَسْئَلُوْنَكَ عَنْ شَانِكَ. قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ. اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَارَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. اَلَمْ تَرْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ جِئْتَ فَصْلَ الْفَتْحِ''

অর্থাৎ তোমার মর্যাদা সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসা করবে। তুমি তাদেরকে বলে দাও, সেই খোদাই আমাকে এই মর্যাদা প্রদান করেছেন। আকাশ ও পৃথিবী একটি পুঁটলির মতো বাঁধা ছিল যেটিকে আমি খুলে দিয়েছি। তুমি কি দেখো নি, তোমার প্রভু হস্তীবাহিনীর সাথে কী করেছিলেন? তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্রকে পণ্ড করে দেন নি? আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ সিদ্ধান্ত

হলো, আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই বিজয়ী হবো। আর তুমি বিজয়ক্ষণে এসেছ। (তাযকেরা, পৃ. ৪৮০, সংস্করণ: ১৯৬৯)

১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসের একটি ইলহাম হলো–

"اِنِّیْ اُنَوِّرُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ. ظَفَرٌ مِّنَ اللّٰہِ وَفَتْحٌ مُّبِیْنٌ. ظَفَرٌ وَّفَتْحٌ مِّنَ اللّٰہ. فَخر اَحْمَد. اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا.

এর অনুবাদ হলো, আমি এই গৃহে অবস্থানরত সকলকে আলোকিত করব। খোদার পক্ষ থেকে সাফল্য এবং প্রকাশ্য বিজয়। খোদার পক্ষ থেকেই সাফল্য ও বিজয়। আহমদের গর্ব। আমি রহমান খোদার জন্য রোযা রাখার মানত করেছি। (তাযকেরা, পৃ. ৪৯৫, সংস্করণ: ১৯৬৯)

১৯০৩ সালের নভেম্বর মাসে যে ইলহাম অবতীর্ণ হয় তা হলো, "আমার বিজয় হয়েছে, আমি জয়যুক্ত হয়েছি।" (তাযকেরা, পৃ. ৪৯৮, সংস্করণ: ১৯৬৯)

অতঃপর ১৯০৩ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে অবতীর্ণ একটি ইলহাম হলো, ... জয় তোমার ও বিজয় তোমার জন্য নির্ধারিত। (তাযকেরা, পৃ. ৪৯৮, সংস্করণ: ১৯৬৯)

তিনি (আ.) বলেন, "হে লোকসকল! শুনে রাখো, এটি তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের এই জামা'তকে সব দেশে বিস্তৃত করবেন এবং অকাট্য দলিলপ্রমাণাদির ভিত্তিতে সবার ওপর তাদের জয়যুক্ত করবেন। সেই দিন আসছে বরং সন্নিকটে যখন পৃথিবীতে (মুসলমানদের) এটিই একমাত্র ধর্মমত হবে যাকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে। খোদা তা'লা এই ধর্ম তথা (ঐশী) জামা'তকে পরম ও অলৌকিক কল্যাণে ধন্য করবেন। প্রত্যেক সে ব্যক্তিকে তিনি ব্যর্থ করবেন যে এটিকে নিশ্চিহ্ন করার দুরভিসন্ধি আঁটে, আর এ বিজয় স্থায়ী হবে; এরপর কিয়ামত এসে যাবে। ... স্মরণ রেখো! আকাশ থেকে কেউ অবতরণ করবে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদী যারা বর্তমানে জীবিত আছে তারা সকলেই মারা যাবে। ... এরপর তাদের সন্তানসন্ততি যারা জীবিত থাকবে তারাও মরবে। ... অতঃপর সন্তানদের সন্তানেরা মারা যাবে তবুও তারা মরিয়মের পুত্রকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখবে না। তখন খোদা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশীয় বিজয়ের যুগও পার হয়ে গেল এবং পৃথিবী একটি নুতন রূপ পরিগ্রহ করল, কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা এখনো আকাশ থেকে এলো না। বুদ্ধিমানরা তখন এই বিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে আর আজ থেকে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবার পূর্বেই ঈসার আগমনের জন্য অপেক্ষমাণ মুসলমান ও খ্রিষ্টান কঠিন হতাশা ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। পৃথিবীতে তখন একটিই মাত্র ধর্ম হবে এবং একজনই কাণ্ডারী থাকবেন। আমি কেবল একটি বীজ বপন করতে এসেছি। অতএব আমার হাতে সেই বীজ বপিত হয়েছে আর এখন তা বিশাল মহিরুহে রূপ নেবে ও ফুলেফলে সুশোভিত হবে; কেউ একে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।" (তাযকেরা, পৃ. ৪৯৩, সংস্করণ: ১৯৬৯)

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর যে ইলহামের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গুরুদাসপুরে নিজ জামা'তের উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সকল সেবকের

জন্য সাধারণভাবে দোয়া করেন। যারা উপস্থিত ছিল বা যাদের নাম মনে পড়েছে তাদের নাম নিয়ে এবং মোটের ওপর সমগ্র জামা'তের জন্য দোয়া করেন। যার ফলশ্রুতিতে এই ইলহাম হয়, "ফাবুশরা লিলমু'মিনীন" অর্থাৎ, মুমিনদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। (তাযকেরা, পৃ. ৪৯৯-৫০০, প্রকাশ: ১৯৬৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অগণিত স্বপ্ন, ইলহাম এবং ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যেগুলোকে আমরা কেবল পূর্ণ হতেই দেখি নি বরং বার বার পূর্ণ হতে দেখেছি। উদাহরণস্বরূপ, 'সাহ্হিকহুম তাসহীকা'-এর নিদর্শনকে নিন যার পূর্ণতাস্বরূপ আমরা অনেকবার শত্রুকে নিষ্পেষিত হতে দেখেছি, তাকে ধূলিসাৎ হতে দেখেছি এবং তার বংশধরদের ওপরও শাস্তি অবতীর্ণ হতে দেখেছি। এমন অনেক নিদর্শন রয়েছে যার ফলে আমাদের ঈমান সকল যুগে দৃঢ় হয়েছে এবং তাঁর (আ.) ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতেও এগুলো পূর্ণ হবে এবং পূর্ণ হওয়া অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাড়াহুড়া কোরো না। এসব নিদর্শন নিজ নিজ সময়ে পূর্ণ হতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, আমি আসব এবং অবশ্যই আসব। ইনি সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা খোদা। তিনি যেহেতু বলেছেন, শত্রুদেরকে আমি পরিবেষ্টন করব; তাই তিনি অবশ্যই পরিবেষ্টন করবেন। জগতের কোনো শক্তি তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় ঘটাতে পারবে না; অবশ্য একটি শর্ত আছে আর তা হলো, আমরা যদি সত্য অন্তঃকরণে খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাঁরই হয়ে যাই। তাঁর ভয়ভীতি যেন আমাদের মাঝে বিরাজ করে। সকল বিষয়ে যেন তাকওয়া আমাদের একমাত্র কাম্য বিষয় হয় কোথাও আমাদের দুর্বলতার কারণে ঐশী প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা বিলম্বিত না হয়ে যায়।

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে দোয়া করেছেন তা এখন আমি আপনাদের সামনে পড়ছি। তিনি (আ.) বলেন, "প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত এ জলসায় যোগদানের জন্য যাত্রা করেন, আল্লাহ্ তার সহায় হোন, তাকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করুন, তার প্রতি কৃপা করুন, তার সমস্যা ও অস্থিরতার অবসান ঘটান, তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূরীভূত করুন, তাকে তার সকল কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ তার জন্য সুগম করে দিন আর পরকালে তাকে নিজের সেসব বান্দার সাথে পুনরুত্থিত করুন, যাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা বিরাজমান। আর যাত্রা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার অনুপস্থিতিতে স্বয়ং তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হোন। হে খোদা, হে মহামহিম ও মহাদাতা, দয়াময় ও সমস্যা নিরসনকারী! এসব দোয়া তুমি কবুল করো আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল নিদর্শনের মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে বিজয় দান করো কেননা তুমিই সকল শক্তি ও ক্ষমতার আধার। আমীন সুম্মা আমীন।" (ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর-১৮৯২, মজমুয়া ইশতেহারাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩৪২)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকল দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। আমাদের দ্বারা যেন এমন কোনো কাজ সংঘটিত না হয় যা আমাদেরকে এসব দোয়া থেকে বঞ্চিত করবে। এই দিনগুলোতে আপনারা অনেক দোয়া করুন। দোয়ার প্রতি গভীর

মনোনিবেশ করুন। যে-সব মেহমান এসেছেন তাদের সকলকে দোয়ায় স্মরণ রাখুন। কিছু মানুষ আসছেন যারা পথে আছেন, তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখুন। এছাড়াও এই জলসা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবার জন্য যারা বাড়িতে আছেন এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসতে পারে নি, তাদেরকে নিজ দোয়ায় স্মরণ রাখুন। আমি পূর্বেও বলেছি, ব্যাপক পরিসরে সাময়িক আয়োজন করতে হয় বিধায় ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট কিছু দুর্বলতা থেকেই যাবে। এমন পরিস্থিতিতে কর্মীদের সাথে এবং নিজ ভাইদের সাথে ক্ষমাসুন্দর ও মার্জনাসুলভ ব্যবহার করুন। কোনো কর্মী যেন ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ দায়িত্বে অবহেলা না করে। সবাই অনেক আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবায় সোচ্চার। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আপনারা যদি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করেন তা আপনার পুণ্যকর্ম হিসাবে পরিগণ্য হবে এবং নিশ্চয় এটিও জলসার কল্যাণ লাভের একটি মাধ্যম হবে। কোনো ব্যক্তি খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে কোনো কাজ করবে আর তিনি তাকে প্রতিদান দেবেন না, এটি খোদা তা'লার রীতি পরিপন্থি। অতএব আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এই জলসায় পূর্বের চেয়ে অধিক আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি; খোদার কাছে আমার দোয়া থাকবে যেন এমনটিই হয়। সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হোন। কেননা বান্দা যখন সেই দয়ালু খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যিনি অসীম দয়াবান ও দানশীল, তখন তিনি পূর্বের চেয়ে বেশি অনুগ্রহ নাযিল করেন। রাজা-বাদশাদের ভাণ্ডার নিঃশেষ হতে পারে কিন্তু খোদা তা'লার ভাণ্ডার কখনো খালি হয় না। প্রতিবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি নিজ বান্দাদের অনুগ্রহ ও কৃপায় পূর্বের চেয়ে বেশি ধন্য করতে থাকেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি পদ্ধতি হলো, আপনারা জলসার উদ্দেশ্যে এসেছেন তাই জলসার অনুষ্ঠানমালায় পূর্ণোদ্যমে অংশগ্রহণ করুন, সাগ্রহে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন, এ থেকে লাভবান ও উপকৃত হোন আর এই তিন দিন কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি সন্ধানের মাঝে নিজের সময় ব্যয় করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দিন।

পরিশেষে আমি পুনরায় আরেকটি দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কেননা দোয়ার ফলেই আমাদের সমস্ত কাজ সুসম্পাদিত হয় এবং দোয়ার মাধ্যমেই সকল কল্যাণ ও বরকত লাভ হয়ে থাকে। জলসার এই দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়া করুন। আমি গতকালও বলেছিলাম, চলাফেরা ও ওঠাবসায় খোদার স্মরণে লেগে থাকুন। দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক করে নিন এবং অজস্রধারায় ইস্তিগফার করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হোন এবং জলসার সাথে সম্পৃক্ত সকল জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত করুন। অতঃপর একথাও স্মরণ করিয়ে দেই, বিভিন্ন দেশে যুক্তরাজ্যের দূতাবাস উদারতার পরিচয় দিয়ে ভিসা প্রদান করেছে। সুতরাং যারা কেবল জলসা শোনার উদ্দেশ্যে ভিসা নিয়ে এখানে এসেছেন অর্থাৎ এই উদ্দেশ্যে ভিসা নিয়েছিলেন যে, জলসায় যাচ্ছি কিংবা এটি প্রকাশ করেছেন যে, আমরা জলসা শোনার জন্য যাচ্ছি; তাদেরকে অবশ্যই নিজ নিজ দেশে ফেরত যেতে হবে। তাদের মধ্যে কেউই এখানে কিংবা ইউরোপের কোনো দেশে যাবেন না। জলসার পরে আপনাদের যে প্রোগ্রামই থাকুক তা শেষে স্ব স্ব দেশে ফেরত যাবেন, জাযাকুমুল্লাহ্।

(১৫)

লন্ডনের টিলফোর্ড ইসলামাবাদ থেকে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ১ যহুর, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ
اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝

(সূরা ইবরাহীম: ৮)

[অর্থ: "আর (স্মরণ করো!) তোমাদের প্রতিপালক-প্রভু যখন ঘোষণা করেছিলেন, 'তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো অধিক দান করব; কিন্তু তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও (তাহলে জেনে রাখো,) নিশ্চয় আমার শাস্তি বড়োই কঠোর'।" (সূরা ইবরাহীম: ৮) –অনুবাদক]

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কেননা তিনি আমাদের প্রতি অপার অনুগ্রহ করেছেন। আমরা যতই তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন, তা কখনো যথেষ্ট হবে না। কেননা তিনি একান্ত নিজ কৃপায় যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসাকে সুন্দরভাবে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হতে দেখেছি এবং অনুভব করেছি আর এমটিএ-র কল্যাণে বিশ্বের সকল দেশে যে যেখানে এই জলসার কার্যক্রম দেখেছেন এবং শুনেছেন– প্রত্যেকে এটিই বলেছেন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি অবতীর্ণ হতে দেখেছি, আলহামদুলিল্লাহ্, (সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র)। এ সবকিছুই সেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষারই অংশ এবং তারই কারণে যা এ যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে আমরা লাভ করেছি। বর্তমানে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে আহমদীয়া জামা'ত ছাড়া কেউ এটি জানেই না এবং কেউ এর জ্ঞানই রাখে না যে, আল্লাহ তা'লার প্রতি কীভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয়, এছাড়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খোদা তা'লা কীভাবে নিজ কৃপারাজি বৃদ্ধি করে থাকেন এবং ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করতে থাকেন। জামা'ত কাকুতিমিনতি করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করেছে, তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করেছে, তাঁর দয়া কামনা করেছে, তাঁর সমীপে মস্তকাবনত করেছে এবং খিলাফতের এই নিয়ামতকে নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সীমাহীন ব্যাকুলতার সাথে আকুতিমিনতি করেছে। এর ফলে সেই খোদা– যিনি নিজ বান্দাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন, সেই খোদা– যিনি বান্দা এক পা এগোলে তার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হন, সেই খোদা– যিনি সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা খোদা এবং নিজ বান্দাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তনকারী, সেই খোদা– যিনি সমস্ত শক্তির আধার, যিনি ধূলিকণা দ্বারাও

অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা রাখেন, সেই খোদা– যিনি একটি খড়কুটার মাঝে সুদৃঢ় ইস্পাতের চেয়েও অধিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি আমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং আহমদীয়াতের এই কাফিলার অগ্রযাত্রাকে পুনরায় নিজ গন্তব্যের পানে সচল ও বেগবান রেখেছেন। এর ফলে প্রত্যেক আহমদী আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে স্বীয় মস্তক খোদার সকাশে নত করেছে। নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। সেই খোদা-ও জামা'তের এই কৃতজ্ঞতাবোধের চেতনার মূল্যায়ন করে জামা'তের প্রতি তাঁর কৃপাবারি আরো প্রবলভাবে বর্ষণ করেছেন। এই কৃপাবর্ষণ কখনো বন্ধ হবার নয়। বরং এই কৃপাবারি অব্যাহত থাকবে বর্ষিত হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। কেননা এটি আমাদের প্রভুর ঘোষণা যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে উন্নতি দান করব। অতএব আপনারা নিজেদের বিশ্বস্ততা, দোয়া এবং স্বীয় প্রভুর দরবারে নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যেন অনুগ্রহের বর্ষণশীল বারিধারা কখনো বন্ধ না হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের প্রিয় মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই উত্তম আদর্শ অনুসরণ করার সৌভাগ্য দান করুন।

এক হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) রাতে উঠে নামায পড়তেন, এমনকি তাঁর (সা.) পা ফুলে ফেটে যাবার উপক্রম হতো। একবার আমি তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কেন এত কষ্ট করেন? আল্লাহ্ তা'লা তো আপনার পূর্বাপর সকল দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন, অর্থাৎ সকল প্রকার ভুলত্রুটি এবং দুর্বলতা থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছন! উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, **"আমি কি আমার প্রভুর অনুগ্রহ এবং কৃপার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দা হবো না?"** (বুখারী, কিতাবুত্ তাফসীর, সূরা আল-ফাতাহ, বাব কাওলুহু লিইয়াগফিরু লাকাল্লাহু তা'লা ...)

কৃতজ্ঞতার এই প্রেরণা, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করা এবং তাঁর প্রশংসায় রত থাকা শুধু সমষ্টিগতভাবে আমাদের প্রতি রহমত ও কৃপাবারি বর্ষিত হবার জন্য নয় বরং আল্লাহ্‌র ব্যবহার হলো, তিনি ব্যক্তিজীবন এবং পারিবারিক জীবনেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে সকল মুমিনের প্রতি স্বীয় কৃপাবারি বর্ষণ করেন এবং তাকে স্বীয় অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী করেন। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য এবং নিজ পরিবারের কল্যাণ ও পরবর্তী প্রজন্মের মঙ্গল ও কল্যাণার্থেও নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন গান্নাম (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে একথা বলে যে, হে আল্লাহ্! আমি সকল কল্যাণ তোমার পক্ষ থেকেই লাভ করেছি। তোমার কোনো অংশীদার নেই। সকল প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা তোমারই জন্য– (যে এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে) যেন সে সারাদিনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দায়িত্ব পালন করল। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় এই দোয়া করে, সে তার রাতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও সম্পন্ন করল। (সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব মা ইয়াকুলু ইযা আসবাহা)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এই দোয়া শিখেছি, **আল্লাহুম্মাজ্য়ালনি উয়াযযিমু শুকরাকা ওয়া উকসিরু যিকরাকা ওয়া আত্তাবিয়ু নাসিহাতাকা ওয়া আহফাযু ওয়াসিয়্যাতাকা**। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে সৌভাগ্য দাও তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার, তোমার স্মরণে অধিক রত থাকার, তোমার আদেশ অনুযায়ী চলার এবং তোমার বিধি-নিষেধ মান্য করার। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি অজস্র ধারায় এই দোয়া করি। [তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব মিন আদিয়্যাতিন্ নাবিয়্যি (সা.)]

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, (খোদার) কৃতজ্ঞতার উৎসস্থল হলো 'হামদ' (তথা খোদা তা'লার প্রশংসার গান গাওয়া)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার 'হামদ' তথা গুণকীর্তন করে নি, প্রকৃত অর্থে সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করে নি। (মিশকাতুল মাসাবীহ্, কিতাবুদ্ দাওয়াত, আল-ফাসলুস্ সানী-২৩০৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু আরবী পঙ্‌ক্তির অনুবাদ উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, "হে সেই সত্তা অর্থাৎ হে খোদা! যিনি স্বীয় নিয়ামতসমূহ দিয়ে গোটা সৃষ্টিজগৎকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আমরা তোমার প্রশংসা করি কিন্তু (যথার্থ) প্রশংসা করার ক্ষমতা রাখি না। আমার প্রতি দয়া ও কৃপাদৃষ্টি দাও। হে আমার আশ্রয়স্থল খোদা! দুঃখ ও ব্যাকুলতা দূরকারী খোদা! আমি একসময় মারা যাব ঠিকই, কিন্তু আমার ভালোবাসা মরার নয়। (কবরের) মাটিতেও তোমার যিকরের ধ্বনি শুনে মানুষ আমাকে চিনতে পারবে। আমার চোখ তোমার মতো (কোনো) অনুগ্রহকারীকে কখনো দেখে নি। অনুগ্রহের বিস্তৃতিদাতা এবং কল্যাণের রাজাধিরাজ হে খোদা! আমি যখনই তোমার অপার স্নেহ এবং দানের বিশালতা দেখতে পেয়েছি, তখনই আমার সমস্ত দুঃখকষ্ট দূর হয়ে গেছে। আর এখন আমি কোনো কষ্টই অনুভব করি না।" (মিনানুর রহমান, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৯, পৃ. ১৬৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "বান্দা যখন নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেয়, আবেগ-অনুভূতির তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর আল্লাহ্ তা'লার সত্তা, তাঁর পথে এবং তাঁর ইবাদতে আত্মবিলীন করে এবং নিজ সেই প্রভুকে চিনতে পারে যিনি স্বীয় অনুগ্রহরাজিতে সিক্ত করে তাকে লালন-পালন করেছেন আর সে সর্বদা তাঁর প্রশংসাকীর্তনে রত থাকে এবং তাঁকে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে বরং নিজ শরীরের প্রতিটি অনুকণা দিয়ে ভালোবাসে, তখন সেই বান্দা নিজেই জগৎসমূহের মাঝে আলাদা একটি জগৎ হয়ে যায়; আর এ কারণেই সারা বিশ্বকে যিনি সবচেয়ে বেশি জানেন তাঁর গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম রাখা হয়েছে **'উম্মত'**।" [এজাযুল মসীহ্, পৃ. ১৩৪, তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৪-৩৫]

একজন মুমিন বান্দা যখন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তখন অবলীলায় খোদার প্রশংসা বা গুণকীর্তনের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আমরা খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কখনো শেষ করতে পারব না। যার অনুগ্রহ অনন্ত ও অসংখ্য তাঁর পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কখনো সম্ভব নয়। অতএব এটিও আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর গুণকীর্তনের পদ্ধতি নিজেই আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "**হামদ**-এর অর্থ হলো, প্রশংসা করা। আরবীতে প্রশংসার জন্যে কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। হামদ, মাদাহ্, শুকর, সানা। আল্লাহ্ তা'লা **'হামদ'** শব্দটি নির্বাচন করেন, কিন্তু বিনা কারণে নয়। শুকর বা কৃতজ্ঞতা শব্দের মাঝে অনুগ্রহ স্বীকার এবং এ কারণে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ভাব প্রকাশ পায়। আর আল্লাহ্ তা'লার ক্ষেত্রে যখন এ শব্দটি ব্যবহার হয় তখন কেবল অনুগ্রহ স্বীকার করা বা এর মূল্যায়নের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। হামদ শব্দটি স্পষ্টতই এর চেয়ে বেশি পরিপূর্ণ শব্দ, কেননা হামদ শব্দটি কেবল অনুগ্রহের স্বীকারোক্তির নাম নয় বরং প্রত্যেক সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তা ভাষায় প্রকাশ করা এবং মূল্যায়ন করাও এতে অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "**আল-হামদ** (সূরা ফাতিহা) হলো একটি সম্পূর্ণ দোয়া। অন্য কোনো দোয়া এর সামনে দাঁড়াতে পারে না– হোক তা ভিন্ন কোনো ধর্মের দোয়া কিংবা হাদীসের কোনো দোয়া।" (তাশহীযুল আযহান, খণ্ড: ০৮, সংখ্যা: ০১, পৃ. ৪৩৪)

তিনি (রা.) আরো বলেন, "**আল-হামদ** হলো অতি উত্তম একটি দোয়া কেননা এতে **ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন**– উভয় প্রকার উন্নতির দোয়া রয়েছে।" (বদর, ৩১ অক্টোবর ১৯২১, পৃ. ০৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কোনো ক্ষমতাবান ভদ্রসত্তার উত্তম কাজের জন্য তাঁর প্রতি সম্মান ও তাঁর মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে গুণগান করার নাম 'হামদ' আর সর্বোচ্চ প্রশংসা কেবল মহাপ্রতাপান্বিত খোদার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্বল্প হোক বা বেশি, সকল প্রশংসা আমাদের সেই প্রতিপালক-প্রভুর দিকে ফিরে যায়, যিনি পথভ্রষ্টদের পথের দিশা দিয়ে থাকেন এবং লাঞ্ছিতদের সম্মানিত করেন। তিনি প্রশংসিতদের প্রশংসিত (অর্থাৎ যারা নিজেরাই প্রশংসা লাভের উপযুক্ত তারাও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ)। অধিকাংশ আলেমের মতে শুকর শব্দের সাথে হামদ শব্দের পার্থক্য রয়েছে, এটি এমন গুণাবলির জন্য নির্ধারিত যা অন্যদেরকে কল্যাণমণ্ডিত করে। মাদাহ ও হামদ শব্দের মাঝে পার্থক্য হলো, 'মাদাহ' শব্দটি এমন প্রশংসার জন্য ব্যবহার হয় যা অনৈচ্ছিক। এ বিষয়টি বাগ্মী আলেম-উলামা এবং দক্ষ সাহিত্যিকদের অজানা নয়।

আর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় গ্রন্থ (কুরআনকে) হামদ শব্দের মাধ্যমে আরম্ভ করেছেন **শুকর** ও **মাদাহ** শব্দ দিয়ে নয়। কেননা হামদ শব্দটি সেই উভয় শব্দের তাৎপর্য নিজের মাঝে পূর্ণভাবে ধারণ করে এবং দুটি অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে। এর মাঝে সংশোধন, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা সেগুলো হতে অতিরিক্ত রয়েছে। কাফিররা যেহেতু অহেতুক তাদের প্রতিমাসমূহের প্রশংসা করত এবং সেগুলোর প্রশংসার জন্য হামদ শব্দটি ব্যবহার করত আর তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত দান ও পুরস্কারের মূল উৎস এবং দাতা হলো সেসব প্রতিমা। অনুরূপভাবে যুদ্ধের ময়দানে যারা মারা যেত, তাদের এবং (অন্য) মৃতদের শোক প্রকাশকারী মহিলা কর্তৃক অহংকারমূলকভাবে কাল্পনিক প্রশংসা ছাড়াও ভোজ সভায় সেভাবে প্রশংসা করা হতো, যেভাবে সেই পরম রিযকদাতা ও সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক

আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করা উচিত।" (কেরামাতুস সাদেকীন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৭, পৃ. ১০৭-১০৮)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "...হামদ শব্দটির মাঝে আরো একটি বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে আমার বান্দারা! আমার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তোমরা আমাকে উদ্‌ঘাটন করো এবং আমার শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে আমার পরিচয় লাভ করো। আমি দুর্বল সত্তাদের অনুরূপ নই, বরং আমার স্তুতি সর্বোচ্চ মানের প্রশংসাকারীদের প্রশংসার চেয়েও ঊর্ধ্বে। তোমরা স্বর্গমর্ত কোথাও এমন কোনো প্রশংসনীয় গুণাবলি দেখবে না, যা আমার সত্তায় নেই। তোমরা যদি আমার প্রশংসনীয় গুণাবলি গণনা করতে চাও, তবে কখনো তা গুনে শেষ করতে পারবে না, তোমরা প্রাণান্তকর চিন্তাই করো না কেন এবং নিজ কর্মে গভীরভাবে মগ্ন ব্যক্তিদের ন্যায় আপ্রাণ চেষ্টা করলেও নয়। তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, এমন কোনো প্রশংসা খুঁজে পেয়েছ কি যা আমার সত্তায় নেই? এমন কোনো শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান কি তোমরা রাখো যা আমার সত্তা ও দরবার বহির্ভূত হবে? তোমরা যদি এমন ধারণা পোষণ করে থাকো, তবে আমাকে তোমরা চিনতেই পারো নি, আর তোমরা অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত বইকি।" (কেরামাতুস সাদেকীন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৭, পৃ. ৬৫-৬৬)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "মহাবিশ্বে এবং সৃষ্টিজগতের মাঝে বিদ্যমান সকল প্রশংসনীয় দিকগুলো সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লারই এবং তাঁরই প্রাপ্য কেননা সৃষ্টির গুণাবলি মূলত স্রষ্টারই গুণাবলি। অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করে না বরং প্রকৃত অর্থে খোদা-ই আলোকিত করে থাকেন এবং চাঁদ রাতের আধার বিদূরিত করে না, বরং খোদা তা'লাই তা করে থাকেন। আবার মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে না, বরং খোদা তা'লাই বর্ষণ করে থাকেন। অনুরূপভাবে আমাদের দৃষ্টিশক্তি মূলত খোদা তা'লা প্রদত্ত, আমাদের শ্রবণশক্তিও খোদার দান এবং আমাদের বিবেকবুদ্ধি যা কিছু আবিষ্কার করে তা-ও খোদা কর্তৃক উদ্ভাবিত। আকাশ ও পৃথিবীর বস্তুনিচয় যে-সব সুন্দর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছে এবং যে সৌন্দর্য ও সতেজতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে তা মূলত সেই স্রষ্টারই গুণাবলি– যিনি তাঁর পরম পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এগুলো সৃজন করেছেন। এছাড়া তিনি কেবল সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং স্থায়ীভাবে এগুলোর সাথে একটি রহমত সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন, যার ওপর নির্ভর করে সেসবের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের নিশ্চয়তা। আর কেবল এখানেই তিনি সংক্ষেপ করে কাজ শেষ করেন নি, বরং একটি জিনিসকে তার পরম ঔৎকর্ষ দান করেছেন, যার ফলে সে জিনিসের মূল্য ও মান সুস্পষ্ট হয়। অতএব সত্যিকার অর্থে **'মুহসিন'** (অনুগ্রহশীল) ও **'মুনয়িম'** (নিয়ামতদাতা) তিনিই আর তিনিই সকল গুণের আধার– **'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'** বাক্যটি সেদিকেই ইঙ্গিত করে।" (আল-হাকাম, ২৪ জুন ১৯০৪, পৃ. ১৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "আবশ্যকীয় বরং অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো, পূর্ণ বিনয় ও নম্রতার সাথে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রতিটি মানুষের এই দোয়া করতে থাকা উচিত যেন তিনি তাকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এবং সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি ও চোখ দান করেন আর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন।" (রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭, পৃ. ৩৬)

তিনি (আ.) আরো বলেন: "সারকথা হলো, দোয়া ও তওবায় অভ্যস্ত হও এবং সদকা-খয়রাত করতে থাকো– যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেন।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৩৫, নতুন সংস্করণ)

একটি হাদীসে হযরত আশআস বিন কায়েস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "মানবমণ্ডলীর মাঝে সে-ই আল্লাহ্ তা'লার সর্বাধিক কৃতজ্ঞ বান্দা, তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি সবচেয়ে কৃতজ্ঞ।" (তাযকেরাতুল হুফ্ফায, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩৪২)

এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই আর তা হলো, বান্দার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আর একইভাবে এই উক্তিও রয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে জলসার পরে আমি সকল কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি; তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আর এদের মধ্যে অনেক বড়ো একটি সংখ্যা হলো যুবকদের– যারা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমস্ত কাজ সম্পাদন করেছেন। ব্যবস্থাপনার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি মেহমান সমাগমের ফলে সকল আয়োজন ভেস্তে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, বিশেষ করে আবহাওয়াও যখন প্রতিকূল হয় (এ আশঙ্কা আরো বেড়ে যায়)। আপনারা সবাই দেখে থাকবেন, প্রথম দিন প্রবল বাতাসের কারণে আবাসনের জন্য নির্ধারিত কিছু হালকা মার্কি মুখ থুবড়ে পড়ে। থাকার জায়গা মোটের ওপর ছোটো হয়ে যায়। খাবারের আয়োজনও প্রভাবিত হতে পারত বরং শেষের দিন রুটি বানানোর মেশিনই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কিছুক্ষণ পর তা ঠিক হয়ে যায়।

তাই এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে উদ্‌বিগ্ন হওয়া কিংবা উদ্‌বেগ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু সেই প্রিয় খোদার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় মাথা নত হয়ে যায়, কেননা এমন পরিস্থিতিতেও তিনি কোনো রকমের বিশৃঙ্খলা অনুভূত হতে দেন নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় এই জামা'তের নিবেদিতপ্রাণ সেসব কর্মীর প্রতি অবলীলায় কৃতজ্ঞতার প্রেরণা হৃদয়ে জাগে, যারা ইউরোপের এই পরিবেশে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও ত্যাগের পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের আতিথেয়তায় কোনোরূপ ত্রুটি থাকতে দেন নি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজও তারা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করেছেন। আমি আশা করি, এতক্ষণে ইসলামাবাদের মাঠও পরিষ্কার হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং স্বীয় অনুগ্রহে ভূষিত করুন। আমি অনেক চিন্তিত ছিলাম আর স্বাভাবিকভাবে চিন্তা হবারই কথা। যদিও আল্লাহ্ তা'লা নিজ ভালোবাসা ও অনুগ্রহের নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং করে চলেছেন কিন্তু এটি আমার প্রথম জলসা ছিল। এ চিন্তাও ছিল যে, কোথাও ব্যবস্থাপনার কোনো ত্রুটি যেন রয়ে না যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অধিকাংশ ব্যবস্থাপনাই গত বছরের তুলনায় অনেক উত্তম ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। একই সাথে পূর্বেও যেভাবে আমি সকল কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি, ঠিক সেভাবে আবার তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

করছি, কেননা আপনারা আমার দুঃশ্চিন্তা দূর করেছেন। আমি এটি অনুভব করছি যে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কোনো ভাষা আমার কাছে নেই কিন্তু এই হাদীসের অনুসরণে, যেখানে মহানবী (সা.) বলেছেন, যার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করা হয়, সে যেন অনুগ্রহকারীকে বলে, আল্লাহ্ তোমাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন, সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, তবেই সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করল; অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দায়িত্ব সে অনেকটা পালন করেছে।

একইভাবে অতিথিরা পরম ধৈর্য ও বড়োমনের পরিচয় দিয়ে ব্যবস্থাপনায় সকল ঘাটতি সহ্য করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও পুরস্কৃত করুন। এই জলসার সকল মেহমান ও মেযবান যেভাবে আমার প্রশান্তির কারণ হয়েছেন এবং ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার উন্নত মান স্থাপন করেছেন, ঠিক সেভাবেই আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও স্বীয় কল্যাণে ধন্য করুন এবং জামা'ত ও খিলাফতের সাথে আপনাদের ভালোবাসা সর্বদা অটুট থাকুক।

সবশেষে এমটিএ-র কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, খুব উন্নত অনুষ্ঠানমালা ছিল আর তারা উত্তমরূপে জলসার সব কার্যক্রম আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এখন আমি হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেন, "আমি আশা রাখি, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বে আমি আমার সত্যিকার প্রতিপালক-প্রভু ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবো না আর প্রত্যেক শত্রুর আক্রমণ থেকে তিনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করবেন।

فالحمد لله اولا و اخرا وظاهرا و باطنا و هوولى
فى الدنيا و الاخرة و هو نعم المولى و نعم النصير

আমি বিশ্বাস রাখি, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন এবং কখনোই আমাকে ধ্বংস করবেন না। আমার বিরোধিতায় পৃথিবীর সবাই যদি পশুর চেয়েও হিংস্র হয়ে যায় তবুও তিনি আমারই সমর্থন করবেন। আমি কখনোই ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে কবরে যাব না। কেননা প্রতিটি পদক্ষেপে আমার খোদা আমার সাথে রয়েছেন এবং আমিও তাঁর সাথে আছি। আমার অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যেভাবে অবগত, অন্য কেউ সেভাবে অবগত নয়। সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তাহলে খোদা আরেকটি জাতি সৃষ্টি করবেন– যারা আমার বন্ধু হবে।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণের বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত রাখুন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "নির্বোধ বিরোধী মনে করে, তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফলে এ উদ্দেশ্য পণ্ড হবে আর এই জামা'ত লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু এই বোকারা জানে না, স্বর্গে যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, পৃথিবীর কোনো শক্তি তাতে পরিবর্তন আনতে

পারে না। আমার খোদার ভয়ে আকাশ ও পৃথিবী কম্পমান। তিনিই সেই পবিত্র খোদা– যিনি আমার প্রতি তাঁর পবিত্র ওহী অবতীর্ণ করেন এবং অদৃশ্যের সংবাদ সম্বন্ধে আমাকে অবগত করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো খোদা নেই। এই জামা'তকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বর্ধিত করা এবং উন্নতি প্রদান করা তাঁর জন্য অবশ্যম্ভাবী, যতদিন না পবিত্র ও অপবিত্রের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রত্যেক বিরোধী এ জামা'তকে ধ্বংস করার যথাসম্ভব চেষ্টা করুক এবং সর্বশক্তি নিয়োজিত করুক অতঃপর দেখুক, চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা বিজয়ী হয় নাকি খোদা। তাদের পূর্বে আবু জাহল, আবু লাহাব এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সত্যকে পরাভূত করার কত-না জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল! কিন্তু এখন তারা কোথায়? যে ফেরাউন মূসাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এখন কি তার কোনো অস্তিত্ব আছে? অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো! সত্যবাদী কখনোই বিনষ্ট হতে পারে না, কেননা সে ফেরেশতাবাহিনীর মাঝে বিচরণ করে। হতভাগা সেই ব্যক্তি! যে তাকে শনাক্ত করতে পারে নি।" (বারাহীনে আহমদীয়া, খণ্ড: ০৫, পৃ. ২৯৫)

(১৬)

লন্ডনের টিলফোর্ড ইসলামাবাদ থেকে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ৮ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ৮ যহুর ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

(সূরা আন-নিসা: ৫৯)

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা আমানতসমূহ এর যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত করো আর তোমরা মানুষের মাঝে যখন শাসনকাজ পরিচালনা করো তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ যে উপদেশ দেন, তা কত-না উত্তম! নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রাহে.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে মুমিনদেরকে সকল বিষয়ে আমানত প্রত্যর্পণের বা প্রাপ্যকে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন; তা ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে হোক বা জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে। তার মতে, মানুষের সম্পর্ক বা লেনদেন হয়ত তা প্রভুর সাথে হয়ে থাকে অথবা মানবজাতির সাথে নয়তো নিজ সত্তার সাথে। এই তিন ক্ষেত্রেই আমানত রক্ষা আমানত প্রত্যর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

এ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে আমানতের বিষয়ে যত্নবান হওয়া এমন কর্মের সাথে সম্পর্ক রাখে যেগুলো করার হয়ত আদেশ দেওয়া হয়েছে নয়তো বারণ করা হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, জিহ্বার আমানত রক্ষা করার অর্থ হলো, মানুষ যেন নিজ জিহ্বাকে মিথ্যা, পরনিন্দা বা পরচর্চা, অবাধ্যতা, বিদআত এবং অশ্লীল কথা বলার কাজে ব্যবহার না করে। একইভাবে চোখের আমানতের অর্থ হলো, মানুষ যেন নিজ চোখ অবৈধ বস্তু দেখার কাজে ব্যবহার না করে এবং কানের আমানত হলো, মানুষ যেন বৃথা বাক্যালাপ ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি শ্রবণের কাজে সেগুলোকে নিয়োজিত না করে অধিকন্তু অশ্লীল কথাবার্তা এবং মিথ্যা শোনা থেকে বিরত থাকে।'

তিনি দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে লেখেন সেটি হলো, মানবজাতি বা সমগ্র সৃষ্টির আমানত প্রত্যর্পণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো হলো, মাপে কম না দেওয়া, মানুষের মাঝে অন্যের দোষ বলে বেড়ানো হতে বিরত থাকা আর অধীনস্থদের সাথে শাসকদের ন্যায়সম্মত মীমাংসা করা। সাধারণ জনগণের প্রতি আলেমদের ন্যায়সংগত আচরণ বলতে যা বুঝায় তা হলো, তারা যেন সাধারণ জনগণকে মিথ্যা-বিদ্বেষে উত্তেজিত না করে বরং তাদের

সঠিক বিশ্বাস ও কর্মের বিষয়ে এমনভাবে দিকনির্দেশনা দেয় যা তাদের জাগতিক ও পারত্রিক জীবনের জন্য কল্যাণজনক হবে।

বর্তমান যুগের আলেম-উলামারা আমাদের কথায় একদমই কান দেন না। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রাহে.)-এর এ কথাটির প্রতিই যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় এবং তদনুযায়ী আমল করা হয়, তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এরপর তৃতীয় বিষয়টি লিখছেন, মানুষের আপন সত্তার ক্ষেত্রে আমানতের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা হলো, মানুষের নিজের ক্ষেত্রে তা-ই পছন্দ করা উচিত যা অধিক কল্যাণকর এবং তার ইহজগৎ ও পরকালের জন্য যথাযথ। এছাড়াও মানুষ যেন স্বীয় প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিংবা ক্রোধের বশে এমন কোনো কাজ না করে বসে যা পরকালে তার জন্য কষ্টের কারণ হবে। এ কারণে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করছে এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর আল্লাহ্ তা'লার উক্তি– يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا -এর মাঝে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত। (তফসীরে কবীর রাযী-তে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য)

গভীর অভিনিবেশসহকারে দেখলে দেখা যাবে সকল মানুষের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি অবস্থাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘুরেফিরে আসে। তবে এই আয়াতের শেষে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, প্রথমে আমি সেটি স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতের শেষে বলেন, আমি যে আদেশ তোমাদেরকে প্রদান করছি– তা একেবারেই মৌলিক। তোমরা যদি এগুলোর ওপর আমল করতে থাকো তবে তোমাদের সফলতা নিশ্চিত।

এর সাথে এটিও বলে দিয়েছেন যে, খোদা তা'লা তোমাদেরকে যখন কোনো আদেশ দেন তখন কেবল আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন না বরং তোমাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যে, তোমরা তাঁর নির্দেশাবলি পালনে কোনোরকম খিয়ানত বা অসৎপন্থা অবলম্বন করছ কিনা। তোমরা যদি খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করো, তবে এর যে যৌক্তিক পরিণতি সামনে আসা উচিত বা যে ফলাফল প্রকাশিত হবার কথা– তা প্রকাশ পাবেই। উপরন্তু তোমাদের ওপর যে আমানত ন্যস্ত করা হয়েছিল তা-ও ফেরত নিয়ে নেওয়া হবে। সেবা প্রদানের সৌভাগ্য থেকে তোমাদের বঞ্চিত করা হবে। যে সম্মান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তা তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। কেননা তোমাদেরকে যাদের তত্তাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল তারা যদি পুণ্যবান এবং খোদাভীরু হয়ে থাকেন তবে খোদা তা'লা তাদের দোয়া শুনবেন আর স্বীয় সৃষ্টির প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের সুযোগ তোমাদেরকে দেবেন না। আমি যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেই উপদেশগুলো কী– যা তোমাদের মেনে চলতে হবে? সেই বিষয়গুলি এবং সেই নির্দেশাবলি কী যাতে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে? অতএব প্রথম কথা হলো, আমানতসমূহ এর প্রাপ্য ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়া। এখন দেখার বিষয়, এগুলো কোন ধরনের আমানত যা খোদা তা'লা আমাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন এবং এর যোগ্য প্রাপককে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন?

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, সরকারের আনুগত্য করা উচিত কেননা এরূপ করাই জনগণের পক্ষ থেকে সরকারের আমানত ফেরত দেবার নামান্তর। আর সরকার ও কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে জনগণের বা নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ও তাদের সকল প্রাপ্য প্রদানে যত্নবান হওয়াই হলো সঠিকভাবে তাদের আমানত রক্ষা করা।

আমাদের জামা'তী ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে কর্মকর্তা-সংক্রান্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। বর্তমান যুগে প্রত্যেক আহমদী যে যেখানেই বসবাস করুক, সে জাগতিক ক্ষেত্রেও যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আমানত তুলে দেবার চেষ্টা করে। তার দায়িত্ব হলো, এই কর্তব্যকে সঠিকভাবে পালন করা এবং প্রাপ্য লোকদের হাতে সেই আমানত পৌঁছে দেওয়া। একইভাবে জামা'তী ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ আহমদী বা কর্মকর্তাদের কাছে এ প্রত্যাশাই রাখে যে, তারা নিজ আমানত সঠিকভাবে প্রত্যর্পণ করবেন। প্রথম কথা হলো, জামা'তী ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা নিযুক্তকারী সাধারণ আহমদীদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব কী কী? তারা কীভাবে জামা'তের এই আমানত সঠিক প্রাপকের নিকট পৌঁছাবেন? এ বিষয়ে আপনারা জানেন যে, নির্বাচনের পূর্বে নীতিমালা পড়ে শোনানো হয় এবং দোয়া করে সঠিকভাবে ভোট দেবার চেষ্টা করা হয় আর মূলত এটিই জামা'তের রীতি। এটিও দেখার বিষয় যে, আপনি কাকে ভোট দিচ্ছেন? আপনার দৃষ্টিতে সর্বাধিক খোদাভীরু একজন মুত্তাকী ব্যক্তিকে ভোট দেবার চেষ্টা করা উচিত। আর যে পদের জন্য নির্বাচিত করা হচ্ছে, সে বিষয়ে যেন তার কিছুটা হলেও জ্ঞান থাকে। আবার এটিও দৃষ্টিতে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি যেন জামা'তের কাজের জন্য সময় দিতে পারেন। যতটা সময়ের কুরবানী তার পক্ষে করা সম্ভব তা যেন তিনি করেন। আর কেবল আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের কারণে তাকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করবেন না। এমন ব্যক্তি যিনি নিজের ব্যস্ততার দরুন জামা'তের কাজের জন্য কোনো সময়ই ব্যয় করতে পারেন না, তাকে কেবল আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্বের কারণে যদি কর্মকর্তা বানানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে এটিই হলো আমানত সঠিক ব্যক্তির হাতে তুলে দেবার বিপরীত আচরণ। যোগ্য ব্যক্তির হাতে আমানত তুলে দেবার মানসে যদি নির্বাচন করা হয়, তবে নির্বাচন আশিসমণ্ডিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। এর ফলে তারাই কর্মকর্তা হিসেবে সামনে আসবেন যারা আত্মম্ভরিতা না করে এবং নিজেকে যোগ্য মনে না করে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য কামনা করে। আর যাদের সকল কাজে বিনয় প্রকাশ পাবে, এ ধরনের লোকেরাই আপনাদের অধিকার প্রদানে যত্নবান হবেন আর জামা'তের ব্যবস্থাপনাও সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করবেন। কখনো কখনো এমন লোকও দেখা যায় যারা বলে, আমাদেরকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করো। তাদের ব্যাপারে এ হাদীসটি রয়েছে যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) **'হাকায়েকুল ফুরকান'**-এ উদ্ধৃত করেছেন। "হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে দুই ব্যক্তি বলে, আমাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করুন কেননা আমরা এর যোগ্য। তিনি (সা.) বলেন, আমরা যাদেরকে আদেশ দেই তাদেরকে খোদা সাহায্য করেন পক্ষান্তরে যে (চেষ্টা করে) নিজের কাঁধে নিজেই দায়িত্ব নেয়, তার সাথে খোদার সাহায্য থাকে না। অতএব তোমরা নিজেরা পদ কামনা কোরো না।" (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০২, পৃ. ৩০)

কর্মকর্তা ও জামা'তের প্রত্যেক কর্মীর একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোনো বিভাগের কর্মকর্তার নিকট যদি কোনো বিষয় উপস্থাপিত হয় কিংবা কোনো কর্মী যদি কোনো বিষয় জ্ঞাত হন, তা তার দৃষ্টিতে যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন, সেটি তার নিকট একটি আমানত এবং অন্যদের কাছে এটি বলে বেড়ানোর কোনো অধিকার তার নেই, কেননা এটি একটি গোপন বিষয়। এমনিতেই কারো দুর্বলতা প্রকাশ করা একটি অপছন্দনীয় কাজ এবং নিষিদ্ধ, বরং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

অনেক সময় সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথাও লোকমুখে ঘুরতে থাকে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, অমুক কর্মী তমুক ব্যক্তির নিকট সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কথাটি বলেছেন, কিন্তু তা নিদেনপক্ষে একশ গুণ অতিরঞ্জিতরূপে সমাজে বিচরণ করে। যার সম্পর্কে কথা বলা হয় তার কানে যখন বিষয়টি আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেটি তার কষ্টের কারণ হয়। প্রথমত, বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট, আর যদি ঘটনা প্রকৃত অর্থে এমনই হয় যেরকম প্রচার করা হয়েছে, তবে কারো সম্মানহানী করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?

এরপর রয়েছে পরামর্শ করার বিষয়টি। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কর্মকর্তার সাথে কিংবা অন্য কারো সাথে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করে তবে তা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় এবং একটি আমানতস্বরূপ। একজন ব্যক্তি তোমাদের নিকট পরামর্শের জন্য আসলে তোমরা যদি তাকে নিজের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে পরামর্শ দাও, তবে এর ফলে তোমরা যথাযথভাবে তার আমানত ফিরিয়ে দিলে। এই পরামর্শের বিষয়টি এখন অন্য কারো সাথে বলে বেড়ানোর কোনো অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা যদি এমনটি করো তবে তা বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়বে। কর্মকর্তা এবং কর্মীবৃন্দ উভয়েরই নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি সদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত,

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমানত যখন পদদলিত হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। এক প্রশ্নকর্তা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমানত পদদলিত হবার অর্থ কী? তিনি (সা.) বলেন, অযোগ্য ব্যক্তিকে যখন শাসক নিযুক্ত করা হবে তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করো। (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক, বাব রাফউল আমানাত)

অতঃপর তিবরানী কবীরে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, যার মাঝে বিশ্বস্ততা নেই তার মাঝে ঈমান নেই। যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার কোনো ধর্ম নেই। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! যার কথা পবিত্র নয় তার হৃদয় পবিত্র হতে পারে না আর হৃদয়ের বিশুদ্ধতা ছাড়া কারো কথা পবিত্র হতে পারে না। আর যে ব্যক্তি অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ ব্যয় করবে তা আশিসমণ্ডিত হবে না আর তা হতে দানদাক্ষিণ্য করা হলেও তা গ্রহণ করা হবে না। এর মধ্য থেকে যতটুকু তার কাছে থাকবে তা তাকে জাহান্নামী বানানোর কারণ হবে। মন্দ কখনো মন্দের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না, বরং ভালো কাজ, ভালো কাজের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকে। (আল-মু'জামুল কাবীরুত্ তিবরানী, খণ্ড: ১০, পৃ. ২২৭)

কর্মকর্তা বা কর্মীদের সদা স্মরণ রাখা উচিত, পদও একটি অঙ্গীকার বা চুক্তি। আবার সেবাদানও খোদা এবং তাঁর বান্দাদের মাঝে একজন কর্মী বা কর্মকর্তা হিসেবে নিজ দায়িত্বাবলি পালনের বিষয়ে একটি চুক্তিবিশেষ। কেবল বুলিসর্বস্ব নয়, বরং প্রকৃত আন্তরিকতার সাথে যদি প্রত্যেক কর্মকর্তা এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান যে, ধর্মসেবা একটি ঐশী কৃপা এবং আমার ভ্রান্ত চিন্তাধারার কারণে এই কৃপা কোথাও কেড়ে নেওয়া না হয়– তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের উন্নতির গতি বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। আমাদের সবার এটি ভাবার বিষয় এবং চিন্তার বিষয় যে, আমানত রক্ষা করা ঈমানের অঙ্গ। আমানত যদি সঠিকভাবে রক্ষা না করে থাকেন কিংবা নিজের অঙ্গীকার সঠিকভাবে রক্ষা না করেন অথবা যে সীমারেখার মধ্যে থেকে দায়িত্বপালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যদি লঙ্ঘন করা হয়, তবে সেই হাদীস অনুযায়ী এ ধরনের মানুষের কোনো ধর্মই নেই। **ধর্মের অনুসরণ করতে হলে প্রথমে নিজের ভাষা পবিত্র করতে হবে। আর বলা হয়েছে, হৃদয়ের বিশুদ্ধতা ছাড়া ভাষা পবিত্র হতে পারে না।** আর এভাবে একটি কড়ার সাথে আরেকটি কড়া যুক্ত হতে থাকবে। অতএব একটি সুন্দর সমাজ গড়তে হলে এই সকল বিষয়ের সংশোধন হওয়া আবশ্যক।

একটি বিষয় আরো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, একথা মৌখিকভাবে বলাই যথেষ্ট নয় যে, আমার অন্তর বিশুদ্ধ, বরং আমাদের প্রত্যেকের সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ রাখতে হবে, খোদা তা'লা হৃদয়ের অবস্থা জানেন। তিনি আমাদের অন্তরের অন্তস্তল সম্পর্কে অবহিত। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিক হতে হবে আর তখনই ধর্মসেবার সুযোগ পাওয়া যাবে, তাকওয়ার মান বজায় থাকবে এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাও সুদৃঢ় হবে আর হতেই থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। যে-সব কর্মকর্তা পূর্ণ তাকওয়ার সাথে (জামা'তের) দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং করছেন তাদের জন্য একটি হাদীসে সুসংবাদ রয়েছে যা আমি এখন পড়ে শুনাচ্ছি।

হযরত আবু মূসা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের ধনসম্পদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যে মুসলমানের ওপর অর্পিত হয়, সে যদি বিশ্বস্ত ও সৎ হয় এবং তাকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয় তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে, কাউকে কোনোকিছু প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হলে সে সানন্দে ও খুশিমনে প্রাপকের প্রাপ্য অধিকার মনে করে তা প্রদান করে, তাহলে এমন ব্যক্তিও সদকা প্রদানকারীর ন্যায় সদকাদাতা বলেই গণ্য হবে। (মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত, আজরুল খাযিনিল আমীন ওয়াল মারআতি.....)

অতএব লক্ষ করুন! পুণ্যকর্ম কীভাবে পুণ্যের জন্ম দিচ্ছে। খোদার জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্যও লাভ হলো, খোদার সৃষ্টির সেবা করার সুযোগও পাওয়া গেল আবার আদেশ পালন করে, বিশ্বস্ততা রক্ষা করে সদকা করার পুণ্যও অর্জন হলো। এর ফলে বিপদাপদ থেকেও নিজেকে সুরক্ষিত করে নিল আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিও অর্জিত হলো।

এরপর বিভিন্ন বৈঠকের মজলিসের (এজেন্ডারূপী) আমানত রয়েছে। কোনো বৈঠকে আপনাকে যদি বন্ধু কিংবা ঘনিষ্ঠ মনে করে আপনার সামনে কথা বলা হয় এক্ষেত্রে এ কথাগুলো বাইরে বলাবলি করা খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা। এছাড়া কোনো বৈঠকে যদি

কারো দোষত্রুটি বা দুর্বলতা দেখতে পান সেক্ষেত্রে তা বাইরে প্রচার করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। এমনকি এই বৈঠকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিকে সেকথা বলা বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন এবং এ বিষয়টি সদা মাথায় রাখা উচিত যে, কোনো সভায় বা বৈঠকে যদি ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কিংবা ব্যবস্থাপনার কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে কথা বলা হয় তবে সেখানে বসেই অভিযোগকারীকে বুঝিয়ে এর নিষ্পত্তি করা সবচেয়ে ভালো আর সেখানেই সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। সংশোধনের কোনো সুযোগ না থাকলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবগত করা উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো কর্মীও এতে জড়িয়ে পড়েন। বর্তমান অবস্থার কারণে পুরুষদের মাথায় বা স্নায়ুতেও বেশি চাপ পড়ছে নাকি নারীদের মতো পুরুষদেরও না বুঝেই কথা বলার অভ্যাস হয়ে গেছে তা জানি না। অনেক সময় অনেক ভালো অভিজ্ঞ কর্মীরাও এতে জড়িয়ে যান; আর তারা এমন সব কথা বলেন যা সে সভায় বা বৈঠকে উপস্থিত লোকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এভাবে নিজেরই অজান্তে একজন কর্মী অপর কোনো কর্মী সম্পর্কে, একজন কর্মকর্তা আরেকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ব্যাপারে অথবা নিজের চেয়ে ছোটো পদের কর্মকর্তা সম্পর্কে কথা বলে লোকদের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণ হচ্ছেন।

দুর্বল প্রকৃতির মানুষ এ ধরনের কথা থেকে তা বাহ্যত যত ছোটো বিষয়ই হোক না কেন নেতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করে। এমন কর্মী বা কর্মচারী যারা নিজেদের কর্মকর্তাদের বিষয়ে এভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে (তাদের দেওয়া) এ সুযোগটি মুনাফিকরা কাজে লাগায় এবং এর ফলে ব্যবস্থাপনার ক্ষতি হয়। অতএব সকল কর্মী এবং কর্মকর্তা যারা ঠাট্টার ছলেও এ ধরনের কথা বলেন, তাদের স্বীয় পদ ও মর্যাদার বিষয়টি মাথায় রেখে এমন আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকা উচিত। সাধারণত সভার কথাবার্তা আমানত হয়ে থাকে, তা বাইরে প্রকাশ হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বা ব্যবস্থাপনা কিংবা কোনো কর্মকর্তা সম্পর্কে যদি কথা বলা হয় আর এতে আপত্তিকর দিক থাকে, তবে সেক্ষেত্রে এ ধরনের কথা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবগত করা উচিত; এমন বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের এর অনুমতি রয়েছে।

অপর একটি হাদীসে এটির অনুমতি এভাবে রয়েছে যে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেন, তিন ধরনের সভা ব্যতীত সকল সভা-বৈঠকের কথাবার্তা আমানতস্বরূপ। প্রথমত, এমন বৈঠক যেখানে অন্যায়ভাবে হত্যাকারীরা পরস্পর বসে পরামর্শ করে থাকে। দ্বিতীয়ত, এমন বৈঠক যেখানে পাপাচার বা ব্যভিচারের পরিকল্পনা করা হয় এবং তৃতীয়ত, এমন বৈঠক যেখানে কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার ষড়যন্ত্র করা হয়।" অতএব যেখানে এমন ষড়যন্ত্র করা হয় যার ফলে কারো ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের কথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছানোও একটি আমানত। তাদেরকে না বললে খিয়ানত করা হবে। তাই জামা'তের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াদি অর্থাৎ কারো ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলা আর তা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যন্ত না পৌঁছানো, এসব বিষয় একই সূত্রে গ্রথিত। কখনো কখনো কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে

এমন কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হয় যা নিছক ভুল বোঝাবুঝির কারণে সৃষ্টি হয়। অথবা অনেক সময় কোনো ব্যক্তি একান্ত ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিজস্ব মহলে বিভিন্ন কথা বলে লোকদেরকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতিতেও আমানত সঠিক প্রাপকের নিকট আপনাদের পৌঁছানো উচিত। অর্থাৎ কথাগুলি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত পৌঁছে দিন। কিন্তু এরপরও ঢালাওভাবে এসব কথা এদিক-সেদিক বলে বেড়ানোর কোনো অধিকার কারো নেই। বরং যার বিরুদ্ধে কথা বলা হচ্ছে সেই কর্মকর্তার সাথে যদি আপনার সম্পর্ক থাকে তবে তার কান পর্যন্ত শুধু এতটুকু পৌঁছে দিন যে, আপনার ব্যাপারে এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। তা যদি সত্য হয় তবে সংশোধন করে নিন আর যদি তা ভুল হয় তবে এর নিরসনকল্পে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে চান, তা করুন। অতঃপর যারা অন্যের পিঠপিছে কথা বলে অভ্যস্ত, তাদের সদা এটি মনে রাখা উচিত, সেসব কথা সত্য হোক কিংবা মিথ্যা- তা গীবত বা মিথ্যার গণ্ডিভুক্ত। গীবতকারীদের এই হাদীসটি স্মরণ রাখা উচিত, পরকালে তাদের নখ হবে তামা দিয়ে বানানো যা দিয়ে তারা নিজের চেহারা এবং বুকের মাংস আঁচড়াতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এ থেকে রক্ষা করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদা আমাদেরকে যে-সব নিয়ামত দান করেছিলেন সেগুলো যখন আমরা ফেরত দেবো বা দিতে প্রস্তুত হয়ে যাব, তখনই আমরা সত্যিকার বান্দা বলে সাব্যস্ত হতে পারব। আমাদের প্রাণ হলো তাঁর আমানত এবং তিনি বলেন, 'তুওয়াদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা' (অর্থাৎ আমানতসমূহ তার সঠিক প্রাপককে ফিরিয়ে দাও –অনুবাদক)।" [তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ২৪৫, নব সংস্করণ, প্রকাশ: রাবওয়া]

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমানতসমূহ এর সঠিক প্রাপকদের ফিরিয়ে দাও। বিশ্বাসঘাতকদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।"

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "মুমিন তারাই– যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকে অর্থাৎ আমানত প্রত্যর্পণ ও অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে তাকওয়া ও সাবধানতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে তারা কোনো প্রকার ত্রুটি করে না। এটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, মানুষের জীবন এবং তার সমস্ত শক্তিবৃত্তি যেমন- দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি ও হাত-পায়ের শক্তি এ সবই আল্লাহ্ তা'লার আমানত যা তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন আর তিনি যখন ইচ্ছা তা ফেরত নিতে পারেন। অতএব এই আমানতসমূহ রক্ষার অর্থ হলো, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাজে আত্মা এবং এর সকল শক্তি এবং দেহ ও এর সকল শক্তিবৃত্তি এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কাজে লাগানো, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এ সবকিছু তার নয় বরং খোদার। এছাড়া তার কোনো ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা তার নয় বরং খোদার আর খোদার ইচ্ছানুসারে যেন সমস্ত শক্তিবৃত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গতিশীল কিংবা স্থিতিশীল হয়। তার নিজের যেন কোনো ইচ্ছা অবশিষ্ট না থাকে, বরং খোদার ইচ্ছাই তার মাঝে সক্রিয় হয় আর তার সত্তা যেন খোদা তা'লার হাতে তেমনি থাকে যেভাবে জীবন্ত মানুষের হাতে এক শবদেহ হয়ে থাকে। সে যেন নিজের মতামতকে জলাঞ্জলি দেয় (অর্থাৎ

নিজের সত্তা বলে কোনোকিছু অবশিষ্ট থাকে না) এবং তার সত্তার ওপর খোদা তা'লার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি সে যেন তাঁরই মাধ্যমে দেখে, তাঁরই মাধ্যমে শোনে, তাঁরই মাধ্যমে কথা বলে এবং তাঁরই মাধ্যমে চলে ও থামে। ফলে মানব প্রবৃত্তির ছোটো ছোটো দুর্বলতা যা কোনো অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না তা দূর হয়ে কেবল বিশুদ্ধ আত্মা রয়ে যায়। সর্বোপরি খোদা তা'লার 'মুহাইমিন' বৈশিষ্ট্য তাকে পরিবেষ্টন করে নেয়। (অর্থাৎ মানুষ পরিপূর্ণরূপে খোদার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যায়)। ফলে সে যেন নিজ সত্তা থেকে সেটিকে (অর্থাৎ দুর্বলতাকে) বের করে দেয়। তার নিজ সত্তার ওপরই তার কোনো কর্তৃত্ব থাকে না এবং সমস্ত শাসন খোদার জন্য হয়ে যায়। মানবীয় সকল আবেগ-অনুভূতি যেন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা খোদার সত্তায় উৎসর্গীত হয়ে যায়। নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মার সমস্ত অট্টালিকা যেন ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয় আর হৃদয়ে এমন এক পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রাসাদ নির্মাণ করা হয় যাতে মহাসম্মানিত খোদা অবতরণ করতে পারেন এবং তাঁর রূহ সেখানে উন্নতি করতে পারে বা বসতি গড়তে পারে। এরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করার পরই বলা যাবে, সত্যিকার নিয়ামতদাতা খোদা যে-সব আমানত মানুষকে দিয়েছিলেন সেগুলো যথাযথভাবে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। তখন গিয়ে এমন মানুষের জন্য এই আয়াত সত্য বলে প্রতীয়মান হবে যে–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

[অর্থাৎ আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান (আল-মুমিনূন: ৯) –অনুবাদক]।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মানুষের সৃষ্টিতে দুই ধরনের সৌন্দর্য বিদ্যমান। একটি হলো, সততাভিত্তিক লেনদেন বা আচার আচরণ অর্থাৎ খোদা তা'লার সমস্ত আমানত প্রত্যর্পণ ও অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে মানুষের এমনভাবে যত্নবান হওয়া যেন যথাসাধ্য এ সংক্রান্ত কোনো কাজ বাদ না পড়ে। খোদা তা'লার বাণীতে বিদ্যমান رٰعُوْنَ শব্দটি একদিকে ইঙ্গিত করে, অনুরূপভাবে সৃষ্টিকুলের আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি রাখাও মানুষের জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করা আর এটিই হলো সঠিক লেনদেন অথবা এটিকে প্রকৃত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বলতে পারো।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়া-কে পোশাক নামে অভিহিত করেছেন। لِبَاسُ التَّقْوٰى কুরআন শরীফের শব্দ। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাকওয়ার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক রূপ-সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। তাকওয়া হলো খোদা তা'লার সকল আমানত ও ঈমানী অঙ্গীকার এবং একইভাবে সৃষ্টিকুলের সকল আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষায় মানুষের সর্বাধিক যত্নবান হওয়া অর্থাৎ এগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর ওপর সাধ্যমতো প্রতিষ্ঠিত থাকা।"

তিনি (আ.) বলেন, "আমানতের অর্থ হলো, পরিপূর্ণ মানবের সেসব শক্তিবৃত্তি, জ্ঞানবুদ্ধি, মনপ্রাণ, ইন্দ্রিয়, ভয়ভীতি, প্রেমপ্রীতি, মানসম্মান এবং সকল আত্মিক ও দৈহিক নিয়ামত যা খোদা তা'লা তাকে প্রদান করেন। এরপর–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

(অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ এর প্রাপককে প্রত্যর্পণ করো –অনুবাদক)– আয়াত অনুসারে পরিপূর্ণ মানব এসব আমানত খোদা তা'লাকে প্রত্যর্পণ করে অর্থাৎ তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে তাঁরই পথে উৎসর্গ করে দেয়। আর এ মর্যাদা সর্বোচ্চ, পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীনরূপে বিদ্যমান ছিল আমাদের নেতা ও অভিভাবক এবং আমাদের পথপ্রদর্শক, সত্যবাদী ও সত্যায়িত উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্তায়।" [আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ. ১৬১-১৬২]

অতএব স্মরণ রাখবেন! আমানতের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। জামা'তের কর্মকর্তারা আমানতের অর্থ যত বেশি গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করবেন তত বেশি তাকওয়ার মান উন্নত হতে থাকবে। হুকুকুল্লাহ্ (আল্লাহ্র প্রাপ্য) এবং হুকুকুল ঈবাদ (বান্দার অধিকার) প্রদানের মান উন্নত হতে থাকবে। নেযামে জামা'ত তথা খিলাফত ব্যবস্থা সুদৃঢ় হবে। জামা'তী ব্যবস্থাপনার সাথে আপনার বন্ধন অটুট থাকবে। খিলাফত-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে যুগ-খলীফার সদা এ দোয়াই থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যেন মুত্তাকীদের ইমাম বানান। অতএব তারাই হবেন সেসব দোয়ার ধারক ও বাহক– যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে যত্নবান, স্বীয় খোদার সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের প্রত্যেক সদস্যকে এই মান ধরে রাখার সামর্থ্য দিন। আমীন।

(১৭)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৫ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ১৫ যহুর ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٢﴾

(আল-আনফাল: ৬২)

পৃথিবীতে খোদার সত্তায় আস্থা আল্লাহ্ তা'লা সবচেয়ে বেশি সৃষ্টি করে থাকেন নবী-রসূলদের মাঝেই। তিনি স্বয়ং তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তোমরা চিন্তিত হয়ো না আমি প্রতিটি পদক্ষেপে তোমাদের সাথে আছি। শত্রু তোমাদের কোনো কষ্ট দিতে (অর্থাৎ মুষড়ে ফেলতে) পারবে না। আমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা। শত্রু যদি নোংরা দৃষ্টিতে দেখার কিংবা কোনো ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করে তাহলে আমি স্বয়ং এর সুরাহা করব, যিনি সকল বিষয়ে অবগত এবং তোমার দোয়া শ্রবণকারী। আর একইভাবে অন্যান্য দৈনন্দিন বিষয়েও নবীদের খোদাতে আস্থা অনেক বেশি থেকে থাকে কেননা তারা এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন যে, প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্ তাদের সহায় এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি তাদের সাথে আছেন। একইভাবে আধ্যাত্মিক মান ও মর্যাদার নিরিখে মুমিনদের মাঝেও খোদানির্ভরতার (ভিন্ন ভিন্ন) মান প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এখনই আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তার অর্থ হলো, "আর তারা যদি সন্ধির জন্য হাত বাড়ায় তাহলে তুমিও এর জন্য হাত বাড়িয়ে দিও এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আল-আনফাল: ৬২)

তফসীরে রূহুল মায়ানী-তে আল্লামা শিহাবউদ্দিন আলুসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন–

" وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ -এর অর্থ হলো, নিজের যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহ্ তা'লার হাতে সঁপে দাও আর এতে ভয় পেয়ো না। তারা যদি তোমার দিকে সন্ধির হাত সম্প্রসারিত করে তাহলে সতর্ক থেকো যেন আবার এতে কোনো প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত না থাকে। 'إِنَّهُ' -এর অর্থ হলো, মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লা। 'هُوَ السَّمِيعُ' দ্বারা বুঝায়, ধোকা দেবার জন্য তারা নিরলে যে শলাপরামর্শ করে আল্লাহ্ তা'লা এর সবই শোনেন। 'الْعَلِيمُ' -এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাদের অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি সম্পর্কে সম্যক অবগত। অতএব তিনি তাদেরকে যথাযোগ্য ভাবে পাকড়াও করবেন এবং তাদের সকল ষড়যন্ত্রের কুফলে তাদেরকেই জর্জরিত করবেন। (তফসীরে রূহুল মায়ানী, খণ্ড: ৬, পৃ. ২৭)

কাজেই, এখানে এর মাধ্যমে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যুদ্ধংদেহি ধর্মবলে ইসলামের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তা এখানে খণ্ডিত হয়েছে। অর্থাৎ শত্রু

যদি নিজের দুর্বলতার কারণে কিংবা ষড়যন্ত্রমূলকভাবেও সন্ধি করতে চায় তবে তোমরাও আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সন্ধি করো, কেননা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাদের বিজিত হওয়া কিংবা তাদেরকে মুসলমান বানানোর পরেই কেবল শান্তির ভিত রচনা করা হবে এমন নয়, বরং তাদের পক্ষ থেকে যদি সন্ধির হাত বাড়ানো হয় তবে তোমরাও সন্ধি স্থাপনে হাত প্রসারিত করো আর এটিই মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ। তখন এ চিন্তা করবে না যে, শত্রু এখন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছে, সে শক্তি সঞ্চয় করতে চায় এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম জোগাড় হলে আক্রমণ করা তাদের উদ্দেশ্য। অতএব এ থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসলমানরা সে যুগেও কেবল নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থেই যুদ্ধ করেছিল। তাই শত্রু নিজের শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় আক্রমণ করার আশঙ্কা রয়েছে জেনেও যেহেতু সন্ধির হাত বাড়িয়েছে; তাই তোমরা সন্ধি করো এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করো, তাহলে তিনি নিজেই তত্ত্বাবধান করবেন। সুতরাং এর মাধ্যমে এ আপত্তিরও খণ্ডন হলো।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ আয়াতের প্রথমাংশ অর্থাৎ 'তারা যদি সন্ধির হাত প্রসারিত করে তবে তোমরাও সন্ধি করো'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, **"প্রকৃতপক্ষে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে একজন মুমিনকে (মানুষের) পদমর্যাদার বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। যেখানে নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত সেখানে কঠোরতা ও কর্কশতা দেখিও না আবার যেখানে কঠোরতা প্রদর্শন করা ছাড়া কাজ হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, সেখানে কোমলতা প্রদর্শনও পাপবিশেষ।"** একস্থানে এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, **"ফেরাউনের ঘৃণ্যভাবে অস্বীকার করা সত্ত্বেও তার সাথে হযরত মূসা (আ.)-কে নম্রভাবে কথা বলার আদেশ ছিল।"**

ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আহমদীকে এই নীতি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। খোদার প্রতি আস্থা রাখা এবং শত্রুর বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, তা আমি সংক্ষেপে এ আয়াতের ব্যাখায় উপস্থাপন করলাম। অনন্তর আল্লাহ্ তা'লার হাতে বিষয় ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত, কিন্তু দৈনন্দিন বিষয়াবলিতেও আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আস্থা তখনই সৃষ্টি হয় যখন খোদার সত্তা ও শক্তিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস জন্মে। যেমন- এখনই আমি যে আয়াতটি পড়েছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

(আল-আনফাল: ৩)

-এর অর্থ হলো, মুমিন কেবল তারাই– (যাদের সামনে) আল্লাহ্কে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে এবং তাঁর আয়াতসমূহ যখন তাদের সামনে পড়ে শোনানো হয় তা তাদেরকে ঈমানে সমৃদ্ধ করে, আর তারা তাদের প্রতিপালক-প্রভুর ওপরই ভরসা করে। (আল-আনফাল: ৩)

খোদার ওপর নির্ভর করার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.); আর কেনইবা করবেন না– একমাত্র তিনিই 'পূর্ণমানব' ছিলেন। একইসাথে উম্মতকেও এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, তোমরা আমার অনুসরণ করলে, খোদাকে ভালোবাসলে এবং তাঁর সত্তায় ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করলে তিনিও তোমাদেরকে ব্যর্থ করবেন না। তাঁর প্রতি আস্থা রাখলে তিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিরাপত্তা-বেষ্টনীতে স্থান দেবেন।

খোদার প্রতি মহানবী (সা.)-এর আস্থা বা ভরসা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস আমি এখানে বর্ণনা করছি। এগুলো ছোটোবেলা থেকেই আমরা শুনে অভ্যস্ত, কিন্তু যখনই পড়া হয় ঈমানে এক নতুন সজীবতা সঞ্চার করে এবং ঈমান আরো দৃঢ় হয়।

মহানবী (সা.) তায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে যখন নাখলা নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন সেই ঘটনা স্মরণ করুন। হযরত যায়েদ বিন হারেস (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এখন মক্কায় কীভাবে প্রবেশ করবেন কেননা তারা যে আপনাকে বের করে দিয়েছে? দেখুন! মহানবী (সা.) কত অসাধারণ মহিমা ও আস্থার সাথে উত্তর দেন; (তিনি বলেন,) হে যায়েদ! দেখবে আল্লাহ্ অবশ্যই কোনো না কোনো পথ উন্মুক্ত করে দেবেন আর আল্লাহ্ নিজ ধর্মের সাহায্যকারী। তিনি তাঁর নবীকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। অতঃপর তিনি (সা.) কুরাইশ নেতাদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন যেন তারা তাদের আশ্রয়ে তাঁর (সা.) মক্কায় প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেয়। কয়েকজন নেতা অস্বীকৃতি জানালেও অবশেষে মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত নেতা মুতঈম বিন আদী স্বীয় আশ্রয়ে মহানবী (সা.)-কে মক্কায় প্রবেশ করানোর ঘোষণা দেন। পরিশেষে অত্যাচারীদের নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে মক্কা থেকে হিজরতের সময় আসে আর তখন তিনি (সা.) পরম গাম্ভীর্যের সাথে সেখান থেকে হিজরত করেন। গুহায় আশ্রিত অবস্থায় শত্রুরা যখন মাথার ওপর তখনো দেখুন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কীরূপ অসাধারণ আস্থা! তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে তিনি (সা.) বলেছিলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে গুহায় ছিলাম। আমি মাথা উঁচিয়ে তাকালে হঠাৎ পশ্চাদ্ধাবনকারীদের পা দেখতে পাই। তখন আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কেউ যদি একটু ঝুঁকে তাকায় তবে আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি (সা.) বললেন, হে আবু বকর! নীরব থাকো, আমরা দুইজন আর আমাদের সাথে তৃতীয়জন রয়েছেন "খোদা তা'লা"। অতএব এটি হলো, খোদার ওপর আস্থার সেই উন্নতমান যা একমাত্র মহানবী (সা.)-এর জীবনেই আমরা দেখতে পাই। অতঃপর আপনারা দেখুন! গুহা থেকে বেরিয়ে তিনি (সা.) যখন যাত্রা আরম্ভ করেন তখন (শত্রুর ভয়ের বিষয়ে) কীরূপ ভ্রুক্ষেপহীনতা এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় কত গভীর আস্থা তাঁর (সা.) ছিল!

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, হিজরতের সময় ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে সুরাকা যখন আমাদের অতি নিকটে পৌঁছে যায় তখন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তো একেবারে নাকের ডগায় পৌঁছে গেছে আর আমি আমার জন্য নয় বরং আপনার জন্য চিন্তিত। তিনি (সা.) বলেন, "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا" অর্থাৎ চিন্তা কোরো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন (আত-তাওবা: ৪১)। অতএব ঐ সময়ই তাঁর (সা.) দোয়ার কল্যাণে সুরাকার ঘোড়ার পা মাটিতে

দেবে যায় আর সে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিরাপত্তা চায়। সে সময় তিনি (সা.) সুরাকার স্বপক্ষে এই মহান ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, হে সুরাকা! তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন কিসরার কঙ্গণ তোমার হাতে পরানো হবে? আর এই ভবিষ্যদ্‌বাণীও পরবর্তীতে অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়।

এরপর সেই মহিমাও দেখুন! যখন তিনি (সা.) শত্রুর কাছ থেকে মাত্র এক ফুট দূরত্বে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে ছিলেন আর শত্রু তরবারি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু (তাঁর) কোনো ভয় ছিল না। কীরূপ ঈমান, বিশ্বাস এবং খোদা তা'লার সত্তায় কতটা আস্থা ছিল তাঁর!

হযরত জাবের (রা.) বলেন, 'যাতুর্ রিকা'-র যুদ্ধে আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। একদিন আমরা ছায়াপ্রদ একটি বৃক্ষের নিকট পৌঁছাই। মহানবী (সা.)-এর বিশ্রামের জন্য সেটিকে নির্বাচন করা হয়। হঠাৎ এক মুশরিক সেখানে আসে যখনকিনা মহানবী (সা.)-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। সেই ব্যক্তি তরবারি উঁচিয়ে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় পাও, নাকি পাও না? মহানবী (সা.) তাকে উত্তর দেন, পাই না। সে আবার বলল, কে তোমাকে আমার কাছ থেকে রক্ষা করতে পারে? তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্। এতে তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) সেটি উঠিয়ে বললেন, এখন আমার হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচাবে? তখন সে বলতে আরম্ভ করে, আপনি (আমাকে) ক্ষমা করুন। তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর আমি আল্লাহ্‌র রসূল? সে যেহেতু কট্টর মুশরিক ছিল তাই উত্তরে বলল, না; কিন্তু আমি এই অঙ্গীকার করছি, আপনার সাথে আর কখনো লড়াই করব না আর তাদের সাথেও যোগ দেবো না যারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে। তখন তিনি (সা.) তাকে ছেড়ে দেন। এরপর সে তার সঙ্গীদের সাথে গিয়ে যোগ দেয় আর তাদের বলতে থাকে, আমি এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি যিনি লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াতু যাতুর্ রিকা')

একথা সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে ব্যবহার এবং যে অঙ্গীকার ছিল, তা সাধারণ মুসলমান ও মানুষের ক্ষেত্রে হতে পারে না কিন্তু যেমনটি এই হাদীস থেকে স্পষ্ট– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাতের বেলা মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে পাহারা দেওয়া হতো। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন এই ওহী "وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" অবতীর্ণ হলো। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মানুষের দুরভিসন্ধি হতে তোমাকে রক্ষা করবেন। তখন মহানবী (সা.) তাঁবুর বাইরে উঁকি দিয়ে বললেন, তোমরা এখন চলে যেতে পারো, কেননা খোদা তা'লা স্বয়ং আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু নিজ উম্মতকে খোদা তা'লার সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এবং তাঁর প্রতি আস্থা রাখার বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করে একস্থানে তিনি (সা.) বলেন, **'আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা এমন মানুষ হবে যারা অন্যের দোষত্রুটি সন্ধানে রত থাকে না। আর তারা (গণক দ্বারা) শুভাশুভ নির্ণয়ের কুসংস্কারেও লিপ্ত থাকবে না, বরং স্বীয় প্রভুর প্রতি আস্থা রাখবে**– এটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।' (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক, বাব ইয়াদখুলুল জান্নাতা সাবউনা আলফান ...)

অতএব এ হাদীসের আলোকে এটি স্পষ্ট হয় যে, উম্মতের লোকেরা যদি আল্লাহ্ তা'লা-প্রদত্ত শিক্ষামালা মেনে চলে, বৃথালাপ ও অপকর্মে লিপ্ত না হয়, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে, স্বীয় প্রভুর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাঁর প্রতি আস্থা রাখে এবং তাঁরই সমীপে বিনত হয় তাহলে তারা কোনো হিসাবের সম্মুখীন না হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কাজেই, এখানে সংখ্যার যে উল্লেখ আছে তা আধিক্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পাশাপাশি এই ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে যে, আমার উম্মতে ব্যাপকহারে এমন লোক (সৃষ্টি) হবে ইনশাআল্লাহ্, যারা আল্লাহ্র সত্তায় ভরসাকারী হবে আর কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এমন নয় যে, সত্তর হাজার সংখ্যা পূর্ণ হওয়া মাত্রই ফেরেশতারা জান্নাতের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলবে, এখন পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী এবং খোদার সত্তায় আস্থাশীল শেষ ব্যক্তি জান্নাতে ঢুকে গেছে তাই এখন আর সুযোগ নেই! এখন তোমরা যতই খোদার ওপর ভরসা করো না কেন কিংবা পুণ্য কাজ করো না কেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না! এমন নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের দ্বার কখনো বন্ধ হয় না। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের দোয়া– আমাদের প্রত্যেক আহমদী যেন খোদার সত্তায় পূর্ণ আস্থাশীল হয় আল্লাহর সত্তায় ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয় এবং তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের চাদরে আবৃত থাকে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'স্মরণ রেখো! শিরক বলতে কেবল প্রতিমা কিংবা পাথর কেটে বানানো মূর্তির পূজা করাকেই বুঝায় না; এটি একটি (সাধারণ) জানা কথা। এটি চরম নির্বোধদের কাজ বইকি। জ্ঞানী ব্যক্তির এটি দেখেও লজ্জা হয়। শির্ক অনেক সূক্ষ্ম একটি বিষয়। যে শিরক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্বংস করে তা হলো, জাগতিক উপায়-উপকরণকে (আল্লাহ্র) অংশীদার করা অর্থাৎ উপকরণের ওপর এতটাই ভরসা করা যেন সেটিই তার (জীবনের) মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তির ধর্মের ওপর পার্থিবতাকে প্রাধান্য দেবার কারণও এটিই যে, সে জাগতিক উপকরণের ওপর নির্ভর করে আর (এসবে) সেই প্রত্যাশা রাখে যা ধর্ম ও ঈমানে থাকে না। 'নগদ লাভ' পছন্দ করে আর পরকালের বিষয়ে থাকে হতভাগা ও বঞ্চিত। জাগতিক উপকরণকেই নিজের সকল সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু জ্ঞান করার কারণে সে খোদা তা'লার সত্তাকে একেবারেই বৃথা এবং অকেজো মনে করে, কিন্তু তোমরা এমনটি কোরো না। তোমরা খোদাতে নির্ভর করো। আর খোদানির্ভরতা হলো, আল্লাহ্ তা'লা কোনো কার্যসাধনের জন্য যে-সব উপকরণ নির্ধারণ করেছেন যতদূর সম্ভব সেগুলো কাজে লাগাও আর এরপর এভাবে দোয়া করো যে, হে খোদা! তুমিই এ কর্মের পরিণতি শুভ করো। শতসহস্র এমন বিপদাপদ ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা এসব উপকরণকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দিতে পারে। কৃষকেরা এই উদাহরণ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত, ফসল উদ্গত হয়, বড়ো হয় আর পাকার সময় ঘনিয়ে আসে কিন্তু আচমকা তুফান আসে, শিলাবৃষ্টি হয় ফলে ফসল একেবারে কর্তিত খড়কুটার ন্যায় হয়ে যায়।'** তিনি (আ.) বলেন, **'কাজেই এই দোয়া করা উচিত, (হে আল্লাহ্!) তুমি এগুলোর ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ থেকে আমাদের রক্ষা করে প্রকৃত সাফল্য এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দাও।'**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা হলেন প্রকৃত জীবিকা বিধায়ক। তাঁর ওপর যে আস্থা রাখে সে কখনো রিযক থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। তিনি সকলভাবে এবং সকল স্থান থেকে তাঁর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তির জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করে থাকেন। খোদা তা'লা বলেন, আমার প্রতি যে ভরসা এবং আস্থা রাখে তার জন্য আমি আকাশ থেকে (নিয়ামত) বর্ষণ করি এবং ভূমি থেকেও উদ্‌গত করি। অতএব প্রত্যেকের খোদা তা'লার ওপর নির্ভর করা উচিত।'**

একটি ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"একবার হঠাৎ আমাদের পঞ্চাশ রুপির প্রয়োজন দেখা দেয়। খোদার ওপর পূর্ণ ভরসাকারী ও দরিদ্রদের জীবনে যেমনটি কখনো কখনো ঘটে থাকে ঠিক তেমনি সে সময় আমাদের কাছে কিছু ছিল না। ভোরে যখন আমি প্রাতঃভ্রমণে বের হই তখন সেই প্রয়োজনের চিন্তাই আমাকে এই জঙ্গলে দোয়া করতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং আমরা সেই খালপাড়ের একটি নির্জন স্থানে গিয়ে দোয়া করলাম যা কাদিয়ান থেকে তিন মাইল দূরে বাটালার পথে অবস্থিত। আমার দোয়া শেষ হওয়া মাত্রই একটি ইলহাম হয় যার অর্থ হলো, 'দেখো! আমি তোমার দোয়া কত দ্রুত কবুল করি।' তখন আমরা প্রফুল্লচিত্তে কাদিয়ানে ফেরত আসি এবং বাজারের দিকে যাই যেন ডাকঘরে জিজ্ঞেস করতে পারি, আজকে আমার নামে কোনো রুপি এসেছে কিনা? আমি একটি চিঠি পাই যাতে লেখা ছিল, লুধিয়ানা থেকে কেউ একজন পঞ্চাশ রুপি প্রেরণ করেছে। সম্ভবত সেদিন কিংবা তার পরের দিন সেই রুপি আমি পেয়ে যাই।"** (নুযূলুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ৬১৭)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"খোদা তা'লার ওপর ভরসা বা নির্ভর করার অর্থ এই নয় যে, মানুষ চেষ্টাপ্রচেষ্টা ছেড়ে দেবে বরং এর অর্থ হলো, সর্বাত্মক চেষ্টার পর পরিণাম খোদা তা'লার হাতে সঁপে দেবার নামই হলো তাওয়াক্কুল বা খোদানির্ভরতা। কেউ যদি চেষ্টাপ্রচেষ্টা না করে কেবল খোদার প্রতি ভরসা করে বসে থাকে তবে তার আল্লাহ্‌তে নির্ভর করা হবে অন্তঃসারশূন্য।"** (অর্থাৎ যার ভেতর কিছু নেই) **"আবার চেষ্টা করে যদি কেবল চেষ্টার ওপরই নির্ভর করে আর খোদা তা'লার ওপর ভরসা না করে তবে সেই প্রচেষ্টাও হবে অন্তঃসারশূন্য।"** (এর মাঝে কিছু নেই) **"এক ব্যক্তি উটের ওপর আরোহিত ছিল আর মহানবী (সা.)-কে দেখতে পেয়ে সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে নীচে নামে কিন্তু সে উটের পা বাঁধে নি বা উটকে বাঁধে নি। অর্থাৎ কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে কেবল তাওয়াক্কুল বা খোদাতে নির্ভর করা ছিল তার উদ্দেশ্য। মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে গিয়ে দেখে, উট নেই। ফিরে গিয়ে সে মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে, 'আমি খোদার ওপর নির্ভর করেছিলাম কিন্তু আমার উট তো হারিয়ে গেল।' তিনি (সা.) বললেন, তুমি ভুল করেছ। উটের পা বাঁধার পর খোদার ওপর নির্ভর করলে ঠিক হতো।"** (বদর পত্রিকা, ১ মার্চ ১৯০৪, মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫৬৬)

তিনি (আ.) বলেন, **"খোদার প্রতি নির্ভরশীল এবং তাঁর সমীপে বিনতরা কখনো বিনষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি কেবল নিজের চেষ্টাতেই লেগে থাকে সে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিবা পেতে পারে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আল্লাহ্ তা'লার রীতি সবসময় এটিই চলে আসছে, যারা**

জগৎকে পরিত্যাগ করে তারাই তাঁকে পায় আর যারা জগতের পেছনে ছুটতে থাকে তারা (তাঁকে লাভের ক্ষেত্রে) হতভাগাই থেকে যায়। খোদা তা'লার সাথে যারা সম্পর্ক রাখে না তারা কিছুদিন ছলচাতুরি করে কিছু অর্জন করলেও তা বৃথা, কেননা পরিশেষে তাদেরকে চরম ব্যর্থতাই দেখতে হয়। ইসলামের ইতিহাসে উত্তম মানুষ তারাই ছিলেন যারা ধর্মের বিপরীতে জাগতিকতাকে কোনো গুরুত্বই দেন নি। ভারতবর্ষে কুতুবউদ্দীন এবং মুঈনুদ্দীন নামে খোদার দুই আওলিয়া অতীত হয়েছেন যারা ধর্মের খাতিরে জগতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। তারা নিভৃতে খোদা তা'লার ইবাদাত করেছেন কিন্তু খোদা তা'লা তাদের সম্মান প্রকাশ করে দিয়েছেন।" (বদর পত্রিকা, ৮ আগস্ট ১৯০৭, মলফুযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ২৪৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কিত এ ঘটনাটিও ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

১৯০৩-১৯০৪ সালে মৌলবি করম দ্বীন-সংক্রান্ত মোকাদ্দমার সূত্র ধরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গুরুদাসপুরে যেতেন। একবার তিনি (আ.) সেখান থেকে বার্তা পাঠান, হযরত মৌলবি নূরউদ্দীন সাহেব এবং হযরত শেখ ইয়াকূব আলী ইরফানী সাহেব যেন দ্রুত সেখানে চলে আসেন। শেখ সাহেব বলেন, আমি এবং হযরত মৌলবি সাহেব দুপুর দু'টার পর এক্কায় বসে বাটালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। শেখ সাহেবের হৃদয়ে এ ধারণা উঁকি মারে যে, হযরত মৌলবি সাহেব প্রায়শ বলেন, আমার সাথে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আমি যদি কোনো ঊষর জনহীন প্রান্তরেও থাকি তবে খোদা তা'লা আমাকে রিযক দান করবেন এবং আমি কখনো ক্ষুধার্ত থাকব না। আজকে আমরা অসময়ে বের হয়েছি তাই দেখা যাবে রাতে তার খাবারের কী ব্যবস্থা হয়। অতঃপর তিনি বলেন, বাটালায় স্থানীয় জামা'তের একটি বাড়ি অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। হযরত মৌলবি সাহেব সেখানে একটি খাটের ওপর শুয়ে বই পড়তে আরম্ভ করেন। সে সময় আনুমানিক সন্ধ্যা ছয়টা বেজেছিল। হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক আসেন আর বলেন, আমি শুনেছি, আজ মৌলবি নূরউদ্দীন সাহেব এসেছেন, তিনি কোথায়? আমি বললাম, তিনি এখানে শুয়ে আছেন। সেই ব্যক্তি বলতে লাগল, হুযূর! আমার একটি নিবেদন হলো, আজ রাতে আপনি আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আমি রেলওয়েতে ঠিকাদারি করি, আমার জন্য ব্যালিস্ট ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, আমি অমৃতসর যাবো। আমার কর্মচারী হুযূরের জন্য খাবার নিয়ে আসবে। হযরত মৌলবি সাহেব বললেন, খুব ভালো কথা। অতঃপর তার কর্মচারী সন্ধ্যাবেলা খুবই সুস্বাদু খাবার নিয়ে উপস্থিত হয় আর আমরা দুইজন পেটভরে তা খাই। শেখ সাহেব বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, তার কথা তো সত্য হলো এবং খোদা তা'লা সত্যিই তার জন্য খাবার পাঠালেন।

ট্রেন যেহেতু রাত দশটার পরে ছাড়ত তাই আমি হযরত মৌলবি সাহেবের নিকট নিবেদন করি, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে পরে আর কুলি পাওয়া যাবে না; তাই কোনো কুলি ডেকে আমরা স্টেশনে পৌঁছে যাই। সেখানে ওয়েটিং রুমে আমরা বিশ্রাম করতে পারব। হযরত মৌলবি সাহেব বললেন, অতি উত্তম। অতঃপর তিনি একজন কুলি ডাকেন... আর সে আমাদের উভয়ের বিছানাপত্র নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে যায়। ট্রেন যেহেতু রাত দশটার

পরে আসার কথা তাই আমি তার বিছানা পেতে দেই, যেন হযরত মৌলবি সাহেব বিশ্রাম নিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী, আমি যখন বিছানোর জন্য বিছানা খুললাম তখন এর মধ্য থেকে কাগজে মোড়ানো দুটি পরোটা বের হয় যার সাথে কিমাও রাখা ছিল। আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হই আর মনে মনে বলি, আরে ভাই! সেই খাবারও আমরা খেয়েছি আবার খোদার পক্ষ থেকেও এ খাবারও এসে গেছে; এই খাবার সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না।

আমি হযরত মৌলবি সাহেবের কাছে নিবেদন করি, হুযূর! কাদিয়ান থেকে অসময়ে হঠাৎ করে যাত্রা করি, তখন আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, আজকে আমি দেখব– মৌলবি সাহেবের খাবার কোথা থেকে আসে। প্রথমে তো আপনাকে দাওয়াতের খাবার খাওয়ানো হলো আর এখন বিছানার মধ্য থেকেই এই পরোটা বের হলো। **হযরত মৌলবি সাহেব বললেন, শেখ সাহেব! আল্লাহ্ তা'লাকে পরীক্ষা করবেন না, বরং তাঁকে ভয় করুন। তাঁর সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তার এক বন্ধুর একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, "আমার এক বন্ধু খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। একদিন এশার নামাযের সময় একজন অতিথি আসে। (সে সময়) তার কাছে কোনো টাকাপয়সা ছিল না। তিনি অতিথিকে বলেন, আপনি একটু বিশ্রাম নিন, আমি আপনার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছি। এরপর তিনি দোয়া করেন, নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করে বললেন, **'উফাভ্যিয়ু আমরি ইলাল্লাহ্ ইন্নাল্লাহা বাসিরুম বিল ঈবাদ'** অর্থাৎ হে আমার প্রভু! ইনি তোমারই অতিথি। সাথে সাথে এক ব্যক্তি শব্দ করে বলল, আরে তাড়াতাড়ি নিন আমার হাত পুড়ে গেল। এক তশতরীভর্তি পোলাও ছিল। সে নিজের নামও বলে নি আর তাড়াহুড়োর কারণে তারও খেয়াল ছিল না। সেই তশতরী বহুকাল পর্যন্ত আমানতস্বরূপ ছিল কিন্তু কোনো মালিক পাওয়া যায় নি। কাজেই, খোদানির্ভরতা এক অদ্ভুত বিষয়।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি, সাহাবীদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি ঈমান এবং বিশ্বাস– বিশেষভাবে এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোয়া গ্রহণ করেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি খোদার প্রতি নির্ভরতার সেই উন্নতমান প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন যা কারো অজানা নয়। এখানে আমি একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা এবং দোয়া গৃহীত হবার বিষয়ে বিশ্বাসের দিকটি স্পষ্ট হয়। আমাদেরও দোয়া করা উচিত।

হযরত তোলাক (রা.) বর্ণনা করেন, **এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রা.)-এর নিকটে এসে বললেন, আপনার বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। একথা শুনে তিনি (রা.) বললেন, আমার বাড়ি পোড়ে নি। এরপর আরেকজন এসে বলল, আপনার বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। তখনো তিনি (রা.) বললেন, আমার বাড়ি পোড়ে নি। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু দারদা (রা.)! আগুন লেগেছিল ঠিকই কিন্তু আপনার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে তা নিভে যায়। তিনি (রা.) বললেন, আমার জানা ছিল, আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করবেন না।**

বৈঠকে উপস্থিত লোকেরা হযরত আবু দারদা (রা.)-কে বললেন, আপনার দুটি কথা খুবই আশ্চর্যজনক। প্রথমে (একথা বলা) যে, আমার বাড়ি পোড়ে নি, তারপর বললেন, আমার জানা ছিল, আল্লাহ্ এমনটি করবেন না। তিনি (রা.) বললেন, আমি এগুলো মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শোনা কিছু কথার ভিত্তিতে বলেছিলাম। তিনি (সা.) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি প্রভাতে এ বাক্যগুলো পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর কোনো বালা-মুসিবত বা বিপদ আসবে না আবার সন্ধ্যার সময় যে এই বাক্যগুলো পড়বে, সকাল পর্যন্ত তার ওপর কোনো বিপদাপদ আসবে না। সেই বাক্যগুলো হলো–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم. مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَلَمْ يِشَآء لَمْ يَكُنْ. لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم. اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّى عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم.

অর্থ: **‘হে আমার আল্লাহ্! তুমিই আমার প্রতিপালক-প্রভু। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমার ওপরই নির্ভর করি এবং তুমিই মহান আরশের অধিপতি। তুমি যা চেয়েছ তা হয়ে গেছে এবং যা তুমি চাও নি তা বাস্তবায়িত হয় নি। অতিব উচ্চ ও মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কারো কোনো শক্তি নেই। আমি জানি, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। হে আল্লাহ্! আমি আমার অবাধ্য প্রবৃত্তির অনিষ্ট এবং প্রত্যেক প্রাণির ক্ষয়ক্ষতি হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যা তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক-প্রভু সরলপথে প্রতিষ্ঠিত।’**

অতএব এরূপ খোদানির্ভরতার দৃষ্টান্ত বর্তমান যুগেও আমরা দেখতে পাই। আগুন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদা তা’লার প্রতিশ্রুতি– **আগুন আমাদের দাস বরং দাসানুদাস**। এর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসই হযরত মৌলবি রহমত আলী সাহেবকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিল, এরপর আল্লাহ্ তা’লা বৃষ্টির মাধ্যমে সেই আগুনকে প্রতিহত করেন, তাঁকে স্পর্শ করতে দেন নি এবং এই আগুন তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছার আগেই নিভে যায়।

অতএব এসব দৃষ্টান্ত আমরা পুনরায় দেখতে পাই অর্থাৎ আজও দেখতে পাই যা ঈমান এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, দৈনন্দিন বিষয়াদিতেও খোদাতে আস্থার ঘাটতি অনেক ক্ষেত্রে পাপের মাত্রা বেড়ে যাবার কারণ হয়; উদাহরণস্বরূপ, অমূলক কথা বা মিথ্যা বলা যা কখনো কখনো মানুষ শাস্তি এড়ানোর জন্য বলে অথবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অসন্তুষ্টি এড়ানোর জন্য বলে থাকে। এটি করে সে খুবই আনন্দিত হয় যে, দেখো! আমি আদালত কিংবা ‘বস’-কে এভাবে প্রতারিত করেছি আর আমার পক্ষে রায়

নিয়েছি। এছাড়া অফিসারদের তোষামোদ করার বিষয়টিও রয়েছে। মানুষ এতটা নীচে নেমে অবৈধভাবে জি হুযূর, জি হুযূর করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যা দেখে অন্যদের ঘৃণা হয়। অর্থাৎ সে নিজের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে খোদা বানিয়ে বসে। এমন লোকেরা তাদের অফিসারদেরকেই জীবিকাদাতা মনে করে আর আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভরসা রাখে না; তাঁর সত্তায় বিশ্বাসই থাকে না। এমন মানুষ ধীরে ধীরে বান্দাকে খোদার আসনে বসায়। অতএব দেখুন! অজ্ঞাতসারেই মিথ্যা এবং অন্যায় তোষামোদ মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। এরপর এদিকে দৃষ্টিই যায় না যে, তিনিই হলেন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ খোদা, যিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত– যাঁর সমীপে আমি বিনত হবো, নিজের দুঃখকষ্ট বর্ণনা করব এবং নিজের বিষয়াবলি উপস্থাপন করব কারণ তিনিই দোয়া শ্রবণকারী, তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন, বিভিন্ন সমস্যা থেকে উদ্ধার করবেন এবং উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন; আর তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি। এসব কথা মিথ্যাবাদী এবং তোষামোদকারীদের মাথায় কখনো আসতেই পারে না। অতএব প্রত্যেক আহমদীর এসব বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত এবং সেই পথে চলা উচিত যা হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন আর যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে এ যুগে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, "আমার স্মরণ আছে, একবার আমি অমৃতসরে একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করি। এর সাথে রলিয়া রামের 'উকীলে হিন্দ' পত্রিকা সম্বন্ধে একটি পত্রও ছিল। প্রবন্ধের সাথে পাঠানো আমার সেই চিঠিকে ডাকবিভাগের আইনপরিপন্থি আখ্যা দিয়ে, আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। উকিলরাও বলল, এই চিঠির কথা অস্বীকার না করলে এ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না; অর্থাৎ মিথ্যা বলা ছাড়া নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই! কিন্তু আমি একথা মোটেও পছন্দ করি নি। আমি বললাম, সত্য বললে যদি শাস্তি হয় তবে হতে দাও; তবুও মিথ্যা বলব না। পরিশেষে সেই মামলা আদালতে পেশ হয়। বাদী হিসেবে ডাকবিভাগীয় কর্মকর্তা উপস্থিত হলেন। আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি স্পষ্টভাবে বললাম, এটি আমার চিঠি, কিন্তু আমি এটিকে প্রবন্ধের অংশ মনে করে এর মধ্যে রেখেছি। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়; আল্লাহ্ তা'লা তাকে দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। ডাকবিভাগের কর্মকর্তা অনেক যুক্তি দেন কিন্তু তিনি কোনো কথাতেই কর্ণপাত করেন নি আর আমাকে সসম্মানে অভিযোগমুক্ত করেন। (কাজেই) আমি কীভাবে বলব যে, মিথ্যা ছাড়া চলতে পারে না; এগুলো নিতান্তই বাজে চিন্তাধারা। সত্য কথা হলো, সত্য ছাড়া চলে না। আজও সেই ঘটনাটির কথা যখন স্মরণ করি আমি (অভাবনীয়) স্বাদ পাই যে, খোদা তা'লা যেদিকে আছেন আমি সে দিকটাই অবলম্বন করেছি। তিনিই আমাদের খেয়াল রেখেছেন আর এমনভাবে রেখেছেন যা নিদর্শন হয়ে রয়েছে।"

مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

(আত-তালাক: ৪)

(বদর পত্রিকা, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬, মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৬৩৬-৭৩৬)

এছাড়া **স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াও খোদার ওপর আস্থার ক্ষেত্রে ঘাটতির কারণে হয়ে থাকে।**

এর একটি কারণ এটিও যে, **মহিলাদের মাঝে কৃচ্ছ্রতার বৈশিষ্ট্য দুর্বল হয়ে থাকে। স্বামীর সামর্থ্য অনুধাবন করে ব্যয় করার পরিবর্তে তারা নিজেদের সেসব বান্ধবী কিংবা প্রতিবেশীদেরকে দেখে, যাদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে তাদের চেয়ে স্বচ্ছল। খরচ করার পর স্বামীর নিকট দাবি করে যে, আরো দাও। এতে ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হয় এবং তারা এতটাই অধৈর্য হয়ে যায় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২-৩টি সন্তান হয়ে যাবার পরও কৃচ্ছ্রতার অভ্যাস না থাকার কারণে, বিশেষভাবে খোদা তা'লার সত্তায় ভরসা না থাকার কারণে আর এ কারণে যে, তারা কেবল বৈষয়িক চিন্তাভাবনাতেই নিমজ্জিত থাকে, নিজেদের সংসারকে উজাড় করে ফেলে; স্বামী থেকে পৃথক হবার দাবি করতে আরম্ভ করে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাদের বিশ্বাস কমে যায়।** খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস না থাকায় (তারা) তাঁর সমীপে বিনতও হয় না এবং দোয়াও করে না। সারকথা হলো, একটি (নেতিবাচক) ধারা সূচিত হলে এর সাথে অপরাপর ধারাও যুক্ত হয়। কাজেই, যারা আল্লাহ্ তা'লার সামনে ঝুঁকে না তাদের খোদার ওপর আস্থা কীভাবে থাকতে পারে? অতএব যেমনটি আমি বলেছি, এক মন্দকর্ম থেকে দ্বিতীয়টির জন্ম হতে থাকে। কিন্তু এটি কেবল মহিলাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমি বলব এমন পুরুষও রয়েছে, যাদের আত্মমর্যাদা কম, যারা নিজেদের স্ত্রীকে বলে যে, (বাবার বাড়ি থেকে) যে-সব অলংকার নিয়ে এসেছ তা আমাকে দাও, যেন আমি ব্যাবসা করতে পারি কিংবা যদি নগদ টাকা থাকে তা আমাকে দাও, যেন ব্যবসায় লগ্নি করতে পারি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক যদি থাকে তবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে মহিলারা দিয়েও দেয়। কিন্তু স্ত্রী যদি জানে, তার স্বামী একজন অকর্মণ্য এবং তার মাঝে ব্যাবসা করার মতো যোগ্যতাই নেই, বরং কিছুদিন পর মূলধনটুকুও হাতছাড়া হয়ে যাবে, সংসারে পুনরায় অভাব-অনটন দেখা দেবে আর অবস্থা তথৈবচ হবে তখন তারা (তা) দেয় না; ফলে ঝগড়াবিবাদ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় আত্মসম্মানবোধের অভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষ যদি একবার আত্মমর্যাদা খুইয়ে বসে তাহলে সে স্ত্রীর কাছে দাবি উত্থাপন করে যে, তোমার পিতা যথেষ্ট সম্পদশালী ও ধনী মানুষ। তাই তার কাছ থেকে আমাকে এত টাকা এনে দাও, যেন আমি ব্যাবসা করতে পারি। একাজে ছেলের পরিবারের সদস্যরা অর্থাৎ ভাই-বোনেরাও যোগ দেয় যারা তাকে এ মর্মে প্ররোচিত করে যে, তুমি এই টাকা দাবি করো। মনে হয় যেন পুরো শ্বশুরবাড়ির ভরণপোষণের দায়িত্ব মেয়ের ওপর বর্তেছে।

অতএব এমন আচরণকারী মানুষ সর্বদা তারাই হয় যারা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হয় না, তাঁর ওপর ভরসা করে না এবং তাঁর নির্দেশাবলি ও শিক্ষা মেনে চলে না। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার যথাযথ পদ্ধতি অনুযায়ী যারা ইবাদাত করবে না তাদের মাঝে কখনো খোদানির্ভরতা সৃষ্টি হতে পারে না। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, দাম্পত্য জীবনে যখন এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় তখনো মহিলাদের ওপর নির্যাতন চলে। পুরুষদের চাহিদা পূরণ না করা হলে তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং খুবই কষ্টদায়ক আবহ সৃষ্টি হয়; সে অবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয় যা আমি বর্ণনা করছি। তাই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি সদয় হোন এবং এমন পরিবারের লোকেদের বিবেকবুদ্ধি খাঁটিয়ে কাজ করার তৌফিক

দিন আর প্রতিটি বাড়ি অর্থাৎ প্রতিটি আহমদী পরিবার যেন প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আত্মসংশোধন এবং শুভ পরিণতির লক্ষ্যে পুণ্যের সামর্থ্য অর্জনের দ্বিতীয় পন্থাটি হলো দোয়া। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার ওপর যত বেশি ভরসা ও বিশ্বাস করবে আর এই পথে অক্লান্ত পদচারণা করবে তত বেশি উত্তম পরিণতি ও ফলাফল লাভ হবে। সকল বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে এবং প্রার্থনাকারী ব্যক্তি তাকওয়ার উচ্চস্তরে পৌঁছে যাবে। এটি একেবারেই সত্য কথা যে, খোদা তা'লা কাউকে পবিত্র না করা পর্যন্ত কেউ পবিত্র হতে পারে না। শুধুমাত্র খোদা তা'লার কৃপা ও তাঁর প্রতি আকর্ষণ থাকলেই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ওপর মৃত্যু এসে থাকে আর দোয়ার ফলেই এই কৃপা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং কেবল দোয়ার মাধ্যমেই এ শক্তি অর্জিত হয়।'**

আমি আবারো বলছি, মুসলমানদের– বিশেষত আমাদের জামা'তের কখনো দোয়ার অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। কেননা একমাত্র এ দোয়া নিয়েই মুসলমানদের গর্ব করা উচিত। অন্যান্য ধর্মের সামনে দোয়ার জন্য নোংরা কিছু পাথর পড়ে আছে আর তারা মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারে না। ... একজন খ্রিষ্টান যে কিনা মসীহ্-র রক্তের (অর্থাৎ প্রাণ দেবার) প্রতি ঈমান এনে সকল পাপ ক্ষমা হয়ে গেছে বলে মনে করে তার দোয়ায় লেগে থাকার কী প্রয়োজন রয়েছে? আবার একজন হিন্দু যে কিনা বিশ্বাস করে যে, তওবা গৃহীতই হয় না এবং জন্মান্তরের চক্কর থেকে মুক্তি নেই, সে কেন দোয়ার উদ্দেশ্যে মাথা ঠুকবে? তার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো, কুকুর, বিড়াল, বানর, শূকর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাজেই স্মরণ রেখো! এটি ইসলামের গর্ব এবং অহংকার যে, এতে দোয়ার শিক্ষা রয়েছে। এ কাজে কখনো আলস্য দেখিও না আর ক্লান্তও হয়ো না।" (আল-হাকাম, ১৭ জানুয়ারি ১৯০৫, মলফুযাত, খণ্ড: ০৭, পৃ. ২৬৬-২৬৭)

মানুষের প্রকৃতিগত অস্থিরতা এবং হতাশার কারণে বর্তমান সমাজে অনেক ঝগড়াবিবাদ হয় যার (অর্থাৎ অস্থিতার ও হাতাশার) জন্ম হয় পরিস্থিতির কারণে। আর জাগতিকতা, বস্তুপূজা এবং পার্থিব সামগ্রীর পেছনে ছোটার প্রতি অধিক মনোযোগী হবার কারণে এই হতাশা ও অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় ভরসা কমে গেছে এবং জাগতিক মাধ্যমসমূহের প্রতি নির্ভরতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই, নিজেদের জীবনকে সুন্দর করতে চাইলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা অনুযায়ী দোয়ার প্রতি জোর দিন। এর ফলেই আপনাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টি সুন্দর-সুশৃঙ্খল হবে। এ খোদানির্ভরতা আপনার এবং আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কাজে আসবে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"প্রকৃতপক্ষে খোদানির্ভরতা এমনই এক জিনিস যা মানুষকে সফল করে ও লক্ষ্যে পৌঁছায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–**

مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

(আত-তালাক: ৪)

অর্থাৎ যে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনি যথেষ্ট হয়ে যান, শর্ত

হলো, আন্তরিকতার সাথে খোদানির্ভরতার মর্মার্থ অনুধাবন করে নিষ্ঠার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়া, ধৈর্যশীল ও অবিচল হওয়া আর বিপদে ভয় পেয়ে পিছু না হটা।"

"আর তাঁর কাজ এমনই। অতএব মানুষের জন্য অরিহার্য হলো, এর জন্য দুঃখিত না হয়ে বরং পরকালের চিন্তাতেই বেশি মগ্ন থাকা। ধর্ম-চিন্তা যদি মানুষের হৃদয়ে প্রাধান্য পায় তবে জাগতিক বিষয়াদির তত্তাবধান স্বয়ং খোদা তা'লাই করেন।" (আল-হাকাম, ৬ মে ১৯০৮, লন্ডন থেকে প্রকাশিত মলফুযাত, খণ্ড: ১০, পৃ. ২৫২)

একটি হাদীস আছে যাতে অনেক সুন্দর একটি দোয়া শেখানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সময় এ দোয়া করতেন, **"হে আমার আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমার জন্যই, আকাশ ও পৃথিবীকে তুমিই প্রতিষ্ঠিত রাখো। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর তুমিই প্রতিপালক-প্রভু। সমস্ত প্রশংসা তোমারই। এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর জ্যোতি তুমি। তুমি সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি, তোমার সাক্ষাৎ, জান্নাত, জাহান্নাম এবং কিয়ামত সবই সত্য। হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমারই আনুগত্য স্বীকার করি আর তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং তোমার ওপরই ভরসা করি। আমার সকল সমস্যা তোমার দরবারেই নিবেদন করছি এবং তোমার কাছেই সমাধান চাই। আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য ও গোপন সকল পাপ ক্ষমা করো আর সেসব পাপও যা সম্বন্ধে আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব দোয়া করার এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ার সামর্থ্য দান করুন। আমীন।

(১৮)

জার্মানির ম্যানহিম থেকে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২২ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ২২ যহুর, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট লোকদের উক্ত ব্যবস্থাপনার নিয়মশৃঙ্খলা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার ওপর ব্যবস্থাপনার সফলতা ও উন্নতি নির্ভর করে। যেমন আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন, উন্নত বিশ্বে আইন মেনে চলার হার তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। আর এই দেশগুলোর উন্নতির একটি বড়ো কারণ হলো, কোনো বড়ো পদাধিকারী কিংবা কোনো কর্মকর্তার কোনো ভুল যদি একবার প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই তা এতটা হইচই হয় যে, নিজ ভুলের মাশুল না দিয়ে উপায় থাকে না এবং তার সেই ভুলের জন্য তাকে নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতেই হয়। পক্ষান্তরে দরিদ্র দেশগুলোতে কিংবা বর্তমানে ব্যবহৃত পরিভাষা অনুসারে তৃতীয় বিশ্বে যে প্রথা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয় তা হলো, যদি কোনো অন্যায় করা হয় তবে তা এমনভাবে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয় যে, অনুতাপ ও অনুশোচনাবোধও হারিয়ে যায়। পরিণামে এমন বিষয়াবলিই দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কাজেই পার্থিব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইন মান্য করা এতটা বা এত অসাধারণ গুরুত্ব রাখে তাহলে ভেবে দেখুন, আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রবর্তিত– তাতে কতটা নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার প্রয়োজন বা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবশ্যক!

স্মরণ রাখবেন, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর রসূলদের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাই আবশ্যিকভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও নবী-রসূলের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিয়মনীতি অনুযায়ীই আমাদের চলতে হবে। আর ইসলাম ধর্মে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে এ ব্যবস্থাপনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আহমদীদের প্রতি এটি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড়ো অনুগ্রহ যে, আমরা কেবল সর্বোৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক মহানবী (সা.)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্তই হই নি, বরং এ যুগে তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জামা'তভুক্ত হবারও সৌভাগ্য দান করেছেন যাতে রয়েছে একটি ব্যবস্থাপনা। এছাড়া রয়েছে খিলাফত ব্যবস্থা এবং একটি সুদৃঢ় হাতল আপনাদের হাতে রয়েছে যা ভাঙবার নয়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! এই হাতল ভঙ্গুর না হলেও আপনি আপনার হাত যদি কিঞ্চিৎ ঢিলা করেন তাহলে আপনি নিজেই ভেঙে যেতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এ থেকে রক্ষা করুন। কাজেই আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকো– এ আদেশ সর্বদা স্মরণ রাখবেন। কেননা বর্তমানে এটি ছাড়া আপনাদের অস্তিত্বের কোনো নিশ্চয়তা নেই। স্মরণ রাখুন! শয়তান পথিমধ্যে ওঁত পেতে বসে আছে। সে সর্বদা আপনাদের প্ররোচিত করার চেষ্টায় রত থাকবে। এ আয়াতটি সদা দৃষ্টিপটে রাখুন যাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

(আল-বাকারা: ২০৯)

অর্থাৎ, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সবাই (বা তোমরা সম্পূর্ণরূপে) আনুগত্যের গণ্ডিতে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ আয়াতের তফসীরে লেখেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং আনুগত্যের জোয়াল সর্বাত্মকভাবে নিজেদের কাঁধে তুলে নাও। অথবা হে মুসলমানগণ! তোমরা আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সকল পথ ও পন্থা অবলম্বন করো এবং কোনো একটি আদেশও অমান্য কোরো না। এ আয়াতে– كَآفَّةً শব্দটি الَّذِيْنَ اٰمَنُوا এবং السِّلْمِ উভয়েরই হাল হতে পারে। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হলো, যারা ঈমান এনেছ তোমরা সকলেই ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করো। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোনো একজনও যেন এমন না থাকে– যে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার মর্যাদায় উপনীত থাকবে না কিংবা যার মধ্যে বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার লক্ষণাবলি থাকবে। অপরদিকে এর আরেকটি অর্থ হলো, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করো। অর্থাৎ এর প্রতিটি নির্দেশের ওপর যেন তোমরা প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মুমিনের কাছে এ ত্যাগস্বীকারের প্রত্যাশা রাখেন। অর্থাৎ মানুষ যেন নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ও চাওয়া-পাওয়া খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দেয়। নিজের মনমতো হলে করব অন্যথায় করব না– এমনটি করা উচিত নয়। অর্থাৎ শরীয়তের সিদ্ধান্ত যদি তার স্বার্থের অনুকূলে থাকে বলবে– আমি শরীয়ত অনুযায়ী চলি এবং সে অনুযায়ী মীমাংসা হওয়া উচিত। অপরদিকে শরীয়ত যখন তাকে (অন্যের প্রাপ্য) দিতে বলে আর দেশীয় আইন যদি তা দিতে বারণ করে তখন বলে দেশীয় আইন অনুযায়ী মীমাংসা হওয়া উচিত। এটি সত্যিকার ঈমানের একেবারে পরিপন্থি কাজ।

পূর্ববর্তী আয়াতে যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে কতক এমন দুর্বল লোকও আছে যারা দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগে নৈরাজ্যে লিপ্ত হয় আর তারা ভুলে যায় যে, আমাদের পূর্ববর্তী অবস্থা কেমন ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় আমাদেরকে কত কিছু দান করেছেন! তাই আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের উপদেশস্বরূপ বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা মুমিন কিন্তু স্মরণ রেখো, কেবল মৌখিকভাবে মুমিন হবার দাবি করেই তোমরা পার পাবে না। তোমরা যদি প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে চাও তবে উপায় হলো, সকল প্রকার কপটতা এবং ঈমানহীনতার বীজ অন্তর থেকে দূর করার চেষ্টা করো এবং জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈমান ও আনুগত্যের সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যাও। দ্বিতীয়ত, কেবল গুটি কতক আদেশ-নিষেধ পালন করেই সন্তুষ্ট হয়ে যেও না বরং আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ কার্যত বাস্তবায়ন করো; অধিকন্তু চেষ্টা করো, যেন ঐশী গুণাবলি পূর্ণ মাত্রায় তোমাতে বিকশিত হয়।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭)

এসব দেশে যেখানে ইসলামী আইন নেই, কেবল ব্যক্তিস্বার্থই তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় যেমনটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) উল্লেখ করেছেন। ঝগড়াবিবাদের ক্ষেত্রে যেখানে দেখে যে, শরীয়ত অধিকার বেশি দিচ্ছে, তখন দ্রুত জামা'তের কাছে আবেদন করে বলে, জামা'তে আমাদের মীমাংসা করুক। পক্ষান্তরে যেখানে দেশীয় আইনের আওতায় অধিক স্বার্থসিদ্ধি হতে দেখে সেখানে জামা'তের অনুমতি না নিয়েই সরকারি আদালতের শরণাপন্ন হয় এবং কোনোভাবেই জামা'তের কথা শুনতে চায় না। তখন তাদের ঘাড়ে শয়তান ভর করে। আর দেশীয় আইন যদি তাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদান করে তখন আবার জামা'তী ব্যবস্থাপনার কাছে ছুটে এসে বলে– 'আমরা ভুল বুঝে নিজেদের ঝগড়াবিবাদ মীমাংসা করাতে সরকারি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলাম, এখন আমাদের ক্ষমা করে দিন। এখন জামা'ত আমাদেরকে যে সিদ্ধান্ত দেবে, তা আমরা মাথা পেতে নেব।' অতএব স্মরণ রাখুন! এখন (তাদের) প্রত্যাবর্তন জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও ভালোবাসার টানে নয়, বরং এই আশায় যে, হয়ত আমাদের ধূর্ততা কাজে আসবে এবং প্রেসিডেন্ট, আমীর কিংবা কাযী সাহেবকে কোনোভাবে বুঝিয়ে নিজেদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা করব। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত! একবার যখন জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জামা'তের অনুমতি না নিয়েছে মীমাংসার জন্য সরকারি আদালতে শরণাপন্ন হন কিংবা জামা'তের ওপর এই বলে চাপ সৃষ্টি করে যে, আমরা জামা'তী ব্যবস্থাপনায় মীমাংসা করাবো না, তাই আমাদেরকে দেশীয় আইন অনুযায়ী মীমাংসা করার অনুমতি দিতেই হবে; এরূপ ক্ষেত্রে এ ধরনের মানুষের কোনো কেইস জামা'তের ব্যবস্থাপনা নেবে না বা শুনবে না আর তারাও যেন কখনো কোনো বিষয় নিয়ে জামা'তের শরণাপন্ন না হন। জামা'তের ব্যবস্থাপনা যখন এমন লোকদের কেইস নিতে অস্বীকার করে তখন তারা সেক্রেটারি উমুরে আমা, প্রেসিডেন্ট কিংবা আমীরের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলে, দেখো! এরা আমাদের ঝগড়াবিবাদ মীমাংসায় সাহায্য করছে না। যুগ-খলীফার নিকটও সুদীর্ঘ চিঠি লিখে তাঁর মুল্যবান সময় নষ্ট করা হয়। এগুলো সব শয়তানী চিন্তাভাবনা। শয়তান প্রথমে তোমাদের হৃদয়ে প্রথমে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে বলে, দেখো! নিজের সমস্যা নিয়ে জামা'তের কাছে যেও না। কেননা দ্বিতীয় পক্ষের সাথে জামা'তী কর্মকর্তাদের সুসম্পর্ক রয়েছে, ফলে তারা তোমাদের বিপক্ষে আর নিজেদের পক্ষে সিদ্ধান্ত করাবে। ফলে একবার শয়তানের খপ্পরে পড়লে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা দুরূহ কাজ। তখন মানুষ একটি শয়তানী চক্রে আবর্তিত হতে থাকে যা তাদের হৃদয়কে ধীরে ধীরে কলুষিত করতে থাকে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হে ঈমানদারগণ! খোদার পথে ঘাড় ঝুঁকিয়ে দাও অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করো এবং শয়তানের পথ অবলম্বন কোরো না, কেননা শয়তান তোমাদের শত্রু। এখানে শয়তান বলতে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যারা পাপ কাজের শিক্ষা দেয়।" [তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৯৮, আল-বাকারা: ২০৯]

উল্লিখিত কারণে কেউ কেউ ব্যক্তিগত ঝগড়াবিবাদ জামা'তের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মীমাংসা করাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ মীমাংসার জন্য ব্যবস্থপনার কাছে আসে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, কিছু মানুষ তোমাদের পাপের শিক্ষা দেয়, হৃদয়ে

মন্দ ধ্যানধারণা সঞ্চার করে, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপায়। এদের কারণেই তোমরা শয়তানের প্রতারণার শিকার হও। সেই প্রতারণা হলো, ব্যক্তিগত বিবাদ সরকারি আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা হোক বা জামাতি ব্যবস্থাপনা মাধ্যমেই হোক না কেন, যে পক্ষের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত প্রদান হয় তারা জামা'তের কর্মকর্তাদেরকে এর জন্য দায়ী করে, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যবস্থাপনার প্রতি কুধারণা পোষণ করা আরম্ভ হয়ে যায়। কার্যত এমন লোকেরা নিজেদেরকে জামা'তী ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথক করে নেয়। এভাবে তারা একূল-ওকূল দুকূলই হারায়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "কোনো ব্যক্তি যদি শাসকের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কোনো বিষয় লক্ষ করে তবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে, কেননা যে ব্যক্তি জামা'ত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্যুত হয়, সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করবে।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, বাব ওয়াজুবু মুলাযিমাতিন জামায়াতিল মুসলিমীন)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বর্ণিত আরেকটি হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতা এবং বিপথগামিতায় সহমত করবেন না। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য জামা'তের সাথে থাকে। যে ব্যক্তি জামা'ত থেকে পৃথক হয়ে যায় সে যেন আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো।" (তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, বাব মা জাআ ফি লুযুমিল জামায়াতি)

সুতরাং একথা সর্বদা আমাদের মাথায় রাখা উচিত, যে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন সর্বদা ধৈর্যধারণ করতে হবে। এটিও যেন মাথায় থাকে– যখন কেউ মনে করে যে, তার অধিকার পদদলিত হয়েছে তখন যদি **ধৈর্যধারণ করা হয় তবে সেটিই ধৈর্য**। এখানে আমি অনুভূতি শব্দটি এ কারণে ব্যবহার করেছি যে অধিকাংশ সময় যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় সে মনে করে যে, এ সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে এবং এ সিদ্ধান্তটি আমার পক্ষে হবার কথা ছিল। তাই এ ধরনের চিন্তাভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। জামা'তের নিম্ন পর্যায় থেকে ওপর পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার সকলেই ভুল সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন– এটি হতেই পারে না এবং শেষমেশ যুগ-খলীফা এই কুধারণার লক্ষ্যে পরিণত হন। আল্লাহ্ তা'লার বাণী–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

(আন-নিসা: ৬০)

এর অর্থ হলো, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের কর্তৃপক্ষের (আনুগত্য করো); কিন্তু (কর্তৃপক্ষের সাথে) কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতভেদ করো তাহলে তা আল্লাহ্ ও রসূলের সমীপে প্রত্যর্পণ করো, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখো। এটি অতি উৎকৃষ্ট (পন্থা) এবং পরিণামের দিক থেকেও অধিক উত্তম।"

যদি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিতে থাকে এমন পরিস্থিতিতে তোমাদেরকে সুস্পষ্ট শরীয়তবিরোধী কোনোকিছু যদি করতে বলা হয় তবে ভিন্ন কথা নতুবা ছাড়া সর্বাবস্থায় জামা'তের ব্যবস্থাপনা মেনে চলো, কর্মকর্তাদের আনুগত্য করো, তাদের নির্দেশাবলি এবং সিদ্ধান্তসমূহ মেনে নাও, কেননা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য এরই মাঝে নিহিত। আর এই সিদ্ধান্তসমূহ যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ধৈর্যের প্রতিদান দেবেন। সত্যিকার অর্থে পরকালে তোমরা ঈমান থাকলে, বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দাও। নিজেদের মতভেদ-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে হঠকারিতা দেখানোর কোনো অধিকার তোমাদের নেই। তোমাদের দায়িত্ব কেবল একটিই আর তা হলো আনুগত্য, আনুগত্য এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং বাদশার আনুগত্য করো। আনুগত্য এমন এক জিনিস, যদি মন থেকে করা হয় তাহলে হৃদয়ে এক জ্যোতি এবং আত্মার মাঝে এক ধরনের স্বাদ ও আলো সৃষ্টি হয়। সংগ্রাম ও সাধনার ততটা প্রয়োজন নেই যতটা আনুগত্যের প্রয়োজন রয়েছে। তবে এর জন্য একটি শর্ত রয়েছে। তা হলো, সেই আনুগত্য যেন সত্যিকার অর্থে, মন থেকে করা হয়। এটিই কঠিন বিষয়। আনুগত্য করার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ওপর ছুরি চালানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রকৃত আনুগত্য হতেই পারে না। আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এমন এক জিনিস, যা অনেক বড়ো একত্ববাদী ব্যক্তির হৃদয়েও প্রতিমার রূপধারণ করতে পারে।

সকল সাহাবীর (রা.) প্রতি ছিল আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ আর মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে তারা আত্মবিলীন এক জাতি ছিলেন! একথা একেবারেই সুনিশ্চিত যে, আনুগত্যের নীতি ও রীতি অবলম্বন ব্যতীত কোনো জাতি সত্যিকার অর্থে জাতি বলে পরিগণিত হতে পারে না এবং তাদের মাঝে জাতীয়তার চেতনা ও প্রীতির বাধন সৃষ্টি হতে পারে না। যদি মতবিরোধ ও মতভেদ বিদ্যমান থাকে তবে জেনে রেখো, এটি পরাজয় এবং অধঃপতনের লক্ষণ। মুসলমানদের দুর্বলতা এবং অধঃপতনের অন্য সব কারণের মাঝে পারস্পরিক মতভেদ এবং অভ্যন্তরীণ বিবাদবিসংবাদও একটি বড়ো কারণ। তাই মতবিরোধ পরিত্যাগ করে যদি একজনের আনুগত্য করা হয় যার আনুগত্য করতে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে যে কাজ করতে চান তা হয়ে যাবে। জামা'তের ওপর আল্লাহ্র কৃপার হাত সদা বিরাজমান; এটিই সাফল্যের মূল রহস্য। আল্লাহ্ তা'লা তওহীদ বা ঐক্য পছন্দ করেন এবং আনুগত্য ব্যতীত এই একতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মহানবী (সা.)-এর যুগে সাহাবীদের মাঝে অনেক বড়ো বড়ো বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা এমন মানসিক গঠনই তাদের দিয়েছিলেন। তারা রাষ্ট্রপরিচালনা নীতি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন কেননা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরা যখন খলীফা হলেন আর তাদের হাতে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো, তখন তারা যত সুন্দর ও সুব্যবস্থার ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করেন– তা থেকে খুব ভালোভাবেই বোঝা যায় যে, তাদের মাঝে প্রজ্ঞার গুণ কতখানি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সকাশে তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যেখানেই

তিনি (সা.) কিছু বলেছেন সেখানে তার বিপরীতে নিজেদের সমস্ত অভিমত এবং জ্ঞানকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন আর মহানবী (সা.) যা কিছু বলেছেন তা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করেছেন। তারা আনুগত্যে এতটাই বিলীন ছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর ওযূর অবশিষ্ট পানির মাঝেও তারা কল্যাণ অন্বেষন করতেন এবং তাঁর (সা.) পবিত্র ঠোঁট বা কথাকে কল্যাণকর মনে করতেন। আনুগত্য স্বীকারের এ বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে যদি না থাকত আর প্রত্যেকে নিজের অভিমতকে প্রাধান্য দিতেন এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন, তবে তারা এত উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না। আমার মতে, শিয়া-সুন্নির ঝগড়া মেটানোর জন্য এই একটি দলিলই যথেষ্ট আর তা হলো, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে কোনো ধরনের অনৈক্য এবং শত্রুতা ছিল না। কেননা তাদের উন্নতি এবং সফলতা এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তারা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের মাঝে কোনো ধরনের শত্রুতা ছিল না। নির্বোধ বিরোধীরা বলে– ইসলাম নাকি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু আমি বলছি, একথা ঠিক নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, তাদের হৃদয়ের শিরা-উপশিরা আনুগত্যের পানিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণরূপে প্রবাহিত হয়। তারা যে অন্যদের হৃদয়কে জয় করেছেন এটি আনুগত্য এবং ঐক্যেরই প্রমাণ বহন করে। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা যা খোদার প্রতি পূর্ণ আস্থার জ্যোতিতে পরিপূর্ণ ছিল যা ছিল জালালী (তথা প্রতাপ) ও জামালী (তথা সিগ্ধ) উভয় বৈশিষ্ট্যে সুষমামণ্ডিত; তাতে হৃদয়সমূহকে অবলীলায় আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তাঁর (সা.) জামা'ত রসূলের আনুগত্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং তাদের দৃঢ়তা এতটাই অলৌকিক প্রমাণিত হয়েছে, যারাই তাদের দেখত তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। মোটকথা বর্তমান যুগেও সাহাবীদের মতো অবস্থা-ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে যে জামা'ত গড়ে উঠছে সে জামা'তকে আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সাথে মিলিত করেছেন। এমন লোকদের আদর্শ দেখেই যেহেতু জামা'তের উন্নতি হয়ে থাকে, তাই তোমরা যারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের সদস্য হবার দাবি করে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জামা'তের সাথে মিলিত হবার বাসনা রাখো আর তোমরা নিজেদের মাঝে সাহাবীদের গুণাবলি সৃষ্টি করো। আনুগত্য একেই বলে। একেই বলে পারস্পরিক ভালোবাসা আর ভ্রাতৃত্ববোধ। সকল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এবং সর্বাবস্থায় তোমরা সাহাবীদের ন্যায় হয়ে যাও।" [তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০২, পৃ. ২৪৬-২৪৭, আন-নিসা: ৬০]

আনুগত্য সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস উপস্থাপন করছি– হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মন্দ পথে ছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ভালো পথে নিয়ে আসলেন। প্রশ্ন হলো, এরপরও কি পাপাচার অবশিষ্ট আছে? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তারপর আবার কি পুণ্যের যুগ আসবে? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এরপর আবার পাপাচার হবে? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেটি কীভাবে? তিনি (সা.) বললেন, আমার পরে এমন লোকেরা শাসক হবে, যারা আমার প্রদর্শিত পথে চলবে না। আমার রীতিনীতির অনুসরণ করবে না আর তাদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যাদের দেহ মানুষের

হলেও হৃদয় হবে শয়তানের। আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই সময় আমি কী করব? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যদি এমন যুগ পাও তবে শাসনকর্তার আদেশ শুনবে এবং মান্য করবে, সে তোমার পিঠে আঘাত করলেও আর তোমার সম্পদ আত্মসাৎ করলেও। অতএব তুমি তার কথা শোনো এবং তার আদেশ মান্য করে যাবে।" (সহীহ মুসলিম, কিতাব বাব উজুবু মুলাযিমাতি জামায়াতিল মুসলিমিন....)

এ হাদীসের সারকথা হলো, তোমাদের সাথে কর্মকর্তাদের অত্যাচারমূলক আচরণও করা হয়, তবুও তোমরা তাদের আনুগত্য অব্যাহত রাখবে। মহানবী (সা.) আনুগত্যের প্রতি এতটাই জোর দিয়েছেন যে, বিভিন্ন আঙ্গিকে স্বীয় উম্মতকে এ বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

আরো কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "কিসমিসের মতো (ছোটো) মাথার কোনো হাবশী দাসকেও যদি তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় তোমরা (তার কথা) শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব আস্ সামউ ওয়াত্ তাআতু লিল ইমামি মা লাম তাকুন মা'সিয়্যাতিন)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তার কোনো যুক্তিও গৃহীত হবে না আর কোনো অজুহাতও চলবে না। যুগ-ইমামের হাতে বয়আত না করে যে মারা যাবে, সে অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতায় মৃত্যুবরণ করবে।" (সহীহ মুসলিম, কিতাব বাব উজুবু মুলাযিমাতি জামায়াতিল মুসলিমিন...)

আরেকটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতায়, সুখে-দুঃখে, অধিকারবঞ্চিত অবস্থায় ও পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের ক্ষেত্রে– মোটকথা সর্বাবস্থায় তোমার জন্য শাসকের নির্দেশ শোনা এবং আনুগত্য করা আবশ্যক।" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্)

অতঃপর হযরত উবাদা বিন ওয়ালিদ তার দাদার বর্ণনা নিজ পিতার ভাষায় ব্যক্ত করে বলেন, "আমরা মহানবী (সা.)-এর হাতে এ মর্মে বয়আত করেছি যে, কথা শুনব আর আনুগত্য করব। কাঠিন্যে হোক বা স্বাচ্ছন্দ্যে, সুখে কিংবা দুঃখে এমনকি আমাদের প্রাপ্য না দেওয়া হলেও ঝগড়াবিবাদ করব না; অধিকন্তু সেই ব্যক্তির নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, যে এর যোগ্য আর আমরা যে অবস্থাতেই থাকি সত্য কথা বলব। এছাড়া আল্লাহ্‌র পথে আমরা কোনো সমালোচকের সমালোচনার ভয় করব না।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, বাব উজুবু তায়াতুল ইমরাই ফি গাইরি মা'সিয়াতিনওয়া তাহরীমিহা ফিল মা'সিয়্যাতি)

অতএব মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি আর কে মানুষের অধিকার প্রদানের বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন? হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, অধিকার প্রদান না করা হলেও আমরা আনুগত্য করব কিন্তু বর্তমানে নীতির পরিবর্তন ঘটছে। যদিও সকল সাহাবী (রা.) এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতেন যে, তিনি (সা.) প্রাপ্য অধিকারের চেয়েও বেশি প্রদান করতেন এবং

তাঁর (সা.) সম্পর্কে তো এটি ধারণাই করা যায় না যে, তিনি (সা.) কারো অধিকার সংরক্ষণের প্রতি যত্নবান হবেন না। এখানে জামা'তী ব্যবস্থাপনার কথা বলা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তাঁর (সা.) মান্যকারীদের আনুগত্যের বাইরে থাকার যৎসামান্য ধারণাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তাই এ অঙ্গীকার নেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখা না হলেও আমরা সর্বাবস্থায় পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং অনুসরণের চেতনা নিয়ে বয়আতের এ অঙ্গীকার রক্ষা করব। এর দ্বারা মহানবী (সা.) কারো অধিকার খর্ব করছেন বলে প্রতীয়মান হয় না, বরং এখন যেহেতু জামা'তী জীবনের বিষয় আসবে, তাই অধিকারের মান পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ এখন তোমরা ব্যক্তিস্বার্থের কথা চিন্তা কোরো না বরং জামা'তকে নিয়ে চিন্তা করো এবং নিজেদের অধিকার সানন্দে বিসর্জন দাও আর জামা'তের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের চেষ্টা করো। এখানে সেই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ উত্তম বস্তুর জন্য তুচ্ছ বস্তুকে উৎসর্গ করো। অতএব যারা আমাদের কর্মকর্তা কিংবা আমীর নিযুক্ত হয়েছেন, এখন তাদের আনুগত্য করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। তাদের আনুগত্য করুন আর এই প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না যে, এদেরকে কেন মনোনয়ন দেওয়া হলো? অনেক সময় বংশের অনেক আত্মীয়স্বজন তীর্যক খোঁটা দিয়ে থাকে যে, আমাদের বংশের সাথে তার অমুক অমুক সমস্যা ছিল আর তুমি তারই আনুগত্য করছ? সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে এসব ভর্ৎসনা বা তিরস্কারকে মোটেও ভয় পাবেন না। এটি হলো একটি মহান ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা– যার ভিত্তি মহানবী (সা.) রাখতে চেয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী নেযাম এবং আত্মসংবরণের (আন্তঃসম্পর্কের) নামই হলো, আনুগত্য। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির এই অধিকার নেই যে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সে জাতীয় স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেবে। এটিই হলো আত্মসংবরণ এবং এটিই নেযাম বা ব্যবস্থাপনা।" [হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কর্তৃক রচিত 'তফসীরে কবীর', খণ্ড: ১০, পৃ. ১৫৬]

একটি হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "মনঃপূত হোক বা না হোক– শোনামাত্র আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। তবে হ্যাঁ, যদি পাপ কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে ভিন্ন কথা। পাপ কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে যেন আনুগত্য এবং অনুসরণ করা না হয়।" (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব আস্ সামউ ওয়াত্ তায়াতু লিইমাম...)

অতএব আমি পূর্বেও বলেছি, স্পষ্ট শরীয়তবিরোধী আদেশ যদি দেওয়া হয় তাহলে ভিন্ন কথা নতুবা সর্বাবস্থায় আনুগত্য করা আবশ্যক আর এ হাদীসে এ আদেশই দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন আর তা হলো, তোমরা ঘরে বসেই এই সিদ্ধান্ত কোরো না যে, এটি শরীয়তবিরোধী বিষয় এবং এটি কোনো নির্দেশ হতে পারে না। তোমরা বিষয়টি যেভাবে বুঝেছ, সেটি তেমন না-ও হতে পারে কেননা শব্দটি হলো, যদি অবাধ্যতার বা পাপ করার আদেশ দেয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের ব্যবস্থাপনা এতটাই সুদৃঢ় হয়েছে যে, এমন কোনো ব্যক্তি কর্মকর্তা হতেই পারবে না, যে এতটা অধঃপতিত হবে বা এ ধরনের আদেশ দেবে। অতএব বাকি থাকল আদেশটি বুঝা এবং

এর ব্যাখ্যার বিষয়টি। তাই প্রথমে নিজে সেই কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন আর যদি তিনি না মানেন তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রেসিডেন্ট কিংবা আমীরের দৃষ্টিগোচর করুন। তারপরও সমাধা না হলে যুগ-খলীফাকে জানাতে পারেন। কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে সেটি পাপ হলেও তা যত্রতত্র বলে বেড়ানোর কোনো অধিকার আপনার নেই, কেননা মন্দের বিস্তার কে সেখানেই থামিয়ে দেবার আদেশ রয়েছে। অতএব আপনাদের কর্তব্য হলো, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যন্ত বিষয়টি পৌঁছানো এবং তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করা।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "আমীর এবং খলীফার আনুগত্যের প্রতি এত গুরুত্বারোপ করার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বিষয়ে আমীর কিংবা খলীফার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয়ে তারাও ভুল করে বসেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আনুগত্য এবং অনুসরণ করার নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্য হলো, এছাড়া ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। যেক্ষেত্রে মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি নিজেও ভুল করতে পারি সেক্ষেত্রে খলীফা কিংবা আমীরের এটি বলার দুঃসাহস কীভাবে হতে পারে যে, আমি সকল ভুলের ঊর্ধ্বে? খলীফাও ভুল করতে পারেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আনুগত্য করা আবশ্যক, নচেৎ ভয়ংকর নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে। যেমন ধরুন, কোথাও প্রতিনিধি দল পাঠাতে হবে এবং খলীফা বলছেন, পাঠানো আবশ্যক। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তির নিকট তা প্রয়োজনীয় মনে হলো না। বাস্তবিকভাবে প্রয়োজন না-ও থাকতে পারে, কিন্তু খলীফার সিদ্ধান্ত না মানার অনুমতি যদি তাকে দেওয়া হয় তাহলে এভাবে গোটা ব্যবস্থাপনা ভেঙে যাবে এবং এর ফলে ভীষণ অরাজকতা দেখা দেবে। তাই ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত এবং সুসংহত রাখার জন্য আবশ্যক হলো নিজের মতামতকে গুরুত্ব না দেয়। যেখানে জামা'তের একজন আমীর নিযুক্ত আছেন সেখানে তিনি যদি অন্যদের মতামতকে কল্যাণজনক মনে না করেন তবে তাদের নিজেদের মতামত পরিত্যাগ করা উচিত। একইভাবে যেখানে আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানকার লোকদের সেক্রেটারির মতামতের বিরুদ্ধে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠায় হঠকারিতা দেখানো উচিত নয়। সেক্রেটারি কিংবা আমীরকে নিজেদের সমমনা বানানোর চেষ্টা করা উচিত এবং তাকে বোঝানো উচিত কিন্তু তারপরও যদি তারা নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন তখন অন্যদের উচিত নিজ নিজ মতামত পরিত্যাগ করা, কেননা নৈরাজ্য সৃষ্টির বিপরীতে মতামত পরিত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যকীয়।"

এতক্ষণ আপনারা আমীরের আনুগত্য সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস শুনেছেন কিন্তু এমন একটি হাদীস রয়েছে যেটি পড়লে হৃদয়ে আরো বেশি ভীতির সঞ্চার হয়। আমীরের আনুগত্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ– তা প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা মাথায় রাখা উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয় সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্য হয় সে আমারও অবাধ্য হয়।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, বাব উজুবু তায়াতুল ইমরা ফি গাইরি মা'সিয়্যাতিন ওয়া তাহরীমিহা ফিল মা'সিয়্যাতি)

অতএব আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে-কিনা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বাইরে যেতে চাইবে? কোনো আহমদী এটি কল্পনাও করতে পারে না। অতএব এটি যদি চিন্তাও না করা যায় তবে নিতান্তই আল্লাহ্‌র খাতিরে কর্মকর্তাগণ কিংবা আমীরগণের আনুগত্য করাকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিন। **জামা'তী ব্যবস্থাপনার ওপর যদি কোনো আঁচড় পড়তে দেখেন তাহলে যুগ-খলীফা পর্যন্ত কথা পৌঁছে দেবার পথ আপনার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। সর্বোত্তম উপায় হলো, সেই কর্মকর্তার মাধ্যমেই আমার নিকট প্রেরণ করুন। নামবিহীন অভিযোগের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সত্যিই যদি সংশোধন আশা করেন, তবে স্পষ্টবাদী হওয়া উচিত। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! কোনো কর্মকর্তার অবাধ্য হবার আদৌ অনুমতি নেই।** এ ধরনের পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় তাহলে হাদীস অনুযায়ী আপনি কর্মকর্তাদের সাহায্য না করে বরং তাদের অবাধ্যতার মাধ্যমে সরাসরি যুগ-খলীফার অবাধ্যতা করছেন আর বিষয়টি এখানে থেমে থাকবে না। অতএব 'প্রত্যেক ত্যাগস্বীকারের জন্য সদা প্রস্তুত থাকব'– এই অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মাঝেই সকলের স্থায়ী (কল্যাণ) নিহিত।

আজ যেহেতু জলসা শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্‌, তাই এখন আমি এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর কিছু দোয়া উপস্থাপন করছি। জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) যেমন অনেক দোয়া করেছেন তদ্রূপ অংশগ্রহণকারীদের নিকট কিছু প্রত্যাশাও রেখেছেন। তিনি (আ.) বলেন, এই জলসাকে দলবেধে বসে, জমিয়ে আড্ডা দেবার মতো জাগতিক মেলার মতো মনে কোরো না। জলসার দিনগুলোতে একান্ত বাধ্যবাধকতা না থাকলে সার্বিকভাবে সবাইকে হলরুম, যেখানে অনুষ্ঠান চলছে সেখানে বসে জলসার পুরো কার্যক্রম শোনা উচিত। ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে সকল অংশগ্রহণকারীকে নম্রতা এবং ভালোবাসার সাথে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত আর যোগদানকারীদেরও এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনাকে সহযোগিতা করা উচিত। তাদের কথায় মন খারাপ করবেন না এবং যে ব্যবস্থাই করা হয়েছে, সেটির পূর্ণ আনুগত্য করুন কেননা এটিও এতায়াতে নেযামের একটি অংশ আর আজ থেকে বরং এখন থেকেই আপনাদের আচরণে প্রকাশ পাওয়া শুরু হবে যে, আপনারা কতটা আনুগত্য প্রদর্শনকারী! বিশেষ করে মহিলারা এ বিষয়টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন যে, আপনারা আড্ডা দিতে কিংবা জাগতিক আলাপচারিতায় মত্ত হতে আসেন নি বরং জলসা শুনতে এসেছেন। এ দিনগুলোতে আত্মার সংশোধনের সুযোগ লাভ হয়। তাই এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত। অতঃপর যে-সব মহিলার ছোটো বাচ্চা রয়েছে তাদের জন্য যেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে অর্থাৎ পৃথক তাঁবু রয়েছে, সেই তাঁবুর পেছনের অংশে বসবেন, যেন বাচ্চাদের কারণে অন্যদের অনুষ্ঠান শুনতে অসুবিধা না হয়। তারা যেন সহজে, জলসার পুরো কার্যক্রম শুনতে পারে। যাদের বাচ্চা রয়েছে তাদেরকে যদি বাচ্চার প্রয়োজনে উঠে বাইরে যেতে হয়– তাদের যাওয়া সহজ হয়ে যাবে। সুতরাং আশা করি, আপনারা এই তিন দিনে এটি প্রমাণ করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ্‌ যে, কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সময় কাটাতে এখানে আপনারা একত্রিত হয়েছেন।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই দোয়াগুলো পড়ছি যা তিনি এই মুহূর্তের জন্য করেছেন। তিনি (আ.) জামা'তের জন্য দোয়া করে আল্লাহ্ তা'লার নিকট এ নিবেদন করেন, "যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত এ জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সফর করে, আল্লাহ্ তাদের সহায় হোন, তাদের মহাপ্রতিদান দিন, তাদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের সব সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান। সব দুঃখকষ্ট হতে তাদের নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিন তাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর সেসব বান্দাদের সাথে উত্থিত করুন যাদের প্রতি তাঁর কৃপা ও আশিস বর্ষিত হয়েছে এবং সফরের সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন। হে খোদা! হে মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াময় ও সমস্যা সমাধানকারী! এসব দোয়া তুমি কবুল করো এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সমুজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলি মাধ্যমে বিজয় দান করো, কেননা সকল শক্তিসামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই, আমীন, সুম্মা আমীন।" (বিজ্ঞাপন: ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২, মজমুআ ইশতিহারাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩৪২)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই দোয়াসহ তাঁর নিজ জামা'তের জন্য কৃত সমস্ত দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। তিনি আমাদেরকে তাঁর ইবাদতকারী বান্দা হবার সামর্থ্য দান করুন। আমাদেরকে সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র রাখুন, তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এছাড়া এ জলসার সকল কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত করে স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপার চাদরে সর্বদা আমাদেরকে আবৃত রাখুন। আমীন।

(১৯)

জার্মানির ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৯ আগস্ট ২০০৩, মোতাবেক ২৯ যহুর, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

জলসার সমাপনী ভাষণে আমি বয়আতের শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যা সময়স্বল্পতার কারণে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব হয় নি। ছয়টি শর্ত এখন পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে আর আজকের জন্য আমি দুটি শর্ত নিয়েছি। **সপ্তম শর্ত হলো, অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।**

অহংকার প্রদর্শনের পর সূচনাতেই শয়তান যেহেতু এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, আমি চূড়ান্ত চেষ্টা চালাবো আর মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দায় পরিণত হতে দেবো না, বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষকে এই জালে এমনভাবে ফাঁসাবো যে, তার হাতে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়ে গেলেও সে স্বভাবগতভাবে সেসব নিয়ে আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হবে আর এই আত্মম্ভরিতা ও গর্বকে ধীরে ধীরে অহংকারের দিকে নিয়ে যাবে। এই অহংকার শেষ পর্যন্ত তাকে সেই (কৃত) সৎকর্মের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করে দেবে। কেননা শয়তান প্রথম দিনই এই সিদ্ধান্ত করেছে যে, মানুষকে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেই ছাড়বে আর সে নিজেও অহংকারের কারণে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অমান্য করেছিল। অতএব এটা সেই অস্ত্র যা শয়তান বিভিন্ন অজুহাতে মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। যারা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে থাকে, ইবাদতে যারা একনিষ্ঠ হয়ে এই আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। রহমান খোদার এমন বান্দা ছাড়া অন্যদের সচরাচর এই অহংকারের মাধ্যমেই শয়তান নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এটা এমন এক বিষয় যাকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়, আমরা বয়আত গ্রহণকালে শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করেছি যে, 'অহংকার করব না। আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করব না।' এসব বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করব। এটা এত সহজ কাজ নয়। কারণ এর বহু প্রকারভেদ রয়েছে। মানবজীবনে বিভিন্নভাবে শয়তান আক্রমণ করতেই থাকে। পরম সাবধানতার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেবল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই এ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এজন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি অর্জন করার জন্য এই ৭ম শর্তে এক উপায় বলে দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, "যখন তোমরা অহংকারের অভ্যাস পরিত্যাগ করবে তখন তোমাদের মধ্যে একপ্রকার শূন্যতা সৃষ্টি হবে। বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে যদি তা পূর্ণ না করো তাহলে অহংকার পুনরায় আক্রমণ চালাবে, এজন্য বিনয় অবলম্বন করো। কেননা আল্লাহ্ তা'লার পছন্দের পথ এটাই।" তিনি (আ.) স্বয়ং এই বিনয়কে সেই উচ্চমানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যার কোনো দৃষ্টান্ত নাই, তবেই তো আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর (আ.) প্রতি ইলহাম করে বলেছেন, 'তেরি আজ্‌যানা রাহেঁ উসকো পছন্দ আয়িঁ' (তোমার বিনয়াবনত পন্থা তাঁর পছন্দ হয়েছে।)

অতএব আমরা যারা তাঁর (আ.) হাতে বয়আতের দাবিদার, তাঁকে (আ.) যুগ-ইমাম হিসাবে মান্য করি, আমাদের এই বৈশিষ্ট্য কত নিষ্ঠার সাথে অবলম্বন করা উচিত! মানুষের তেমন কোনো মর্যাদাই নেই যে, অহংকার প্রদর্শন করবে বা বুক ফুলিয়ে চলবে। আমি কুরআনের আয়াতটি পড়ছি, আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٨﴾

(বনী ইসরাঈল: ৩৮)

অর্থাৎ "আর পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না, (কেননা) তুমি কখনো ভূমিকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পর্বতসমও হতে পারবে না।"

এ আয়াত থেকে যা সুস্পষ্ট, তা হলো মানুষের তেমন কোনো মর্যাদাই নাই, তাহলে অহংকারের কারণটি কী! কতিপয় লোক নিজেদেরকে যুগের বাদশা মনে করে আর নিজ গণ্ডির বাইরে মিশতেই চায় না। নিজ পরিমণ্ডলে বসে থেকে ভাবে, আমরা বড়োই করিৎকর্মা। এ সংক্রান্ত ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরছি। পারিবারিক জীবনের পরিমণ্ডল, আপনার ঘরের গণ্ডিকেই নিন। কতিপয় পুরুষ নিজ বাড়িতে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার করে যে, অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কোনো কোনো মেয়ে লিখে জানায়, শৈশব পেরিয়ে এখন আমরা সাবালিকা হয়েছি, আমাদের আর সহ্য হয় না। আমাদের বাবা আমাদের মায়ের সাথে আর আমাদের সাথে সবসময় নির্যাতনমূলক আচরণ করে আসছেন। বাবা গৃহে প্রবেশের সাথে সাথেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে নিজ নিজ কক্ষে চলে যাই। আমাদের মা অথবা আমরা, বাবার সামনে কখনো তার পছন্দের বাইরে কোনো মতামত ব্যক্ত করলেই বাবা এমনই অত্যাচারী যে, সবার ওপর চড়াও হয়ে যায়। অতএব অহংকারই এমন বাবাদেরকে চরম সীমায় পৌঁছিয়েছে। বেশিরভাগ এমন মানুষ, বাইরে নিজেদের ভাবমূর্তি খুব ভালোই রাখে, বাইরের লোকেরা ভাবে তার মতো ভদ্র মানুষই হয় না। আর বাইরের লোকদের সাক্ষ্যও তাদেরই স্বপক্ষে থাকে। কতিপয় এমনও মানুষ আছেন, আচারব্যবহারে যারা গৃহের অভ্যন্তরে আর বাইরে এক-অভিন্ন, তাদের সবটাই প্রকাশিত। অমন দুরাচারী ও অহংকারী মানুষের সন্তানেরাও, বিশেষভাবে ছেলেরা যৌবনে উপনীত হলে, সেই নির্যাতনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বাবার সামনে ঘুরে দাঁড়ায় যা তারা এসব ছেলেমেয়ের মা-বোন বা স্বয়ং তাদের তাদের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করে। এক পর্যায়ে বাপ যখন নিজের বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়ে তখন তার (অর্থাৎ পিতার নিকট হতে) বিশেষভাবে ছেলেরা প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। অহংকারী স্বভাবের লোকদের নিজেদের গণ্ডিতে এমন দৃষ্টান্ত অহরহ দেখা যায়। সমাজের বিভিন্ন গণ্ডি ও পরিমণ্ডল রয়েছে। প্রথমত গৃহাভ্যন্তরের গণ্ডি আর দ্বিতীয়ত, বাইরের পরিমণ্ডল। স্ব স্ব গণ্ডিতে পর্যবেক্ষণ করলে অহংকারের এসব দৃষ্টান্ত আপনার সামনে আসতে থাকবে।

আবার এর চরম রূপ হলো, বিভিন্ন দেশ ও জাতি এবং রাষ্ট্র, উন্নাসিকতার কারণে নিজেদের থেকে অন্যদের নীচু মনে করে। দরিদ্র দেশ ও জাতিগুলোকে নিজেদের জুতার

তলায় পিষ্ট করতে চায়। আজকের বিশ্বে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার একটি প্রধান কারণ এটিই। এই অহংকারের অবসান ঘটলে বিশ্বে ঝগড়াবিবাদও মিটে যাবে। তবে এসব অহংকারী জাতি ও সরকারগুলো বুঝতে পারছে না যে, আল্লাহ্ তা'লা অহংকারীদের অহংকারকে যখন পদদলিত করেন তখন তাদের চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٩﴾

(লুকমান: ১৯)

অর্থাৎ "আর (অহংকারবশে) মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো অহংকারী (ও) দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।"

এ আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলছেন, এভাবে দম্ভভরে চলাফেরা কোরো না। অহংকারী লোকদের বিশেষ অঙ্গভঙ্গি হয়ে থাকে, তারা ঘাড় সটান করে চলাফেরা করে, যা আল্লাহ্ তা'লার সম্পূর্ণরূপে অপছন্দনীয়। কোনো কোনো লোকের অভ্যাস হলো, নিজের চেয়ে অধঃস্তন লোকদের সামনে ঘাড় উঁচিয়ে থাকে আর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে পরম বিনয়াবনত ব্যবহার করে। এমন লোকদের পক্ষ থেকে কপটতার (মন্দ) স্বভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে। অতএব এই যে অহংকার– তা অনৈতিক ব্যধিতে পর্যবসিত হয় এবং সৎকর্মে উন্নতি করার পথ ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে যায়, আবার ধর্ম থেকেও দূরে নিয়ে যায়। জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথেও দূরত্ব বেড়ে যায়। অহংকার বৃদ্ধির পাশাপাশি তারা আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নৈকট্য থেকে এবং খোদার কল্যাণরাজি থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়।

এক হাদীসে রয়েছে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেন, 'কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় আর সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে সেসব লোকেরা, যারা সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য আর আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে 'ছরছার' বা নোংরাভাষী ও অপলাপকারীরা এবং 'মুতাসাদ্দিক' বা যারা গাল ফুলিয়ে কথা বলে আর 'মুতাফাইহিক'। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! ছরছার আর মুতাসাদ্দিক-এর অর্থ তো আমরা জানি, তবে মুতাফাইহিক কারা?' তিনি (সা.) জবাবে বললেন, 'মুতাফাইহিক হলো তারা– যারা আত্মম্ভরিতা, অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সাথে কথা বলে'।" (তিরমিযী, আবওয়াবুল বির্‌রে ওয়াস্ সিলাহ, বাব ফি মায়ালিল আখলাক)

অপর এক হাদীসে রয়েছে: হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক পাপের মূলে রয়েছে ৩টি বিষয়– তা এড়িয়ে চলা উচিত। প্রথমত, অহংকার থেকে বাঁচো। কেননা অহংকারই শয়তানকে আদমের সিজদা (মান্য) না করার বিষয়ে প্ররোচিত করেছে। দ্বিতীয়ত, লোভ সংবরণ করো। কেননা এ লোভই আদম (আ.)-

কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেতে উসকে দিয়েছে। তৃতীয়ত, হিংসা থেকে বাঁচো। কেননা এ হিংসার কারণেই আদমের দুই পুত্রের মধ্য থেকে একজন নিজের ভাইকে হত্যা করেছে'।" (আর-রিসালাহ, আল-কুশাইরিয়া, বাব আল-হাসাদু, পৃ. ৭৯)

অপর একটি হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন– 'যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার থাকবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবেন না'। এক ব্যক্তি নিবেদন করল, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! মানুষ চায় তার পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর হোক, জুতা ভালো দেখাক আর তাকে দেখতে সুন্দর লাগুক'। তিনি (সা.) বললেন, 'এটা অহংকার নয়'। এরপর তিনি (সা.) আরো বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা পরম সুন্দর, সৌন্দর্য তিনি পছন্দ করেন। প্রকৃত অহংকার হলো, এক অহংকারী মানুষ সত্যকে অস্বীকার করতে শুরু করে, অন্যদেরকে নীচু জ্ঞান করে, তাদেরকে হীন দৃষ্টিতে দেখে আর তাদের সাথে মন্দ আচরণ করে'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব তাহরীমীল কিবর ওয়া বায়ানিহ)

আরো একটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে পরস্পর তর্কবিতর্ক হবে। জাহান্নাম বলবে, আমার ভেতর বড়ো বড়ো স্বৈরাচারী ও অহংকারী লোকেরা প্রবেশ করে আর জান্নাত বলতে শুরু করবে যে, আমার মাঝে দুর্বল আর দীনহীনরা প্রবেশ করে। এতে আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামকে বলবেন– তুমি আমার শাস্তির প্রকাশস্থল, যাকে আমি চাই তোমার মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে থাকি এবং জান্নাতকে তিনি বলবেন– তুমি আমার কৃপার বিকাশস্থল, আমি যাকে চাই তোমার মাধ্যমে কৃপাবর্ষণ করি। আর তোমরা উভয়েই তোমাদের প্রাপ্য অংশ পুরোপুরি পাবে'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাতে বাবুন্নারে ইয়াদখুলুহাল জাব্বারূন...)

প্রত্যেক আহমদী বিনয়, নম্রতা আর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি লাভকারী হবেন, আল্লাহ্ তা'লার জান্নাতে প্রবেশকারী হবেন আর প্রতিটি গৃহ অহংকারের পাপ থেকে পবিত্র থাকবে– আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ দোয়াই থাকবে।

অন্য এক হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহ্ আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, "মহানবী (সা.) বলেন, 'মানসম্মান হলো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র পোশাক এবং মহানুভবতা ও বিশালত্ব হলো তাঁর চাদর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অতএব যে-কেউ আমার থেকে এসব ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে, আমি তাকে শাস্তি দেবো'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস সিলাহ বাব তাহরীমুল কিবর)

অতএব অহংকার শেষ পর্যন্ত মানুষকে খোদা তা'লার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। খোদা তা'লার অংশীবাদীদের আল্লাহ্ তা'লাই যখন বলেন 'ক্ষমা করব না'; তাই যে নিজেই খোদা হবার দাবিদার তার কী করে ক্ষমা লাভ হতে পারে? এই অহংকারই তো ছিল, যা বিভিন্ন সময়ে ফেরাউনি বৈশিষ্ট্যের মানুষ সৃষ্টি করেছে আর এমন ফেরাউনদের পরিণাম আপনারা পাঠও করেছেন; এই যুগেও তা দেখেছেন। এটি সত্যিই ভয়ের কারণ। প্রত্যেক আহমদীর সামান্যতম অহংকার থেকেও আত্মরক্ষা করে চলা উচিত। কেননা এটি ক্রমান্বয়ে

মানুষকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এটি আমার চাদর। আমি বিশ্বপ্রতিপালক, বড়ত্ব কেবল আমার, এটি শিরোধার্য করো, বিনয় প্রদর্শন করো। যদি এই গণ্ডির বাহিরে যাবার চেষ্টা করো তবে শাস্তিতে নিপতিত হবে। এক সরিষা দানা পরিমাণও অহংকার থাকলে শাস্তি তোমাদের জন্য অবধারিত। একইসাথে অবশ্য এই শুভসংবাদও দিয়েছেন যে, বিন্দু পরিমাণ ঈমানও যদি তোমাদের ভেতর থাকে তাহলে আমি তোমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করব। যেমনটি হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আবার যার অন্তরে এক সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে, সে আগুনে প্রবেশ করবে না"। (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল মুকাদ্দামা)

হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "আমি সত্য সত্যই বলছি, কিয়ামতের দিন শিরকের পর অহংকারের মতো বড়ো আর কোনো আপদ নেই। এটা এমন এক বিপদ যা মানুষকে উভয় জগতে লাঞ্ছিত করে। খোদা তা'লার কৃপা, এক খোদার উপাসনাকারী প্রত্যেকের তদারকি করে থাকে তবে অহংকারীর নয়। শয়তানও একত্ববাদী হবার দাবি করত কিন্তু তার প্রকৃতিতে যেহেতু দাম্ভিকতা ছিল এবং আদম (আ.) খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রিয় ছিলেন। তাই যখন সে তাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখল আর তার সমালোচনা করল। এ অপরাধে সে ধ্বংস হলো আর অভিসম্পাতের মালা তার গলায় পরানো হলো। অতএব প্রথম পাপ যার কারণে এক ব্যক্তি চিরকালের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, তা এই অহংকারই।" (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৫৯৮)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোথাও যদি অহংকার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তাহলে আদৌ তোমরা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এরূপ যেন না হয়– মাত্র কয়েকটি কথা শিখে এই বলে তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হবে যে, 'যা কিছু করণীয় আমরা তা করে ফেলেছি'। কেননা খোদা তা'লা তোমাদের জীবনে আমুল পরিবর্তন দেখতে চান। তিনি তোমাদের কাছে এক মৃত্যু চান, যার পর তিনি তোমাদেরকে এক নতুন জীবন দান করবেন।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৯, পৃ. ১২)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন: "অবশ্য এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্‌র নবীদের চেয়ে মর্যাদায় হাজার হাজার স্তর নীচে অবস্থান করে, মাত্র দিন কয়েক নামায পড়লেই তাদের হৃদয়ে অহংবোধ দানা বাঁধে। অনুরূপভাবে রোযা রেখে বা হজ্জ পালন করে আত্মশুদ্ধির পরিবর্তে তাদের মাঝে অহংকার আর লোক-দেখানো ভাব মাথাচাড়া দেয়। স্মরণ রেখো! অহংকার আসে শয়তান থেকে আর তা মানুষকে শয়তান বানিয়ে ছাড়ে। এ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দূরে না থাকবে তা সত্য গ্রহণে এবং ঐশী কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে বাধ সাধে। কোনোক্রমেই অহংকার করা উচিত নয়। না জ্ঞানের ক্ষেত্রে, না ধনসম্পদের বেলায় আর না উচ্চপদের জন্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যও না, বংশ ও গোত্রের গরিমায়ও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের জন্যই অহংবোধ জন্মায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ এসব অহংবোধ

থেকে আত্মশুদ্ধি করছে ততক্ষণ পর্যন্ত মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে মনোনীত হতে পারে না। আর সেই তত্ত্বজ্ঞান যা হীন কামনা-বাসনার ঘৃণ্য চাওয়া-পাওয়াকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয় তা তার লাভ হয় না। কেননা এসব হীন বিষয়াদি শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা মোটেই পছন্দ করেন না...।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে যেগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। সেগুলো এড়িয়ে চলো। কিছু লোক দু-চারদিন নামায পড়ে মনে করে, আমরা বড়োই পুণ্যবান হয়ে গিয়েছি, তাদের চেহারায় কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে অহংকারও ফুঁটে ওঠে। আর আপনারা কখনো কখনো কতক জুব্বাধারীদের দেখে থাকবেন যে, তসবীহ হাতে মসজিদ থেকে বের হচ্ছে, তাদের ঘাড়েই দম্ভ ও অহংকার দৃশ্যমান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই, আহমদীয়া জামা'ত এমন জুব্বাধারীদের থেকে পবিত্র। হজ্জ করে যখন ফেরত আসে, এর এত প্রচারণা চালানো হয়ে হয় যার কোনো সীমা-পরিসীমাই নেই। এমন ব্যক্তিদের রোযাও হয় লোক-দেখানোর জন্য আর তাদের হজ্জও হয় লোক-দেখানোর খাতিরে। কেবল বড়াই করার জন্যই এসব করা হয়ে থাকে যে, লোকেরা বলুক– অমুক অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি, রোযাও রাখে আবার হাজীও বটে, বড়োই সৎপরায়ণ ব্যক্তি। লোক-দেখানো এসব কাজ অহংকারের কারণেই হয়ে থাকে বা লোক-দেখানোর ইচ্ছা থেকেই এই অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায়।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, কতিপয় ব্যক্তি নিজ বংশ-মর্যাদার কারণে গর্ব ও অহংকার করে থাকে যে, আমাদের বংশ অতি সম্ভ্রান্ত, অমুকরা তো নীচু জাতের, তারা কী করে আমাদের সমকক্ষ হতে পারে! এ প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অহংকার কয়েক রকমের রয়েছে যা তোমাদেরকে খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা থেকে দূরে নিয়ে যায়, তাঁর নৈকট্য থেকে দূরে ঠেলে দেয় আর এভাবে ধীরে ধীরে মানুষ শয়তানের দলে ভিড়ে যায়।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "অতএব আমার দৃষ্টিতে পাকপবিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপনের উত্তম পদ্ধতি হলো মানুষের সর্ব প্রকারের দম্ভ ও অহংকার থেকে বিরত থাকা আর এর চেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি পাওয়াও সম্ভব নয়। জ্ঞানের দিক থেকেও নয়, বংশমর্যাদায়ও নয় আর অর্থসম্পদের বেলায়ও নয়। খোদা তা'লা কাউকে দৃষ্টিশক্তি দান করলে সে দেখতে পায় যে, প্রতিটি আলোক রশ্মি যা এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে তা ঊর্ধ্বলোক থেকেই অবতীর্ণ হয়। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ সেই ঐশী জ্যোতির মুখাপেক্ষী। চক্ষুও দেখতে সক্ষম নয় যতক্ষণ না সূর্যের আলো আসে যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। অনুরূপভাবে, আধ্যাত্মিক জ্যোতি যা প্রত্যেক ধরনের অন্ধকারকে বিদূরিত করে আর এর জায়গায় তাকওয়া ও পবিত্রতার জ্যোতি সৃষ্টি করে তা ঊর্ধ্বলোক থেকেই এসে থাকে। আমি সত্য সত্যই বলছি, মানুষের তাকওয়া ঈমান, ইবাদত, পবিত্রতা– এককথায় সবকিছু ঊর্ধ্বলোক থেকেই অবতীর্ণ হয়। আর এসবই খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে এসব বিরাজমান রাখেন আবার তিনি চাইলে এসব মিটিয়ে দেন।

অতএব সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান হলো মানুষের নিজ সত্তাকে অতি তুচ্ছ ও অর্থহীন জ্ঞান করে বিনয় ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে এক অদ্বিতীয় সত্তার আস্তানায় সিজদাবনত হয়ে খোদা তা'লার আশিস যাচনা করা আর তত্ত্বজ্ঞানের সেই জ্যোতির প্রার্থী হওয়া যা প্রবৃত্তির মোহকে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দেয়। আর হৃদয়ে এক জ্যোতি ও পুণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও উষ্ণতা সৃষ্টি করে। এরপর যদি তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণরাজি থেকে তার অংশ লাভ হয় আর কোনো এক মুহূর্তে বিশেষ প্রশান্তি ও দৃঢ়বিশ্বাস লাভ হয়ে থাকে তাহলে এজন্য গর্ব বা অহংকার করা উচিত নয় বরং বিনয় ও কাকুতিমিনতিতে আরো উন্নতি করা উচিত। কেননা যে নিজ সত্তাকে যত বেশি তুচ্ছ জ্ঞান করবে তত বেশি ঐশী জ্যোতি তার ওপর অবতীর্ণ হবে আর অভিজ্ঞতায় সে তত সমৃদ্ধ হবে, যার কল্যাণে সে শক্তিশালী ও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে। মানুষ যদি এই বিশ্বাস পোষণ করে তাহলে প্রত্যাশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার নৈতিক মান উন্নততর হবে। জগতে নিজ সত্তাকে কিছু একটা ভেবে বসাও অহংকার এবং তা একই পরিণাম ডেকে আনে। তখন মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সে অন্যদের অভিসম্পাত করে এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ২১২-২১৩, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "অহংকার অত্যন্ত ভয়াবহ রোগ। যে ব্যক্তির মাঝে এ রোগ সৃষ্টি হয় তার জন্য এটা আধ্যাত্মিক মৃত্যু। আমি নিশ্চিত জানি, এ রোগ হত্যার চেয়েও গুরুতর। অহংকারী শয়তানের ভাই হয়ে যায়। কেননা অহংকারই শয়তানকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেছে। এ কারণে মুমিন হবার শর্ত হলো, তার মাঝে অহংকার না থাকা বরং তার মাঝে বিনয়, দীনতা ও কাকুতিমিনতির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা। আর এটা খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের বিশেষত্ব হয়ে থাকে। তাদের মাঝে পরম মার্গের বিনয় বিরাজ করে। আর এসব চারিত্রিক গুণাবলি মহানবী (সা.)-এর মাঝে ছিল সর্বাধিক। তাঁর (সা.) এক সেবককে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সাথে তাঁর (সা.) আচার-আচরণ কেমন ছিল, উত্তরে সে বলল, সত্য কথা হলো, আমি তাঁর যতটা না সেবা করতাম তার চেয়ে অধিক তিনি আমার সেবা করতেন (**আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম**)।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন:, "... আমি আমার আপন জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা অহংকার এড়িয়ে চলো। কেননা অহংকার আমাদের মহাপরাক্রমশালী খোদার দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য একটি বিষয়। তবে তোমরা হয়ত বুঝবে না যে, অহংকার জিনিসটা কী? অতএব আমার কাছ থেকে জেনে নাও, কারণ আমি ঐশী প্রেরণায় কথা বলি।

প্রত্যেক এমন ব্যক্তি হলো অহংকারী– যে তার ভাইকে এজন্য হীন জ্ঞান করে যে, সে নিজে তার চেয়ে বেশি শিক্ষিত বা বেশি বুদ্ধিমান বা বেশি কুশলী, কেননা সে খোদাকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস মনে করে না আর নিজ সত্তা সম্পর্কে ভাবে, মুই কী হনুরে। খোদা কি তাকে বিকারগ্রস্ত করে দেবার আর তার ঐ ভাই যাকে সে ছোটো মনে করে তাকে জ্ঞানবুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষা আর কুশলে তার চেয়ে উন্নততর করে তোলার মতো ক্ষমতা রাখেন না? অনুরূপভাবে যে অর্থসম্পদ ও মানমর্যাদার গরিমায় নিজেকে উঁচু মনে করে আর নিজ

ভাইকে নীচু জ্ঞান করে সে-ও অহংকারী। কেননা সে একথা ভুলে গিয়েছে যে, এই মানমর্যাদা খোদা তা'লাই তাকে দান করেছেন। সে অন্ধ, কেননা সে জানে না, খোদা তার ওপর এমন এক দৈবদুর্বিপাক নিপতিত করার ক্ষমতা রাখেন, যার ফলে নিমিষে সে সর্বনিকৃষ্টাবস্থায় পতিত হতে পারে আর তার সেই ভাই যাকে সে হীন জ্ঞান করে তার চেয়ে তাকে অধিক অর্থকড়ি ও ধনসম্পদ দান করতে পারেন। তেমনিভাবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের দৈহিক স্বাস্থ্যের গর্ব করে বা নিজের রূপ-সৌন্দর্য আর শক্তিসামর্থ্যের বড়াই করে আর হাসিঠাট্টাবশত নিজ ভাইকে বিকৃত নামে ডাকে এবং তার দৈহিক খুঁতের কথা লোকদের কাছে বলে বেড়ায়, সে-ও অহংকারী। সে ব্যক্তি ঐ খোদা সম্পর্কে অজ্ঞ, যিনি মুহূর্তের মধ্যে তার মাঝে দৈহিক ত্রুটি সৃষ্টি করে তাকে সেই ভাইয়ের চেয়ে হীন পর্যায়ে উপনীত করতে পারেন আর যাকে অপদস্থ করা হয়েছিল, এক দীর্ঘকালের জন্য তার শক্তিবৃত্তিতে সেই আশিস সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে কোনো ঘাটতিও আসবে না আর যা নষ্টও হবে না; কেননা তিনি যা চান তা-ই করেন। একইভাবে ঐ ব্যক্তিও অহংকারী– যে নিজের শক্তি ও ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে দোয়া যাচনা করতে আলস্য দেখায়। কেননা শক্তি ও মহিমার উৎসকে সে শনাক্ত করতে পারে নি আর নিজ সত্তাকে সে কিছু একটা ভেবে বসেছে।

অতএব তোমরা হে আমার প্রিয়গণ! এসব কথা স্মরণ রেখো। এমন যেন না হয়, তোমাদের অজান্তেই কোনো দিক থেকে তোমরা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে অহংকারী সাব্যস্ত হয়ে যাও। এক ব্যক্তি, যে নিজের এক ভাইয়ের কোনো কথা অহংকার প্রদর্শনপূর্বক সংশোধন করে সে-ও অহংকার করে আবার এক ব্যক্তি যে মনোযোগের সাথে নিজ দরিদ্র ভাইয়ের কথাবার্তা শুনতে চায় না আর মুখ ফিরিয়ে নেয় সে-ও অহংকার করছে। এক ব্যক্তি, যে দোয়াকারীদেরকে ঠাট্টা ও হাসিবিদ্রুপের দৃষ্টিতে দেখে সে-ও অহংকারের এক ভাগ গ্রহণ করেছে। সেই ব্যক্তি, যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত মহাপুরুষের সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য করতে চায় না, সে-ও অহংকারে ভাগ বসিয়েছে। আবার সে ব্যক্তিও, যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কথা মনোযোগের সাথে শোনে না আর তার উক্তিসমূহ মনোযোগের সাথে পাঠ করে না, সে-ও অহংকার করেছে। অতএব চেষ্টা করো যেন অহংকারের কোনো দিকই তোমাদের মধ্যে না থাকে, ধ্বংস হয়ে না যাও আর তোমরা নিজ সন্তানসন্ততি ও পরিবারবর্গসহ মুক্তি লাভ করতে পার। খোদামুখি হও, পৃথিবীতে কাউকে যতটা ভালোবাসা সম্ভব, সেই ভালোবাসা তাঁকে (অর্থাৎ খোদাকে) দাও, পৃথিবীতে সর্বাধিক যতটা ভয় কাউকে করা যায়, সে ভয় তোমরা খোদাকে করো। পবিত্র হৃদয়ের ও পবিত্র ইচ্ছার অধিকারী হয়ে যাও আর দরিদ্র মিসকিন ও নিরীহ প্রকৃতিসম্পন্ন হও।" (নুযুলুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ৪০২-৪০৩)

আবার বয়আতের এই শর্তে আরেকটি বিষয় যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, কাকুতিমিনতি ও বিনয়, উত্তম ব্যবহার ও সহিষ্ণু-স্বভাব এবং দীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করব। যেমনটা আমি পূর্বেই বলেছি, নিজেদের অন্তর আর চিন্তা-চেতনাকে আপনারা যদি অহংকারমুক্ত করার চেষ্টা করেন বরং অহংমুক্ত করেন তখন আবশ্যকীয়ভাবে এক মহান বৈশিষ্ট্য, এক মহান গুণ এক উন্নত চরিত্র আপনাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি

করতে হবে। নইলে শয়তান পুনরায় আক্রমণ করবে, কেননা সে এ কাজের জন্যই বসা আছে, আপনার পিছু ছাড়ছে না। ঐ নৈতিক গুণ হলো বিনয় ও দীনতা আর এটা হতেই পারে না যে, বিনয় ও অহংকার সহাবস্থান করবে। অহংকারী ব্যক্তিরা সর্বদাই এমন বিনয়ী ব্যক্তি যারা 'ঈবাদুর রহমান' (বা রহমান খোদার বান্দা) তাদেরকে তীর্যক বাক্যবাণে জর্জরিত করতে থাকে, বড়ো বড়ো কথা বলে থাকে, এমন লোকদের প্রতিযোগিতায় আপনারা তাদের মতো পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না বরং আপনাদেরকে খোদা তা'লার সেই নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে হবে। যেমনটি কিনা তিনি বলেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

(আল-ফুরকান: ৬৪)

অর্থাৎ "আর তারাই রহমান আল্লাহ্‌র বান্দা– যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা (বিবাদ না করে প্রত্যুত্তরে) বলে, 'সালাম'।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি একগুণ বিনয় অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ তা'লা মর্যাদায় তাকে এক গুণ পর্যন্ত উন্নীত করবেন। এতটাই উন্নীত করবেন যে, তাকে ইল্লিয়্যীনে (তথা উঁচুদের মধ্যে) জায়গা দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে একগুণ পর্যন্ত অহংকার প্রদর্শন করেছে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক স্তর নিম্নে পতিত করে দেবেন, এতটা নীচুতে যে, তাকে আসফালা সাফিলীনে (তথা নীচুদের মধ্যে সর্বনিম্নে) প্রবেশ করিয়ে ছাড়বেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, বাকী মুসনাদীল মুকাস্‌সিরীনা মিনাস সাহাবাতি)

এমন লোকদের বৈঠক থেকে 'সালাম' বলে উঠে পড়ার মাঝেই আপনাদের জীবন ও আপনাদের কল্যাণ নিহিত, কেননা এতেই আপনাদের মর্যাদা বেড়ে যায় আর বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ ধরনের মন্দ আচরণের কারণে নিজেরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ে গিয়ে পতিত হতে থাকে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আর আমাদের পারস্পরিক বিষয়ে তা দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে অর্থ সম্পদ কমে যায় না, বরং আল্লাহ্ তা'লার বান্দা কাউকে যতটা ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তা'লা ততই তার সম্মান বৃদ্ধি করেন। কোনো ব্যক্তি যতই বিনয় ও দীনতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে ততটাই উচ্চ মর্যাদা দান করেন'।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস্ সিলাহ, বাবু ইসতেহবাবুল আফু ওয়াত তাওয়াযে')

আইয়ায বিন হুমার বীন মাজাশয়ী (রা.)-এর ভাই বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মাঝে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন আর বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ওহী করেছেন যে, তোমরা এতটা বিনয়ী হও যেন তোমাদের মধ্যে কোনো একজন অপরের ওপর যেন গর্ব না করে আর কেউ অন্যের ওপর যেন নির্যাতন না চালায়'।"

অন্য একটি হাদীস রয়েছে; আমাদের পারস্পরিক বিষয়ে তা দৃষ্টিতে রাখা উচিত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে অর্থ সম্পদ কমে না বরং আল্লাহ্ তা'লার বান্দা কাউকে যতটা ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তা'লা ততই তার সম্মান বৃদ্ধি করেন। কোনো ব্যক্তি যতই বিনয় ও দীনতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ততটাই উচ্চমর্যাদা দান করেন'।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াসসিলাহ, বাবু ইসতেহ বাবুল আফু ওয়াত তাওয়াযে')

অতএব প্রত্যেক আহমদীর পরস্পরকে ক্ষমা করার অভ্যাস গড়া উচিত, এর ফলে পরজগতেও উঁচু মর্যাদা লাভ হবে আর ইহজগতেও আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজের খাতিরে কৃত কোনো কর্মকেই কখনো বিনা পুরস্কারে যেতে দেন না।

মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে মিসকীনের মর্যাদা কতটা, নিম্নবর্ণিত হাদীস থেকে সে ধারণা পাওয়া যায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) মহানবী (সা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, "দীনহীন-কাঙালদের ভালোবাসবে।" তিনি বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এই দোয়া করতে শুনেছি– **'আল্লাহুম্মা আহ্ইনি মিসকিনা ওয়া আমিতনি মিসকিনা ওয়াহ্ শুরনি ফি জুমরাতিল মাসাকিনা'** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখো, আমাকে দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুদান করো আর আমাকে দরিদ্রদের মধ্যেই উত্থিত করো।' (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল যোহদ, বাব মাজালিসাতুল ফুকারা)

অতএব প্রত্যেক আহমদীরও সেই পথ অবলম্বন করা উচিত। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত, যার ওপর আমাদের মনিব ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) চলতেন। প্রত্যেক আহমদীর নিজেরও দীনহীন-মিসকিনের বেশে জীবন কাটানোর চেষ্টা করা উচিত, কেননা বয়আতের অঙ্গীকার এটাই যে, 'দীনতার মাঝে জীবনযাপন করব'।

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "জাফর বিন আবু তালিব (রা.) মিসকিন ও কাঙালদের অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাদের বৈঠকে তিনি বসতেন, তিনি তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন আবার মিসকিনরাও তার সাথে আলাপচারিতা করত। সে কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত জাফর (রা.)-কে 'আবুল মাসাকিন' (অর্থাৎ মিসকিনদের পিতা) বলে ডাকতেন।" (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল যোহদ, বাব মাজালিসাতুল ফুকারা)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লাকে সন্ধান করতে হলে মিসকিনদের হৃদয়পাশে সন্ধান করো। এ কারণেই, নবীগণ দীনতার পোশাক পরে নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বড়ো বড়ো জাতির লোকেরা অপেক্ষাকৃত ছোটো জাতির লোকদেরকে যেন হাসিবিদ্রুপ না করে আর কেউ যেন একথা না বলে, আমার বংশই উঁচু। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তোমরা যারা আমার নিকট আসবে তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞাসা করব না যে, তোমার বংশমর্যাদা কী, বরং জিজ্ঞাসা এটা করা হবে, তোমার আমল বা কর্ম

কেমন?' অনুরূপভাবেই খোদার নবী (সা.) তাঁর নিজের মেয়েকে বলেছেন, 'হে ফাতেমা! খোদা তা'লা কারো বংশপরিচয় কী তা জানতে চাইবেন না। তুমি যদি কোনো মন্দকর্ম করো তবে খোদা তা'লা তোমাকে এ কারণে ছাড় দেবেন না যে, তুমি রসূলকন্যা। অতএব তোমার উচিত হবে প্রতিটি মুহূর্ত নিজের কাজকর্মের বিশ্লেষণ করা'।" (আল-হাকাম, ১৭ জুলাই ১৯০৩; মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৭০, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য এ শর্ত ছিল, দীনতার মাঝে ও প্রবাসীর বেশে জীবন অতিবাহিত করা। এটা তাকওয়ার এক শাখা– যার মাধ্যমে আমাদেরকে অবৈধ ক্রোধ ও ক্ষোভের মোকাবিলা করতে হবে। বড়ো বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী ও সাধু-সত্যবাদীদের জন্য চূড়ান্ত ও কঠিন গন্তব্য হলো ক্রোধ পরিত্যাগ করে চলা। আত্মম্ভরিতা ও গর্ব, ক্রোধ থেকেই সৃষ্টি হয় আর কখনো কখনো আত্মম্ভরিতা থেকেও ক্রোধ জেগে ওঠে, কেননা ক্রোধের উদ্রেক সেই সময়ে হয়, মানুষ যখন নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়।" (রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭, পৃ. ৪৯)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "তোমরা যদি চাও আকাশে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হন, তাহলে তোমরা এমনভাবে এক হয়ে যাও যেন সহোদর দুই ভাই। তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক ধর্মপরায়ণ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগা সে– যে হঠকারিতামূলক আচরণ করে, অপরাধ ক্ষমা করে না। সুতরাং তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই ।" (কিশতিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৯, পৃ. ১২-১৩)

অতঃপর **অষ্টম শর্ত হলো, ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।**

জাগতিকতার বিপরীতে ধর্মকে প্রাধান্য দেবার অঙ্গীকার এমন এক অঙ্গীকার যে, জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি, জামা'তের সাথে যে সর্বাবস্থায় সম্পর্ক রাখে, জামা'তের অনুষ্ঠান এবং ইজতেমা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণকালে সে এই অঙ্গীকার বার বার পুনরাবৃত্তি করে থাকে। প্রত্যেক ইজতেমা এবং জলসা ইত্যাদিতে ব্যানার লাগানো হয়। আর এসব ব্যানারের মধ্যে প্রায়ই এটা প্রদর্শিত হয়ে থাকে যে, 'ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেবো।' এ বিষয়টিকে কেন এতটা গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে? এজন্যই যে, এটা ছাড়া ঈমান অটুট-অক্ষত থাকতেই পারে না। কিন্তু এটি মেনে চলা কোনো সহজ কাজ নয়। এটা অর্জন করার জন্য সর্বদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য চাইতে থাকা উচিত। এ উঁচু মান কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থাকলেই অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি, আমাদের জন্য কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো–

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

(আল-বাইয়্যিনা: ৬)

অর্থাৎ "অথচ তাদেরকে কেবল সদা বিনত থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের প্রেরণায় তাঁর ইবাদত করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর এটিই হলো চিরস্থায়ী ধর্ম।"

সুতরাং নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে– অর্থাৎ বাজামা'ত ও সময়মতো নামায আদায়ের মাধ্যমে, তাঁর পথে খরচ করে এবং দরিদ্রদের প্রতি দৃষ্টি দেবার মাধ্যমেও আমরা সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। আর ঐ শিক্ষাসমূহকে নিজেদের জীবনের অংশ করে নিতে পারি, নিজেদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ করে নিতে পারি। আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করব, তার প্রদত্ত শিক্ষা মেনে চলব তখনই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করবেন। আমাদের ঈমানকে এতটা দৃঢ়তা দান করবেন যে, আমাদের নিজ সত্তা, নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিজ সন্তানসন্ততি ধর্মের মোকাবিলায় তুচ্ছ মনে হবে। অতঃপর সবকিছু যখন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার জন্য হয়ে যাবে এবং আমাদের নিজেদের বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের ব্যর্থ হতে দেন না। তিনি তাদের সম্মানের সুরক্ষা করেন, তাদের সন্তানসন্ততিদেরও সুরক্ষা বিধান করেন, তাদের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেন, তাদের সম্পদও বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে কৃপা ও করুণার চাদরে সর্বদা আবৃত করে রাখেন আর তাদের সকল ধরনের ভয় দূরীভূত করেন।

যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন–

بَلٰى ۩ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

(আল-বাকারা: ১১৩)

অর্থাৎ "প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সদাচারী হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে সেক্ষেত্রে তার প্রতিদান তার প্রতিপালক-প্রভুর কাছে অবধারিত। আর এমন লোকদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখভারাক্রান্তও হবে না।"

ইসলামী শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۶﴾

(আন-নিসা: ১২৬)

অর্থাৎ "আর ধর্মের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম কে, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে এবং একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করেছে? আর আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।"

এ আয়াতে ইসলামী শিক্ষার সারাংশ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে নিজের সবটুকু শক্তিসামর্থ্য উজাড় করে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধানের

অনুসরণ ও তার ধর্মের খাতিরে নিজেকে উৎসর্গকারী ও সৎকর্মশীল হওয়া চাই। অতএব সে যেহেতু আল্লাহ্‌র খাতিরে সৎকর্ম করবে তাই কারো মনে এই ধারণা জাগা উচিত নয় যে, যদি সে সর্বদা ধর্মের দিকে এবং ধর্মের সেবায় লেগে থাকে তাহলে তার ধনসম্পদ বা সন্তানসন্ততি নষ্ট হয়ে যাবে! কখনো নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদান ও পুরস্কার প্রদানে সকলের চেয়ে অগ্রগামী, তিনি নিজেই তার সেই কর্মের পুরস্কার দেবেন। যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি স্বয়ং তার প্রাণ, ধনসম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। এমন লোকদেরকে এবং তাদের বংশধরদেরকে তিনি কখনো বিনষ্ট হতে দেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃত করে বলেন–

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

(আল-বাকারা: ১১৩)

অর্থাৎ "প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সদাচারী হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে সেক্ষেত্রে তার প্রতিদান তার প্রতিপালক-প্রভুর কাছে অবধারিত। আর এমন লোকদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখভারাক্রান্তও হবে না।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ সমুদয় শক্তিবৃত্তি খোদার রাস্তায় নিয়োজিত করে রাখে তার কথা-কর্ম, গতি-স্থিতি, আনন্দ-বেদনা, মোটকথা জীবনের সবকিছুই একনিষ্ঠভাবে খোদারই জন্য নিবেদিত হয়ে যায় আর প্রকৃত পুণ্য অর্জনে উদ্যোগী হয়ে প্রশান্তি লাভ করে। সুতরাং খোদা তা'লা তাকে নিজ পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবেন এবং ভয় ও দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ দেবেন। (সিরাজ উদ্দীন ঈসাইয়োঁ কী চার সওয়ালোঁ কা জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১২, পৃ. ৩৪৪)

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; মুয়াবিয়া বিন হায়দাহ কুশায়রি (রা.) তার নিজের ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু কী বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন আর কী ধর্ম নিয়ে আপনি এসেছেন'? তিনি (সা.) বললেন, 'খোদা আমাকে ইসলাম ধর্মসহ পাঠিয়েছেন'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'ইসলাম ধর্ম কী'? হুযূর (সা.) উত্তরে বললেন, 'ইসলাম ধর্ম হলো, তুমি নিজ সত্তাকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার হাতে সোপর্দ করে দাও এবং অন্যান্য মাবুদ (উপাস্য)-দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো, নামায কায়েম করো আর যাকাত দাও'।" (আল-ইসতিআব)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সুফিয়ান (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে ইসলামের এমন কোনো কথা বলুন যার বাইরে অন্য কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার আর প্রয়োজন থাকবে না, অর্থাৎ আমি যেন পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারি'। হুযূর (সা.) উত্তরে বললেন: 'তুমি একথা বলো, আমি আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান এনেছি। অতঃপর এর ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এবং অবিচলতার সাথে এতে প্রতিষ্ঠিত থাকো'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব জামেউ আওসাফুল ইসলাম)

সাহাবীদের কর্ম কেমন ছিল? একটি হাদীসে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে– শুরুতে যখন ইসলামে মদ নিষিদ্ধ ছিল না সাহাবীরাও মদ পান করতেন আর প্রায়শ নেশাগ্রস্তও হতেন। কিন্তু সেই অবস্থায়ও হৃদয়ে ধর্ম ও ধর্মের সম্মানের প্রাধান্য বিরাজ করত। এ চিন্তা মাথায় থাকত যে, সবকিছুর ওপরে ধর্ম আর ধর্মই সবার ঊর্ধ্বে। সুতরাং মদ হারাম হবার নির্দেশ যখন এলো তখন যারা বসে মদ পান করছিল, তাদের মধ্যে কিছু নেশাগ্রস্ততাও ছিল। কিন্তু এটি নিষিদ্ধ হওয়া-সংক্রান্ত নির্দেশ শোনামাত্র তাৎক্ষণিকভাবে তারা তা পালন করলেন। এ বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, "আমি একবার আবু তালহা আনসারী, উবায়দা ইবনে জাররাহ এবং উবাই ইবনে কাব (রা.)-কে খেজুরের তৈরি মদ পরিবেশন করছিলাম। এমন সময় তাদের কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'মদ পান হারাম করা হয়েছে'। এটি শুনে আবু তালহা (রা.) বললেন, 'আনাস উঠে পড়ো আর মদের কলসিগুলো ভেঙে ফেলো'। আনাস (রা.) বলেন, 'আমি উঠলাম এবং পাথুরে হাতুড়ির বাট দ্বারা কলসে আঘাত হানলাম আর সেটি ভেঙে গেল'।" (সহীহ্ বুখারী, কিতাবু খাবরিল ওয়াহেদ, বাব মাযাআ ফি ইযাজাতিল ওয়াহেদিস সুদুক)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "ইসলামের জীবন লাভ করা আমাদের কাছে এক ফিদিয়া চায়, তা কী? তা হলো এই পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এ মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন আর জীবন্ত খোদার মহিমা-বিকাশ নির্ভর করে। এটি সেই বিষয় যার অপর নাম ইসলাম। খোদা তা'লা এ ইসলামকে এখন জীবিত করতে চাইছেন। আর এই মহান অভিযাত্রাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সব দিক দিয়ে কার্যকর এক বিরাট কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত করা আবশ্যক ছিল। সুতরাং সেই মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদা এ অধমকে সংস্কারের জন্য পাঠিয়ে এমনটিই করেছেন। (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১০-১২)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সাথে খোদা তা'লার দাসত্ব বরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মর্যাদা লাভ করা দুস্কর। যেভাবে ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে খোদা তা'লা সাক্ষ্য দিয়েছেন "ওয়া ইবরাহীমাল্লাযি ওয়াফ্ফা" (আন-নাজম: ৩৮) অর্থাৎ ইবরাহীম সেই ব্যক্তি, যিনি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। সেভাবেই অন্য সবকিছু থেকে নিজের হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করা, খোদার ভালোবাসায় অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ করে রাখা আর খোদা তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী চলা উচিত। যেভাবে ছায়া কায়ার অধীনস্থ হয়ে চলে ঠিক সেরকমই অধীনস্থ হয়ে পথচলা, যেন তার (বান্দার) এবং খোদার ইচ্ছা এক ও অভিন্ন হয়ে যায় আর এসব বিষয় অর্জিত হয়ে থাকে দোয়ার মাধ্যমে। নামায প্রকৃতপক্ষে দোয়া করার জন্যই– অর্থাৎ নামাযের প্রত্যেক পর্যায়ে দোয়া করা উচিত। কিন্তু যে ঘুমের ঘোরে নামায পড়ে, যদি তার জানাই না থাকে যে, সে কী যাচনা করছে, তাহলে সেটি আসলে নামাযই নয়।... সুতরাং মানুষের উচিত, নামায আদায়কালে অলস ও অমনোযোগী না হওয়া। আমাদের জামা'ত সত্যিকারের কোনো জামা'ত হতে চাইলে নিজেদের ওপর একটি মৃত্যু আনয়ন করতে হবে। প্রবৃত্তির কামনা-

বাসনা ও এর তাড়না হতে আত্মরক্ষা করে চলতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে সকল ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য করতে হবে। (মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, নব সংস্করণ, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "হে খোদা-অন্বেষী বান্দারা! কান খুলে শোনো, একীনের (বা বিশ্বাস) ন্যায় আর কোনোকিছু নাই। একমাত্র বিশ্বাসই মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে। দৃঢ়বিশ্বাস মানুষকে পুণ্যকর্ম সাধনের শক্তি যোগায়। একমাত্র দৃঢ়বিশ্বাস মানুষকে খোদা তা'লার খাঁটি প্রেমিক করে তোলে। তোমরা কি বিশ্বাস ব্যতিরেকেই পাপ বর্জন করতে পার? একীনের জ্যোতি ব্যতীত তোমরা কি প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করতে পারো? বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতে তোমরা কি প্রকৃত কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারো? বিশ্বাস ব্যতিরেকে তোমরা কি কোনো সত্যিকারের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারো? আকাশের নীচে এমন কোনো 'কাফফারা' (প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোনো 'ফিদিয়া' (বিনিময়) আছে কি, যা তোমাদেরকে পাপ বর্জন করাতে পারে? অতএব তোমরা স্মরণ রেখো, বিশ্বাস ব্যতিরেকে অন্ধকারপূর্ণ জীবন হতে তোমাদের নিষ্কৃতি লাভ হবে না এবং রূহুল কুদুস (পবিত্রাত্মা) লাভ করাও তোমাদের জন্য সম্ভবপর নয়। কল্যাণমণ্ডিত তারা– যারা একীন বা বিশ্বাস লাভ করেছে। কেননা খোদা তা'লার দর্শন তারা লাভ করবে। ভাগ্যবান তারা– যারা সেসব সংশয় ও সন্দেহ হতে মুক্তি লাভ করেছে। কেননা তারাই পাপ হতে পরিত্রাণ পাবে। কল্যাণমণ্ডিত তোমরা, কেননা তোমাদেরকে বিশ্বাসের সম্পদ প্রদান করা হবে, যা প্রাপ্তির পর তোমাদের পাপের অবসান ঘটবে। পাপ এবং বিশ্বাস একত্রিত হতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্তের ভেতর হাত দিতে পারো, যেখানে তোমরা ভয়ানক এক বিষাক্ত সাপ দেখেছ? তোমরা কি এমন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো, যেখানে কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে পাথরবারি বর্ষণ ঘটে, কিংবা বজ্রপাত হয় অথবা যেখানে এক রক্তপিপাসু বাঘের আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে অথবা এমন জায়গা যেখানে প্রাণবিনাশী প্লেগ মানুষের এক প্রজন্মকে নিধন করছে? সুতরাং খোদা তা'লার প্রতি যদি তোমাদের বিশ্বাস ঠিক সেরূপ থাকে, যে-রূপ সাপ, বজ্রপাত, বাঘ বা প্লেগের উপস্থিতির বিষয়ে থাকে, তাহলে খোদা তা'লার বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা করে শাস্তির পথ অবলম্বন করবে বা তাঁর সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক তোমরা ছিন্ন করবে– এটি অসম্ভব। (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৯, পৃ. ৬৬, ৬৭)

তিনি (আ.) বলেন, "ভয়, ভালোবাসা আর প্রশংসাবোধের মর্মের মূলে রয়েছে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ। যাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে ভীতি আর ভালোবাসাও পরিপূর্ণরূপে দান করা হয়। আর যাকে পূর্ণাঙ্গ ভীতি ও ভালোবাসা দেওয়া হয় তাকে ঔদ্ধত্যের ফলে সৃষ্ট প্রত্যেক পাপ থেকে রক্ষা করা হয়।

সুতরাং এই মুক্তি লাভের জন্য আমরা কোনো রক্তদানেরও মুখাপেক্ষী নই, আমাদের কোনো ক্রুশেরও প্রয়োজন নেই আর কোনো প্রকার প্রায়শ্চিত্তেরও আমাদের দরকার নেই। বরং আমাদের কেবল একটিই ত্যাগের প্রয়োজন এবং সেটি হচ্ছে আমার আমিত্বকে পদদলিত করা। মানব প্রকৃতি, এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। এ ধরনের ত্যাগেরই

আরেক নাম ইসলাম। ইসলামের অর্থই হলো জবাই হবার জন্য নিজ গর্দান পেতে দেওয়া। অর্থাৎ সানন্দে নিজের আত্মাকে খোদার কাছে সমর্পণ করা। এই সুন্দর নামটি সমস্ত ধর্মের জীবন এবং যাবতীয় (ধর্মীয়) বিধানের প্রাণ। সানন্দে-স্বেচ্ছায় জবাই হবার জন্য প্রস্তুত থাকা অনুরাগপূর্ণ ভালোবাসা এবং পূর্ণ-প্রেমের দাবি রাখে আর পূর্ণ ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। সত্যিকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও পূর্ণ ভালোবাসার প্রয়োজন অন্য কিছুর নয়; 'ইসলাম' শব্দটি কেবল এরই দিকে ইঙ্গিত করে। (লেকচার লাহোর, পৃ. ৫-৬, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ১৫১-১৫২)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব বিষয় বোঝার ও এর ওপর যথাযথ আমল করার তৌফিক দান করুন।

(২০)

ফ্রান্সের আহমদীয়া মিশন থেকে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ০৫ তাবুক ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

(আল-আহযাব: ৫৭)

এর অনুবাদ হলো, "নিশ্চয় আল্লাহ্ একাধারে এই নবীর প্রতি কৃপাবর্ষণ করেন আর ফেরেশতারাও (তার জন্য দোয়ায় রত)। হে মুমিনরা! তোমরাও এ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো এবং (গভীর আন্তরিকতার সাথে) তার জন্য শান্তি কামনা করো।"

আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদেরকে দরূদ শরীফ পড়ার প্রতি যে এত তাকিদপূর্ণ নির্দেশ নিয়েছেন– এর কারণ কী? মহানবী (সা.) কি আমাদের দোয়ার মুখাপেক্ষী? কখনো না বরং আমাদেরকে এই রীতি শিখিয়েছেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা যখনই নিজেদের অভাব নিয়ে আমার কাছে আসবে এবং আমার দরবারে নিজেদের বিভিন্ন দোয়া গ্রহণ করানোর জন্য উপস্থিত হবে তখন (মনে রেখো,) তোমাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ বা অভাব মোচনের এখন একটি উপায়ই (অবশিষ্ট) রয়েছে আর তা হলো আমার প্রিয় নবী (সা.)-এর মধ্যস্থতায় আমার নিকট আসো। তোমরা যদি এই মাধ্যম অবলম্বন না করো তাহলে তোমাদের সমস্ত ইবাদত বৃথা, কেননা আমার এ প্রিয় নবীর জন্যই আমি এ সবকিছু এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"যদিও মহানবী (সা.)-এর অন্য কারো দোয়ার প্রয়োজন নেই তথাপি এতে অত্যন্ত গভীর একটি রহস্য রয়েছে। (সে রহস্যটি হলো,) যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত ভালোবাসার কারণে কারো জন্য আশিস ও কল্যাণ কামনা করে, তার সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসার সম্পর্কের সুবাদে সে ঐ ব্যক্তির অস্তিত্বের একটি অংশ হয়ে যায়। ফলে যার জন্য দোয়া করা হয় তার প্রতি যে কল্যাণরাজি বর্ষিত হয় তা কল্যাণ প্রার্থনাকারীর প্রতিও বর্ষিত হয়। কাজেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার অসীম কল্যাণ রয়েছে তাই তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসে যারা তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করে তারাও সেই সীমাহীন কল্যাণ থেকে নিজ নিজ উদ্দীপনা অনুযায়ী অংশ পেয়ে থাকে, কিন্তু আত্মিক প্রেরণা ও উচ্ছ্বাস এবং ব্যক্তিগত ভালোবাসা ছাড়া এ কল্যাণ খুব কমই প্রকাশ পায়।"** (মকতুবাতে আহমদীয়া, খণ্ড: ০১, পৃ. ২৪-২৫)

এ উদ্ধৃতিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে-সব কথা বুঝিয়েছেন তাতে

দরূদ শরীফ পড়ার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম তোমরা সবাই মনে রেখো! মহানবী (সা.) তোমাদের দোয়ার মুখাপেক্ষী নন। এটি মনে কোরো না যে, তোমাদের দরূদ পড়ার ফলেই তাঁর (সা.) পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি (সা.) শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'লার অতি প্রিয় এক সত্তা। তিনি (আ.) বলেন, এতে বিদ্যমান গূঢ় রহস্যটি হলো, কোনো ব্যক্তি যখন অন্য কারো সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ভালোবাসার কারণে তার জন্য অনুগ্রহ ও কল্যাণ কামনা করে তখন সে সেই সত্তারই একটি অংশে পরিণত হয় অর্থাৎ তারা ভালোবাসা এবং সম্পর্কের সুবাদে একাকার হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ- জাগতিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে মা ও সন্তানের ভালোবাসাকে নিন। অনেক সময় আপনারা দেখে থাকবেন, বাচ্চারা যখন হাঁটতে শেখে এবং একটু বুঝতে আরম্ভ করে তখন তারা খাবার কিছু পেলেই তা মায়ের মুখে তুলে দেবার চেষ্টা করে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোটো একটি টুকরা হয় বরং আরো ছোটো খাদ্যকণা হয়ে থাকে, আর এটি মায়ের সাথে সন্তানের ভালোবাসা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই হয়ে থাকে। এই ছোটো ছোটো টুকরা খেয়ে তো মায়ের পেট ভরে না, কিন্তু ভালোবাসার একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর এ আচরণের কারণে সন্তানের প্রতি মায়েরও সে অনুপাতে ভালোবাসা জন্মে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সন্তানের নিষ্পাপ আচরণে মায়ের সাথে তার সম্পর্ক পূর্বের চেয়ে আরো বেশি নিবিড় হয় এবং তার প্রতি (আরও) যত্নবান হন। যাহোক, আপনারা জাগতিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তার গণ্ডিতে এ ধরনের উদাহরণ কমবেশি পেয়ে থাকবেন।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এই উদ্ধৃতিতে আরো বলেন, ভালোবাসার কারণে যখন উভয়ে অভিন্ন সত্তা হয়ে যায় তখন যার জন্য আপনি দোয়া করছেন, তিনি যে-সব কল্যাণ ও অনুগ্রহ লাভ করেন তা আপনারও লাভ হয়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও কল্যাণ সীমাহীন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অশেষ কল্যাণ অবতীর্ণ করেছেন, এখনো করছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন। দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে এবং মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত যে সম্পর্ক রয়েছে কিংবা যে সম্পর্ক থাকা উচিত তার সুবাদে আপনি, আমরা এবং তারাও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কল্যাণরাজি হতে অংশ পেতে থাকবে যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। কিন্তু শর্ত হলো, দরূদ পাঠের সময় আপনাদের হৃদয়ে এক ধরনের আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হতে হবে। অজস্র ধারায় দরূদ পাঠের ফলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি যে অশেষ কল্যাণবারি অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "একবার এমনটি ঘটল যে, দীর্ঘকাল যাবৎ আমার দরূদ শরীফ পড়ার প্রতি অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে গভীর নিমগ্নতার সৌভাগ্য হয়, কেননা আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, খোদা তা'লার পথগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম যা নবী করীম (সা.)-এর ওয়াসীলা বা মাধ্যম ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লাও বলেন, وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ [অর্থাৎ আর তোমরা তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো (আল-মায়েদা: ৩৬) –অনুবাদক]। এভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর আমি দিব্যদর্শনে দেখলাম, দুইজন মশক বহনকারী এলেন যাদের একজন ভেতরের রাস্তা দিয়ে এবং অপরজন বাইরের রাস্তা

দিয়ে আমার বাড়িতে প্রবেশ করলেন। আর তাদের কাঁধে নূরের মশক ছিল এবং তারা বললেন, **'হাযা বিমা সাল্লাইতা আলা মুহাম্মাদিন (সা.)'** [অর্থাৎ তুমি যে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেছ এটি তারই কল্যাণে –অনুবাদক]।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, টীকা: ১৩১ নং পৃ. দ্রষ্টব্য; তাযকেরা, পৃ. ৭৭, প্রকাশ সন: ১৯৬৯)

অতএব এখানে তিনি (আ.) বলেন, যেহেতু আমি আমার সৃষ্টিকর্তা খালেক ও মালেক খোদাকে পেতে চাইতাম আর তাঁর নৈকট্য লাভ করা এত সহজ কাজ নয়, আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য লাভের পথ কোনো সহজ পথ নয়– একথা আমি জানতাম, অনেক কঠিন ও দুর্গম পথ অতিক্রমের পরেই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ নৈকট্য লাভের জন্য এবং এখন আমার কাছে পৌঁছানোর জন্য একটিই পথ এবং একটিই মাধ্যম আর তা হলো, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর প্রতি অনেক বেশি দরূদ পাঠ করি। অবস্থা এমন ছিল যে, প্রতিটি মুহূর্ত আমি এই একমাত্র চিন্তাতেই মগ্ন থাকতাম এবং তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করতাম। ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দিব্যদর্শনে এই দৃশ্য দেখালেন এটি বোঝানোর জন্য যে, তুমিও এখন এর মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করেছ– অর্থাৎ দু'ব্যক্তি যাদের কাঁধে নূরের মশক রয়েছে, তারা ভেতর ও বাইরের রাস্তা দিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, এ সবই তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের কল্যাণে লাভ করেছ। ভেতর ও বাইরের রাস্তা দিয়ে প্রবেশের অর্থও হলো, এখন এ আশিসের ফলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর সব ধরনের কল্যাণ ও অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকবে এবং মহানবী (সা.)-এর কল্যাণরাজিতে তিনিও ধন্য হতে থাকবেন। সুতরাং এটিই হলো দরূদ শরীফের কল্যাণ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

"অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি দরূদ প্রেরণ করো, যিনি আদম সন্তানদের নেতা এবং খাতামান নাবিয়্যীন (সা.)।"

"এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে, এসব মর্যাদা, কৃপারাজি ও পুরস্কার তাঁর (সা.) কল্যাণেই লাভ হয়েছে এবং এ সবই তাঁকে ভালোবাসার প্রতিফল। সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এই বিশ্বনেতা (সা.)-এর মর্যাদা কত মহান এবং কত অসাধারণ নৈকট্য তিনি লাভ করেছেন! যে তাঁকে ভালোবাসে, সে খোদার প্রিয় হয়ে যায়!" [এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা কত উঁচু যে, তাঁকে যে ভালোবাসে সে আল্লাহ্‌রও প্রিয় হয়ে যায় এবং তাঁর (সা.) সেবক সারা পৃথিবীর সেবাধন্য হয়ে যায়।] অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "এ স্থলে আমার মনে পড়ছে যে, এক রাতে এ অধম এত বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করে যার ফলে আমার মনপ্রাণ সুরভিত হয়ে যায়। সে রাতেই স্বপ্নে দেখলাম, স্বচ্ছ-সুপেয় পানির ন্যায় নূরের মশক এ অধমের ঘরে নিয়ে আসছে আর তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, এটি সেই কল্যাণরাজি যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে।

এমনই আরেকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা মনে পড়ল। একবার একটি ইলহাম হলো যার অর্থ হলো, ঊর্ধ্বলোকের মানুষ অর্থাৎ ফেরেশতারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত অর্থাৎ ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা প্রবল। (আল্লাহ্ তা'লা চাচ্ছেন, ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হোক এবং ধর্ম বিস্তার লাভ করুক।) কিন্তু তখনো ঊর্ধ্বলোকে (ধর্মের) জীবনসঞ্চারী ব্যক্তি কে নির্ধারিত হলো তা প্রকাশিত হয় নি। এ কারণে তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত ছিল। এমতাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখলাম, লোকেরা একজন পুনরুজ্জীবিতকারী ব্যক্তির খোঁজ করছে এবং এক ব্যক্তি এই অধমের নিকট এসে ইশারা করে বলল, **'হাযা রাজুলুন ইউহিব্বু রসূলাল্লাহ'** অর্থাৎ এই হলো সেই ব্যক্তি যে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে ভালোবাসে। একথার অর্থ হলো, এই মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার জন্য রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা হলো শর্ত।" অর্থাৎ ধর্মের প্রাণসঞ্চারী ব্যক্তি কে হবে এর উত্তর হলো, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে যে ভালোবাসে সে-ই হবে আর এটিই হলো সবচেয়ে বড়ো শর্ত। "অতএব এটি এই ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান" অর্থাৎ এই শর্ত হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে পূর্ণতা পায় আর ফেরেশতারা এ ইঙ্গিতই করছিল।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত ইলহামে মহানবী (সা.)-এর পরিবারের প্রতি দরূদ প্রেরণের নির্দেশ রয়েছে; সেক্ষেত্রেও এই রহস্য বিদ্যমান যে, ঐশী জ্যোতির বিকাশের ক্ষেত্রে আহলে বাইতকে [অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর পরিজন –অনুবাদক] ভালোবাসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় সে ঐসকল পূতপবিত্র ব্যক্তিবর্গের উত্তরাধিকার পায় এবং সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও মারেফতে তাদের উত্তরাধিকারী হয়।" (বারাহীনে আহমদীয়া, খণ্ড: ০৪, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০১, পৃ. ৫৯৭-৫৯৯)

একটি হাদীসে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেন, "লোকদের মাঝে সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে তাদের মাঝে আমার প্রতি সর্বাধিক দরূদ প্রেরণকারী হবে।" [তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত, বাব মা জাআ ফি ফাযলিস্ সালাতি আলান্ নাবি (সা.)]

আরেকটি হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী (সা.)-কে এটি বলতে শুনেছেন যে, "তোমরা যখন মুআযযিনের আযান শোনো তখন তোমরাও সেই বাক্যগুলির পুনরাবৃত্তি করো এবং আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি (একবার) দরূদ প্রেরণ করবে (এর বিনিময়ে) তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দশগুণ রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নিকটে আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করো। এটি জান্নাতের স্তরগুলোর একটি যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনই পাবে আর আশা করি, আমিই হবো সেই বান্দা। আল্লাহ্‌র দরবারে যে আমার জন্য ওয়াসীলা যাচনা করল তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত।" [সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সালাত, বাব ইসতিহবাবুল কওলি মিসলু কওলুল মুআযযিন লিমান সামিয়াহু সুম্মা ইউসাল্লি আলান্ নাবিয়্যি (সা.)]

সুতরাং এ থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা, অনুগ্রহ এবং ক্ষমা যদি

চাও তবে তা বর্তমানে কেবল মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। এছাড়া এটিও তাঁর (সা.) অনেক অনুগ্রহের মাঝে একটি অনুগ্রহ যে, তিনি (সা.) এর রীতিও আমাদেরকে শিখিয়েছেন অর্থাৎ আযানের পরের দোয়া শিখিয়ে বুঝিয়েছেন যে, এভাবে আমার ওয়াসীলা অন্বেষণ করো। অতএব এই দোয়াটিও আমাদের প্রত্যেকের মুখস্থ করা উচিত।

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো; কেননা আমার জন্য দরূদ পাঠ তোমাদের নিজেদের পবিত্রতা অর্জন এবং উন্নতির কারণ হবে।" [জালাউল ইফহাম বিহাওয়ালিহি কিতাবু সালাতিন আলান্ নাবিয়্যি (সা.)]

অতএব কে আছে– যে পুণ্য ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চায় না? আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এই পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, তোমরা আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। কেননা আমার জন্য দরূদ পাঠ তোমাদের নিজেদের পবিত্রতা অর্জনের কারণ হবে। কিন্তু কেবল দরূদ পাঠ করলেই কি উন্নতির সকল স্তর অতিক্রান্ত হবে? কিছু মানুষকে আপনারা দেখবেন, তসবীহ্ গুনতে থাকে আর বলে, আমরা আল্লাহ্‌র যিকর করছি। তারা এত দ্রুত তসবীহ্‌র দানা গুনতে থাকে যে, সেই সময়ের ভেতর দরূদ শরীফ পড়াই যায় না বরং কোনো যিকরই করা সম্ভব নয়। তাদের এ অবস্থা দেখে মন অস্থির হয়ে যায় যে, এরা কীভাবে দরূদ পড়ছে? এরা কেমন মানুষ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নাম যপছে! কিছু মানুষের মনে কখনো কখনো প্রশ্নও জাগে যে, তাদের বাহ্যিক কর্ম অর্থাৎ তসবীহ্ গুনতে থাকা এবং তাদের বাস্তব অবস্থার মাঝে এত বিরোধ কেন? বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টির সমাধান দিয়েছেন আর আমরা আহমদীরা খুবই সৌভাগ্যবান যে, যুগ-ইমামকে আমাদের চেনার সৌভাগ্য হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার মাত্রা আরো বৃদ্ধি এবং ভালোবাসার নবায়নের জন্য প্রত্যেক নামাযে দরূদ শরীফ পড়া আবশ্যক করা হয়েছে, যেন দোয়া কবুলিয়তের জন্য এটি একটি স্থায়ী ব্যবস্থাপত্র হয়ে যায়। বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা এটি অবিচলতা লাভের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু তা যেন কেবল প্রথাসর্বস্ব ও অভ্যাসজনিতভাবে না হয় বরং মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও (আমাদের প্রতি) অনুগ্রহরাজিকে দৃষ্টিপটে রেখে, তাঁর সম্মান ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাঁর (সা.) যাবতীয় সফলতার জন্য দোয়া করা উচিত।" তাঁর (সা.) সফলতা বলতে কী বুঝায়? সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভ করাই হলো তাঁর (সা.) সফলতা। "এর ফলে দোয়া কবুলিয়তের সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল তোমরা লাভ করবে। দোয়া গৃহীত হবার মাধ্যম তিনটি। প্রথমত, **'ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী'** [অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো (আলে ইমরান: ৩২) –অনুবাদক], দ্বিতীয়ত, **'ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা'** [অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করো। (আল-আহযাব: ৫৭) –অনুবাদক] এবং তৃতীয়ত, **ঐশী দান**।" [রিভিউ অব রিলিজিওন (উর্দু), খণ্ড: ০৩, সংখ্যা: ১, পৃ. ১৪-১৫)

সুতরাং প্রথম দুটি মহানবী (সা.)-এর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাও মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের ফলে লাভ হবে। আবার যারা ঈমান এনেছে তারাও যেন তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে ও আবেগের সাথে তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করে দরূদ শরীফ পড়া না হবে এবং হৃদয়ে সেই প্রকৃত উদ্দীপনা সৃষ্টি না হবে যার ফলে তাঁর (সা.) প্রতি সত্যিকার অর্থে দরূদ প্রেরণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এটিকে কেবল বুলিসর্বস্ব দরূদ বলা হবে আর তা আপনাদের মনের কথা হবে না। তাই দরূদ শরীফ পড়ারও কিছু নিয়মনীতি এবং রীতি আছে আর সেগুলো মেনে যদি আমরা দরূদ পাঠ করি তবে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং সেখান থেকে অজস্র ধারায় আশিস ও কল্যাণ নিয়ে ফেরত আসবে।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে যেখানে মহানবী (সা.) বলেন, আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো, কেননা আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ তোমাদের জন্য একটি কাফফারাস্বরূপ (তথা পাপমোচনের কারণ)। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বার দরূদ প্রেরণ করবে তার ওপর আল্লাহ্ তা'লা দশ বার রহমত বর্ষণ করবেন। [জালাউল ইফহাম বিহাওয়ালিহি কিতাবুস্ সালাত আলান্ নাবিয়্যি (সা.) লিইবনি আবি আসিম]

ভুল করা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, সে ভুল করে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ না হলে না জানি আমাদের সাথে কী হয়! আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ অবতীর্ণ করার পদ্ধতি মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আর তা হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও (আমাদের প্রতি তাঁর) অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো এবং করতে থাকো। এর ফলে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দশগুণ রহমতের ভাগী হতে থাকবে। **আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।**

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বর্ণনা করেন, ঠান্ডা পানি যেভাবে পিপাসা দূর করে, দরূদ শরীফ পড়া তার চেয়ে অনেক বেশি পাপ মোচন করে আর তাঁর (সা.) প্রতি সালাম প্রেরণ দাসমুক্ত করার চেয়েও অধিক কল্যাণের কারণ এবং তাঁর (সা.) প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া কিংবা জিহাদ করার চেয়েও উত্তম। [তফসীর দুররে মানসূর বিহাওয়ালিহি তারীখু খতিবিন ওয়া তারগীবু আসফাহান]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসের আশঙ্কা এবং বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুরক্ষিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সে হবে যে আমার প্রতি সর্বাধিক দরূদ প্রেরণ করবে। তিনি বলেন, (আমার জন্য তো) আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাদের দরূদ পাঠই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মুমিনদের পুরস্কৃত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। [তফসীর দুররে মানসূর বিহাওয়ালিহি তারগীবু আসফাহানী ওয়া মুসনাদ দীলামী]

সুতরাং এ হাদীসের মাধ্যমে কথা আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ ও কল্যাণের চাদরে আবৃত করার সুযোগ খুঁজছেন যে, তোমরা

আমার প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো, এর ফলে আমি তোমাদের পরিত্রাণের উপকরণ সৃষ্টি করতে থাকব। অতএব মহানবী (সা.)-এর এটিও একটি অনুগ্রহ যে, তিনি (সা.) আমাদেরকে পরকালে মুক্তি লাভের পদ্ধতিও শিখিয়েছেন।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে দোয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায় আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা না হলে তার কোনো অংশই (খোদা তা'লার দরবারে উপস্থাপিত হবার জন্য ওপরে যায় না)। [তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত, বাব মা জাআ ফি ফাযলিস্ সালাতি আলান্ নাবিয়্যি (সা.)]

যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এ হাদীসটি আরো বেশি স্পষ্ট করছে যে, তোমরা যদি দোয়াসমূহ কবুল করাতে চাও তবে হৃদয়ের প্রকৃত আবেগ ও এমন ভালোবাসা যা একজন মুমিনের অন্য কারো জন্য হতে পারে না আর হওয়া উচিতও নয়, সেই ভালোবাসার সাথে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর দরবারে তা (দোয়া) উপস্থাপন করো। কেবল তখনই তোমাদের সমস্ত দোয়া গ্রহণযোগ্য হবে এবং পথিমধ্যে হারিয়ে যাবে না।

আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমার সাথে কা'ব বিন আজরাহ (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয় আর তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শোনা একটি কথা উপহারস্বরূপ বলব? আমি বললাম, অবশ্যই আপনি আমাকে সেই উপঢৌকন দিন। তখন তিনি বলেন, আমরা একবার রসূল করীম (সা.)-এর নিকট নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাদের অর্থাৎ আপনার পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কীভাবে দরূদ প্রেরণ করব? সালাম দেবার পদ্ধতি তো আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিন্তু দরূদ প্রেরণের পদ্ধতি আমরা জানি না। তখন মহানবী (সা.) বললেন, তোমরা এমনটি বলো যে, **আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।** [তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত, বাব মা জাআ ফি সিফাতিস্ সালাতি আলান্ নাবিয়্যি (সা.)]

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করো মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অনুগামীদের প্রতি– যেরূপ তুমি শান্তি বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর অনুগামীদের ওপর। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত ও মহামর্যাদাবান। হে আমার আল্লাহ! তুমি কল্যাণ বর্ষণ করো মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি– যেভাবে তুমি কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত এবং মহামর্যাদাবান।

অতএব এক্ষেত্রে সাহাবীদের পুণ্য দেখুন! একদিকে তাদের হৃদয়ে এই আকুতি ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে-সব নিয়ামতে ভূষিত করছেন তা থেকে যেন আমার অন্য মুমিন ভাইয়েরা বঞ্চিত না থাকে। অপরদিকে ছিল একথা মুমিনদের কাছে অনেক বেশি পৌঁছানোর আকুতি– যেন তারা আমার প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে।

অতএব এটিই হলো মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু স্মরণ রাখুন! বাহ্যিকভাবে আসর জমিয়ে আর না বুঝে দেখানোর জন্য কেবল তোতা পাখির মতো যপসর্বস্ব দরূদ পড়ার রীতি সঠিক নয়; যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখনই দরূদ প্রেরণ করবে তখন তা হৃদয়ের গভীর থেকে প্রেরণ করো; কেননা তা হয়ত মহানবী (সা.)-এর সামনেও উপস্থাপন করা হবে কিন্তু তোমরা তা জানো না। বর্ণনাকারী বলেন, শ্রোতারা আমাকে বলল, আপনি আমাদেরকে সেই পদ্ধতি শেখান। তিনি (রা.) বললেন, এভাবে বলো, হে আমার আল্লাহ্! নিজের পক্ষ থেকে তুমি সাইয়্যেদুল মুরসালীন, মুত্তাকীদের ইমাম এবং খাতামান নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো এবং অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষণ করো যিনি তোমার বান্দা ও রসূল, সকল পুণ্যের ময়দানে অগ্রগামী, প্রত্যেক পুণ্যের পানে পথপ্রদর্শনকারী এবং অনুগ্রহশীল রসূল। হে আল্লাহ্! তুমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এমন সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করো যা দেখে পূর্বাপর সবাই ঈর্ষান্বিত হয়। [সুনানে ইবনে মাজাহ্ কিতাব ইকামাতুস্ সালাতা ওয়াস্ সুন্নাতা ফীহা বাব আস্ সালাতু আলান্ নাবিয়্যী (সা.)]

আরেকটি হাদীসে হযরত আমের বিন রবিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যে মুসলমানই আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে আর যতক্ষণ আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে ততক্ষণই ফেরেশতারা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে থাকে। অতএব বান্দা চাইলে তার (দরূদ পাঠের) পরিমাণ কমাতেও পারে আবার বাড়াতেও পারে। [সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাব ইকামাতুস্ সালাতা ওয়াস্ সুন্নাতা ফীহা বাবুস্ সালাতু আলান্ নাবিয়্যী (সা.)]

অতএব দেখুন! কৃপাধন্য হবার কত ধরনের পদ্ধতি আমাদেরকে শেখানো হয়েছে!

অতঃপর একটি হাদীসে বর্ণনাকারী বলেন, আমি একদিন মহানবী (সা.)-এর বরাবরে নিবেদন করলাম, হুযূর (সা.)! আমি নিজের জন্য যতক্ষণ দোয়া করি তার মধ্যে অনেকটা সময় আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে থাকি। ভালো হতো যদি আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে বলতেন যে, দোয়ায় কাটানো সময়ের কতটা আমি দরূদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করব? মহানবী (সা.) বলেন, যতটা তুমি চাও। আমি নিবেদন করলাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি (সা.) বললেন, যতটা তুমি চাও। তবে এ সময় যদি বৃদ্ধি করো তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। তখন আমি বললাম, আগামীতে আমি আমার দোয়ার পুরোটা সময়ই হুযূর (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের জন্য নির্ধারণ করলাম। মহানবী (সা.) বললেন, এটি করলে তোমার সমস্ত চাওয়া-পাওয়া এবং লক্ষ্য পূর্ণ হবে আর তোমার সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। [তিরমিযী, কিতাব সিফাতুল কিয়ামাতি বাব মা জাআ ফিল আওয়ানিল হাওয]

এ যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীদের মাঝে এমন অনেক উদাহরণ দেখা যায় যেমনটি হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রা.)-এর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি (রা.) বলেন– "আমি লাহোরের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের (বা হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের) অফিসে চাকরি করতাম। ১৮৯৮ সালের কাছাকাছি সময়ের একটি ঘটনা।

আমি বহুল পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করতাম আর এতে আমি অনেক তৃপ্তি এবং প্রশান্তি লাভ করতাম। সে দিনগুলোতে আমি একটি হাদীসে পড়লাম, এক সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করলেন, দরূদ শরীফই আমার সাকুল্য দোয়া হবে। এ হাদীস পাঠের পর আমার ভিতরও এমনটি করার প্রবল বাসনা জাগ্রত হলো। অতঃপর একদিন আমি কাদিয়ানে আসলাম এবং মসজিদে মুবারকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি নিবেদন করলাম, আমি নিজের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চাওয়া-পাওয়া জলাঞ্জলি দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া হিসেবে কেবল দরূদ শরীফই পড়ব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং উপস্থিত সকলকে নিয়ে আমার জন্য হাত তুলে দোয়া করলেন। তিনি (রা.) বলেন, তখন থেকেই আমি নিজের সব বাসনা দরূদ শরীফের অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করতে থাকি।"

হাদীসে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) ঘর থেকে বের হলে আমি একদিন তাঁর (সা.) পিছু পিছু গেলাম। তিনি (সা.) একটি খেজুরের বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে সিজদায় পড়ে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার অপেক্ষার প্রহর ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে আর পুরোটা সময় মহানবী (সা.) সিজদায় ছিলেন। আমি যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সিজদার মাঝে বাদ সাধতে চাচ্ছিলাম না তাই আর সামনে গেলাম না। কিন্তু সময় এতটাই দীর্ঘ হয়ে গেল যে, আমার আশঙ্কা হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রাণপাখি আবার দেহে ছেড়ে উড়ে যায় নি তো (নাউযুবিল্লাহ্)! সিজদাবনত অবস্থাতেই তিনি ইন্তেকাল করলেন না তো! এ দুশ্চিন্তায় ও দুঃখের ঘোরে ছুটলাম আর যখন নিকটে এলাম তখন তিনি (সা.) আমার আসার শব্দ শুনে সিজদা থেকে উঠে পড়লেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্দুর রহমান! কী হয়েছে? আমি তাঁর নিকট নিজের শঙ্কার কথা ব্যক্ত করে বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এ কারণে আমি আপনার কাছে চলে এসেছি। তখন মহানবী (সা.) বললেন, জিবরাঈল আমাকে বলল, আমি কি তোমাকে এই সুসংবাদ দেবো না যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করব আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে আমি তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করব। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, আল আশারাতুল মুবাশশিরীনা বিল জান্নাতি, হাদীস আব্দুর রহমান বিন অওফ...]

আরেকটি হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে ভুলে গেল, সে জান্নাতের পথ হারালো অথবা সে জান্নাতের পথ থেকে বিচ্যুত হলো। [সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাব ইকামাতুস্ সালাতা ওয়াস্ সুন্নাতা ফীহা বাবুস্ সালাতু আলান্ নাবিয়্যী (সা.)]

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পৃথিবীতে কোটি কোটি পবিত্রচেতা মানুষ গত হয়েছেন এবং আগামীতেও হবেন কিন্তু আমরা সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে খোদার সেই বান্দাকে পেয়েছি যার নাম **মুহাম্মদ (সা.)**। **ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু .... তাসলীমা**। [অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ এ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর

প্রতি দরূদ এবং অনেক সালাম প্রেরণ করো (আল-আহযাব: ৫৭) –অনুবাদক]। [চশমায়ে মারেফত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২৩, পৃ. ৩০১-৩০২]

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.) জীবনে যে-সব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন সেসব যদি কেউ বুঝতে পারে আর যদি অবহিত হয় যে, সে সময়কার পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল এবং তিনি (সা.) এসে কী করেছেন; তাহলে মানুষ অভিভূত হয়ে যায়।" [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের যুগে পৃথিবীর কী অবস্থা ছিল, কতটা অধঃপতন ঘটেছিল... আর তাঁর (সা.) আগমনের ফলে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল] তিনি (আ.) বলেন, " মানুষের আত্মা অভিভূত হয়ে যায় আর বলে ওঠে, **আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ**। আমি সত্য সত্যই বলছি, এটি কোনো কল্পনাপ্রসূত কিংবা বানানো কথা নয়। মহানবী (সা.) কী করেছেন সে সম্পর্কে কুরআন শরীফ এবং পৃথিবীর ইতিহাস পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। অন্যথায় (তাঁর মাঝে) কী এমন বৈশিষ্ট্য ছিল, যে কারণে বিশেষভাবে তাঁর জন্য বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

(আল-আহযাব: ৫৭)

অন্য কোনো নবীর ক্ষেত্রে এই আদেশ দেওয়া হয় নি। পূর্ণ সাফল্য ও সম্পূর্ণ প্রশংসাসহ এ পৃথিবীতে কেবল এই একজন মানুষই এসেছেন আর তিনি হলেন, মুহাম্মদ (সা.)।" [আল-হাকাম, খণ্ড: ০৫, সংখ্যা: ২, ১৭ জানুয়ারি ১৯০১, পৃ. ৩]

তিনি (আ.) বলেন, খোদার কালাম বা বাণী অনুসারে মুত্তাকী তারাই– যারা নম্রতা ও দীনতার মাঝে জীবনযাপন করে এবং তারা দাম্ভিকসুলভ কথাবার্তা বলে না। ছোটোরা বড়োদের সাথে যেভাবে কথা বলে তাদের আলাপচারিতাও তেমনই হয়। আমাদের সর্বদা তা-ই করা উচিত যার ফলে আমরা সফলতা লাভ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঠিকা নেন নি। তিনি খাঁটি তাকওয়া চান। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে সে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। মহানবী (সা.) কিংবা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে কেউই উত্তরাধিকারসূত্রে সম্মান লাভ করেন নি। যদিও আমাদের বিশ্বাস হলো, মহানবী (সা.)-এর শ্রদ্ধেয় পিতা আব্দুল্লাহ মুশরিক ছিলেন না, তবুও তিনি নবুওয়ত পাপ্ত হন নি। এটি তাঁর প্রকৃতিতে নিহিত নিষ্ঠার কারণে ঐশী কৃপা ছিল যা কৃপাকে উদ্‌বেলিত করেছিল। আবার হযরত ইবরাহীম (আ.) যিনি নবীকুলের পিতা ছিলেন তিনি স্বীয় নিষ্ঠা ও তাকওয়ার কারণেই স্বীয় পুত্রকে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি; এমনকি নিজে আগুনে নিক্ষিপ্ত হন। অন্যদিকে আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা লক্ষ করুন! তিনি (সা.) সকল প্রকার পাপাচারমূলক আন্দোলনের মোকাবিলা করেছেন। বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ ও দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন তবুও কোনোকিছুর পরোয়া করেন নি আর এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার কারণেই খোদা তা'লা তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

(আল-আহযাব: ৫৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং তাঁর সকল ফেরেশতা এই রসূলের প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করো।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-এর আমল বা কর্ম এমন ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা বা বৈশিষ্ট্যাবলিকে সীমাবদ্ধ করার নিমিত্তে কোনো শব্দ নির্দিষ্ট করেন নি।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সেসব কর্মকে এতটা পছন্দ করেছেন যে, সেগুলোকে বর্ণনার জন্য এমন কোনো শব্দ নির্ধারণ করেন নি যা সেসব গুণকে সীমাবদ্ধ করতে পারে অর্থাৎ, সেই গুণাবলির সীমাপরিসীমা ছিল না। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "অর্থাৎ তাঁর (সা.) সত্তায় সেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর কর্ম খোদার দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য এ আদেশ দিয়ে দিলেন, আগামীতে তোমরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ দরূদ প্রেরণ করবে। তাঁর (সা.) দৃঢ়চিত্ততা, নিষ্ঠা ও সত্যতা এবং বিশ্বস্ততার কতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব তাঁর অনুসারীদের ওপর পড়েছিল! একজন বিপথগামী মানুষকে সংশোধন করা কতটা কঠিন কাজ তা প্রত্যেকেরই জানা। বদ্ধমূল বদভ্যাস পরিত্যাগ করানো কত-না অসম্ভব বিষয়! অর্থাৎ যে বদভ্যাস পোক্ত হয়ে যায় তা ত্যাগ করা খুব কঠিন। কিন্তু আমাদের পবিত্র নবী (সা.) হাজার হাজার এমন মানুষকে সংশোধন করেছেন যারা পশুর চেয়েও অধম ছিল। অর্থাৎ অনেকে পশুর মতো মা-বোনের মধ্যে পার্থক্য করত না। এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ করত। মৃত ব্যক্তির সম্পদ হরণ করত। কেউ কেউ নক্ষত্রপূজারি ছিল, কেউ ছিল নাস্তিক আবার কেউ ছিল প্রাকৃতিক শক্তির পূজারি। আরব উপদ্বীপ ছিল সকল ধর্মের এক সমাহার। এর ফলে সবচেয়ে বেশি যে সুবিধা হয়েছিল তা হলো, পবিত্র কুরআনের মাঝে সব ধরনের শিক্ষা পুঞ্জিভূত রয়েছে যা সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ শিক্ষার মূলোৎপাটনের জন্য জন্য যথেষ্ট। এটি হলো আল্লাহ্ তা'লার গভীর প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "প্রকৃতপক্ষে মানুষ হলো বান্দা অর্থাৎ দাস। মালিক যে আদেশ দেবে তা পালন করাই দাসের কাজ। একইভাবে তোমরা যদি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণ লাভ করতে চাও তবে তাঁর দাসত্ব বরণ করো। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম'** [অর্থাৎ তুমি বলো, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ (আয-যুমার: ৫৪) –অনুবাদক]। এখানে **'বান্দা'** শব্দটি সৃষ্টিকুল অর্থে নয় বরং দাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর দাস হবার জন্য আবশ্যক হলো, তোমরা তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করো এবং তাঁর (সা.) কোনো আদেশ অমান্য কোরো না আর সকল আদেশ জীবনে বাস্তবায়ন করো।" (বদর পত্রিকা, খণ্ড: ০২, সংখ্যা: ১৪, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩, পৃ. ১০৯)

অনেক সময় এই প্রশ্ন করা হয় যে, কতবার দরূদ পড়া উচিত? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক চিঠিতে লেখেন, "কোনো সংখ্যা নির্ধারণের প্রয়োজন নেই বরং নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও গভীর মনোযোগসহকারে এবং বিগলিত চিত্তে দরূদ পড়া উচিত। ততক্ষণ পড়তে থাকুন যতক্ষণ না হৃদয় বিগলিত হয় এবং একপ্রকার (আধ্যাত্মিক) নেশায় বিভোর হয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও প্রাণোদ্দীপ্ত তৃপ্তি লাভ হয়।"

এমনকি তিনি (আ.) বলেন, "এত বেশি দরূদ পড়া উচিত যাতে দরূদের এক আধ্যাত্মিক আনন্দে হৃদয় ভরে যায় এবং একপ্রকার স্বতঃস্ফূর্ততা, পরিতৃপ্তি ও প্রাণ সঞ্জীবনী অবস্থার উন্মেষ ঘটে।" (মাকতুবাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ২৬)

যেন অনুভব হয়, হৃদয়ে একপ্রকার উদ্দীপনা ও পরিতৃপ্তি বিরাজমান। যাহোক, সেসব মানুষের প্রশ্নের উত্তর এখানে চলে এসেছে যারা বলে যে, কতবার পড়া উচিত? প্রথম কথা হলো, নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করো। যাকে ভালোবাসো তার নাম উচ্চারণ করতে, তার প্রশংসা করতে, তার গুণের কথা বলতে, তার অনুগ্রহ স্বীকার করতে এবং তার কথা স্মরণ করার ক্ষেত্রে মানুষ সংখ্যার সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে না। জাগতিক প্রেমিকরাও তো এমন করে না। ইনি তো সেই প্রেমাস্পদ যাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণের ফলে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় জগৎ কল্যাণে সিক্ত হয়। এছাড়া এমন আধ্যাত্মিক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, আবেগ ও উদ্দীপনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং তাঁর (সা.) স্মরণে ও দরূদ প্রেরণে এক অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়, স্বাদ অনুভূত হয় আর মন সার্বক্ষণিকভাবে দরূদ পড়তে চায়। **আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।**

আরেকটি পত্রে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখেন, "আপনি দরূদ শরীফ পড়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। বাস্তবে যেভাবে কেউ তার আপনজনের জন্য আন্তরিকভাবে মঙ্গল কামনা করে ঠিক তেমনই উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার সাথে এবং অনেক বেশি কাকুতিমিনতির সাথে মহানবী (সা.)-এর জন্য কল্যাণ কামনা করুন। এই কাকুতিমিনতিতে ও দোয়ায় যেন কোনো কৃত্রিমতা না থাকে বরং মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব থাকা উচিত। প্রকৃত অর্থে অন্তরের অন্তস্তল থেকে যেন মহানবী (সা.)-এর জন্য কল্যাণ কামনা করা হয় যেমনটি দরূদ শরীফে উল্লেখ আছে। ... আর ব্যক্তিগত ভালোবাসার লক্ষণ হলো, মানুষ কখনো ক্লান্ত-শ্রান্ত হবে না এবং বিরক্তিও বোধ করবে না আর ব্যক্তিস্বার্থের কোনো ভূমিকাও এতে থাকবে না, বরং কেবল এ উদ্দেশ্যেই দরূদ পড়বে যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণ বর্ষিত হয়।" (মাকতুবাতে আহমদীয়া, খণ্ড: ০১, পৃ. ২৪-২৫)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "একবার আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এমনকি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন বার আমার আত্মীয়স্বজনরা শেষ সময় মনে করে সুন্নত অনুযায়ী আমাকে তিন বার সূরা ইয়াসীন পড়ে শোনায়। তৃতীয় বার যখন সূরা ইয়াসীন শোনানো হচ্ছিল তখন আমি দেখলাম, আমার কোনো কোনো আত্মীয় দেয়ালের পেছনে লুকিয়ে অঝোরে কাঁদছেন

যাদের কেউ কেউ ইতোমধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমার এক ধরনের কঠিন রক্ত আমাশয় হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পর পর পায়খানার বেগ পেয়ে বার বার রক্ত যাচ্ছিল। ষোলো দিন অনবরত এমন অবস্থা চলতে থাকল। আমার সাথে আরো একজন একই রোগে আক্রান্ত হয়। সে আট দিনের মাথায় অবিনশ্বর জগতের পথিক হয়ে যায় অথচ সে ততটা গুরুতর অসুস্থ ছিল না যতটা আমি ছিলাম। আমার অসুস্থতার ষোলো দিনের মাথায় সবাই পুরোপুরি আশা ছেড়ে দেয় (অর্থাৎ সম্পূর্ণ হতাশা ছেয়ে গেল)। তৃতীয় দফায় সূরা ইয়াসীন পড়ে শোনানো হলো এবং আমার সব আত্মীয়স্বজন নিশ্চিত ধরে নেয় যে, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত কবরে থাকবেন অর্থাৎ মারা যাবেন। ঠিক তখন যা হয় তা হলো, আমাকে খোদা তা'লা ইলহামের মাধ্যমে একটি দোয়া শেখালেন আর তা হলো, **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম; আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ**।" (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৫, পৃ. ২০৮, নিদর্শন নং: ১৫)

হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার আমি নিজে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলতে শুনেছি, দরূদ শরীফ পাঠ এবং অজস্র ধারায় পাঠের কল্যাণে আল্লাহ্ আমাকে এই সম্মান প্রদান করেছেন। তিনি (আ.) আরো বলেন, ঐশী কল্যাণধারাকে আমি এক আশ্চর্যজনক নূররূপে মহানবী (সা.)-এর দিকে প্রবাহিত হতে দেখেছি। সেখানে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর বক্ষে শোষিত হয় আর সেখান থেকে বেরিয়ে তা অগণিত স্রোতস্বিনীতে বিভক্ত হয় আর তা থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ পেয়ে থাকে।" (অর্থাৎ যারা যেমন আবেগ নিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করছে তারা ঠিক সে অনুপাতে নূর হতে অংশ পায়।) "নিশ্চয় কোনো কল্যাণ মহানবী (সা.)-এর মাধ্যম ছাড়া অন্যরা পেতেই পারে না।" অর্থাৎ বর্তমানে এমন কোনো কল্যাণ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবে না, যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যম ছাড়া কোনো ব্যক্তির লাভ হতে পারে।

তিনি (আ.) বলেন, "দরূদ শরীফ কী? (দরূদ শরীফ হলো) মহানবী (সা.)-এর সেই আরশকে আন্দোলিত করা, যেখান থেকে এই জ্যোতির ফোয়ারা বিচ্ছুরিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভ করতে চায় তার জন্য বাধ্যতামূলক, সে যেন অজস্র ধারায় দরূদ শরীফ পাঠ করে যেন সেই কল্যাণ উথলে ওঠে।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৭, সংখ্যা: ৮, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩)

একবার হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)-কে তার কিছু সমস্যার সমাধানের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়া করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, "আপনি দরবেশসুলভ পদ্ধতিতে প্রত্যেক নামাযের পর **১১** বার **লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম** পড়ুন এবং রাতের নির্ধারিত নামাযের পর ঘুমানোর সময় কমপক্ষে **৪১** বার **দরূদ শরীফ** পাঠ করে দুই রাকাত নামায পড়ুন আর প্রতিটি সিজদায় কমপক্ষে **৩** বার এই দোয়া পড়ুন, **ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগীস**। অতঃপর নামায সম্পূর্ণ করে সালাম ফেরান এবং নিজের জন্য দোয়া করুন।" (মাকতুবাতে আহমদীয়া, খণ্ড: ০৭, ১ম অংশ, পৃ. ৩৩)

এখানে কেউ যেন এটি মনে না করে যে, প্রথমে (হযরত মসীহ্ মওউদ) কোনো নির্দিষ্ট

সংখ্যা নির্ধারণ করেন নি আবার এখানে সংখ্যার কথা উল্লেখ করলেন! অতএব স্পষ্টভাবে জেনে নিন, প্রথমত তিনি (আ.) হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)-এর একটি বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে দোয়া করার একটি পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন আর দ্বিতীয়ত এখানে 'কমপক্ষে' শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, এতবার অবশ্যই পড়ুন। মূলকথা হলো, দরূদ পড়তে কোনো বাধা নেই বরং যত বেশি দরূদ পড়া যায় ততই উত্তম। যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু দরূদ পড়তে থাকুন আর সে অনুযায়ীই কল্যাণ পেতে থাকবেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহামেও দরূদ শরীফের বহু স্থানে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'এজাযুল মসীহ্' পুস্তকে লেখা আছে, **'ফাসাল্লু আলা'**। অর্থাৎ (হে লোকসকল!) তোমরা সেই অনুগ্রহশীল নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো, যিনি খোদা তা'লার রহমান (তথা দয়ালু) এবং মান্নান (তথা অনুগ্রহ) গুণের বিকাশস্থল, কেননা অনুগ্রহের বিনিময় অনুগ্রহই হয়ে থাকে। যে হৃদয় তাঁর অনুগ্রহ অনুভব করে না, হয় তার ঈমান নেই কিংবা সে তার ঈমান নষ্ট করার পর্যায়ে আছে। হে আল্লাহ্! তুমি এই উম্মী নবী ও রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো– যিনি এই আখারীনদের (আখেরী যুগের পুণ্যবানদেরও) সেভাবেই (আধ্যাত্মিক) পানিতে পরিতৃপ্ত করেছেন যেভাবে তিনি (সা.) আউয়ালীনদের (প্রথম যুগের সাহাবীদের) করেছিলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে নিজ গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং পবিত্রচেতা লোকদের মাঝে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" (এজাযুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ৫-৬)

আরেকটি ইলহাম হলো,

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ. اَلصَّلٰوةُ هُوَالْمُرَبِّى۔

অর্থাৎ তুমি সৎকর্মের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো এবং মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। কেননা দরূদ শরীফই তো তরবিয়তের মূল পন্থা।" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০১, পৃ. ২৬৭)

স্বীয় মনিব (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অজস্র ধারায় দরূদ প্রেরণ করার ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এত বেশি কল্যাণমণ্ডিত করেছেন যে, ইলহাম করে তাকে বলেন, "তোমার প্রতি আরবের পুণ্যবান ও এবং সিরিয়ার আবদাল বা পরিশুদ্ধ বান্দারা দরূদ প্রেরণ করবে। আকাশ এবং পৃথিবী তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে আর আল্লাহ্ তা'লা নিজ আরশ থেকে তোমার প্রশংসা করেন।" (তাযকেরা, পৃ. ১৬২, প্রকাশ: ১৯৬৯)

অতঃপর একটি দীর্ঘ আরবী ইলহামের কিছু অংশের অনুবাদ উপস্থাপন করছি। "খোদা আরশ থেকে তোমার প্রশংসা করছেন। আমরা তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করি। লোকেরা খোদার নূরকে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু খোদা অস্বীকারকারীদের অপছন্দ সত্ত্বেও সেই জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ অবশ্যই ঘটাবেন। আমরা শীঘ্রই তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করব। খোদার সাহায্য এবং বিজয় যখন আসবে আর যুগের হাওয়া আমাদের অনুকূলে বইতে থাকবে তখন বলা হবে, তোমাদের ধারণামতে কি এটি সত্য ছিল না?" (তাযকেরা, পৃ. ৩৫৫, প্রকাশ: ১৯৬৯)

অতএব এসব হলো সেই বরকত ও কল্যাণ যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের ফলে লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। এটিই সেই মাধ্যম যার সাথে আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সমষ্টিগত কল্যাণ আর উন্নতি সম্পৃক্ত; পাশাপাশি আজকে জুমুআর দিনও বটে। জুমুআর দিনে মহানবী (সা.) মুমিনদেরকে দরূদ পাঠের প্রতি বিশেষভাবে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন একটি হাদীসে আছে, তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমুআর দিন। এই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনই তার রূহ কবজ করা হয়েছিল। এ দিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং এ দিনই সবাই মূর্ছা যাবে। কাজেই, এ দিন তোমরা আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এটি শুনে সাহাবীরা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার পবিত্র সত্তা অর্থাৎ দেহ যখন মাটির সাথে মিশে যাবে তখন আমাদের দরূদ আপনার নিকট কীভাবে পৌঁছানো হবে? তিনি (সা.) বলেন, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মাটির জন্য নবী-রসূলদের দেহকে হারাম করে দিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত, বাব আল-জুমুআ)

আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথেও জুমুআর দিনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, জামা'তের উন্নতি এরই সাথে সম্পৃক্ত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) উপরোক্ত হাদীসের চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি (রাহে.) বলেন, "জুমুআর বিষয়টি অনেক ব্যাপক ও গভীর। ... জুমুআ একটি যুগের নাম এবং সে যুগে 'দলবদ্ধ' বা জামা'তবদ্ধ হবার একটি তাৎপর্য আছে অর্থাৎ বিভিন্ন জিনিসকে একসাথে মিলিয়ে দেওয়া। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা এ হাদীসটি পর্যালোচনা করি তখন অনেক ব্যাপক একটি বিষয় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম কথা হলো, এ দিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং এ দিনই সবাই মূর্ছা যাবে। এখানে যদি কিয়ামত দিবসের অর্থ বুঝানো হয় তাহলে এর সাথে জুমুআর সম্পর্ক কী? কিয়ামত দিবসে তো আদি-অন্ত সব একাকার হয়ে যাবে। সেখানে এ প্রশ্নই থাকবে না যে, আজকে কোন দিন? প্রকৃত বিষয় হলো, কিয়ামত একটা যুগের নাম এবং সেখানে আমরা যেভাবে দিন গণনা করি সেরকম দিন থাকবে না। এটি একটি সুদীর্ঘ কালের নাম আর একে যে অর্থে জুমুআ বলা সঠিক হবে তা হলো, এদিনে পূর্বাপরের সকলকে একত্রিত করা হবে। ... আর সেটি সাধারণ কোনো দিনের মতো হবে না যে, সূর্য উঠল আর দিন হলো এবং সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে দিনের সমাপ্তি ঘটল; বরং একটি দীর্ঘ যুগের সূচনা হবে যার পুরো সময়টাকেই জুমুআ বলা হয়েছে।

...দ্বিতীয় যে বিষয়টি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছেন তা হলো, "এ পৃথিবীর ক্ষেত্রে যদি সেটি প্রয়োগ করা হয় তবে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা ঘটে যা সূরা জুমুআতে বলা হয়েছে। আর তা হলো, সেদিনই শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে অর্থাৎ সকল মানুষকে মহানবী (সা.)-এর ধর্মের প্রতি আহ্বান জানানো হবে আর শিঙায় সেই ফুৎকার দেওয়া হবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে। এ সম্পর্কে হাদীসে অনেক

সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ওলী-আওলিয়াদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকেও স্পষ্ট হয় যে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মসীহ্ মওউদের যুগেই পৃথিবীর সকল ধর্মের ওপর মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম বিজয় লাভ করবে।

অতএব এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ যা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেদিন সবাই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে অর্থাৎ এতটাই ভয়ংকর যুগ হবে যে, মানুষকে প্রথমে অচেতন করে ফেলা হবে, মানুষ উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াবে এবং বুঝতে পারবে না যে, পৃথিবীর এ কী হলো? অতঃপর তাদেরকে ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা হবে।

এরপর তিনি (রাহে.) বলেন, অতএব তোমরা সেদিন আমার প্রতি অনেক বেশি দরূদ প্রেরণ করো। জামা'তের জন্য এর মধ্যে কত বড়ো সুসংবাদ রয়েছে লক্ষ করুন! এটি তো সেই যুগ চলছে যেখানে আমাদের সকল কল্যাণ ইতোমধ্যে দরূদ শরীফের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এটি সেই যুগ যেখানে অজস্র ধারায় দরূদ প্রেরণের ফলে আমাদেরকে বৈশ্বিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দরূদ শরীফের কল্যাণেই পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তার লাভ করবে। এটি তো স্পষ্ট বিষয়, আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করব তখন দরূদ প্রেরণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কেননা আকাশ থেকে খোদা ও তাঁর ফেরেশতারাও দরূদ প্রেরণ করবে। ফলে সংখ্যাগত একটি আশিসও এতে যুক্ত হয়। সুতরাং তোমরা অজস্র ধারায় দরূদ প্রেরণ করো। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও তোমাদের প্রতি অধিকহারে দরূদ প্রেরণ করা হবে যার ফলে সংখ্যাগত কল্যাণও লাভ হবে অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

অতএব এর প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। জামা'তের সকলের অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। এখানে আপনাদের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর আপনারা অনেক পুণ্যবান ব্যক্তিকে পেয়েছেন যারা যুগ-ইমামকে চিনেছে এবং পূর্ণাঙ্গীন ঈমান এনেছে। সুতরাং আপনারা পুরোনো আহমদী হন কিংবা নতুন, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এবং নিজেদেরকে আরো সুসংহত করতে চাইলে আপনারা প্রত্যেকেই বেশি করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন। বুঝেশুনে পড়ুন এবং মন থেকে পড়ুন যেন আপনারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহভাজন হতে পারেন।" (জুমুআর খুতবা, ১২ মার্চ ১৯৯৯)

ইনশাআল্লাহ্ তা'লা, আজ আপনাদের জলসাও আরম্ভ হচ্ছে। এই তিন দিন এদিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করুন এবং অধিক হারে দরূদ পাঠ করুন যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের কল্যাণ আপনারা এই তিন দিনেও লক্ষ করতে পারেন। এ জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রচুর দোয়া করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এসব দোয়াকে আপনাদের সবার অনুকূলে গ্রহণ করুন এবং সবাইকে এর ভাগী করুন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সর্বদা স্বীয় অনুগ্রহ ও কল্যাণরাজিতে ভূষিত করুন। আমীন।

(২১)

লন্ডনের বাইতুল ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১২ তাবুক, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযূর (আই.) বলেন,

ইসলামী শিক্ষা এতটাই অনিন্দ্য সুন্দর যে, এটি মানবজীবনের কোনো একটি দিক এমন রাখে নি যা দেখে মনে হবে, এই শিক্ষায় কোনো ঘাটতি রয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার এসব অনুগ্রহরাজির দাবি হলো, তাঁর প্রিয় রসূল (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ এই শিক্ষানুযায়ী নিজেদের জীবন গড়া এবং তা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেওয়া। আর আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর প্রিয় দাস এবং এ যুগের ইমামের জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি বা হবার দাবি করি, তাদের তাদের ওপর এ দায়িত্ব আরো বেশি বর্তায়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যেখানেই তাঁর ইবাদত করার কথা বলে হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র অধিকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেখানেই হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার প্রাপ্য প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদেরকে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। এই গুরুত্বারোপের কারণেই হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) নবম শর্তের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের অধিকারসমূহ প্রদানের কথা বলেছেন। অতএব বয়আতের শর্তাবলি নিয়ে আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজকে আমি নবম শর্ত নিয়ে আলোচনা করব।

নবম শর্ত হলো, কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۝

(আন-নিসা: ৩৭)

অর্থাৎ "আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক কোরো না। আর পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতিম, অভাবী, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গীসহচর, পথচারী, এমনকি তোমাদের অধিকারভুক্তদের সাথেও (সদয় ব্যবহার করো)। নিশ্চয় আল্লাহ্ অহংকারী (ও) দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কেবল ভাই, আত্মীয়স্বজন, পরিচিতজন এবং

প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে তা-ই নয়, কেবল তাদের প্রতিই সহমর্মিতা প্রদর্শন নয়, সাহায্যের প্রয়োজন হলে কেবল তাদেরই সাহায্য ও যথাসাধ্য উপকার সাধন করবে তা-ও নয়, বরং যাদেরকে বা যে-সব প্রতিবেশীকে তোমরা চেনো না, যাদের সাথে তোমাদের কোনো আত্মীয়তা বা ওঠা-বসার সম্পর্ক নেই, যাদের সাথে তোমাদের ক্ষণিকের পরিচয় হয়েছে মাত্র তাদের ক্ষেত্রেও যদি তোমার সহমর্মিতা এবং সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে, তোমাদের মাধ্যমে যদি তারা কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারে তবে তাদের সেই উপকার সাধন করো। এর মাধ্যমে একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ গড়ে উঠবে। **সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের হিতসাধনের বৈশিষ্ট্য ও গুণ নিজের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে এবং এই পুণ্যকে সাধারণ পুণ্য হতে বেশি অর্থাৎ অনুগ্রহের পর্যায়ের পুণ্য মনে করতে হবে। আর অনুগ্রহ কখনো প্রতিদান লাভের আশায় করা হয় না। অনুগ্রহ মানুষ কেবল আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। এর ফলে এমন সুন্দর একটি সমাজ গড়ে উঠবে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদবিসংবাদ থাকবে না, শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়াও থাকবে না, ভাইয়ে ভাইয়ে কোনো দ্বন্দ-কলহ থাকবে না, প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর কোনো বিতণ্ডা থাকবে না। সেখানে এক পক্ষ অপর পক্ষের সাথে অনুগ্রহের আচরণ করবে এবং অপর পক্ষের অধিকার মমতাপূর্ণ আবেগ নিয়ে আদায় করতে সচেষ্ট থাকবে। আর তারা কেবল আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি ও ভালোবাসা লাভের জন্য এসব কাজ সম্পাদন করবে।** বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি এসব না করো, তাহলে তোমরা অহংকারী আখ্যায়িত হবে আর আল্লাহ্ অহংকার পছন্দ করেন না। অহংকার এমন এক ব্যাধি, এর থেকেই সকল বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সূচনা হয়। বয়আতের সপ্তম শর্তে এ বিষয়টি পূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে, তাই এখানে অহংকার সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। সারকথা হলো, সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হও, যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে প্রিয়ভাজন হতে পারো এবং উভয় জগতে সফলতা লাভ করতে পারো। আর একে অপরের প্রতি যে অনুগ্রহ করবে, তা ভালোবাসার টানেই করবে, অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে খোঁটা দেবার জন্য নয়।

আল্লাহ্ তালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ①

(আদ-দাহর: ৯)

অর্থাৎ "আর তারা খাবারের প্রতি অদম্য আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও অভাবী, এতিম এবং বন্দিদের আহার করায়।"

এর একটি অর্থ হলো, তাদের নিজেদের অভাব-অনটন থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কেবল আল্লাহ্‌র প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যেই অভাবীদের প্রয়োজন পূরণে সংবেদনশীল হয়। নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে তাদেরকে খাওয়ায়। দানকালে সংকীর্ণ মনেরও পরিচয় দেয় না। অর্থাৎ কাউকে যা কিছু দিচ্ছে তা পরিমাণে এত অল্প নয় যে, গ্রহিতার প্রয়োজনই মেটাতে

ব্যর্থ হবে আর ক্ষুধাও নিবারণ করতে পারবে না, বরং যথাসাধ্য সাহায্য করে এবং এ সবকিছু করে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, কোনো ধরনের খোঁটা দেবার উদ্দেশ্যে নয়। এর আরেকটি অর্থ হলো, তাদের নিজেদেরও যা প্রয়োজন, অর্থাৎ দাতারও যে জিনিসের প্রয়োজন থাকে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে তারা সে জিনিস দানও করে। 'আল্লাহ্‌র খাতিরে তা দান করো যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করো'– মর্মে নির্দেশ সর্বদাই তারা দৃষ্টিপটে রাখে। অনেকে নিজেদের কোনো অভাবী ভাইকে সাহায্য করে পরবর্তীতে সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে খোঁটা দিতে থাকে– এমনটি হওয়া উচিত হয়। অদ্ভুত স্বভাবের এমন অনেক লোকও আছে, যারা কোনো উপহার দিলে নিজেদের ব্যবহৃত জিনিস থেকেই দেয় বা ব্যবহৃত কাপড় দিয়ে থাকে। এমন প্রকৃতির লোকদের উচিত নিজের ভাই-বোনদের আত্মসম্মানের প্রতি যত্নবান থাকা। সামর্থ্য যদি না থাকে তাহলে উপহার না দেওয়াই শ্রেয় বা একথা স্পষ্ট বলে দেওয়া উচিত, এটি আমার ব্যবহৃত জিনিস, তুমি নিতে চাইলে আমি দিতে পারি।

অনেকেই আবার লেখেন, আমরা দরিদ্র মেয়েদের বিয়ের জন্য ভালো কাপড়-চোপড় দিতে চাই যেগুলো আমরা এক-আধ দিন পরেছি, যা ছোটো হয়ে গেছে অথবা কোনো কারণে ব্যবহার করতে পারি নি। এমন ক্ষেত্রে স্পষ্ট হওয়া উচিত, এমন জিনিস অঙ্গসংগঠনসমূহ তথা লাজনা বা খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতভাবেই দেওয়া হোক না কেন, এক্ষেত্রে অঙ্গসংগঠনকেও বলা হয়ে থাকে যে, এমন লোকেরা জিনিস দেবার ক্ষেত্রে যেন দরিদ্রদের আত্মসম্মানের বিষয়ে যত্নবান থাকেন। আর সেই জিনিস দেবার যোগ্য হলে তবেই যেন দেওয়া হয়। এমন কাপড় যা ব্যবহারের একেবারেই অযোগ্য, তা যেন দেওয়া না হয়। দাগ লেগে আছে বা কাপড় থেকে ঘামের দুর্গন্ধ আসছে– এমন জিনিস দেওয়া শোভনীয় নয়। গরিবেরও আত্মসম্মানবোধ রয়েছে, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এমন কাপড় যদি দিতেই হয় তাহলে ধুয়ে পরিষ্কার-পরিপাটি করার পর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন আমি আগেও বলেছি, আমাদের অঙ্গসংগঠনগুলো যেমন লাজনা ও অন্যান্য সংগঠন কাপড় প্রভৃতি বিতরণ করে থাকে। যাদেরকে এসব জিনিস দিতে হয় তাদেরকে অবগত করতে হবে যে, এটি ব্যবহৃত জিনিস; যে নিচ্ছে সে যেন এটি স্বেচ্ছায় নেয়। প্রত্যেকেরই আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। আমি এর আগেও বলেছি, এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে এবং খুবই গুরুত্বের সাথে এদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গে বলেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝

(আদ-দাহর: ৯)

অর্থাৎ "... স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যকে খুবই ভালোবাসেন এবং তিনি চান, তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি সহানুভূতি বা সহমর্মিতা প্রদর্শন করা হোক। পাপ পছন্দ করলে তিনি পাপ করার নির্দেশ দিতেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এ থেকে পবিত্র, সুবহানাল্লাহ্ তা'লা

শানুহু।... অতএব যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখো, স্মরণ রেখো প্রত্যেকের সাথে তোমরা সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে– তা সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, কোনোরূপ ভেদাভেদ না করে সবার সাথে পুণ্য করো, কেননা এটিই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ①

(আদ-দাহর: ৯)

বন্দি হিসাবে তখন যারাই আসত তাদের অধিকাংশ কাফিরই ছিল। এখন লক্ষ করো, ইসলামের সহমর্মিতার শিক্ষা কত মহান। আমার মতে পূর্ণাঙ্গীন নৈতিক শিক্ষা ইসলাম ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটে নি। আমি সুস্থ হলে চারিত্রিক শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি পৃথক পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করব। কেননা আমি চাই, আমার সব ইচ্ছা বা অভিপ্রায় যেন প্রকাশিত হয়। আমার জামা'তের সামনে যেন একটি পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা থাকে আর এর মাঝে যেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ কীভাবে অন্বেষণ করতে হয় তা বিধৃত থাকে। প্রায়শই আমি যখন দেখি ও শুনি যে, কেউ এ কাজ করেছে, কারো হাতে সে কাজ সাধিত হয়েছে, তখন আমার খুবই কষ্ট হয়। আমার হৃদয় এসব কথা ও বিষয়াবলি শুনে মোটেই প্রীত হয় না। আমি আমার জামা'তকে এখনো সেই শিশুর মতোই দেখতে পাচ্ছি, যে দু-পা চলতে গিয়ে চার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি, খোদা তা'লা এ জামা'তকে উৎকর্ষতা দান করবেন। তাই তোমরাও প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা, কঠিন সাধনা এবং আকুতিভরা দোয়ায় রত থাকো যেন খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। কেননা তাঁর কৃপা বা অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। যখন তাঁর কৃপা অবতীর্ণ হয় তখন সব পথ খুলে যায়। (মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ২১৮-২১৯, নব সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে এবং তার শিক্ষা অনুযায়ী চলার ফলে অনেক রোগব্যাধি জামা'ত থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল, যেগুলো নিয়ে তিনি সেসময় উদ্‌বিগ্ন থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় একটি বড়ো অংশ এসব ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু আমরা সে যুগ ও সেসময় থেকে যতই দূরে যাচ্ছি সমাজের কিছু কদাচারকে ভর করে শয়তানও আক্রমণ করে চলছে। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন, তাঁর শিক্ষা অনুসারেই পরিকল্পনা ও আকুতিভরা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যাচনা করে এসব অপকর্ম বা পাপ থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকা উচিত, যেন আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে স্থায়ীভাবে উন্নতির পরম মার্গে স্থান দিয়ে রাখেন।

এখন আমি এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার সেবাশুশ্রূষা করো নি'। বান্দা বলবে, 'হে আমার প্রভু, তুমি বিশ্বপ্রতিপালক। আমি কীভাবে তোমার সেবাশুশ্রূষা করতে পারি?' আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল। তুমি তা জানতে পেরেও তার সেবাশুশ্রূষা করো নি। তুমি তার শুশ্রূষা করলে তুমি আমাকে তার পাশে পেতে– এটি কি তুমি জানতে না?'

'হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি দাও নি।' এটি শুনে আদম সন্তান বলবে, 'হে আমার প্রভু! তুমি তো বিশ্বপ্রতিপালক। আমি কীভাবে তোমাকে খাওয়াতে পারি?' আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'তোমার কি মনে নেই, আমার অমুক বান্দা খাবার চেয়েছিল, তুমি তাকে খাবার খাওয়াও নি। তুমি যদি তাকে খাবার খাওয়াতে তাহলে তুমি আমার কাছে এর প্রতিদান পেতে, তুমি কি এটি জানতে না?'

'হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাও নি।' আদম সন্তান বলবে, 'হে আমার প্রভু! তুমিই সারা বিশ্বের পালনকর্তা। তোমাকে আমি কীভাবে পানি পান করাতে পারি'? এতে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'আমার অমুক পিপাসার্ত বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাও নি। তুমি তাকে পানি পান করালে এর প্রতিদান তুমি আমার কাছে পেতে'।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা বাবু ফাজলে ইয়াদাতিল মারীযে)

আরেক বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সৃষ্টিকুল আল্লাহ্র পরিবার-পরিজন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর সৃষ্টজীবের মাঝে সে-ই প্রিয়ভাজন, যে তাঁর অধীনস্থদেরও সৃষ্টজীবের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করে এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান থাকে'।" (মিশকাত, বাবুশ শাফকাতে ওয়ার রাহমাতে আলাল খালকে)

আরেকটি হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'একজন মুসলমানের কাছে অপর মুসলমানের ৬টি অধিকার প্রাপ্য।

১. তার সাথে সাক্ষাৎ হলে 'আসসালামু আলাইকুম' বলা।

২. সে হাঁচি দিলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলা।

৩. সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষার জন্য যাওয়া। [আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অনেকেই নিজে থেকেই এ বিষয়ে লক্ষ রাখেন এবং হাসপাতালে গিয়ে পরিচিত-অপরিচিত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করেন। তাদের জন্য ফলফলাদি নিয়ে যান, ফুল নিয়ে যান। এটি সত্যিই খুব ভালো অভ্যাস। আর খেদমতে খালকের বা সৃষ্টির সেবার এই পদ্ধতি খুবই ভালো।

৪. সে ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেওয়া।

৫. সে মারা গেলে তার জানাযায় যোগ দেওয়া।

৬. নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অপরের জন্যও তা-ই পছন্দ করা। আর তার অবর্তমানে তার কল্যাণ কামনা করা'।" (সুনান দারেমী, কিতাবুল ইস্তিযান, বাব ফী হাক্কিল মুসলিমে আলাল মুসলিমে)

অপর এক বর্ণনায়, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'একে অপরকে হিংসা কোরো না। একে অন্যের ক্ষতিসাধনের জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে (পণ্যের) অলীক মূল্য বৃদ্ধি কোরো না। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না। একে অপরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোরো না অর্থাৎ সম্পর্কহীনতামূলক ব্যবহার কোরো না। একজনের দামদর করার সময়ে অপরজন দাম করবে না। আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হিসেবে

পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। মুসলমান কখনো ভাইয়ের প্রতি অন্যায় করতে পারে না। তাকে হীন-জ্ঞান করতে পারে না, তাকে লজ্জিত করতে পারে না। তিনি (সা.) নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, **তাকওয়া হা হুনা** অর্থাৎ 'তাকওয়া এখানে'। এ বাক্যটি তিনি তিন বার পুনরাবৃত্তি করেন। এরপর বলেন, নিজের কোনো মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখাটাই কোনো মানুষের হতভাগা সাব্যস্ত হবার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ, সম্মান ও সম্ভ্রম অন্য মুসলমানের জন্য হারাম বরং সম্মানের যোগ্য'।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস্ সিলাহ, বাবু তাহরীমে যুলমিল মুসলিমে ওয়া খাযলিহে)

আরেক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জাগতিক কোনো অস্থিরতা ও কষ্ট বা সমস্যা লাঘব করেছে এবং যে-কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে আর তার জন্য কোনো বিষয় সহজ করেছে, আল্লাহ্ তা'লা পরকালে তার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ তা'লা পরকালে তার দুর্বলতাও ঢেকে রাখবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তা'লা তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানের অন্বেষায় বের হয়, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যারা মসজিদের কোনো কোনায় বসে আল্লাহ্ তা'লার কিতাব পাঠ করে এবং এর পঠন-পাঠনে লেগে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সুখ ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, আল্লাহ্ তা'লার রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখে। ফেরেশতারা তাদেরকে নিরাপত্তার বেষ্টনিতে রাখে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি আমলের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখায়, তার বংশ ও পরিবার তার পুণ্যকর্মে গতি সঞ্চার করতে পারে না অর্থাৎ বংশের জোরে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না'।" (মুসলিম, কিতাবুয যিকর, বাব ফাযলুল ইজতেমায়ে আলা তিলাওয়াতিল কুরআনে ওয়া আলায্ যিকরে)

এতে প্রথম দিকে বর্ণনা করা হয়েছে, তোমরা মানুষের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট থাকো এবং নিজ ভাইয়ের অস্থিরতা এবং কষ্ট ও সমস্যাবলি দূর করো, তাহলে পরকালে আল্লাহ্ তোমাদের সাথে অনুরূপ স্নেহের আচরণ করবেন এবং তোমাদের অস্থিরতা এবং সমস্যাবলি দূর করে দেবেন। আমাদের প্রতি এটি মহানবী (সা.)-এর অনেক বড়ো অনুগ্রহ। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সচেষ্ট হলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমার চাদরে আবৃত করে নেবেন। অস্থিরতা ও দুঃখকষ্টে নিপতিত এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য তুমি যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছ, তাদের আরামের ব্যবস্থা করেছ, অনুরূপভাবেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবেন। নিজ ভাইয়ের দোষত্রুটি ঢেকে রাখো, তার কোনো দোষ ধরে এর প্রচার কোরো না। কে জানে! তোমার মাঝে কত-সব দুর্বলতা আছে আর কত-শত দোষত্রুটি, যার হিসাব পরকালে তোমাকে দিতে হবে। তাই এ দুনিয়াতে তুমি যদি তোমার ভাইয়ের কোনো দোষত্রুটি ঢেকে রাখো, কোনো দোষ দেখে থাকলে সমালোচনা না করে তার সহমর্মী হয়ে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করো, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমার সাথেও দোষত্রুটি গোপন রাখার আচরণ করবেন। এগুলোই হলো 'হুকুকুল ইবাদ' বা বান্দার অধিকার। এসব অধিকার আদায় করলে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহভাজন হবে।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সদকা বা দান-খয়রাত করলে সম্পদ কমে না। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরো সম্মান দান করেন। অধিকন্তু কারো অপরাধ ক্ষমা করলে সম্মানের কোনো হানি হয় না'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ০২, পৃ. ২৩৫)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণিত হাদীস, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে দয়া প্রদর্শন করবে রহমান খোদা তার প্রতি দয়া করবেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে ঊর্ধ্বলোকবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।" (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফির রাহ্মাতে)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "একথাটি গুরুত্বের সাথে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লার দুটি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। প্রথমত, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কোরো না। সত্তার দিক থেকেও নয়, গুণাবলির দিক থেকেও নয় আর ইবাদতের ক্ষেত্রেও নয়। আর দ্বিতীয়ত, সকল মানুষের সাথে সদাচরণ-সহমর্মিতা প্রদর্শন করো। কেবল নিজ ভাই ও আত্মীয়স্বজনের সাথেই অনুগ্রহের আচরণ করবে– এহসান বা অনুগ্রহ বলতে কেবল এটুকু বুঝায় না। বরং অনুগ্রহ বলতে যা বুঝায় তা হলো, যে-ই হোক, যে-কোনো আদম সন্তান হোক বা আল্লাহ্-সৃষ্ট জীবের যে-ই হোক, তার সাথে অনুগ্রহের আচরণ করতে হবে। সে, হিন্দু নাকি খ্রিষ্টান তা চিন্তা কোরো না। আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের বিচারের ভার আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। তোমরা নিজেরা বিচারক সাজবে– এটি তিনি চান না। নম্রতা ও বিনয় যত বেশি অবলম্বন করবে আল্লাহ্ তা'লা ততই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তোমরা তোমাদের শত্রুদের খোদার হাতে ছেড়ে দাও। কিয়ামত সন্নিকট, শত্রু তোমাদেরকে যে-সব দুঃখকষ্ট দেয় তাতে তোমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনো তোমাদের আরো অনেক দুঃখ-যাতনা সইবার আছে। কেননা ভদ্রতার গণ্ডি থেকে যারা বেরিয়ে যায়, তাদের মুখ সেভাবে চলে, যেভাবে বাঁধ ভেঙে গেলে পানির ঢল নামে। অতএব ধার্মিক ব্যক্তির নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা উচিত।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৯, পৃ. ১৬৪-১৬৫)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "স্মরণ রেখো, অধিকার দুই ধরনের। একটি হলো– আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকার, অপরটি বান্দার অধিকার। আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকার প্রদানে ধনী লোকদের সমস্যা হয় কারণ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন- নামাযের সময় একজন দরিদ্র ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে তার খারাপ লাগে, তাদেরকে নিজের কাছে বসাতে পারে না আর এভাবে আল্লাহ্র অধিকার আদায় থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা মসজিদ মূলত 'বাইতুল মাসাকীন' অর্থাৎ দীনহীনদের ঘর। এখানে যাওয়াকে তারা নিজেদের সম্মানের পরিপন্থি মনে করে। আর একইভাবে এরা বান্দার অধিকার প্রদানে বিশেষ বিশেষ সেবা বা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। **দরিদ্র ব্যক্তি সব ধরনের খেদমতের জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা পা-ও টিপতে পারে, পানি আনতে পারে, কাপড়ও ধুতে পারে, এমনকি সে যদি মল পরিষ্কারের সুযোগও পায় এতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু ধনীরা এমন কাজে সংকোচ বোধ করে; আর এভাবে তারা এ থেকেও বঞ্চিত থাকে।**

মোটকথা প্রাচুর্যও অনেক ক্ষেত্রে পুণ্যার্জনে বাধা সৃষ্টি করে। হাদীসে যেমন বর্ণিত হয়েছে, দরিদ্ররা পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এর মর্ম এটিই।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৬৮, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "অতএব সৃষ্টজীবের সাথে সহমর্মিতা এমন একটি বিষয়, মানুষ যদি এটি ছেড়ে দেয় এবং এ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে সে-ও ক্রমান্বয়ে নরপশুতে রূপান্তরিত হতে থাকে। মানুষের মনুষত্বের দাবি এটি এবং সে ততক্ষণই মানুষ আখ্যায়িত হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুগ্রহ ও সদাচরণের সাথে সে মানুষের মাঝে বসবাস করে আর এই সদ্ব্যবহার করায় কোনো ভেদাভেদ করে না। শেখ সাদী যেমন বলেছেন, 'আদম সন্তান একে অপরের অঙ্গ।'

মনে রাখবে, আমার দৃষ্টিতে সহনশীলতার পরিধি অনেক ব্যাপক। কোনো জাতি বা ব্যক্তিকে এর গণ্ডির বাইরে রাখবে না। বর্তমান যুগের কিছু নির্বোধের মতো আমি একথা বলব না যে, তোমরা তোমাদের সহনশীলতার পরিধি কেবল মুসলমানের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখো; বরং আমি বলব, তোমরা হিন্দু-মুসলমান বা যে-ই হোক না কেন, আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টজীবের সাথে সদাচরণ করো। কেবল স্বজাতির মধ্যে যারা সহমর্মিতা বা সদাচরণ সীমাবদ্ধ করে রাখে এমন লোকদের কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৭, পৃ. ২১৬-২১৭, নব সংস্করণ)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "মোটকথা মানবজাতির প্রতি স্নেহাচরণ ও সহমর্মিতা অনেক বড়ো ইবাদত এবং এটি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের খুবই কার্যকর একটি উপায়। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, এক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা দেখানো হয়ে থাকে। অন্যদের হীন জ্ঞান করা হয়, ঠাট্টা ও তামাশার লক্ষ্যস্থল বানানো হয়, তাদের খেয়াল রাখা এবং কারো সমস্যা ও দুঃখকষ্টে সাহায্য করা তো দূরের কথা, দরিদ্রদের সাথে যারা ভালো ব্যবহার করে না তাদের ব্যাপারে আমি শঙ্কিত, পাছে তারা নিজেরাই সেই সমস্যা ও দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাচুর্য দান করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হলো, তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সদাচরণ করা, খোদাপ্রদত্ত সেই অনুগ্রহ বা সম্পদের কারণে অহংকার না করা এবং দরিদ্রদেরকে বন্যদের ন্যায় পদপিষ্ট না করা।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "পবিত্র কুরআন পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন এবং অভাবীদের অধিকার, যেভাবে বর্ণনা করেছে, আমার পর্যবেক্ষণে আর কোনো ধর্মগ্রন্থে এতটা উল্লেখ নাই।

যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۝

(আন-নিসা: ৩৭)

অর্থাৎ "আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক কোরো না, পিতামাতার প্রতি সদয় হও এবং তাদের সাথেও সদ্‌ব্যবহার করো যারা তোমার নিকটাত্মীয়, (নিকট আত্মীয়ের মাঝে সন্তান, ভাই এবং কাছের ও দূরের সকল আত্মীয় অন্তর্ভুক্ত)। এরপর আরো বলেছেন, এতিমদের সাথেও সদ্‌ব্যবহার করো আর অভাবীদের সাথেও এবং এমন প্রতিবেশীদের সাথেও যারা নিকটাত্মীয় আবার এমন প্রতিবেশীর সাথেও যারা অপরিচিত। আর এমন সাথি যারা কোনো কাজে বা সফরে তোমার সহযাত্রী অথবা নামাযের সাথি ও সহপাঠী এছাড়া যারা মুসাফির তাদের সাথেও। অধিকন্তু যে-সব প্রাণী তোমাদের করায়ত্তে রয়েছে তাদের সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করো। আর খোদা তা'লা এমন লোকদের ভালোবাসেন না যারা অহংকারী ও দাম্ভিক এবং যারা অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না'।" (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২৩, পৃ. ২০৮-২০৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন: "খাবার যোগান দেবার উদ্দেশ্য এটা হওয়া উচিত–

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝

(আদ-দাহর: ১১)

আমরা আমাদের প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে এক দিনের আশঙ্কা করি যা হবে আবুস ও কামতারীর।" 'আবুস' অর্থ অভাব-অনটন এবং 'কামতারীর' অর্থ দীর্ঘ। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনটি হবে বড়ো কষ্টের ও দীর্ঘ। ক্ষুধার্তদের সাহায্য করলে আল্লাহ্ তা'লা দুর্ভিক্ষের অনটন এবং এর দীর্ঘ ব্যাপ্তিকাল থেকে মুক্তি দান করেন। এর ফলশ্রুতিতে যা হয় তা হলো–

فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝

(আদ-দাহর: ১২)

অর্থাৎ সুতরাং আল্লাহ সে-দিনের অনিষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।

আমি আবারো বলছি, মনে রাখবে বর্তমান যুগে অভাবগ্রস্ত এবং ক্ষুধার্তদের সাহায্য করার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের যুগের অনটন থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এবং তোমাদেরও তৌফিক দান করুন, আমরা বাহ্যিক সম্মানের জন্য যেভাবে চেষ্টা-সাধনা করি পরকালের সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্যও যেন সেভাবেই চেষ্টা করতে পারি। আমীন। (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০৪, পৃ. ২৯০-২৯১)

এটি আহমদীয়া জামা'তের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, এ জামা'ত সামর্থ্য অনুযায়ী সৃষ্টিসেবার কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করে। যতটুকু সামর্থ্য ও উপকরণ রয়েছে তার মধ্য থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং জামা'তী পর্যায়েও যথাসম্ভব খেদমতে খালক বা মানবতার সেবা করে থাকে। জামা'তের সদস্যরা সামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষুধা নিবারণ, অভাবীদের চিকিৎসা, তাদের শিক্ষা-সাহায্য এবং দরিদ্রের বিয়েশাদির জন্য জামা'তের তত্ত্বাবধানে সাহায্য প্রদানে অংশ নিয়ে বয়আতের অঙ্গীকার পালন করে আর এটি করাও

উচিত। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন কখনো সেসব জাতি ও রাষ্ট্রের মতো না হই, যারা নিজেদের উদ্‌বৃত্ত নষ্ট করে ফেলে কিন্তু দুঃখকষ্টে নিপতিত দেখেও নিরঙ্কুশ মানবসেবার প্রেরণায় তাদের জন্য খরচ করে না। কেননা সেসব দেশের সাথে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত নেই আর সেসব দেশ তাদের সব কথা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা এবং তাদের ডিক্টেশন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, আর এ কারণে শাস্তিমূলকভাবে তাদের অনাহারে ও উলঙ্গ থাকতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া জামা'তকে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি নিঃস্বার্থভাবে আর্তমানবতার সেবা করার তৌফিক দান করুন।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, সমষ্টিগতভাবে যথাসাধ্য মানবতার সেবা হচ্ছে– জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যদের আল্লাহ্ তালা সে তৌফিকও দিচ্ছেন। তারা অনেকে বড়ো অংকের টাকাও দিচ্ছেন যার মাধ্যমে মানবসেবা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আফ্রিকা, রাবওয়া এবং কাদিয়ানেও জীবন উৎসর্গকারী ডাক্তার এবং শিক্ষকরা সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। কিন্তু আমি সকল আহমদী ডাক্তার ও সকল আহমদী শিক্ষক এবং প্রত্যেক আহমদী উকিল আর প্রত্যেক সেই আহমদীকে, যার নিজ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মানবসেবা করার সুযোগ আছে, অর্থাৎ দরিদ্র ও অভাবীদের উপকারে আসতে পারে এমন সকলকে বলছি, তারা যেন অবশ্যই দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য উপকারী হবার চেষ্টা করে। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা আপনার ধন ও জনসম্পদে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি বরকত দান করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আর আপনারা সবাই যদি এসব সেবা এ উদ্দেশ্যে করেন যে, যুগ ইমামের হাতে বয়আতের এক অঙ্গীকার আমরা করেছি যা পূর্ণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও করুণাবারি এত অসাধারণভাবে বর্ষিত হবে, যা কখনো ফুরাবে না।

মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা, বিশেষত নিজ ভাইদের প্রতি সহানুভূতি ও তার পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে এক স্থানে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার নিজের মনের অবস্থা হলো নামাযরত অবস্থায় কষ্টে নিপতিত কোনো ব্যক্তির আর্তনাদ যদি আমার কানে পৌঁছে যায় নামায ভেঙে হলেও তার কোনো উপকার যদি সাধন করা সম্ভব হয় করব; তার প্রতি যতটা সম্ভব আমি সহমর্মিতা প্রদর্শন করব। কোনো ভাইয়ের সমস্যা ও বিপদের সময় পাশে না থাকা নৈতিকতা পরিপন্থি কাজ। তোমরা যদি তার জন্য কিছু করতে না পারো তাহলে কমপক্ষে তার জন্য দোয়া-ই করো। স্বজনদের তো বটেই, আমি বলব, অন্যদের সাথে এবং হিন্দুদের সাথেও একই নৈতিক আদর্শ দেখাও এবং তাদের সাথেও সদাচরণ করো। ভ্রুক্ষেপহীন আচরণ আদৌ প্রদর্শন করা উচিত নয়।

একবার আমি হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, আমার সাথে আব্দুল করীম নামে জনৈক পাটোয়ারী ছিল। সে আমার থেকে কিছুটা এগিয়ে ছিল আর আমি ছিলাম একটু পেছনে। পথিমধ্যে ৭০/৭৫ বছর বয়সের জীর্ণ-শীর্ণ এক বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ হয়। এই বৃদ্ধা তাকে একটি চিঠি পড়ে শোনাতে বলল, কিন্তু সে তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিল। আমি মর্মাহত

হলাম। সেই বৃদ্ধা চিঠিটি আমাকে দিলে আমি তার চিঠিটি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আর পুরোটা তাকে পড়ে শুনালাম ও ভালোভাবে ধীরে-সুস্থে বুঝিয়ে দিলাম। এতে আব্দুল করীম খুবই লজ্জিত হলো, কেননা দাঁড়াতে তো তার হলোই একইসাথে পুণ্য থেকেও বঞ্চিত থেকে গেল। (মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৮২-৮৩, নবসংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো আর জিহ্বা, হাত বা অন্য কোনো উপায়ে অন্যায় আচরণ কোরো না এবং সৃষ্টজীবের মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হও। কারো সাথে সে তোমার অধীনস্থ হলেও অহংকার কোরো না। কেউ গালি দিলেও তুমি তাকে গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্টজীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, যেন খোদা তা'লার নিকট গ্রহণীয় হতে পারো। ...বড়ো হয়ে ছোটোকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে আত্মগরিমাবশত বিদ্যাহীনদের অবজ্ঞা না করে সদুপদেশ দেবে। ধনী হলে আত্মশ্লাঘাবশত দরিদ্রের প্রতি অহংকার প্রদর্শন না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথসমূহকে ভয় করো।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৯, পৃ. ১১-১২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মানুষ তোমাদের দুঃখ দেবে এবং সকল ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করবে, তবুও আমার জামা'তের সদস্যদের উচিত হবে উত্তেজিত না হওয়া আর উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে পীড়াদায়ক কোনো শব্দ উচ্চারণ না করা। আল্লাহ্ এমন লোকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জামা'তকে একটি উৎকৃষ্ট নমুনা বা আদর্শ বানাতে চান।"

এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য স্মরণে রেখে সবাই সচেতন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চলো, আর মনে রাখবে সকলেই আল্লাহ্র বান্দা, তাই কারো ওপর অন্যায় করবে না। কারো ওপর কঠোর ব্যবহার করবে না আর কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। জামা'তে যদি একজনও নোংরা লোক থাকে, সে পুরো জামা'তকে কলুষিত করে দেয়। উত্তেজিত হও হলে নিজের হৃদয়কে বিশ্লেষণ করো যে, সেই রাগের কারণ বা উৎসমূল কী? এটি খুবই একটি স্পর্শকাতর বিষয়।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৮-৯)

তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা এমন হয়ে যাও, যেন তোমাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং বিগলিত আকুতিমিনতি ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছে যায়। খোদা তা'লা যার হৃদয় নিষ্ঠা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ দেখতে পান, এমন ব্যক্তিকে তিনি নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করেন এবং তাকে কল্যাণমণ্ডিত করেন। তিনি অন্তঃকরণ পরখ করেন ও পর্যালোচনা করেন, বাহ্যিক বা মৌখিক দাবিকে দেখেন না। যার অন্তঃকরণকে তিনি সব ধরনের মন্দ ও নোংরামি থেকে মুক্ত ও পবিত্র পান, সেই অন্তরে তিনি অবতরণ করেন এবং সেথায় নিজের ঘর বাঁধেন।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১৮১, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) বলেন, "আমি আবারো বলছি, যারা মানবহিতৈষী এবং ঈমান, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ ও নিটোল, নিশ্চয় তারা রক্ষা পাবে। অতএব তোমরা নিজেদের মাঝে এসব গুণাবলি সৃষ্টি করো।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ১৮৪, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) বলেন, "তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কখনো তাঁর কাছে গ্রহণীয় হবে না। বড়ো হয়ে ছোটোকে অবজ্ঞা কোরো না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো। জ্ঞানী হলে জ্ঞানহীনদের সদুপদেশ দাও। অহংকারবশত তাদের অসম্মান কোরো না। ধনী হলে আত্মম্ভরিতায় দরিদ্রের প্রতি অহংকার না করে তাদের সেবা কোরো। ধ্বংসের পথসমূহকে ভয় করো। সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো।... কত হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে আমার মাধ্যমে প্রচারিত আল্লাহ্‌র মুখনিঃসৃত বাণী মানে না। তোমরা যদি চাও আকাশে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহলে তোমরা দুই সহোদরের মতো হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে নিজ ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগা সে, হঠকারিতা দেখিয়ে যে ক্ষমা করে না।" (কিশতিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৯, পৃ. ১২-১৩)

তিনি (আ.) বলেন, "সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লার সৃষ্টজীবের সাথে সহমর্মিতা দেখানো অনেক বড়ো বিষয় আর আল্লাহ্ তা'লা এটিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তার প্রতি তিনি সহমর্মিতা দেখাবেন– এর চেয়ে বড়ো পাওয়া তার জন্য আর কী হতে পারে! সাধারণত পার্থিব জগতেও এটি দেখা যায়, কোনো ব্যক্তির কোনো সেবক বা চাকর যদি তার বন্ধুর কাছে যায় আর তার বন্ধু যদি তার চাকরের কোনো যত্ন-আত্তির খেয়াল না করে তাহলে সে কি তার বন্ধুর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে? কখনো নয়, অথচ সে তাকে প্রত্যক্ষভাবে কোনো কষ্ট দেয় নি, তবুও সেই চাকরের সেবা করা হলে ও তার সাথে সদাচরণ করা হলে মূলত সেই সদাচরণ হতো মালিকেরই সাথে। ঠিক একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টজীবের সেবায় শিথিলতা দেখালে তিনিও কষ্ট পান। কেননা তার কাছে তার সৃষ্ট সকল কিছু খুবই প্রিয়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে, মূলত সে তার খোদাকে সন্তুষ্ট করে।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ২১৫-২১৬, নব সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এসব উপদেশ কার্যে রূপ দেবার শক্তিসামর্থ্য দান করুন। আমরা তার সাথে বয়আতে যে অঙ্গীকার করেছি তা তিনি পূর্ণ করারও তৌফিক দান করুন।

এখন আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জার্মানির কর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। জার্মানিতে খুতবার সময় আমি কোনো কারণে তা বলতে পারি নি। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সকল পুরুষ এবং মহিলা কর্মী অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মেহমানদের আতিথেয়তা করেছেন। আর জলসার প্রাথমিক ব্যবস্থাপনার কাজ এবং জলসা শেষ হলে যে-সব গোছানোর কাজ থাকে যা খুবই কঠিন হয়ে থাকে তা অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে নির্দিষ্ট সময়ে, বরং সময়ের পূর্বেই করে আর পুরো এলাকা পরিষ্কার করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেছে। আর যে-সব স্থানেই জলসা হয়েছে সেখানেই এ চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি আমার ভালো লাগে তা হলো, এ বছর লাজনাদের অর্থাৎ মহিলাদের উপস্থিতি পুরুষদের চেয়ে বেশি ছিল এবং পুরুষদের তুলনায় মোটামুটি দুই হাজার মহিলা বেশি উপস্থিত ছিল। এর ফলে এ বিষয়েও আশ্বস্ত হয়েছি যে, আহমদীয়া জামা'তের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও খিলাফত এবং জামা'তের সাথে

ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে তুলবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মকর্তা, কর্মী এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদের ধন ও জনসম্পদে অশেষ কল্যাণ দান করুন। খিলাফতের সাথে তাদের বিশ্বস্ততা ও সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করুন এবং তিনি নিজে তাদেরকে প্রতিদান দিন।

একইভাবে ফ্রান্সের জলসাও তাদের অবস্থা অনুযায়ী অনেক সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এখানকার কর্মীরা কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির দাবি রাখে আর এ জলসার সবচেয়ে বড়ো যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হলো, এখানে পাকিস্তানিদের বাইরে একটি বৃহৎ সংখ্যায় আহমদী রয়েছে যাদের মধ্যে আফ্রিকা, আলজেরিয়া, মরক্কো, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের মানুষ অন্তর্ভুক্ত। আর সবাই একই উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং খুবই সুন্দরভাবে তা পালন করেছেন। তারা এমনভাবে দায়িত্ব পালন করেছে যা দেখে মনে হয়েছে তারা অনেক দিনের পুরোনো এবং দীর্ঘ সময়ের তরবিয়তপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঈমান ও নিষ্ঠায় কল্যাণ দান করুন। খিলাফত এবং জামা'তের প্রতি তাদের যে ভালোবাসা তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আরো বৃদ্ধি করুন এবং তাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই জলসায় দশজন পুণ্যবান ব্যক্তি জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে দৃঢ়তা দান করুন। জামা'তের সকল প্রিয় সদস্যদের প্রতি আহ্বান– আপনারা এ দুটি স্থান অর্থাৎ জার্মানি এবং ফ্রান্স জামা'তের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এবং আমাদেরকেও বয়আতের অঙ্গীকার সুচারুরূপে পালনের সামর্থ্য দান করুন। আমীন।

(২২)

লন্ডনের বাইতুল ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১৯ তাবুক, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

বয়আতের শর্তাবলি সম্পর্কে যে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম, সেগুলোর আজ সর্বশেষ অর্থাৎ বয়আতের দশম শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করব। দশম যে শর্তটি রয়েছে সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন– **"শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মারূফ বা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এ অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অবিচল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধনে এবং তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"**

(বয়আতের) এ শর্তে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিচ্ছেন যে, এ ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার সাথে যেন এক নিবিড় ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে তুলছ। কেননা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। কিন্তু এখানে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে তা হবে এর চেয়েও গভীরতর। কেননা এখানে সম্পর্ক বা বন্ধন সমতার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে না বরং তোমরা অঙ্গীকার করছ যে, আগমনকারী মসীহ্‌কে মান্য করা খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ; এজন্য আল্লাহ্‌র খাতিরে (আমরা) এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করছি। আল্লাহ্ তা'লার (মনোনীত) ধর্মকে সমুন্নত রাখতে এবং ইসলামকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এই সম্পর্ক স্থাপন করছি। ন্যায়সংগত ক্ষেত্রে আনুগত্যের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া আর এ অঙ্গীকারকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লালন করলেই এই সম্পর্কের স্বীকারোক্তি সফল ও ফলপ্রসু হতে পারে। এরপর এ-ও স্মরণ রাখতে হবে, এ সম্পর্ক যেন এখানেই এসে থমকে না যায় বরং প্রতিদিন যেন এতে আরো দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। এর দৃঢ়তা এত বেশি হওয়া উচিত এবং এর মান এত উন্নত হওয়া উচিত যেন এর বিপরীতে জগতের সকল আত্মীয়তা ও অন্যান্য সব সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। (যেন) এমন অতুলনীয় ও সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে যার বিপরীতে অন্য সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক অর্থহীন মনে হয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, হৃদয়ে এ ধারণা আসতে পারে, আত্মীয়তার গণ্ডিতে কখনো কিছু দেবার আবার কখনো কিছু নেবার, কখনো কিছু মানার এবং কখনো মানানোর রীতিও থাকে। তবে এখানে একথা সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, তোমাদের এই সম্পর্ক ভৃত্য ও সেবকসুলভ সম্পর্ক বরং এর চেয়েও নিবিড় হওয়া উচিত। টু-শব্দটি না করে তোমাকে এই আনুগত্য করতে হবে। তোমরা এটা বলতে শুরু করবে যে, এ কাজ এখন করা সম্ভব না অথবা এখন করতে পারব না– এ অধিকার তোমাদের নেই। যেহেতু তোমরা বয়আত

করেছ আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছ, তাই তোমরা নিজেদের সবকিছু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে সোপর্দ করেছ; এখন তোমাদেরকে শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশাবলির আনুগত্য করতে হবে। তাঁর শিক্ষার অনুসরণ করতে হবে। আর তাঁর (আ.) (তিরোধানের) পর যেহেতু খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই যুগ-খলীফার আদেশ-নিষেধ ও নির্দেশনার অনুসরণ করাও তোমাদের কর্তব্য। তাই বলে এখানে এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, সেবক বা চাকরের কাজ তো বাধ্যবাধকতার (কাজ), সেবা তাকে করতেই হবে। সেবক কখনো কখনো বিড়বিড় করে নিজের উস্মাও প্রকাশ করে থাকে। তাই সদা স্মরণ রাখবে, এটা সেবকসুলভ অবস্থাই বটে, বরং এর চেয়েও বড়ো কিছু। কেননা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, আবার আল্লাহ্ তা'লার খাতিরেই আনুগত্যের অঙ্গীকার আর এজন্যই ত্যাগস্বীকারেরও অঙ্গীকার। কাজেই, ত্যাগের প্রতিদান তখনই লাভ হয়, মানুষ যখন স্বেচ্ছায় কুরবানী করে। অতএব এটা এমন একটা শর্ত যা নিয়ে আপনি যতই ভাববেন হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালোবাসায় ততই বিভোর হতে থাকবেন, আর নিজেকে জামা'তী ব্যবস্থাপনার অনুগত দেখতে পাবেন।

অনেক সময় অনেক মানুষ মারূফ বা ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত বা ন্যায়সংগত নির্দেশাবলির আনুগত্যের চক্করে পড়ে নিজেই ব্যবস্থাপনা থেকে সরে যায়, অন্যদেরকেও নষ্ট করে, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশও দূষিত করে। তাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত, নিজেরাই মারূফ ও গয়ের মারূফ (অর্থাৎ ধর্মানুমোদিত ও এর বিপরীত)-সিদ্ধান্তের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যাবেন না। (অতএব এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল,) অন্যায্য বা গয়ের মারূফ হলো সেটা, যা আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধান এবং শরীয়তের বিধিবিধানের সুস্পষ্ট পরিপন্থি, যেমনটি এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদের মাঝে একজনকে নেতা মনোনীত করেন, যেন লোকেরা তার কথামতো চলে এবং তার আনুগত্য করে। সেই ব্যক্তি আগুন জ্বালালেন আর নিজের সাথিদের নির্দেশ দিলেন, 'আগুনে ঝাঁপ দাও'। কেউ কেউ তাঁর কথা মান্য না করে বলল, '(আমরা) আগুন থেকে বাঁচার জন্য মুসলমান হয়েছি'। কিন্তু কয়েকজন আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) এ বিষয়টি জানতে পেরে বললেন, 'তারা আগুনে ঝাঁপ দিলে সর্বদা আগুনেই পড়ে থাকত'। এছাড়া তিনি (সা.) আরো বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতার আদলে কোনো আনুগত্য বৈধ নয়। আনুগত্য শুধুমাত্র ন্যায়সংগত বিষয়েই আবশ্যকীয়'**।" (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল্ জিহাদ বাব ফিত্ তায়াত)

অতএব প্রথমত এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, না মানার বিষয়টিও কোনো ব্যক্তির একক সিদ্ধান্ত ছিল না। কিছু লোক আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা শুনেছিল সর্বাবস্থায় আমীরের আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে। আর তারা মনে করত, সর্বাবস্থায় এবং সকল পরিস্থিতিতে এটা ইসলামী শিক্ষা। সব ক্ষেত্রেই আমীরের অনুগত্য করতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো সাহাবী, ঐশী বিধিবিধানের যারা অধিকতর ব্যুৎপত্তি রাখতেন, মহানবী (সা.)-এর সংসর্গে বেশি কল্যাণমণ্ডিত হয়েছিলেন, তারা অস্বীকার করেন। ফলে

নিজেদের মধ্যে পরামর্শের পর, কেউই সে নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন নি, কেননা এটি আত্মহত্যা। আর ইসলামে আত্মহত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। (যেহেতু) প্রাথমিক যুগ ছিল এবং অনেক বিষয়ই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ছিল আর এ ঘটনার পর, মহানবী (সা.) মারূফ বা ন্যায়সংগত বিষয় কোনটি আর গয়ের মারূফ বা অন্যায্য বিষয় কোনটি তা সুস্পষ্ট করে দেন। অতএব কেউ কেউ মনে করে বরং বর্তমানেও আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, এক কর্মী ভালোই কাজ করছিল, অথচ তাকে সরিয়ে অন্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে!

যুগ-খলীফা কিংবা জামা'তের ব্যবস্থাপনা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এটা অন্যায় সিদ্ধান্ত ছিল! তারা যেহেতু আর কিছুই করতে পারে না তাই এটাকে গয়ের মারূফ বা অন্যায় সিদ্ধান্ত আখ্যা দিয়ে নিজেরাই একটা সংজ্ঞা বানিয়ে নেয়, এ কারণে তারা ভাবে যে, আমাদেরও বলার অধিকার আছে, এসব কথা যেখানে খুশি সেখানে বসে বলারও অধিকার আছে। প্রথম কথা হলো, যত্রতত্র বসে জামা'তের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার অধিকার কারো নেই। এ বিষয়ে আমি পূর্বেও সবিস্তারে আলোকপাত করেছি। তোমাদের কাজ শুধুমাত্র আনুগত্য করা। আর আনুগত্যের মানদণ্ড কী– তা আমি বিভিন্ন হাদীসের আলোকে স্পষ্ট করব। এমন লোকদের হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর ঘটনাটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত আর তা হলো, এক যুদ্ধ চলাকালে হযরত উমর (রা.) যুদ্ধের সেনাপতির দায়িত্ব হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর কাছ থেকে নিয়ে হযরত আবু উবায়দাহ (রা.)-কে প্রদান করলে হযরত আবু উবায়দাহ (রা.) ভাবেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) পরম দক্ষতার সাথে কাজ করছেন, তাই তিনি তার কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নি। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যখন জানতে পারেন, হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই নির্দেশ এসেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি হযরত আবু উবায়দাহ (রা.)-এর কাছে যান এবং বলেন, (এটা) যেহেতু যুগ-খলীফার নির্দেশ, তাই আপনি দ্রুত এই নির্দেশ শিরোধার্য করুন। আমার তিল পরিমাণও দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই যে, আমি আপনার অধীনে থেকেই কাজ করব। আমি আপনার অধীনে থেকে সেভাবেই কাজ করতে থাকব যেভাবে কমান্ডারের অধীনস্থ এক সৈনিক কাজ করে। মূলত এটাই হলো আনুগত্যের মানদণ্ড। কেউ আপত্তি করে বলতে পারে, হযরত উমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত ঐ সময়ে ন্যায়সংগত ছিল না, এটাও ভুল ধারণা। কী কারণে হযরত উমর (রা.) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার প্রকৃত অবস্থা আমরা জানি না, এটা তিনিই ভালো জানেন। বস্তুত এই সিদ্ধান্তের মাঝে বাহ্যত এমন কোনো বিষয় ছিল না যা শরীয়তের পরিপন্থি। অতএব দেখুন! আল্লাহ্ তা'লাও হযরত উমর (রা.) প্রদত্ত এই সিদ্ধান্তের সম্মান রেখেছেন। এই যুদ্ধে বিজয় লাভ হয়েছে। এই যুদ্ধে কোনো কোনো সময় এমন অবস্থা হয়েছে যে, একেকজন মুসলমানকে শত শত শত্রুসেনার সাথে লড়তে হয়েছে, তা সত্ত্বেও বিজয় অর্জিত হয়েছে।

স্বীয় মনিব ও নেতা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ আলাইহিস্ সালাম 'হাকাম' (অর্থাৎ মীমাংসাকারী) ও 'আদাল' (অর্থাৎ ন্যায়বিচারক) এর পদমর্যাদা লাভ করেছেন, তিনি তাঁর এমন দাসত্ব করেছেন, যার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে

পাওয়া যায় না। এজন্য এখন, এ যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আনুগত্য করলে এবং তাঁকে ভালোবাসলেই হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি সত্য প্রমাণিত হতে পারে। আর মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসার দাবি সত্য সাব্যস্ত হতে পারে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা (পবিত্র কুরআনে) বলেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(আলে ইমরান: ৩২)

অর্থাৎ "তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, (তাহলেই) আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন; বস্তুত আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।"

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এই নিয়ামত যা আমার পূর্বে নবী, রসূল এবং খোদার মনোনীত বান্দাদের দান করা হয়েছে, তা হতে যে এক উৎকর্ষ অংশ আমি লাভ করেছি তা শুধুমাত্র খোদার অনুকম্পায় লাভ করেছি, নিজের কোনো যোগ্যতায় নয়। আমার পক্ষে এ নিয়ামত লাভ করা সম্ভব হতো না, যদি আমি আমার নেতা ও অভিভাবক, নবীদের গর্ব ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পথের পূর্ণ অনুগামী না হতাম। তাই আমি যা কিছু পেয়েছি তা সেই আনুগত্যের কল্যাণে লাভ করেছি। আমি আমার সত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি, কোনো মানুষ মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য ছাড়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না এবং পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। সেটি কী– যা মহানবী (সা.)-এর সত্য ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের কারণে হৃদয়ে সর্বাগ্রে সৃষ্টি হয়– এখানে আমি তা-ও উল্লেখ করছি। অতএব স্মরণ রাখা উচিত, তা হলো এক সুস্থ হৃদয় অর্থাৎ (ঐ) হৃদয় যা থেকে ইহ-জাগতিক ভালোবাসা উবে যায় আর হৃদয় এক ধরনের চিরস্থায়ী ও অনন্ত স্বাদের সন্ধানী হয়ে যায়। এরপর এই সুস্থ-স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী হবার কল্যাণে এক ধরনের নিখাদ ও পরিপূর্ণ ঐশী ভালোবাসা লাভ হয়। এসব নিয়ামত মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে উত্তরাধিকারস্বরূপ লাভ হয়ে থাকে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজে বলেছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(আলে ইমরান: ৩২)

অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা খোদা তা'লাকে ভালোবাসো তাহলে আমার আনুগত্য করো, যেন খোদাও তোমাদের ভালোবাসেন। বরং একপেশে ভালোবাসার দাবি সম্পূর্ণরূপে একটি মিথ্যাও বুলিসর্বস্ব বিষয় মাত্র। মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে তখন খোদা-ও তাকে ভালোবাসেন। পৃথিবীতে তার জন্য একটি গ্রহণযোগ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। আর সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়ে তার জন্য

এক সত্যিকার ভালোবাসা সঞ্চার করা হয়, তাকে এক আকর্ষণী শক্তি দান করা হয়। আর তাকে এক জ্যোতি দান করা হয় যা সর্বদা তার সাথে থাকে। যখন কোনো মানুষ আন্তরিকতার সাথে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে, জগতের সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দেয় এবং তার হৃদয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সম্মান অবশিষ্ট না থাকে, এমনকি সবাইকে সে মৃত এক কীটের চেয়েও নগণ্য মনে করে তখন খোদা– যিনি তার হৃদয়কে অবলোকন করে থাকেন, তিনি এক মহান জ্যোতির সাথে তার মাঝে অবতীর্ণ হন। আর যেভাবে স্বচ্ছ একটি আয়নাকে যদি সূর্যের বিপরীতে রাখা হয়, তাহলে সূর্যের প্রতিকৃতি এর মাঝে এমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন রূপকভাবে বলা যেতে পারে, সত্যিকার অর্থে আকাশের সূর্যই যেন আয়নাতে বিদ্যমান। একইভাবে এমন হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা অবতরণ করেন আর তার হৃদয়কে নিজের আরশ বা আসন বানিয়ে নেন। এটিই সেই বিষয়– যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ. ৬২-৬৩)

অতএব মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এরূপ গভীর প্রেমানুরাগ ও ভালোবাসার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র হৃদয়কে নিজের আরশ হিসেবে পছন্দ করেছেন, (যোগ্যতানুসারে ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ তা'লা অনুরূপ হৃদয়ের মাঝে অবতীর্ণ হতে থাকবেন।) কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্যের দাবি তখনই সত্য প্রমাণিত হবে যখন তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক সন্তানের সঙ্গেও ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এ কারণেই তিনি (আ.) বলছেন, সকল আত্মীয়স্বজনের চেয়ে বেশি ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক আমার সাথে স্থাপন করো; এর মাধ্যমেই তোমরা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ করবে। তিনি শুধু এমনিতেই একথা বলেন নি, বরং আল্লাহ্র রসূল (সা.) স্বয়ং আমাদেরকে একথা বলেছেন। যেমনটি (তিনি) বলেছেন, **"তোমরা যদি মসীহ্ ও মাহদীর সংবাদ পাও, তাহলে (বরফের পাহাড়ের ওপর দিয়ে) হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে।"** এত জোর কেন দেওয়া হলো, এত কষ্ট করে এই সালাম পৌঁছানোর মাঝে রহস্য কী? এটাই যে, সে আমার প্রিয় আর আমিও তাঁর প্রিয়। আর এটা নিয়মের কথা, প্রেমিকের মাধ্যমেই প্রিয়দের কাছে পৌঁছানো যায়। এজন্য তোমরা যদি আমার অনুসারী হতে চাও তাহলে তোমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসরণ করো। তাঁকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করো। তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হও। এজন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাবধান! **ঈসা ইবনে মরিয়ম (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ) এবং আমার মাঝে কোনো নবী অথবা রসূল হবে না। ভালোভাবে শুনে রেখো! তিনি আমার পরে উম্মতের মাঝে আমার খলীফা হবেন। তিনি অবশ্যই দাজ্জালকে বধ করবেন। ক্রুশ ভঙ্গ করবেন অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদকে নস্যাৎ করবেন। 'জিযিয়া বা কর' রহিত করবেন।** (তার যুগে এর প্রচলন থাকবে না। কেননা সে যুগে ধর্মের নামে যুদ্ধ হবে না, করপ্রথা উঠে যাবে।) **স্মরণ রাখবে! যে-ই তাঁর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য পাবে তার উচিত হবে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছানো।** (তিবরানী, আল্ আওসাত ওয়াস সগীর)

এই হাদীস সম্পর্কে প্রণিধান করার পরিবর্তে অথবা যারা প্রণিধান করেছেন এবং এর

গভীরে অবগাহন করেছেন তাদের কথা বোঝার চেষ্টা না করে এ যুগের আলেমরা এর বাহ্যিক অর্থের পেছনেই ছুটছে। আর সাধারণ ও সহজসরল মুসলমানদেরকে এভাবে ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে, আমরা এর থেকে খোদা তা'লার আশ্রয় যাচনা করছি। তিনি এদের শাস্তিও দিচ্ছেন আর ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ্ তিনি তাদের সাথে বোঝাপড়া করতে থাকবেন। এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ন্যায়পরায়ণ বিচারক হবেন, যিনি ন্যায় ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবেনই না। আর তিনি এমন ইমাম, যিনি জগতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন; এজন্য তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। তাঁর আদেশ অনুসারে চলবে। তাঁর শিক্ষা মেনে চলবে। কেননা তিনি ন্যায় ও সুবিচারের শিক্ষাই দেবেন যা কুরআনের শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোনো শিক্ষা নয়। অথচ এ যুগের লোকেরা এমনভাবে ক্রুশ ভাঙার দিকে ছুটছে যে, তারা মনে করছে হাতুড়ি-শাবল নিয়ে মসীহ্ আসবেন আর তিনি ক্রুশ ভাঙবেন। এগুলো সব অলীক কথাবার্তা। বিষয়টি পরিষ্কার, আগমনকারী মসীহ্ তাঁর নেতা ও গুরুর অনুসরণে দলিলপ্রমাণ দ্বারা তাদেরকে পরাজিত করবেন আর দলিলপ্রমাণ দ্বারাই ক্রুশীয় মতবাদের মূলোৎপাটন করবেন, এর যবনিকা টানবেন। দাজ্জালকে হত্যার অর্থ এটাই যে, দাজ্জালের নৈরাজ্য থেকে তিনি উম্মতকে রক্ষা করবেন। আবার যেহেতু ধর্মীয় যুদ্ধের প্রচলন থাকবে না তাই জানা কথা, জিযিয়া বা করের প্রচলনও উঠে যাবে। এছাড়া এই হাদীসে সালাম পৌঁছানোরও নির্দেশ রয়েছে। অথচ মুসলমানরা সালাম পৌঁছানোর পরিবর্তে আগমনকারী মসীহ্র বিরোধিতায় উঠেপড়ে লেগেছে। আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে সুবুদ্ধি দিন।

অন্য আরেকটি হাদীস রয়েছে, যা থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পদমর্যাদার বিষয়টি (সহজেই) বুঝা যায় যে, কেন তাঁর সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করা আমাদের জন্য আবশ্যক। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী ইমাম ঈসা ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। (যখন তিনি আবির্ভূত হবেন তখন) তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। শূকর বধ করবেন। জিযিয়া বা করপ্রথা রহিত করবেন। আর এমনভাবে ধনসম্পদ বিতরণ করবেন লোকেরা যা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে।"** (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল ফিতন, বাব ফিতনাতুদ্ দাজ্জালে ওয়া খুরুজে ঈসা ইবনে মরিয়ম ওয়া খুরুজে ইয়াজুজ ওয়া মাজুজ)

কাজেই, এ হাদীসটিও বুঝা আবশ্যক ছিল কিন্তু স্থূল বুদ্ধির লোকেরা বুঝতে পারে নি, তাই তারা বাহ্যিক অর্থের দিকে ছুটেছে। তারা এর অদ্ভুত ও হাস্যকর ব্যাখ্যা করে থাকে। স্পষ্ট বুঝা যায়, শূকর হত্যার অর্থ হলো শূকর স্বভাবসম্পন্ন লোকদের বধ করা। শূকরের মাঝে অন্যান্য পশুর তুলনায় ঘৃণ্য কী কী অভ্যাস রয়েছে তা আজ প্রমাণিত বিষয়। অতএব এই নোংরামিই যখন মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা একান্ত আবশ্যক। আবার এ বিষয়টিও রয়েছে যে, তিনি সম্পদ দান করবেন, সম্পদ বণ্টন করবেন, (এ বিষয়টিও এরা বোঝে না।) এখনই মনে পড়ল, সম্প্রতি পাকিস্তানে আলেমরা একটি জলসা করে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও জামা'তের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরা

ভাষা ব্যবহার করে তারা এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছে যে, মসীহ্ এসে তো সম্পদ বণ্টন করার কথা ছিল, লোকদের কাছে চাওয়ার কথা নয়। দেখো! আহমদীরা (তারা তো কাদিয়ানী বলে) চাঁদা সংগ্রহ করে। এতে প্রমাণিত হয় তারা মিথ্যাবাদী, তারা নিজেরাই এটি প্রমাণ করে দিচ্ছে। এখন বিবেকবুদ্ধিহীন এই অন্ধদেরকে কোনো বুদ্ধিমান বুঝাতে পারবে না– মসীহ্ যে আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার বিতরণ করেছেন তোমরা সেটা নিতেও অস্বীকার করে বসে আছো। প্রকৃত বিষয় হলো, এদের শুধুমাত্র জাগতিক চোখই রয়েছে। এর বেশি তারা ভাবতেও পারে না। এদের কাজই এটা, এদের তা করতে দাও। পাকিস্তানের আহমদীদের বেশি উদ্‌বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। এদের এসব নোংরা কথাবার্তা ও মিথ্যাচার শুনে ধৈর্যধারণ করুন এবং সৎসাহসের সাথে সসম্মানে নিজ পথে এগিয়ে চলুন। আমরা স্বীকার করছি, এদের অপকর্মের বিপরীতে আমরা নিজেদের পরাজয় এক্ষেত্রে মেনে নিচ্ছি। আমরা তাদের নোংরামির মোকাবিলাই করতে পারব না। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিচ্ছি, যখন বান্দা নীরব থাকে তখন খোদা কথা বলেন। যখন খোদা বলেন তখন বিরুদ্ধবাদীদের টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে আমরা ভাসতে দেখেছি আর ভবিষ্যতেও দেখব, ইনশাআল্লাহ্। অতএব আহমদীরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখুন, দোয়ার ওপর জোর দিন, সর্বদা দোয়ায় রত থাকুন। এসব হাদীস থেকে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে, আগমনকারী মসীহ্ ইমামও হবেন, ন্যায়বিচারকও হবেন আর ন্যায়বিচারের রাজপুত্র হবেন তিনি। তাই তাঁর সাথে অবশ্যই সম্পর্ক স্থাপন করবে। আর একজন ন্যায়বিচারক ইমাম হিসেবে তাঁর আনুগত্য করাও তোমাদের জন্য অপরিহার্য। এজন্য লোকদের কল্যাণার্থে, তোমাদের তরবিয়তের জন্য যে বিষয়গুলো বলা হয়েছে, এর ওপর আমল বা অনুশীলন করো, যেন তোমরা মহানবী (সা.)-এর প্রিয়ভাজনদের দলভুক্ত হও এবং খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এখন আনুগত্য সম্পর্কে আমি আরো কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি, যা থেকে আনুগত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, সুখে-দুঃখে, অধিকার হরণ বা পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের সম্মুখীন হও না কেন; মোটকথা সর্বাবস্থায় যুগের শাসকের নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যক। (মুসলিম, কিতাবুল এমারাহ্, বাবু ওয়াজুবে তা'আতিল উমারা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নেতা এবং আমীরের মাঝে এমন কোনোকিছু দেখে যা তার অপছন্দনীয়, তার উচিত ধৈর্যধারণ করা। কেননা যে ব্যক্তি জামা'ত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্যুত হয় সে জাহেলিয়াতের (তথা অজ্ঞতার) মৃত্যুবরণ করবে। (বুখারী, কিতাবুল ফিতন, বাব কওলে নবীয়ে সাতারূনা বা'দী উমুরা)

আবার হযরত আরফাজাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি– 'যখন তোমরা এক হাতে ঐক্যবদ্ধ হও, অর্থাৎ তোমাদের মাঝে একজন আমীর থাকেন, তখন কোনো ব্যক্তি এসে যদি তোমাদের ঐক্যের বাঁধনে ফাঁটল সৃষ্টি করতে প্রয়াস

চালায় তাহলে তাকে হত্যা করো, অর্থাৎ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো এবং তার কথা অমান্য করো'।" (মুসলিম, কিতাবুল এমারাহ্, বাবু হুকমে মিন ফারকি আমারিল মুসলিমিনা ওয়া হুয়া মুজতামা)

হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, "আমরা মহানবী (সা.)-এর বয়আত এই গুরুত্বপূর্ণ কথার ওপর করেছি যে, 'শুনব আর আনুগত্য করব, তা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আর আমরা যেখানেই থাকব, কোনো আদেশদাতার সাথে ঝগড়া করব না। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব বা সত্য কথাই বলব। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করব না'।" (মুসলিম, কিতাবুল এমারাহ্, বাবু ওয়াজুবে তা'আতিল উমারা)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি– আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তখন তার কাছে কোনো যুক্তিও থাকবে না আর না কোনো অজুহাত। আর যুগ-ইমামের হাতে বয়আত না করে যে মারা যাবে সে অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল এমারাহ্, কিতাবুল্ এমারাহ্, বাবু ওয়াজুবে মুলাযিমাতে জামা'আতুল মুসলিমীন)

অতএব আপনারা সৌভাগ্যবান, কারণ আপনারা যুগ-ইমামকে মান্য করেছেন আর তাঁর বয়আতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এখন বিশুদ্ধচিত্তে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। তাঁর সকল নির্দেশ পালন করতে হবে, নতুবা খোদা তা'লার আনুগত্যের গণ্ডির বাইরে চলে যাবেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে আনুগত্যের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত রাখুন। আর এই উন্নতমান কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? এই মান হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই অর্জন করা সম্ভব।

তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের জামা'তে সে-ই প্রবেশ করে– যে আমাদের শিক্ষাকে নিজের কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করে। নিজের উদ্যম ও চেষ্টাপ্রচেষ্টা অনুযায়ী এর ওপর আমল করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নাম লিখিয়েছে কিন্তু শিক্ষানুসারে কাজ করে না– স্মরণ রাখবে! খোদা তা'লা এ জামা'ত'কে এক নিষ্ঠাবান জামা'ত বানানোর সংকল্প করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি জামা'তভুক্ত না থাকে তাহলে শুধুমাত্র নাম লেখালেই সে জামা'তে থাকতে পারে না। তার জীবনে কোনো না কোনো মুহূর্ত এমন আসবে যখন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এজন্য যে শিক্ষা দেওয়া হয়, যতটা সম্ভব নিজের কর্মকে সে শিক্ষানুসারে ঢেলে সাজাও।

নিজের শিক্ষা সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতিতে তিনি (আ.) বলেন, "অশান্তির কথা বোলো না। দুষ্কৃতি কোরো না। গালি শুনে ধৈর্য ধরো। কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ কোরো না। যে বিবাদ করতে চায় তার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং পুণ্যকর্ম করো। সুমিষ্ট ব্যবহারের উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করো। আন্তরিকতার সাথে প্রত্যেক নির্দেশের আনুগত্য করো, যেন খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন আর শত্রুরাও জানতে পারে যে, এখন বয়আতের পর এ ব্যক্তি আর পূর্বের সেই ব্যক্তি নেই। মামলা-মোকদ্দমায় (সাক্ষ্য প্রদানকালে) সত্য সাক্ষ্য দাও। এই

জামা'তে যোগদানকারীদের উচিত পূর্ণ আন্তরিকতা, পূর্ণ অধ্যবসায় ও মনেপ্রাণে সততা অবলম্বন করা। জগৎ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।" (বদর পত্রিকা, ১৬ মার্চ ১৯০৪, মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৬২০-৬২১)

এখানে তিনি (আ.) যেভাবে বলেছেন, 'অশান্তির কথা বোলো না'। কোনো কোনো মানুষের স্বভাব হলো, নিছক আনন্দ করার জন্য অভ্যাসবশে এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় বলে বেড়ায় আর এতে অশান্তি সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়ে থাকে। যার সামনে বিষয়টি বর্ণনা করা হয় এবং বিষয়টি যদি তার সম্পর্কে হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে অপর ব্যক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা হবে বা মনোমালিন্য হবে, যার প্রতি সেকথা আরোপ করা হয়। তা যদি সে জেনেও যায় তবুও আমার দৃষ্টিতে এমন মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এমন বিশৃঙ্খলা নিরসনের পদ্ধতি হলো– যার প্রতি আরোপ করে কথা বলা হয়েছে তার কাছে গিয়ে এ বিষয়টি পরিষ্কার করা যে, 'তুমি এসব কথা বলেছ কিনা?' এ বিষয়টি আমার কাছে এভাবে পৌঁছেছে। (এমনটি করলে) সেখানেই বিষয়টির সমাধান হয়ে যাবে এবং এমন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী লোকদের সংশোধনও হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ এমনও হয়ে থাকে যে, এমন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী লোকেরা এক বংশের সাথে অন্য বংশকে ঝগড়াবিবাদে জড়িয়ে দেয়। কাজেই, এমন অশান্তির বিষয় নিজেরাও এড়িয়ে চলো আর নৈরাজ্যবাদীদেরও এড়িয়ে চলো। আর সম্ভব হলে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করো। এছাড়া প্রধানত ঝগড়াবিবাদ ও গালিগালাজ থেকে সরাসরি অশান্তির সৃষ্টি হয়, এর ফলে নৈরাজ্যও দেখা দেয়। তাই [তিনি (আ.)] বলেছেন, তোমাদের যদি আমার সাথে সম্পর্ক থাকে আর তোমরা আমার আনুগত্যের দাবি করো তাহলে আমার শিক্ষা হলো– প্রত্যেক প্রকার নৈরাজ্য ও অশান্তির পথ এড়িয়ে চলো। তোমাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার মান এমন হওয়া উচিত যে, তোমাদেরকে কেউ গালি দিলেও তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। আর এ শিক্ষার ওপর আমল করলেই তোমাদের মুক্তির পথ সুগম হবে। তোমরা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্তদের শ্রেণিভুক্ত হবে। কোনো বিষয়েই বিবাদবিসংবাদে জড়ানো উচিত নয়। সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয় অবলম্বন করো। তোমাদেরকে যে যা-ই বলুক তোমরা তাদের সাথে প্রেমপ্রীতি, সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করো। পবিত্র ও মধুর ভাষা ব্যবহার করো। এমন উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তোমাদের মাঝে গড়ে তোলো যেন লোকেরা তোমাদের দিকে আকর্ষিত হয়। তোমাদের আশপাশের পরিবেশে সবাই যেন জানে, এই লোক আহমদী। এর কাছে উত্তম চরিত্র ছাড়া অন্য কিছু কাম্য নয়। তোমাদের এই চারিত্রিক গুণও অন্যদেরকে টেনে আনার ও মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হবে। এরপর এমনও হয় যে, অনেকে মামলা-মোকদ্দমায় ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্যও প্রদান করে। নিজের পক্ষ থেকে মিথ্যা মামলা সাজায়। কাজেই [তিনি (আ.)] বলেছেন, তোমাদের ব্যক্তিস্বার্থও যেন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য দানে বিরত না রাখে। কেউ কেউ এখানেও এবং অন্যান্য দেশেও অনেক সময় বহির্বিশ্বে গমনের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়, এগুলো থেকেও মুক্ত থাকো। প্রকৃত অবস্থানুসারে নিজেদের কেইস দাখিল করো, যদি তা গৃহীত হয় তাহলে ভালো কথা নতুবা

ফেরত চলে যাও। কেননা মিথ্যার আশ্রয় নেবার পরও অনেকের কেইস খারিজ হয়ে যায়। কাজেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যাচাই করে দেখো, ইনশাআল্লাহ্ লাভই হবে। অথবা কেইস রিজেক্ট বা বাতিল হলেও নিদেনপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে না।

এরপর নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করো আর পাশবিকতা ও মতভেদ পরিহার করো। সকল প্রকার হাসিবিদ্রুপ ও উপহাস সম্পূর্ণরূপে বর্জন করো, কেননা উপহাস ও বিদ্রুপ মানুষের হৃদয়কে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরস্পর একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও, প্রত্যেকে নিজের আরামের ওপর ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য দাও, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার মীমাংসা করো আর তাঁর আনুগত্যের গণ্ডিতে ফিরে আসো। পারস্পরিক সকল ঝগড়াবিবাদ, রাগ ও শত্রুতা পরিহার করো, কেননা এখন ঐ সময় এসে গেছে যখন তোমাদের নগণ্য বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ ও বড়ো বড়ো কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিত।" (আল-হাকাম, ২০ থেকে ২৭ মে ১৮৯৬, মলফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ২৬৬-২৬৮)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "খোদা তা'লার সাথে আমাদের জামা'তের সত্যিকার সম্পর্ক-বন্ধন রচিত হওয়া উচিত আর তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেন নি; বরং তাদের ঈমানী শক্তিকে সুদৃঢ় পর্যায়ে উপনীত করার জন্য নিজের শক্তিমত্তার শত শত নিদর্শন দেখিয়েছেন।"

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, তোমাদের মাঝে এমন কেউ কি আছে যে বলতে পারবে, আমি কোনো নিদর্শন দেখি নি? আমি দাবির সাথে বলছি, একজনও এমন নেই, যার আমাদের সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে, অথচ সে খোদা তা'লার জলজ্যান্ত নিদর্শন স্বচক্ষে দেখে নি। আমাদের জামা'তের সদস্যদের জন্য এটি আবশ্যকীয় যে, তাদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায়, খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। পুণ্যকর্মে শৈথিল্য ও আলস্য যেন সৃষ্টি না হয়। কেননা শিথিলতা থাকলে ওযূ করাও একটা আপদ মনে হয়, তাহাজ্জুদ (নামায) পড়া তো অনেক পরের বিষয়। যদি সৎকর্মের শক্তি সৃষ্টি না হয় আর পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হবার প্রেরণা না থাকে তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়া নিরর্থক। (আল-হাকাম, ২৪ মার্চ ১৯০৩, মলফুযাত, খণ্ড: ০২, পৃ. ৭১০-৭১১)

বয়আতের এ শর্ত অর্থাৎ দশম শর্তের আলোচনা চলছে। এতে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের সাথে এমন নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, যার দৃষ্টান্ত জগতের অন্য কোনো আত্মীয়সুলভ সম্পর্কের মাঝে পাওয়া যাবে না– এর কারণও শুধুমাত্র আমাদের প্রতি তাঁর (আ.) সহমর্মিতা। আমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি (আ.) (একথা) বলেছেন। কেননা সত্যিকার ইসলাম শুধুমাত্র তাঁকে (আ.) মান্য করার ফলেই লাভ করা সম্ভব। আমরা যদি নিজেদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাই তাহলে আমাদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণ করা আবশ্যক।

তিনি (আ.) বলেন, "এখন আমার পানে ছুটে আসো, কেননা এটাই সময়। যে ব্যক্তি এখন আমার পানে ছুটবে আমি তাকে ঐ ব্যক্তির সাথে তুলনা করি, যে তুফানের সময় জাহাজে উঠে নিরাপদ আসন গ্রহণ করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মান্য করে না, আমি দেখছি যে, সে তুফানের মুখে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে আর তার কাছে বাঁচার কোনো উপকরণ নেই। সত্যিকার শাফায়াতকারী আমি, যে সেই মহাসম্মানিত শাফায়াতকারীর ছায়া ও প্রতিচ্ছবি, যাকে এ যুগের দৃষ্টিহীনরা গ্রহণ করে নি বরং তাঁকে চরমভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে।" (দাফেউল বালা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ২৩৩)

এটি বলার কারণ হলো, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ীই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেছেন।

আবার তিনি (আ.) বলেন, "মূলত আমার হাতে বয়আত করার দুটি উপকারিতা রয়েছে। প্রথমত, পাপ থেকে ক্ষমা লাভ হয়। আর মানুষ খোদা তা'লার সাথে প্রতিশ্রুতি অনুসারে ক্ষমা লাভের যোগ্য হয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যাদিষ্টের সামনে তওবা করার কারণে শক্তি লাভ হয় আর এতে মানুষ শয়তানী আক্রমণ থেকে রেহাই পায়। স্মরণ রেখো! এ জামা'তে যোগ দেবার উদ্দেশ্য যেন বস্তুবাদিতা না হয়, বরং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভই (মুখ্য) উদ্দেশ্য হয়। কেননা এই ইহজগৎ ছেড়ে একদিন যেতেই হবে। এটা কোনো না কোনোভাবে অতিবাহিত হয়েই যাবে।

'কষ্টদায়ক রাত হোক বা বিলাসিতাপূর্ণ রাত, তা কেটেই যাবে'। (ফার্সী পঙ্‌ক্তির অনুবাদ)

ইহজগৎ আর এই ইহজাগতিক উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখো। এগুলোকে ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের সাথে কখনো গুলিয়ে ফেলো না, কেননা জগৎ নশ্বর কিন্তু ধর্ম ও ধর্মের ফলাফল নিঃশেষ হবার নয়।" (বদর, ৯ অক্টোবর ১৯০৩, মলফুযাত, খণ্ড: ০৬, পৃ. ১৪৫)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, "তোমরা হে আমার বন্ধুগণ! আমার প্রিয়গণ! আমার বৃক্ষরূপ অস্তিত্বের সবুজ শাখাপ্রশাখা! তোমাদের প্রতি বর্ষিত খোদা তা'লার অনুগ্রহে তোমরা আমার বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছ এবং নিজেদের জীবন, নিজেদের আরাম ও নিজেদের ধনসম্পদ এ পথে বিলিয়ে দিচ্ছ। যদিও আমি জানি, আমি যা-ই বলব তা মেনে নেওয়াকে তোমরা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করবে এবং তোমাদের শক্তি অনুযায়ী তা করতে কুণ্ঠিত হবে না, তথাপি এ সেবার জন্য আমি নিজের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোনোকিছু তোমাদের ওপর ধার্য করতে চাই না, তোমাদের সেবা আমার বলার দরুন বাধ্যতামূলক না হয়ে তোমাদের নিজেদের অনুপ্রেরণা থেকে যেন হয়। আমার বন্ধু কে? আর আমার প্রিয়ভাজনইবা কে? সে-ই, যে আমাকে চেনে। আমাকে কে চেনে? কেবল সে-ই, যে আমার সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে, আমি (খোদা কর্তৃক) প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করে যেভাবে প্রেরিত পুরুষদের গ্রহণ করা হয়। পৃথিবী আমাকে

গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি পৃথিবী হতে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিকে সে জগতের অংশ দেওয়া হয়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করে এবং করবে। যে আমাকে পরিত্যাগ করে, সে তাঁকে পরিত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক-বন্ধন রচনা করে, আসলে সে তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করে, যাঁর পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার হাতে একটি প্রদীপ আছে; যে আমার কাছে আসে সে অবশ্যই সে আলো থেকে জ্যোতি লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণার বশবর্তী হয়ে দূরে সরে যায়, সে ঘোর অমানিশায় নিক্ষিপ্ত হবে! এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে, সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান, এমনকি তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে ও পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার পানে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব পরিত্যাগ করে খোদা তা'লার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে সে আমার এবং আমি তার। কিন্তু এরূপ করতে কেবল সে-ই সক্ষম হয়, যাকে খোদা তা'লা পবিত্রকারী ব্যক্তির ছায়াতলে আশ্রয় দেন। তখন তিনি (অর্থাৎ পবিত্রকারী ব্যক্তি) সেই ব্যক্তির অবাধ্য প্রবৃত্তির নরকে নিজের পা রাখেন। তখন তা এরূপ শীতল হয়ে যায়, যেন তাতে কখনো আগুন ছিলই না। তখন সে উন্নতির পর উন্নতি করতে থাকে। এমনকি খোদা তা'লার রূহ বা প্রেরণা তার মাঝে বাসা বাঁধে এবং এক বিশেষ জ্যোতির্বিকাশসহ তার হৃদয়ে বিশ্বজগতের প্রতিপালক-প্রভুর অধিষ্ঠান হয়। (অর্থাৎ খোদা তার হৃদয়ে স্বীয় আরশ প্রতিষ্ঠিত করেন) তখন তার পুরোনো মনুষত্ব জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় এবং এক নতুন ও পবিত্র মনুষত্ব তাকে দান করা হয়। আর খোদা তা'লাও এক নতুন খোদা রূপে তার সাথে এক নতুন ও বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তার স্বর্গীয় জীবনের সব পবিত্র উপকরণ সে এ জগতেই পেয়ে যায়।" (ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৪-৩৫)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত সকল অঙ্গীকার পালন করার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন তাঁর সাথে কৃত বয়আতের সকল অঙ্গীকারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি। তাঁর শিক্ষার ওপর আমল করে আমরা যেন আমাদের জীবনকে জান্নাতপ্রতীম বানাতে পারি আর পরকালের জান্নাতেরও উত্তরাধিকারী গণ্য হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

(২৩)

লন্ডনের বাইতুল ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ২৬ তাবুক, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(মুমতাহিনা: ১৩)

অনুবাদ: "হে নবী! মুমিন নারীরা যখন তোমার কাছে এসে এ মর্মে বয়আত করে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা নিজেদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে মিথ্যা কথা বানিয়ে (তা) কারো প্রতি আরোপ করবে না এবং ন্যায়সংগত বিষয়ে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে তুমি তাদের বয়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।"

গত খুতবায় আমি বয়আতের শর্তাবলির দশম তথা শেষ শর্তের ওপর আলোচনা করেছি। তবে ন্যায়সংগত নির্দেশনার সাথে আনুগত্যের যে সম্পর্ক সে প্রসঙ্গে আজ কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করতে চাই। এ আয়াতে মহিলাদের নিকট থেকে এই অঙ্গীকারের শর্তে বয়আত নেবার তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা শিরক করবে না। চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না। সন্তানদের হত্যা করবে না, সন্তানদের তরবিয়তের বিষয়ে যত্নবান থাকবে, কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না। আর ন্যায়সংগত বিষয়ে অবাধ্যতা করবে না। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, নবী– যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত, তিনিও কি এমন আদেশ-নিষেধ দিতে পারেন যা অন্যায় বা অসংগত? আর নবী যদি দিতে পারেন তাহলে খলীফাও এমন অসংগত আদেশ-নিষেধ দিতে পারেন! এ প্রসঙ্গ স্পষ্ট হওয়া উচিত, নবী কখনো এমন আদেশ-নিষেধ দিতেই পারেন না। নবী যা বলবেন তা ন্যায়সংগত কথাই হবে, এছাড়া তিনি আর কিছুই বলবেন না। এজন্য পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করতে হবে, সেসব নির্দেশ মেনে চলতে হবে। কোথাও এটা লেখা হয় নি– যে নির্দেশ ন্যায়সংগত কেবল তার আনুগত্য করো। ফলে আবার এ প্রশ্নেরও অবতারণা হয়, দুটি ভিন্ন নির্দেশ তবে কেন? আসল বিষয় হলো, এগুলো দুটি ভিন্ন নির্দেশ নয়। এটি বোঝার ভুল।

যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি– নবী যে নির্দেশই দেবেন তা ন্যায়সংগতই হবে আর নবী কখনো আল্লাহ্ তা'লার বিধান-পরিপন্থি, শরীয়তের বিধি-নিষেধের বিপরীত কাজ করতেই পারেন না। তাঁকে তো শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কাজে প্রেরণ করা হয়েছে। যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে তিনি কীভাবে তার বিরোধী কাজ করতে পারেন? এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ– তোমরা নবীকে মেনে, মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্টকে মেনে, তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের সুরক্ষিত করেছ। তোমাদের জন্য এখন কোনো অন্যায় নির্দেশের প্রশ্নই ওঠে না। যে নির্দেশই রয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "আরেকটি ভ্রান্তি হলো, ন্যায়সংগত বিষয়ে আনুগত্য করা সংক্রান্ত, অর্থাৎ যে-সব কাজকে আমরা ন্যায়সংগত মনে করি না, আমরা তার আনুগত্য করব না। উল্লেখ্য, মহানবী (সা.) সম্পর্কে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– 'ওয়ালা ইয়াসীনাকা ফী মা'রূফিন' (আল-মুমতাহানা: ১৩)। তবে কি এরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরও দোষত্রুটির কোনো তালিকা তৈরি করেছে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বয়আতের শর্তে 'তাআত' ও 'মারূফ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে একটি নিগূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে। তোমাদের কারো সম্পর্কে আমি মোটেও কুধারণা পোষণ করি না। এজন্য আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছি যেন তোমরা কেউ আত্মপ্রতারণার শিকার না হও।" (ঈদুল ফিতরের খুতবা, ১৫ অক্টোবর ১৯০৯; খুতবাতে নূর, পৃ. ৪২০-৪২১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) "ইয়ামুরুহুম বিল মারূফ"-এর তফসীরে লেখেন, "এই নবী (সা.) সেসব বিষয়েরই আদেশ প্রদান করেন যা কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত নয়। আর ঐসব বিষয়ে বারণ করেন যেগুলো সম্পর্কে বিবেকও বারণ করে। পবিত্র জিনিসকে বৈধ আর অপবিত্র জিনিসকে অবৈধ করেন। মানবজাতির মাথা থেকে সেই বোঝা নামিয়ে দেন যার নীচে তারা চাপা পড়ে ছিল। তিনি সেসব ঘাড়কে বেড়িমুক্ত করেন যার কারণে ঘাড় সোজা হতে পারছিল না। তাই যারা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাকে শক্তিশালী করবে, তাকে সাহায্য করবে আর সেই নূরের আনুগত্য করবে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ইহকাল ও পরকালের সব সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করবে। (বারাহীনে আহমদীয়া, খণ্ড: ০৫, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২১, পৃ. ৪২০)

তাই নবী নিজে যখন আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষার অনুগত থাকেন, এমন নির্দেশই প্রদান করেন যা বিবেকসম্মত, মন্দকর্ম করতে বারণ করেন, পুণ্যকর্ম করার নির্দেশ প্রদান করেন আর এ থেকে বিচ্যুত হতেই পারেন না; তাহলে খলীফা– নবীর পর যিনি নবীর মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মুমিনদের এক জামা'তের মাধ্যমে নিযুক্ত হন, তিনিও সেই শিক্ষার, সেই বিধিবিধানকেই পরবর্তীতে জারি রাখেন যা আল্লাহ্ তা'লা নবীর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। আর এ যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ব্যাখ্যা করে তা আমাদেরকে অবগত করেছেন। কাজেই এখন সেই খিলাফত ব্যবস্থা অনুযায়ী যা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তে প্রবর্তিত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে– এতে শরীয়ত ও

বিবেকবুদ্ধিসম্মত সিদ্ধান্তই প্রদান করা হয় আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও হতে থাকবে আর এসবই ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত। যদি কোনো সময় যুগ-খলীফা ভুলবশত বা ভুল বোঝার কারণে এমন কোনো সিদ্ধান্ত দেন যাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যার ফলে কখনো এর অশুভ পরিণাম প্রকাশ পায় না আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও প্রকাশ পাবে না।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে যুগ-খলীফার কোনো ভুল হতে পারে, কিন্তু সেসব বিষয়– যার ওপর জামা'তের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি নির্ভর করে সেক্ষেত্রে যদি তাঁর কোনো ভুলও হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা নিজ জামা'তের সুরক্ষা করেন আর কোনো না কোনোভাবে তাকে এই ভুল সম্পর্কে অবহিত করে দেন। সুফিদের পরিভাষায় একে 'ইসমতে সুগরা' (lesser protection) বলা হয়। অর্থাৎ নবীদের লাভ হয় 'ইসমতে কুবরা' (greater protection) কিন্তু খলীফাদের 'ইসমতে সুগরা' লাভ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের এমন কোনো গুরুতর ভুল হতে দেন না, যা জামা'তের জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। তাঁদের সিদ্ধান্তে আংশিক ও সাধারণ ভুল হতে পারে কিন্তু ফলাফল হবে ইসলামের বিজয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা পরাজিত হবে অর্থাৎ তাঁদের 'ইসমতে সুগরা' অর্জিত হবার কারণে খোদা তা'লার নীতি তা-ই হবে যা তাঁদের নীতি। যদিও তাঁরাই কথা বলবেন, তাঁদেরই জিহ্বা নড়বে, তাঁদেরই হাত চলবে এবং তাঁদেরই মস্তিষ্ক কাজ করবে, কিন্তু এ সবকিছুর নেপথ্যে থাকবে খোদা তা'লার হাত। গৌণ বা ব্যাখ্যাগত বিষয়ে তাদের দ্বারা সাধারণ ভুল হতে পারে। অনেক সময় তাদের পরামর্শদাতারাও তাদের ভুল পরামর্শ দিতে পারে, কিন্তু এর মধ্যবর্তী সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বিজয় তাঁদেরই হবে। আর সবগুলো কড়া বা আংটা সংযুক্ত হয়ে পূর্ণ শিকলে পরিণত হবে, তখন সেটি সঠিক সাব্যস্ত হবে আর এমন সুদৃঢ় হবে যে, কোনো শক্তি এটিকে ভাঙতে পারবে না।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৬, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭)

পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে–

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ
طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

(আন-নূর: ৫৪)

অর্থাৎ "আর তারা এ মর্মে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খায়, তুমি যদি তাদেরকে আদেশ দাও তাহলে তারা অবশ্যই (ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়বে। তুমি বলো, 'তোমরা কসম খেয়ো না। নিয়মানুযায়ী আনুগত্য (করো)। তোমরা যা-ই করো সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবগত'।"

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতেও আনুগত্যের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, মুমিনগণ সর্বদা একথাই বলে থাকেন যে, 'আমরা শুনলাম, আনুগত্য করলাম ও মেনে নিলাম।' আর এই তাকওয়ার কারণেই তারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী আখ্যায়িত হন এবং সাফল্য

অর্জন করেন। এ আয়াতেও বলা হয়েছে যে, মুমিনদের ন্যায় 'শোনো ও আনুগত্য করো'– আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করো। কসম খেয়ো না যে, 'আমরা এই করব, সেই করব'।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তফসীরে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, দাবি তো মুনাফিকরাও অনেক করে থাকে। আসল বিষয় হলো, কার্যত আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং মুনাফিকদের মত বড়ো বড়ো কথা না বলা। এখানে আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের সম্পর্কে বলছেন, আনুগত্যের যে ন্যায়সংগত পন্থা রয়েছে, নিয়মতান্ত্রিক যে আনুগত্য রয়েছে, সেই আনুগত্য করো। তোমরা যে বিষয়ে প্রশ্ন করছ সে বিষয়ে নবী তোমাদেরকে শরীয়তবিরোধী ও বিবেক-পরিপন্থি কোনো আদেশ দেবেন না। আমি এর উদাহরণ দিচ্ছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার হাতে বয়আত করেছ এবং আমাকে মান্য করেছ, কাজেই পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত হয়ে যাও, মিথ্যা বর্জন করো, অহংকার পরিত্যাগ করো, লোকদের অধিকার হরণ করা ছেড়ে দাও এবং পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করো– এসব তাআত ও মারূফ তথা ন্যায়সংগত আনুগত্যের নির্দেশেরই অন্তর্ভুক্ত। এগুলো না করে যদি কেউ বলে বেড়ায়– আমরা কসম খাচ্ছি, আপনি আমাদের যে আদেশই দেবেন তা আমরা পালন করব এবং শিরোধার্য করব– তা ঠিক নয়।

এছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খলীফাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তাহরীক (বা বিশেষ কাজের আহ্বান) করা হয়ে থাকে। যেমন- মসজিদসমূহকে আবাদ রাখা, নামায প্রতিষ্ঠা করা, সন্তানদের তরবিয়ত করা, নিজ নৈতিকতার মান উন্নত করা, বড়োমনা হওয়া, তবলীগ করা অথবা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে তাহরীক (বা বিশেষ কাজের নির্দেশ প্রদান)। এগুলো এমন বিষয়, যার আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। অন্যকথায়, এগুলো মারূফ বা ন্যায়সংগত বিষয়ে আনুগত্যের গণ্ডিভুক্ত বিষয়। তাই কোনো নবী বা কোনো খলীফা তোমাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধান বা বুদ্ধিবিবেক-পরিপন্থি কোনো কাজ করান না। এটা বলবেন না যে, 'তোমরা আগুনে ঝাঁপ দাও অথবা সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ো'। গত খুতবায় আমীরের নির্দেশে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া প্রসঙ্গে আমি একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছিলাম। এ বিষয়ে আরো হাদীস রয়েছে যেন বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আলকামা বিন মুজাযযেয্ (রা.)-কে একটি যুদ্ধে পাঠান। তিনি যখন তাঁর যুদ্ধের নির্ধারিত জায়গার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছেন অথবা তখনো পথেই ছিলেন এ অবস্থায় সেনাদলের একটি অংশ তাঁর কাছে যাত্রা বিরতির অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। আর আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা বিন কায়েস আল সাহ্মীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দেন। আমি তাঁর সাথে এ যুদ্ধাভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। তিনি পথিমধ্যেই ছিলেন এমন সময় ঐ লোকেরা আগুন পোহাতে বা খাবার রান্নার জন্য আগুন জ্বালালো। তখন আব্দুল্লাহ্ (যিনি আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন আর যিনি রসিক স্বভাবের ছিলেন) বললেন, আমার কথা শুনে মান্য করা কি তোমাদের জন্য আবশ্যক নয়? তারা বলল, কেন নয়? আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) বললেন, আমি তোমাদেরকে যে আদেশ দেবো তোমরা কি তা-ই করবে? তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা তা-ই করব?

এতে আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) বললেন, আমি তোমাদের জোর নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা এ আগুনে ঝাঁপ দাও। এতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবার প্রস্তুতি নিতে লাগল। আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) যখন দেখলেন সত্যি সত্যিই এরা আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে তখন তিনি বারণ করে বললেন, 'তোমরা নিজেদেরকে (আগুনে নিক্ষেপ করা থেকে) বিরত রাখো।' (যখন তিনি দেখেন, তারা নির্দেশটিকে সত্যিকার অর্থে নিয়েছে তখন তিনি নিজেই বারণ করেন)। বর্ণনাকারী বলেন, পরে যখন যুদ্ধ থেকে আমরা ফিরে আসি, সাহাবীগণ (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ঘটনাটি অবহিত করেন। এতে রসূল (সা.) বলেন, "আমীরদের মধ্যে যে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতার আদেশ দেয়, তোমরা তার আনুগত্য করবে না।" (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল জিহাদ, বাব লে ইতায়াতে ফি মা'সিয়াতিল্লাহ্)

অতএব স্পষ্ট হওয়া উচিত, নবী বা যুগ-খলীফা ঠাট্টাচ্ছলেও এমন কথা বলতে পারেন না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা যদি আমীরের পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থি কিছু দেখতে পাও, তাহলে আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরে খিলাফতে রাশেদা প্রবর্তিত হয়েছে। তাই তোমরা খিলাফতের দ্বারস্থ হও, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা ন্যায়সংগত বা মারূফই হবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর বিধিবিধান অনুসারেই হবে। তাই যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, তোমাদের জন্য শুভসংবাদ, এখন সদাসর্বদা তোমরা ন্যায়সংগত বিষয় বা মারূফ সিদ্ধান্তের অধীনেই থাকবে। কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ ইনশাআল্লাহ্ এমন হবেই না, যা 'গয়ের মারূফ' বা ন্যায়সংগত নয়।

এটুকু উল্লেখের পর আমি স্মরণ করাতে চাই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে, তার (আ.) হাতে বয়আত করে, বয়আতের সেই দশটি শর্তে তার সাথে বয়আতের অঙ্গীকার করে সেই শর্তাবলি প্রতিপালন করা হয়েছে কি, আনুগত্যের নমুনা দেখানো হয়েছে কি? নাকি এসব কেবলই বুলিসর্বস্ব কথা যে, 'আমরা এসব শর্ত শিরোধার্য করে তাঁর হাতে বয়আত করছি।' এজন্য আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি, যা থেকে পরিদৃষ্ট হয়, বয়আত গ্রহণকারীরা নিজেদের মাঝে কী অসাধারণ পরিবর্তন আনয়ন করেছেন এবং কীরূপ আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। অসাধারণ এসব বিপ্লব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যেমন ঘটেছে, এ যুগেও আমরা প্রত্যক্ষ করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি হলফ করে বলতে পারি, কমপক্ষে এক লাখ মানুষ আমার জামা'তে এমন রয়েছে, যারা সত্য অন্তঃকরণে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আমলে সালেহা তথা সৎকর্ম সম্পাদন করে, এমনকি আমার কথা শ্রবণকালে কান্নায় তারা এমনভাবে ভেঙে পড়েন যে, চোখের পানিতে তাদের বুক পর্যন্ত ভেসে যায়"। (সীরাতুল মাহদী, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৪৬)

বয়আতের একটি শর্ত ছিল শিরক থেকে আত্মরক্ষা করব। এক্ষেত্রে কেবল আমাদের পুরুষরাই নয়, বরং মহিলারাও এমন উন্নতমান প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর এমন অসাধারণ আদর্শ দেখিয়েছেন যে, তাদের দেখে হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় ভরে যায়, কীরূপ

অসাধারণ বিপ্লব সাধিত হয়েছে! আর এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য অবলীলায় (হৃদয় থেকে) দোয়া নির্গত হয়।

হযরত চৌধুরী জাফরউল্লাহ্ খান সাহেবের মায়ের শিরকের প্রতি কতটা ঘৃণা ছিল, এর দৃষ্টান্তমূলক একটা বাস্তব ঘটনা রয়েছে। তিনি (রা.) বলেছেন, তাঁর সন্তানদের বেশিরভাগ জন্মের পর মারা যেত। এমনই অবস্থায় একবার তাঁর এক শিশুসন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই শিশুর চিকিৎসা করা হয়। একজন একটি তাবিজ দিয়ে যায় আর এক মহিলা সেই তাবিজটি শিশুর গলায় পরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু শিশুটির মা তাবিজটি ছিনিয়ে নিয়ে চুলার জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিয়ে বলেন 'আমি খালেক ও মালেক তথা স্রষ্টা ও সর্বাধিপতির ওপর ভরসা রাখি। আমি ওসব তাবিজ-কবজকে কোনো গুরুত্ব দেবো না'। শিশুটি দু'মাস বয়সে উপনীত হবার পর, সেই একই জয়দেবী আবার আসে আর শিশু বালকটিকে আদর করে শিশুর মায়ের কাছে কিছু কাপড়চোপড় আর খাদ্যশস্য এমনভাবে চাইল যা থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, এসব জিনিস জাফরকে বিপদমুক্ত করার জন্য। জবাবে তিনি (অর্থাৎ চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের মা) বললেন, তুমি এক কাঙাল বিধবা, সদকা-খয়রাতস্বরূপ কিছু চাইলে যতটা আমি দিতে পারি, তা দেবার জন্য আমি প্রস্তুত, কিন্তু আমি পেতনি ও ডাইনির কথা মানতে প্রস্তুত নই। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ই আমার একমাত্র প্রতিপালক-প্রভু, জীবনমরণের মালিক একমাত্র তিনিই। এমন বিষয়ে অন্য কারো হাত থাকতে পারে– তা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার দৃষ্টিতে এমনটি ভাবা অংশীবাদিতার শামিল আর আমি এমন বিষয়কে অবশ্যই ঘৃণা করি। এ কারণে আমি তোমাকে কিছু দিতে রাজি নই। এতে জয়দেবী বলে ওঠে, ভালো করে ভেবে দেখো, তোমার ছেলের জীবন বাঁচাতে চাইলে তোমার কাছে আমি যা চেয়েছি, আমার সেই দাবি তোমাকে পূরণ করতেই হবে।

কয়েকদিন পর শিশু জাফরকে তিনি গোসল করাচ্ছিলেন, জয়দেবী পুনরায় এসে উপস্থিত হয় আর শিশুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কৌতুহলের সাথে বলে, 'এই কি সেই শাহজাদা?' শিশুর মা 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, 'এ সেই শিশুই।' জয়দেবী আবারো সেই একই ঢঙে ভিক্ষা চাইলে তিনি (শিশুর মা) তাকে কোনোকিছু দিতে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকৃতি জানান। এতে জয়দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার এই সন্তানকে জীবিত অবস্থায় সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারো কেবল তবেই বলতে পারবে যে, আমি মিথ্যা বলছি'। শিশুর মা বললেন, 'যা ঘটার খোদার ইচ্ছাতেই ঘটবে'। জয়দেবী ফিরতি পথ ধরে তখনো দেউড়িতেও পৌঁছে নি, শিশুকে তখনো গোসল করানো হচ্ছে, এরই মধ্যে শিশু জাফর রক্তবমি করে এবং রক্ত পায়খানা করে। কয়েক মিনিটের ভেতর শিশুর অবস্থার চরম অবনতি ঘটে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশুটি পরলোক গমন করে। তিনি আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত হয়ে স্বগতোক্তি করেন, 'হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! তুমিই সন্তান দান করেছিলে আর তুমিই তাকে ফিরিয়ে নিলে! তোমার সন্তুষ্টিতে আমি সন্তুষ্ট! তুমিই এখন আমাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দাও।' এরপর শূন্য কোলে তিনি 'ডেস্কা' শহরে তার নিজ স্বামীগৃহে ফেরত যান। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ১১, পৃ. ১৫-১৬)

লক্ষ করুন! এরপর আল্লাহ্ তা'লা কীরূপ পুরস্কাররাজিতে ধন্য করেছেন, 'চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব'-এর মতো সুপুত্র তাঁকে দান করেছেন যিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করে বিশ্বজুড়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

বয়আত করার পর মানুষ রিপুর তাড়না থেকে কীভাবে সুরক্ষা লাভ করছে– এ প্রসঙ্গে কেবল সে যুগের কথাই নয় বরং আমি এ যুগের দৃষ্টান্তও তুলে ধরছি, আর তা-ও আফ্রিকার লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখে।

আফ্রিকার প্যাগান জাতির মাঝে অনেক নোংরা আচার-অনুষ্ঠান ও কদাচার বিদ্যমান; কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণ করার সাথে সাথেই তারা সেসব নোংরা আচার-আচরণ পরিহার করে নিজেদের মাঝে এমন পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছে যে, সেসব নোংরামি যেন তাদের মাঝে কখনো ছিলই না। এমন রিপোর্টও আসে, মদ্যপানে অভ্যস্তরা মদ পান করাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে আর এতে অন্যদের ওপরও প্রভাব পড়ে। আর তাদের মাঝে ঘটে যাওয়া পবিত্র পরিবর্তনের এসব কথা যখন তারা তুলে ধরে, মোল্লারা বলে– আহমদীয়াত তাদের ওপরে জাদুটোনা করেছে আর এ কারণে তারা মদ পান করা ছেড়ে দিয়েছে।

একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। একজন মুরব্বী সাহেব আমাকে বলেছেন, ঘানার এক ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে, যার মাঝে সর্বপ্রকার বদঅভ্যাস ছিল। মদপান, ব্যভিচার সবই। সেখানকার রীতি হলো, দারিদ্র্যের কারণে কিংবা রুজি-রোজগারের অভাবে থাকার জন্য বৃহদায়তন বাসগৃহের কোনো কোনো কক্ষ ভাড়া নেয়, তাদের বসবাসের ধরন এমনই। এই ব্যক্তি এমনই এক পরিবেশে বসবাস করত। মহিলাদের সাথে তার অবাধ মেলামেশা ছিল। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর সবাইকে বলে দিল, কোনো অপকর্মের জন্য আমার কাছে কেউ আসবে না। তবে এক মহিলা ছিল নাছোড়বান্দা। তাই সে ব্যক্তি যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তা হলো, দূর থেকে তাকে দেখলেই দরজা বন্ধ করে নফল নামায পড়া আরম্ভ করে দিত। কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করে দিত, এভাবেই সে নিজেকে নিরাপদ রাখে। অতএব এটাই হলো বিপ্লব– যা আহমদীয়াত নিয়ে এসেছে।

মওলানা বশীর আহমদ কমর সাহেব নামে আমাদের একজন মুবাল্লেগ আছেন। তিনি বর্ণনা করেন, এ অধম আহমদীয়া জামা'ত ঘানার সদস্যদের সাথে একবার ঈদের নামায পড়ার পর 'প্যারামাউন্ট চিফ'-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়। সেই চিফ তার গোত্রের গণ্যমান্য লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন, আমরা সেখানে প্রবেশ করতেই আহমদী বন্ধুরা চিফ ও তার সঙ্গীসাথিদের সামনে অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে এমনভাবে তারানা গাইতে আরম্ভ করে যে, একজন বৃদ্ধ আহমদী যে চিফের ঠিক সামনেই দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল, সে-ও উচ্ছ্বাসভরে তারানা গাওয়ার সাথে সাথে নিজের লাঠিটি বাতাসে শূন্যে নাচিয়ে গান গাইছিল। অন্য বন্ধুরা তার সাথে সাথে সেই তারানার পুনারাবৃত্তি করতে শুরু করে, যাদের সংখ্যা হবে প্রায় তিনশ। অনুবাদককে জিজ্ঞেস করলাম এরা কী বলছে, সে আমাকে জানালো, এরা আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে আর ইসলামের কল্যাণরাজির কথা বলছে। তারা বলছে, 'আমরা

মূর্তিপূজারি ও মুশরিক ছিলাম। হালাল ও হারাম আর পাপ-পুণ্যের কোনো জ্ঞানই ছিল না আমাদের। পশুর ন্যায়ই আমরা জীবনযাপন করতাম, বন্য ছিলাম আমরা আর পানির মতোই মদ পান করতাম। আহমদীয়াত আমাদেরকে সহজসরল পথ দেখিয়েছে আর আমাদের অপকর্মগুলো আমাদের থেকে বিদূরিত হয়েছে, মানুষ হয়েছি আমরা।

এসব মানুষ পরিপূর্ণ আস্থার সাথে নিজেদের শহরের 'প্যারামাউন্ট চিফ' ও অন্যান্য গণ্যমান্যদের সামনে, যারা তাদের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, নিজেদের পবিত্র পরিবর্তনের কথা নির্ভিকচিত্তে অবলীলায় বর্ণনা করে চলছে আর আহমদীয়াতেরই সত্যতার সাক্ষ্য হিসেবে তা উপস্থাপন করছে। (মাসিক আনসারুল্লাহ্, জানুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৩০-৩১)

নিয়মিত পাঁচবেলার নামায পড়া ও তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে বয়আতের শর্তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি লক্ষ করছি, আমার বয়আতকারীদের মধ্যে প্রতিনিয়ত সৎকর্ম আর তাকওয়ার মান উন্নত হচ্ছে। মুবাহালার দিনগুলো অতিক্রান্ত হবার পর আমাদের জামা'তের মধ্যে যেন এক অভাবনীয় নতুন রং ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ সময় আমি লক্ষ করি, সিজদারত অবস্থায় তারা কাঁদছেন আর তাহাজ্জুদে তারা বিনয়ে বিগলিত হচ্ছেন। অপবিত্র হৃদয়ের লোকেরা তাদেরকে কাফির বলে অথচ তারাই ইসলামের জীবন, ইসলামের প্রাণ।" (যামিমা আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১১, পৃ. ৩১৫)

এখানে আমি পুনরায় ঘানার একটি উদাহরণ দিচ্ছি, লোকেরা নিজেদের মাঝে এরূপ পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে যা স্বয়ং আমার পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। দীর্ঘপথ সফর করে এসেছে আর অনেক রাতে পৌঁছেছে। রাত ১২টার দিকে শোবার সুযোগ পেয়েছে। এরপরও রাতে জেগে উঠে দেখি দেড়টা বা দু'টো হবে, অতিথি মসজিদেই আছেন আর সিজদারত অবস্থায় আছেন।

হযরত মুন্সি মুহাম্মদ ইসমাইল (রা.) বর্ণিত এক বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলতেন "কেবল একটি নামাযের কথা আমার স্মরণ রয়েছে, যা আমি বাজামা'ত পড়তে পারি নি, (একান্ত অপারগতা ছাড়া), এর কারণ হলো, জরুরি কাজে আমাকে মসজিদ থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল"। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৯৬)

হযরত মুন্সি মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণের পর তিনি নিজ শহর সিয়ালকোটে ফেরত যান। লোকেরা লক্ষ করল, তিনি তার পুরোনো বদঅভ্যাস অর্থ্যাৎ তাস খেলা, বাজারে বসে অযথা গালগল্প করা, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি ছেড়ে দিয়েছেন এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে শুরু করেছেন। তার অবস্থার এই অসাধারণ পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে সবাই হতবাক।" (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০১, পৃ. ২০০)

কাদিয়ানে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নামায সযত্নে আদায় করা সম্পর্কে হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "কাদিয়ানে সূর্যগ্রহণের দিনের নামাযে আমি উপস্থিত ছিলাম। মৌলবি মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী নামায পড়িয়েছেন। নামাযে

যোগদানকারীরা অঝোরে কাঁদছিলেন। রমযানের ঐ দিনগুলোতে অবস্থা এমন ছিল যে, ভোর রাত দু'টো বাজতেই 'বাজার আহমদী চক' সরব হয়ে উঠত। বেশিরভাগ মানুষ গৃহে আর কেউ কেউ মসজিদ মুবারকে উপস্থিত হতো যেখানে তাহাজ্জুদ নামায পড়া হতো। এরপর সেহরী খাওয়া হতো আর ফজরের নামায পড়া হতো ওয়াক্তের প্রথমভাগে। এমনিভাবে নামায আদায় করা হতো। এরপর কিছু সময় ধরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা হতো আর প্রায় ৮টার দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। সেবকরা সবাই সাথে থাকতেন। ১১-১২টার দিকে এই ভ্রমণ শেষ হতো। এরপর যোহরের আযান হতো আর ১টা বাজার আগেই যোহরের নামায শেষ হয়ে যেত। এরপর আসরের নামাযও নির্ধারিত সময়ের প্রথম ভাগেই পড়া হতো। এভাবে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ লাভ হতো। মাগরিবের নামাযের পর খাওয়াদাওয়া শেষ করে রাত ৮-৮.৩০টায় ইশার নামায শেষ হয়ে যেত। আর পরিবেশ পরিস্থিতি এমন নীরব ও শুনশান হয়ে যেত, যেন এখানে কোনো জনবসতিই নেই, তবে রাত দু'টো বাজতেই সবাই সজাগ হয়ে যেত আর প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসত।" (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০২, পৃ. ৭৭)

নওয়াব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একটি ঘটনা লিখেছেন, তিনি (রা.) নামায-প্রেমিক ছিলেন। বিশেষ করে বাজামা'ত নামায প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর (রা.) উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা আর সাধ্যসাধনা ছিল স্বতন্ত্রধারায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পাঁচবেলার নামায মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত পড়ার বিষয়ে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। যখন তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন, তখনো আযানের ধ্বনি তিনি সেই ভালোবাসাপূর্ণ আবেগ নিয়েই শুনতেন যেমনটি প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের ডাক শোনার জন্য কান পেতে রাখে। এরপর আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব যখন কিছুটা চলাফেরার শক্তি লাভ করেন তখন মাঝে মধ্যেই তিনি তাঁর ঘরের ছেলেদের মধ্য থেকে কাউকে ধরে বাজামা'ত নামায পড়ানোর জন্য ইমামের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিতেন আর এভাবে জামা'তবদ্ধ হয়ে নামায পড়ার পিপাসা নিবারণ করতেন। রতনবাগের নির্ধারিত নামায ঘরের পাশে নিজের চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি বাজামা'ত নামাযে অংশগ্রহণ করতেন। মডেল টাউনে কুঠি ক্রয় করার পর সেখানেই তিনি বাজামা'ত পাঁচবেলার নামাযের ব্যবস্থা করে নিজের ঘরকেই যেন মসজিদে রূপান্তরিত করে নিলেন। সেখানে তিনি পাঁচবেলা আযান দেবার ব্যবস্থা করিয়েছেন। আবহাওয়া অনুসারে কখনো বাড়ির আঙিনায় অথবা কক্ষের ভেতরে নামাযের পাটি বিছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন আবার কখনো মসজিদে বসে এক ওয়াক্ত নামায পড়ার পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকতেন। বিভিন্ন ধরনের লোকদের নিজ আবাসগৃহে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়াটা সাধারণ কোনো পুণ্য নয়। বিশেষ করে যখন গৃহস্বামীর জীবনযাত্রার মান থাকে অনেক উন্নত এবং তার সামাজিক যোগাযোগের পরিধিও থাকে ব্যাপক, এমন পরিস্থিতিতে তার এই পুণ্যের মূল্যমান আরো অনেক গুণই বেড়ে যায়। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ১২, পৃ. ১৫২-১৫৩)

সযত্নে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শেখ হামেদ আলী সাহেব (রা.)-এর নিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন, "শেখ হামেদ আলী, যাকে আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে ভালোবাসি এক ধার্মিক পরিবারের ধর্মভীরু যুবক যে ৭/৮ বছর ধরে আমার সেবায় নিয়োজিত আছে। আমি নিশ্চিত জানি, আমার প্রতি তার নিষ্ঠাপূর্ণ গভীর অনুরাগ রয়েছে। যদিও তাকওয়ার সূক্ষ্মতা অর্জন করা গভীর তত্ত্বজ্ঞানী এবং পুণ্যবানদের কাজ, তবুও যতটা সে বুঝে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণ ও তাকওয়ার বিষয়ে খুবই যত্নবানই। আমি তাকে দেখেছি, এমন কঠিন রোগে যা মরণব্যাধিই মনে হতো, যখন দুর্বলতা ও শীর্ণতায় লাশ সদৃশ হয়ে গিয়েছিল, একনিষ্ঠভাবে পাঁচবেলার নামায আদায়ে এতটা আন্তরিক উদ্দীপনা রাখত যে, সেই নাজুক পরিস্থিতি ও প্রায় বেহুঁশ অবস্থায়ও যে করেই হোক নামায পড়ে নিত। আমি জানি, মানুষের খোদাভীরুতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে নামায পড়ার ক্ষেত্রে তার মনোযোগিতা কতটুকু, তা পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে পুরো মনোযোগের সাথে নামায আদায় করে, ভয়ভীতি, রোগ-ব্যাধি, অসুখ-বিসুখ আর পরীক্ষা যাকে নামায থেকে বিরত রাখতে পারে না, সে অবশ্যই খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার ঈমান রাখে। তবে এরূপ ঈমান দরিদ্রদের দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ামত লাভকারীদের সংখ্যা বিত্তশালীদের মধ্যে খুবই কম।" (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫৪০)

"বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী পাঁচবেলা নামায আদায়ে রত থাকব মর্মে যে শর্ত রয়েছে"– এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব (রা.)-এর ব্যবহারিক নমুনা কেমন ছিল তা বর্ণনা করেছেন, একজন পুণ্যবান ব্যক্তি মৌলবি ফযলে ইলাহী (রা.)। মির্যা আইয়ুব বেগের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড়োই ভালোবাসা ছিল। আমি মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেবের গৃহে একদিন মাগরিবের নামায পড়েছিলাম। হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেবের নামায "আস সালাতু মি'রাজুল মু'মিনীন" (অর্থাৎ নামায মুমিনের মি'রাজ)-এর বৈশিষ্ট্যে শোভামণ্ডিত ছিল। তিনি নামায আদায়কালে জাগতিক ধ্যানধারণার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন থাকতেন এবং তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। সেদিন তিনি অসাধারণভাবে নামায দীর্ঘ করেন। নামাযের পর সবার বসা থাকা অবস্থায় মির্যা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আজকের নামায তো আপনি অনেক লম্বা করে পড়ালেন, এর কারণ কী? প্রথমে তো তিনি কিছুই বলতে চাচ্ছিলেন না, তবে অনুরোধ-উপরোধের পর বললেন, "আমি যখন দরূদ পাঠে রত ছিলাম, আমার 'কাশফ' (বা দিব্যদর্শন লাভ) হয়, আমি দেখলাম মহানবী (সা.) রেলওয়ের এক প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছেন। মির্যা সাহেব সেই আরবী দোয়া এবং এর অনুবাদও বললেন, এর ভাবার্থ যা দাঁড়ায় তা হলো– হে খোদা! আমার উম্মতকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করো আর তাদের তরী তটে ভিড়িয়ে দাও, আমি সেই দোয়ার সাথে সাথে 'আমীন' বলছিলাম। পরবর্তীতে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখি, তিনিও দোয়া করছিলেন, হে খোদা! মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোয়াগুলো গ্রহণ করো আর তাঁর

উম্মতকে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা করো। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়া শেষ করলে আমিও নামাযের সমাপ্তি টানলাম"। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৯৪-১৯৫)

এই হলো আধ্যাত্মিক বিপ্লব– জাগ্রত অবস্থাতেও মহানবী (সা.)-এর দর্শন লাভ হয়ে থাকে।

হযরত ডাক্তার মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব (রা.) এবং হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব– উভয়ের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রভাব কেমন আর কতটা গভীর ছিল সে প্রসঙ্গে এক বর্ণনায় রয়েছে বরং তারা নিজেরাই বলেন, আমাদের পিতা তার এক বন্ধুকে বলেছেন, "আমার এই দুই পুত্র ১৮৯২-১৮৯৩-এর গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আমার কাছে, মুলতান জেলার 'কাকড়হাটে' নিজ বাড়িতে আসে। আমি তাদের মাঝে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ করি, যা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই আর বিস্ময়ের সাথে দোয়া করি– হে খোদা! তুমি তাদেরকে কী এমন উপকরণ দান করেছ, যে কারণে তাদের অন্তরে এরূপ অসাধারণ পরিবর্তন ঘটেছে যে, তারা 'নূরুন আলা নূর' হয়ে গেছে। এরা সকল নামাযই পড়ে আর সঠিক সময়ে অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে, একনিষ্ঠ প্রেমানুরাগের সাথে এবং আন্তরিকতাপূর্ণ চেতনা নিয়ে এতটা কাকুতিমিনতির সাথে পড়ে যে, তাদের প্রাণবায়ুই বুঝি বেরিয়ে যাবে। অধিকাংশ সময়ই তাদেরকে অশ্রুসজল অবস্থায় দেখতে পাই আর তাদের চেহারাতেও আল্লাহ্‌র ভয়ের চিহ্ন দৃশ্যমান। সেকালে এই দুই সন্তানের বয়সও ছিল খুবই কম, সবেমাত্র দাঁড়ি গজাচ্ছিল, উঠতি বয়সে তাদের ঐ অবস্থা দেখে আমি কৃতজ্ঞতা ভরে সিজদা করে কখনো ক্লান্ত হতাম না। কেননা নবযৌবনে উপনীত হওয়াকালে, তাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতার আশঙ্কার যে বোঝা আমার অন্তরে ছিল, তা উবে গেছে।

পিতা মহোদয় তার সেই বন্ধুকে বলেন, তাদের এই উঁচু মানের পবিত্র পরিবর্তনের রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত হয় নি যে, এত ছোটো বয়সে তাদের এই আশিস ও আধ্যাত্মিকতার কল্যাণধারা কোথা থেকে লাভ হলো! কিছুকাল পর এটা জানতে পারলাম যে, তাদের এই পবিত্র সুধা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার কল্যাণে অর্জিত হয়েছে। অতএব পিতা মহোদয়ের হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করার ক্ষেত্রে আমাদের পরিবর্তনেরই মুখ্য ভূমিকা ছিল (অর্থাৎ সন্তানদের পবিত্র পরিবর্তন দেখে পিতা আহমদী হয়েছিলেন), যা তাকে হযরত আকদাস (আ.)-এর পাকপবিত্র অন্তঃকরণের বিষয়ে ধারণা লাভের উত্তম সুযোগ এনে দিয়েছে। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৮৬)

হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-এর পিতা হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-এর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁর এক পুত্র বলেন, আমার পিতা (অর্থাৎ হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব) পরম নিয়মনিষ্ঠা এবং গভীর যত্ন ও একাগ্রতার সাথে নামায পড়তেন আবার তাহাজ্জুদের প্রতিও গভীর আকর্ষণ রাখতেন। আমার প্রকৃতিতে শৈশব থেকেই আমার পিতার সুগভীর প্রভাব ছিল। আমি কল্পনার চোখে প্রায়শই তাঁকে নামায পড়তে কিংবা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখি। বয়আত গ্রহণের পর তিনি

নিয়মিত কবুতর ওয়ালী মসজিদে ফজরের নামায জামা'তের সাথে পড়তেন। মসজিদ আমাদের বাড়ি থেকে দূরে হওয়ায় বাবা অন্ধকার থাকতেই রওয়ানা হয়ে যেতেন"। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ১১, পৃ. ১৬৩)

এরপর নিষ্ঠার সাথে যথাসময়ে নিয়মিত নামায পড়া সম্পর্কে হযরত বাবু ফকির আলী সাহেব (রা.)-এর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। "তিনি ছিলেন, 'দিল বাইয়ার দস্ত বাকার' (অর্থাৎ হাত কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলেও অন্তর প্রেমাস্পদের ভালোবাসায় বিভোর –অনুবাদক)-এর ব্যবহারিক প্রতিচ্ছবি। এম. বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, সে যুগে ইংরেজদের দাপট ছিল খুবই বেশি। ইংরেজ কর্মকর্তা তাকে উদ্দেশ্য করে বলত, মৌলবি সাহেব! সবসময় নামায পড়তে থাকেন, কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবেন। তার এরূপ কথায় তিনি খুবই অস্বস্তিতে ছিলেন। একদিন তিনি (অফিসের) দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে তার সন্নিকটে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে আরম্ভ করলে ইংরেজ অফিসার এতে ভয় পেয়ে যায় পাছে তার ওপর হামলা করে বসে। এমতাবস্থায় তিনি তাকে আশ্বস্ত করেন যে, আমার এমন কোনো দুরভিসন্ধি নেই, আমি পৃথকভাবে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। কথা হলো, আপনি অফিসে পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য সময় নষ্ট করেন, অনুরূপভাবে চা ও ধূমপানেও সময় নষ্ট করেন, তবুও আমার বেলায় আপত্তি কেন করেন? উত্তরে সে বলতে আরম্ভ করে, এসব তো প্রকৃতির ডাক। তিনি বলেন, আমি আপনার অধস্তন, আমি আপনার আনুগত্য করব, তবে সেসব নির্দেশই পালন করব যা দায়িত্বের সাথে সম্পর্ক রাখে। অন্যান্য ব্যাপারে আপনার নির্দেশের আনুগত্য করা আমার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তাই আপনার কথায় আমি নামায ছাড়তে পারি না। আমার অবজ্ঞার কারণে কিংবা অবহেলায় দুর্ঘটনা ঘটলে বা রেলগাড়ি বিলম্বের মুখে পড়লে আপনি আমার সাথে কঠোর হতে পারেন। একথা বলেই তিনি দরজা-জানালা খুলে দিলেন। সেই কর্মকর্তা তাঁর এই আলোচনায় খুবই বিস্মিত হয়।... এই আলোচনা তার ওপর এমন গভীর প্রভাব ফেলে যে, এরপর থেকে ওযূ করার জন্য তিনি পানির বদনায় হাত দিতেই সেই রেল কর্মকর্তা বলত, মৌলবি সাহেব! আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার নামায আদায় করুন, আমি আপনার কাজের প্রতি খেয়াল রাখব। একদিন তাঁর শুষ্ক ও অতি সাধারণ খাবার খাওয়া দেখতে পেয়ে, সে যারপরনাই বিস্মিত হয় আর ভাবে, এই বুঝি তাঁর অবস্থা।" (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১১)

এখানে এই ইংল্যান্ডেও আমাদের একজন প্রবীণ আহমদী বেলাল নাট্টাল সাহেব যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, নিজের জন্য 'বেলাল' নামটি তিনি বেছে নেন আর হযরত বেলাল (রা.)-এর অনুকরণে তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে ডাকা অর্থাৎ আযান দেবার ক্ষেত্রে এক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সত্যিই তার মাঝে আযান দেবার গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ তার ছিল। (মাসিক আনসারুল্লাহ্, জুন ১৯৬৫, পৃ. ৩৬)

বয়আতের একটি শর্ত হলো প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করা। এতে শিক্ষণীয় কী রয়েছে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি উত্তম নৈতিক গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দুদের সাথে এক আলোচনা অনুষ্ঠান ছিল, মতবিরোধের কারণে ঝগড়া বাঁধে, এতে

জামা'ত আত্মসংবরণের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র প্রকৃতির মুসলমানরা যদি সভ্যতা-ভব্যতার দাবি মেনে না চলত আর কুরআনের শিক্ষার ও দাবি অনুসারে ধৈর্যশীল না হতো এবং ক্রোধ সংবরণ না করত, তাহলে এসব দুরভিসন্ধিবাজরা এমন এমন উসকানিমূলক আচরণ করেছে যে, সে সভাস্থল রক্তে রঞ্জিত হবার উপক্রম হয়েছিল। সহস্র সাধুবাদের যোগ্য আমাদের জামা'ত, যারা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করেছে আর আর্যদের সেসব কটুক্তি যা ছিল বুলেটের চেয়েও মারাত্মক, তা শুনেও ধৈর্যধারণ করে সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমার জামা'তের জন্য আমার পক্ষ থেকে যদি ধৈর্যধারণের নসীহত না থাকত আর পূর্ব থেকেই নিজের এই জামা'তকে যদি এভাবে প্রস্তুত না করতাম যে, তারা যেন সর্বাবস্থায় কটুক্তি ও অপলাপের প্রত্যুত্তরে ধৈর্যধারণ করে, তাহলে এই ময়দান রক্তে রঞ্জিত হয়ে যেত। কিন্তু এটা ছিল ধৈর্যধারণের সেই শিক্ষা যা তাদের ক্রোধ ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করেছে। (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২৩, পৃ. ১০)

ক্রোধ দমনের আরেকটি উদাহরণ হযরত সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে। আশ্চর্যজনক এক আদর্শ। বর্ণিত আছে, "একদিন হযরত শাহ সাহেব নামায পড়ার জন্য নিকটস্থ মসজিদে যান। সে সময় আহমদীয়াতের এক ঘোর বিরোধী চৌধুরী রহীম বখশ ওযূ করার জন্য মাটির বদনা হাতে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। হযরত ডাক্তার সাহেবকে দেখতেই (ডাক্তার সাহেব সরকারি ডাক্তার ছিলেন, সরকারি হাসপাতালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন) ধর্মীয় আলোচনা শুরু করে দেয়। হযরত ডাক্তার সাহেবের কোনো কথায় চৌধুরী রহিম বখশ প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে মাটির বদনা তার মাথায় ছুড়ে মারে। বদনা মাথায় লাগতেই ভেঙে যায় আর মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ডাক্তার সাহেবের কাপড় রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তিনি ক্ষতস্থান হাত দিয়ে চেপে ধরেন আর ব্যান্ডেজ করানোর জন্য দ্রুত হাসপাতালের দিকে ছুটে যান। তার চলে যাবার পর রহীম বখশ অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন যে, এখন কী হবে! তিনি তো সরকারি ডাক্তার। সরকারি কর্মকর্তাও তারই কথা গ্রহণ করবে। এখন আমার বাঁচার কোনো উপায় নেই। আমি এখন কোথায় যাই আর কী করি? এই ভেবে সে অস্থির হয়ে ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় মসজিদেই পড়ে থাকে। ওদিকে ডাক্তার সাহেব হাসপাতালে গিয়ে মাথার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে এবং রক্তাক্ত কাপড়চোপড় পরিবর্তন করে আবার নামাযের জন্য সেই মসজিদেই আসেন। ডাক্তার সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেব পুনর্বার মসজিদে প্রবেশ করলে সেখানে চৌধুরী রহীম বখশ সাহেবকে দেখতে পান, আর তাকে দেখা মাত্রই তিনি মৃদু হাসেন আর মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করেন 'চৌধুরী রহীম বখশ সাহেব! এখন আপনার রাগ ঠান্ডা হয়েছে কি?' একথা শোনামাত্রই চৌধুরী রহীম বখশ-এর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৎক্ষণাৎ করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী হন আর বলতে থাকেন, শাহ সাহেব! আমার পক্ষে বয়আতের পত্র লিখে দিন। ধৈর্যের এই মহান দৃষ্টান্ত আর কোমলতা ও মার্জনার ব্যবহার, ঐশী জামা'তের সদস্যদের ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকেই প্রকাশ পেতে পারে না। সুতরাং চৌধুরী সাহেব আহমদী

হয়ে গেলেন আর কিছুকাল পর তার অন্যান্য সঙ্গীসাথিরাও আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (সীরাত হযরত ডাক্তার আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেব, পৃ. ৬৩, প্রকাশক: মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান)

এই হচ্ছে কয়েকটি দৃষ্টান্ত যা আমি উপস্থাপন করলাম। এগুলো বয়আতের প্রথম দিকের তৃতীয় বা চতুর্থ শর্তের সাথে সম্পর্ক রাখে। বয়আত গ্রহণ করার পর লোকদের মাঝে কীরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য পরবর্তীতে আরো কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব, যেন নবাগত ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারে এবং তারাও নিজেদের মাঝে অনুরূপ পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে পারে আর তাদের ওপর কখনো যেন দাজ্জালের প্রভাব না পড়ে। আমীন।

(২৪)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ০৩ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ০৩ ইখা, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন।

قُلْ اَمَرَ رَبِّیْ بِالْقِسْطِ ۟ وَ اَقِیْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ
مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝
فَرِیْقًا هَدٰى وَ فَرِیْقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیٰطِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝
یٰبَنِیْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ
الْمُسْرِفِیْنَ ۝

(আল-আরাফ: ৩০-৩২)

[অর্থ: "তুমি বলো, 'আমার প্রতিপালক-প্রভু ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়েছেন, অধিকন্তু (এ আদেশও দিয়েছেন,) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদের মনোযোগ (আল্লাহ্র প্রতি) নিবদ্ধ রাখো এবং আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকো। তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবেই তোমরা (মৃত্যুর পর) ফিরে যাবে।' এক দলকে তিনি হিদায়াত দিয়েছেন এবং আরেকটি দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে শয়তানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং তারা মনে করে যে, তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত। হে আদমসন্তানরা! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদেরকে (খোদাভীতির পোশাকে) সুসজ্জিত করো এবং আহার করো ও পান করো, তবে সীমালঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"]

ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ বরং এই জুমুআর খুতবার মাধ্যমেই এই মসজিদের উদ্বোধন করা হচ্ছে, যার নাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) **'বাইতুল ফুতুহ'** রেখেছিলেন– আলহামদুলিল্লাহ্। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি বলে দিচ্ছি।

১৯৯৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) (এই মসজিদ নির্মাণের) আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রথমদিকে বিশ্ব জামা'তে আহমদীয়াকে এই মসজিদের জন্য পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর ১৯৯৬ সালে প্রায় সোয়া দুই মিলিয়ন বা বাইশ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউন্ড খরচ করে এখানে পাঁচ একর জমি ক্রয় করা

হয়। ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যাতে কাদিয়ানের বাইতুল ফিকর-এর ইট ব্যবহার করা হয়। এ মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর স্মৃতি আমাদের আবেগতাড়িত করছে, কেননা তিনি যে প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন তা যদি নিজ হাতেই উদ্‌বোধন করতেন (তাহলে কত ভালো হতো!)। কিন্তু যাহোক, ঐশী নিয়তির ওপর আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং আমরা তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু একইসাথে হুযূর (রাহে.)-এর জন্য আমরা দোয়ার প্রেরণা বোধ করি আর দোয়া করতে থাকা উচিত।

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হুযূর (রাহে.) এক্ষেত্রে কিছুটা প্রশাসনিক পরিবর্তন আনেন এবং এই মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরো পাঁচ মিলিয়ন অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানান। যুক্তরাজ্যের আমীর মোহতরম রফিক আহমদ হায়াত সাহেবের হাতে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন এবং একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির কো-অর্ডিনেটর ছিলেন মোহতরম নাসের খান সাহেব। তিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করেন অর্থাৎ যে প্রকল্প আরম্ভ করা হয়েছিল তা সফলভাবে সম্পন্ন করেন, মাশাআল্লাহ্। তার সাথে আরো কয়েকজন বন্ধু ছিলেন যারা অহোরাত্র পরিশ্রম করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আঞ্জুম উসমান সাহেব, এছাড়াও পুরো একটি টিম ছিল যাদের প্রত্যেকের নাম নেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য সেসব মানুষ যারা অহোরাত্র পরিশ্রম করে মসজিদটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন তাদের সবাইকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। সেসব খাদেম এবং স্বেচ্ছাসেবী যারা কায়িক শ্রম দিয়েছেন তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

ইংল্যান্ডের জামা'ত ছাড়াও বিশ্বের নিষ্ঠাবান (আহমদী) পুরুষ ও মহিলারা মুক্তহস্তে এই মসজিদ নির্মাণে আর্থিক ত্যাগস্বীকার করেছেন। শিশু-কিশোররা নিজেদের পকেটখরচ এবং মহিলারা নিজেদের অলংকারাদি দান করে অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করুন। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আর্থিক কুরবানীর পাশাপাশি এই মসজিদ নির্মাণে কায়িক শ্রমের অনেক বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এতে কাদিয়ান এবং জার্মানির খাদেমদের উল্লেখযোগ্য কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সেসব কর্মীকে উত্তম দানে ভূষিত করুন যারা অর্থ ও সময়ের কুরবানী করেছেন আর সবসময় তাদের প্রতি স্বীয় কৃপারাজি ও অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করুন।

এবার এই মসজিদের নকশা বা ডিজাইন সম্পর্কে কিছু বলছি। এর ছাদে ঢাকা বা Covered Area প্রায় ৩৫০০ (সাড়ে তিন হাজার) বর্গমিটার যেখানে প্রায় চার হাজার মুসল্লী নামায পড়তে পারবে। আর এই মসজিদ কমপ্লেক্স সংলগ্ন প্রশস্ত কয়েকটি হলও রয়েছে, সেগুলো যদি ধরা হয় তবে প্রায় দশ হাজার মানুষ এখানে নামায পড়তে পারবে। এই মসজিদে যে কার্পেট বিছানো হয়েছে তা আমেরিকার এক বন্ধু মুনাওয়ার আহমদ সাহেব অনেক কষ্ট করে সেখান থেকে সরবরাহ করেছেন এবং তিনি নিজে পুরো টিম নিয়ে এসে তা বিছিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও প্রতিদান দিন।

আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে এর চেয়েও বড়ো মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করুন,

কিন্তু এখন পর্যন্ত এটিই ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ। অধিকন্তু একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা এ মসজিদে রয়েছে যা ইসলামের রীতিনীতির অনুসারে, ইসলামী নির্মাণ কৌশলকে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর রেখে নির্মাণ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের দোয়া হলো, এই মসজিদ যেন ইউরোপে ইসলামের শান্তি-সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার অনুপম দৃষ্টান্ত তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। আর পবিত্রচেতা এমন মানুষ যেন এখানে আসেন যাদের হৃদয়ে সদা খোদাভীতি ও তাকওয়া বিরাজ করবে, আর তারা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টিকারী হবেন ও তাদের খোদার সাথে নিবিড় সম্পর্ক-বন্ধন রচনাকারী হবেন। এছাড়া আপনারা সেই পুণ্যেরও অংশীদার হোন এবং তার উত্তরাধিকারী হোন যার উল্লেখ হাদীসে এভাবে এসেছে যে, মাহমুদ বিন লাবীব বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) (তাঁর খিলাফতকালে) মসজিদে নববীর পুনঃনির্মাণ এবং সম্প্রসারণের ইচ্ছা পোষণ করলে কিছু মানুষ সেটি অপছন্দ করেন। তারা চাইত, এ মসজিদটি যেন মূল রূপেই বিদ্যমান থাকে। এটি শুনে তিনি (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, **'মান বানা মাসজিদাল্ লিল্লাহি বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল্ জান্নাতি মিসলাহু'**। অর্থাৎ **'আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতে ঠিক তদ্রূপ একটি গৃহ নির্মাণ করবেন'**। (মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব ফযলু বানাইল্ মাসাজিদি ওয়াল্ হাসসি আলাইহা)

আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে এই পুণ্যের ভাগী করুন। কিন্তু একথা স্মরণ রাখবেন, কেবল মসজিদ নির্মাণ করেই (আমাদের) দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় নি, বরং প্রত্যেক আহমদীকে সর্বদা একথা মাথায় রাখা উচিত, এ যুগের ইমামকে মেনে তাঁর হাতে বয়আত করে আমরা সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নির্দেশ মানার এবং সেগুলোকে পূর্ণ করার কারণে পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত করার সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু এটি মনে করবেন না, আমরা সুসংবাদ পেয়ে গেছি আর আগত মসীহ্‌কে মেনেছি তাই আমাদের দায়িত্ব শেষ, আর এ কারণেই আমরা সেসব পুরস্কারের ভাগী হবো। মোটেও না, বরং আমাদেরকে অবিরাম চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করে এই মসজিদগুলোকে আবাদও করতে হবে আর এখান থেকে প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্বের বাণীও বিশ্ববাসীকে দিতে হবে। অনবরত দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনের প্রতি এবং পরবর্তী প্রজন্মের সংশোধনের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে।

আমি যে-ক'টি আয়াত পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা সর্বপ্রথম ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, বান্দার অধিকার প্রদানকারী হবে, যার আশপাশের লোক তার পক্ষ থেকে কোনোভাবে কষ্ট পাবে না বরং কল্যাণমণ্ডিত হবে, নিজ বাড়িতে ও স্ত্রী-সন্তানদের সাথে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক হবে, পুণ্য কাজের আদেশদাতা ও মন্দ কাজ থেকে বারণকারী হবে, কারো শত্রুতাও তাকে ন্যায়বিচার করা থেকে বিরত রাখবে না, তাহলে এমন ব্যক্তি যে ন্যায়বিচার ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের উন্নত মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ করে আল্লাহ্

তা'লার প্রতি বিনত হবে, ধর্মে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকবে, মসজিদে প্রবেশ করতেই আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে তার হৃদয় বিগলিত হবে, ইবাদতের প্রেরণা জাগরূক থাকবে, মসজিদে একবেলা নামায পড়ার পর পরবর্তী ওয়াক্তের অপেক্ষায় থাকবে– তবে আল্লাহ্র প্রাপ্য প্রদানকারী এমন লোকেরা নিশ্চিতরূপে বান্দার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করবে। অতএব আল্লাহ্র ইবাদত এমন লোকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছে যে, তোমরা বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি দাও। আর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ফলে আল্লাহ্র ইবাদত করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে একনিষ্ঠ হয়ে গেলে মৃত্যুর পর তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ অবস্থায় উপস্থিত হবে। এর একটি ব্যাখ্যা এভাবেও করা হয় যে, মাতৃগর্ভে শিশু বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর একটি সুস্থ-সবল সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। যদি কোনো স্তরে সঠিকভাবে বৃদ্ধি না ঘটে তাহলে সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে আর অনেক সময় ডাক্তার স্বয়ং তা নষ্ট করে ফেলে। একইভাবে মৃত্যুর পর আত্মাও বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করবে, তাই সতর্ক হও! মৃত্যুর পর তোমাদের আত্মা আল্লাহ্ তা'লার সকাশে বিকৃত অবস্থায় যেন উপস্থিত না হয়। এ কারণে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ যাচনা করতে থাকো এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে যাও।

প্রথমত, এ আয়াতে এই নির্দেশ রয়েছে যে, হে আল্লাহ্র রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমানরা! তোমরা যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্র খাতিরে ধর্মকে একনিষ্ঠ করতে হবে, অন্যথায় তোমরা ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিপতিত হবে। **দ্বিতীয়ত**, এতে এই ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে, একটি কাল অতিবাহিত হবার পর মুসলমানরা যদি ইসলামের খাঁটি শিক্ষা ভুলে যায় তাহলে তাদের ইসলাম হবে কেবল নাম সর্বস্ব এবং কিছু মানুষ ছাড়া সিংহভাগ মুসলমানই এই শিক্ষা বিস্মৃত হবে। মহানবী (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমার পর বরং কিছুকাল পরেই ইসলামের ওপর এক অন্ধকার ও অমানিশার যুগ নেমে আসবে। একেবারে ঘোর অমানিশার যুগ হবে সেটি, যেভাবে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানরাও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ন্যায় সুপথ ছেড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা মনে করে, ইসলামের ওপর আমাদের চেয়ে বেশি আর কেউ প্রতিষ্ঠিত নয়। এই দাম্ভিক আচরণে তারা এতটাই সীমাতিক্রম করেছে যে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগের ইমামকে চিনতে তারা কেবল অস্বীকারই করছে না বরং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় আগত ইমামের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রুপও করছে, উপহাসের ছলে তাঁর কথা উল্লেখ করে কিংবা নোংরা ভাষা ব্যবহারে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। অতএব এমন লোকদের বা এমন দলের বিপথগামী হওয়া অবধারিত। তারা ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিপতিত হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, **'অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনের অক্ষরসমূহ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সেই যুগের মসজিদগুলো বাহ্যিকভাবে আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হিদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নীচে**

বসবাসরত সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে নৈরাজ্যের উদ্ভব ঘটবে এবং তাদের প্রতিই তা ফিরে যাবে।' (মিশকাত, কিতাবুল ইলম, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩৮; কনযুল উম্মাল, খণ্ড: ০৬, পৃ. ৪৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"ইসলামের বাহ্যিক ও দৈহিক অবস্থায়ও দুর্বলতা এসে গেছে। ইসলামী সাম্রাজ্যের সেই ঐশ্বর্য আর নেই এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দ্বীন'-এর মাঝে যা শেখানো হয়েছিল এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয় না। অভ্যন্তরীণভাবে ইসলাম অনেক দুর্বল হয়ে গেছে এবং বাইরের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা কুকুর এবং শূকরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, ইসলামকে ধ্বংস করা এবং মুসলমানদের বিনাশ ঘটানো। বর্তমানে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর সাহায্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি ছাড়া তাদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়; আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা স্বহস্তে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।"**

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **"ইসলাম যাকে বলা হয়, বর্তমানে তাতে অনেক পার্থক্য এসে গেছে। সবার আচরিত জীবন নোংরামিতে ভরে গেছে এবং 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দ্বীন'-এর মধ্যে যে নিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। খোদার প্রতি বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং খোদা-ভরসা বিলুপ্ত প্রায়। আর এখন খোদা তা'লা নূতনভাবে সেই শক্তি ও বৈশিষ্ট্যকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"**

(আমরা) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ! কেননা সেই পুনরুজ্জীবিতকারী লোকদের মধ্যে আপনারাও অন্তর্ভুক্ত। তাই মসজিদগুলো আবাদ করাটা আপনাদের গুরুদায়িত্ব হয়ে গেছে।

তিনি (আ.) বলেন, **"বর্তমান যুগে লোক-দেখানো, আত্মশ্লাঘা, আত্মঅহংকার, দম্ভ, গর্ব ও অহংবোধ প্রভৃতি হীন অভ্যাস ও হীন বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দ্বীন' ইত্যাদি উত্তম গুণাবলি বলতে যা ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খোদা-নির্ভরতা, চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা এবং এমন সব গুণাবলি বিলুপ্তপ্রায়। এখন খোদা তা'লা আবার সেগুলোর বীজ বপন করতে চাইছেন।"**

তৃতীয়ত, এ আয়াতে আমাদের জন্য একটি সতর্কবাণীও রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলছেন, এখন খোদা তা'লা নবরূপে সেই শক্তি বা বৈশিষ্ট্যগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে চাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমরা যারপরনাই কৃতজ্ঞ, তিনি আমাদেরকে তাঁর সেই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে অংশীদার করেছেন এবং আমরা সেই ইমামকে মেনেছি। কিন্তু আমাদের কর্ম যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রত্যাশানুরূপ না হয় তাহলে (মনে রাখতে হবে) খোদা তা'লা কারো আত্মীয় নন। (এমনটি হলে) অন্য কোনো জাতি এবং অন্য কোনো মানুষ সে স্থান নেবে। উদ্দেশ্য তো অবশ্যই পূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ্, কিন্তু আমরা আবার পিছিয়ে না যাই।

এতে যে সাবধানবাণী রয়েছে তা হলো, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না রাখো এবং ধর্মকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ না করো, তাহলে শয়তান আবার তোমাদের ঘাড়ে না চেপে বসে। এজন্য সর্বদা এস্তেগফারে রত থেকে আল্লাহ্ তা'লার

দরবারে বিনত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ কামনা করতে থাকো। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"সৎকর্ম সম্পাদনের শর্ত হলো নিষ্ঠা। আল্লাহ্ তা'লা যেমনটি বলেছেন, 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দ্বীন'। এই এখলাস বা নিষ্ঠা সেসব লোকের মাঝে থাকে যারা আবদাল অর্থাৎ পরিবর্তিত মানুষ বা পুণ্যবান। এসব লোক অবদাল হয়ে যান অর্থাৎ তারা আর এ জগতের মানুষ থাকেন না। তাদের প্রতিটি কাজে এক নিষ্ঠা ও যোগ্যতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।' তিনি (আ.) বলেন, 'এটি খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি খোদার হয়ে যায় খোদা-ও তার হয়ে যান'।"**

অতএব খোদা তা'লার (প্রিয়ভাজন) হতে হলে এবং খোদাকে আপন করে নিতে হলে আল্লাহ্ তা'লা মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে এবং সেগুলো সর্বদা মেনে চলতে হবে আর সেসব আবদাল বা পরিবর্তিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যারা খোদার নির্দেশকে দৃষ্টিগোচর রাখে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٧﴾

(আয-যারিয়াত: ৫৭)

অর্থাৎ "আর আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।" এরপর তাঁর জন্য ধর্মকে একনিষ্ঠ করে তাঁর ইবাদত করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা বলেন, জিন ও ইনসানকে আমি ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। তবে হ্যাঁ! এই ইবাদত এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অবচিলতার সাথে দণ্ডায়মান থাকা তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসা ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে কেবল একপেশে ভালোবাসা বুঝাচ্ছে না, বরং এর দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের ভালোবাসা বুঝানো হয়েছে; যাতে বজ্রের অগ্নির ন্যায় যা মৃত্যুর পথযাত্রী মানুষের ওপর পতিত হয় এবং যা তখন মানুষের দেহ থেকে নির্গত হয় তা (যেন) শরীয়তের (ওপর আমল-সংক্রান্ত) সকল দুর্বলতাকে জ্বালিয়ে দেয় আর উভয়টি একযোগে পুরো আধ্যাত্মিক সত্তাকে করায়ত্ত করে নেয়।"**

তিনি (আ.) আরো বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।** অতএব এ আয়াতের আলোকে মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো, খোদা তা'লার ইবাদত করা, তাঁর মা'রেফত অর্জন করা এবং সত্যিকার অর্থেই তাঁর হয়ে যাওয়া। এটি স্পষ্ট যে, মানুষ নিজের জীবনের লক্ষ্যে নিজেই নির্ধারণ করবে– এ যোগ্যতা সে রাখে না, কেননা মানুষ নিজের ইচ্ছায় আসে না আর নিজের ইচ্ছায় যাবেও না, বরং সে কেবল এক সৃষ্টি। কাজেই যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সব জীবজন্তুর তুলনায় তাকে উন্নত ও উত্তম শক্তিবৃত্তি দান করেছেন, তিনিই তার জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখন কোনো মানুষ সেই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করুক বা না করুক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা, তাঁকে চেনা এবং তাঁর জন্য বিলীন হয়ে যাওয়া।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "কেননা প্রকৃতিগতভাবে মানুষ খোদার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, যেমনটি বলা হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۝

(আয-যারিয়াত: ৫৭)

এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তার প্রকৃতিতে নিজের জন্য কিছু না কিছু রেখে দিয়েছেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপকরণে সজ্জিত করে তাকে নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, তোমাদের সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য খোদা তা'লা এটি নির্ধারণ করেছেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে। কিন্তু যারা তাদের এই মূল এবং প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যকে পরিত্যাগ করে পশুর ন্যায় কেবল পানাহার ও ঘুমানোকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য মনে করে, তারা খোদা তা'লার কৃপা থেকে বঞ্চিত; আর তাদের বিষয়ে খোদার কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না। দায়িত্বশীল জীবন হলো–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۝

-এর প্রতি ঈমান এনে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া, কেননা মৃত্যুর কোনো ভরসা নেই। তাই তোমরা এটি ভালোভাবে জেনে রাখো, তোমাদেরকে সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'লার একটিই উদ্দেশ্য আর তা হলো, তোমরা তাঁর ইবাদত করো এবং তোমরা তাঁর হয়ে যাও। ইহজগৎ যেন তোমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য না হয়। এজন্য আমি বার বার এ বিষয়টি বর্ণনা করি যে, আমার দৃষ্টিতে কেবল এই একটি বিষয়ই রয়েছে যার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু (পরিতাপের বিষয় হলো) এ থেকেই সে দূরে পড়ে আছে। আমি এটি চাই না যে, তোমরা জাগতিক ব্যাবসাবাণিজ্য পরিত্যাগ করো এবং স্ত্রী-সন্তানকে ছেড়ে কোনো জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও। ইসলাম এগুলোকে বৈধ মনে করে না আর ইসলামের উদ্দেশ্য বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসব্রত নয়। ইসলাম মানুষকে উদ্যমী, চৌকস ও সোচ্চার বানাতে চায়। এজন্যই আমি বলি, তোমরা তোমাদের ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখো। হাদীসে আছে, যার কাছে জমি আছে কিন্তু সে যদি তা কাজে না লাগায় তাহলে সে জিজ্ঞাসিত হবে। কাজেই কেউ যদি এর অর্থ করে যে, জাগতিক ব্যাবসাবাণিজ্য পরিত্যাগ করতে হবে তাহলে সে ভুল করে আর এর অর্থ এটি নয়। বরং মূল কথা হলো, তোমরা যে ব্যাবসাই করো না কেন তা যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় এবং খোদার ইচ্ছার বাইরে গিয়ে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অগ্রগণ্য কোরো না।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৫, সংখ্যা: ২৯, ১০ আগস্ট ১৯০১, পৃ. ২)

মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ হলো, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নফল নামায এবং যিকরে এলাহী করার পদ্ধতি শেখানোর পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমষ্টিগত ইবাদত করার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে সামাজিক শ্রেণিবৈষম্যও দূরীভূত হয়ে যায় এবং ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে।

ইবাদতের পাশাপাশি জাতির শিক্ষাদীক্ষা ও অন্যান্য বিষয়াদির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া

উচিত, যেন ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে আর যেন এই প্রেরণা সঞ্চার করা যায় যে, তোমরা মসজিদে আসো, একে আবাদ করো এবং ধনী-দরিদ্র সবাই মিলে আমার ইবাদত করো। তিনি (আ.) বলেন, **'আমার ইবাদতের জন্য তোমরা যদি এভাবে পাঁচবেলা সমবেত হও তাহলে এর পুণ্যও অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে'**। এজন্য আমরা যারা এ যুগের ইমামের অনুসারী এবং তাঁর শিক্ষা মানার দাবি করি, কেবল মসজিদ নির্মাণ করেই আনন্দিত হলে চলবে না বরং আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হলো, মসজিদগুলো আবাদও করা; অন্যথায় অন্যদের সাথে আমাদের আর পার্থক্য কী? আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এভাবে বিনত হন যেন কোনো আহমদীর প্রতি কেউ অঙ্গুলি তুলতে না পারে যে, এরা মসজিদ খুব সুন্দর বানালেও নামায কমই পড়ে বরং মানুষ যেন একথা বলতে বাধ্য হয় যে, যদি প্রকৃত ইবাদতকারী দেখতে চাও এবং রহমান খোদার এমন বান্দা দেখতে চাও যাদের কাছে শয়তান ভেড়ে না আর যারা খোদার খাতিরে বিশুদ্ধরূপে ধর্মপালন করে তাহলে তোমরা তা প্রত্যেক আহমদী আবালবৃদ্ধবণিতার মাঝে দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করার সামর্থ্য দিন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের এত তাগাদা দিয়েছেন যে, (নির্দেশ হলো) যখনই নামাযের সময় হবে তখন তোমরা এটি দেখবে না যে, ওযূর পানি আছে কিনা, কাপড় পরিষ্কার আছে কিনা কিংবা এমন স্থান আছে কিনা যেখানে তোমরা নামায পড়তে পারো বরং যখনই নামাযের সময় হবে নামায পড়ে নেবে। এমনকি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ এবং একে পবিত্র বানানো হয়েছে। কাজেই, আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তির জন্য যেখানেই নামাযের সময় হবে সেখানেই যেন সে নামায পড়ে নেয়। অতএব প্রত্যেক আহমদীকে এ শিক্ষাই দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **তাকওয়ারূপী সৌন্দর্য নিয়ে মসজিদগুলোতে প্রবেশ করার মাঝেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত**। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে সেসব মহৎ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন ঘটা উচিত, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) নির্দেশ প্রদান করেছেন। একইসাথে বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যত্নবান হবারও নির্দেশ রয়েছে। যেমন- কাপড়চোপড় পরিষ্কার হওয়া উচিত এবং দুর্গন্ধ যেন না আসে। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, রসুন, পিঁয়াজ প্রভৃতি খেয়ে মসজিদে এসো না পাছে পাশে দাঁড়ানো মুমিন ব্যক্তি যে নিমগ্ন চিত্তে নামায পড়তে চায় তার নামাযে ব্যাঘাত ঘটে এবং তার মনোযোগে বাধা আসে বরং মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন, এগুলো খেয়ে মসজিদের কাছেও আসবে না; কেননা যে-সব জিনিসে মানুষের কষ্ট হয় তাতে ফেরেশতাদেরও কষ্ট হয়। তাই কাঁচা রসুন কিংবা পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসা উচিত নয়।

এরপর বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য এবং নামাযে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার জন্য ওযূ করারও নির্দেশ রয়েছে। ওযূ করার ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবার পাশাপাশি মানুষ কিছুটা উদ্যমীও হয়ে ওঠে এবং (নামাযী) একাগ্রতার সাথে নামায পড়ে। বিশেষভাবে জুমুআর দিন গোসল করে (মসজিদে) যাওয়াকে পছন্দ করা হয়েছে। যাহোক, মূল উদ্দেশ্য হলো দৈহিক

পবিত্রতার বিষয়ে যত্নবান থাকলে আত্মিক পবিত্রতার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে আর হৃদয়ে খোদাভীতি ও তাকওয়াও সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি। প্রথম কথা হলো, মসজিদে ব্যক্তিগত কিংবা জাগতিক আলাপচারিতা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কেবল খোদার স্মরণের নিমিত্তে এসব মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে আর এদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

হযরত আমর বিন শোয়াইব (রা.) তাঁর পিতার বরাতে দাদার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, **"মহানবী (সা.) মসজিদের মধ্যে কবিতার আসর বসিয়ে কবিতা পড়তে নিষেধ করেছেন। আর সেখানে বসে কেনাবেচা করতে এবং জুমুআর দিন মসজিদে গোল হয়ে বসে গল্প করতেও (বারণ করেছেন)।"** (তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত)

এরপর হযরত ওয়াসেলাহ্ বিন আসকাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আরো একটি হাদীস রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"তোমরা নিজেদের ছোটো শিশুদের, পাগলদের এবং ক্রয়-বিক্রয় মসজিদ থেকে দূরে রাখো। নিজেদের ঝগড়াবিবাদ ও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা থেকে মসজিদ পবিত্র রাখো। আর মসজিদকে তোমাদের শাস্তি কার্যকর করার স্থল বা তরবারি তাক করার স্থল বানিও না। মসজিদের দরজায় (অর্থাৎ এর নিকটে) ওযূখানা বানাও এমনকি জুমুআর দিনে (কিংবা জনসমাগম হলে) মসজিদে সুগন্ধি ছড়াও।"** (সুনানে ইবনে মাজাহ্)

কাজেই, যে-সব শিশু এখনো বোঝার বয়সে উপনীত হয় নি তাদের মসজিদে নিয়ে আসা উচিত নয়, কেননা তাদের ক্রন্দনে অন্য নামাযীদের ইবাদত বিঘ্নিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'ত একটি শান্তিপূর্ণ জামা'ত এবং আমাদের এখানে বন্দুক তাক করার কথা কল্পনাও করা যায় না। আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কারাগারে লম্বা দাঁড়িধারী এক মৌলবি গোছের মানুষ ছিল। আমি তার সাক্ষাৎকার নিতে আরম্ভ করি যে, তুমি কীভাবে এখানে এলে? সে হত্যা মামলার আসামি ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, এই হত্যাকাণ্ড ঘটল কীভাবে? (সে বলে,) রমযান মাসে ইতিকাফে বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আসে, আমার কাছে বন্দুক ছিল, আমি ফায়ার করে তাকে মেরে ফেলি। ভুলে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম, ভুলে গুলি বেরিয়েছে? কিন্তু তুমি সেখানে বন্দুক কেন রেখেছিলে? মোটকথা, তাদের এই শত্রুতা মসজিদের মধ্যেও চলতে থাকে এবং ইতিকাফে বসেও হত্যা করাকে বৈধ মনে করে।

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে ভ্রমণ করবে তখন সেখানে কিছু পানাহারও করো'**। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই জান্নাতের বাগান বলতে কী বুঝায়? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, **'মসজিদ হলো জান্নাতের বাগান'**। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আর পানাহার বলতে কী বুঝায়? তিনি (সা.) বললেন, **'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর'** পাঠ করা। (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব হাদীসু ফী আসমাইল্লাহিল হুসনা মায়া যিকরিহা তামামা)

মসজিদ হলো জান্নাতের বাগান আর যিকরে এলাহী বা আল্লাহ্‌র স্মরণ বলতে সেখানকার খোরাক বুঝায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে কোনো শহরের সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হলো সেখানকার মসজিদগুলো এবং সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হলো সেখানকার হাট-বাজার।'** (মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব ফাযলুল্ জুলুসি ফী মিসলাহি বা'দাস্ সুবহি ওয়া ফযলুল মাসাজিদ)

কিন্তু বর্তমানে আপনারা লক্ষ করে দেখবেন, অপছন্দনীয় জায়গাতেই মানুষ বেশি বসে আর মসজিদ যা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সর্বাধিক পছন্দনীয় স্থান, সেখানে কম বসা হয় এবং সেদিকে আগ্রহ কম।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে নিজেদের মসজিদসমূহ আবাদ বা নামাযীতে পরিপূর্ণ রাখার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে।

মসজিদে কুরআন পাঠ এবং দরসের বিষয়ে বা (কুরআন হাদীস) পঠন-পাঠন সম্পর্কে হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন– **'কোনো জাতি যখন মসজিদে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ এবং পরস্পর পঠন-পাঠনের জন্য বসে তখন তাদের ওপর প্রশান্তি বর্ষিত হয়। খোদা তা'লার রহমত তাদেরকে আবৃত করে নেয় এবং ফেরেশতারা তাদেরকে নিজেদের ক্রোড়ে আশ্রয় দেয়।'** (সুনান তিরমিযী, কিতাবুল কিরাআত, বাব মা জাআ ইন্নাল্ কুরআনা আনযালা আলা সাবয়াতিন আহরুফিন)

হযরত বুরাদা আল-আসলামী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'অন্ধকারের মধ্যে অনেক দূর থেকে হেঁটে মসজিদে গমনকারীদের কিয়ামত দিবসে পূর্ণ জ্যোতি লাভের সুসংবাদ দাও।'**

অতএব এর অর্থ হলো, এটি বস্তুবাদিতার যুগ আর এ যুগে মসজিদ আবাদকারীরা পূর্ণ জ্যোতি প্রদত্ত হবে আর এতে এ সুসংবাদই দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা যখন কাউকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে তখন তার মুমিন হবার বিষয়ে তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করো। (কেননা) আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'মসজিদকে তারাই আবাদ করে যারা খোদা ও পরকালে বিশ্বাস রাখে'**।" (তিরমিযী, কিতাবুত্ তফসীর, তফসীর সূরা আত-তাওবা)

উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের তার দাদা উরওয়াহ্-র বরাতে বলেন, তার নিকট মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, রসূলে করীম (সা.) আমাদেরকে নিজেদের পাড়ায় মসজিদ নির্মাণের এবং তা উত্তমরূপে নির্মাণের ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিতেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

অতএব মসজিদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অনেক বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)

বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আমার সামনে আমার উম্মতের পুরস্কার বা প্রতিদান উপস্থাপন করা হয়েছে এমনকি কোনো ব্যক্তি মসজিদ থেকে যে খড়কুটো বাইরে ফেলে দেয় তা-ও পুরস্কারের কারণ হয়।"**

মসজিদ পরিষ্কারের জন্য কেউ যদি কোনো খড়কুটাও তুলে বাইরে ফেলে তবে তার জন্যও প্রতিদান বা পুরস্কার লাভ হয়।

এরপর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন।"** (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব তাতহীরুল মাসাজিদি ওয়া তাতঈবুহা)

অতএব এই মসজিদসহ পৃথিবীর যেখানেই আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ রয়েছে সেগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কেবল মসজিদ বানিয়েই সারা, এরপর এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি দৃষ্টি থাকবে না– তা যেন না হয়। বরং এ বিষয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। আর আমাদের মসজিদগুলোর পরিচ্ছন্নতার মান অনেক উন্নত হওয়া উচিত। মহানবী (সা.) কখনো কখনো ময়লা চোখে পড়লে নিজেই তা পরিষ্কার করতেন। কাজেই, জামা'তী ব্যবস্থাপনার এদিকে অনেক বেশি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

অনেক মানুষ এমন রয়েছেন যারা ইমামের অপেক্ষায় একটু বসতে হলে কানাঘুষা করতে শুরু করে দেয় এবং বার বার ঘড়ি দেখতে থাকে। নিম্নোক্ত হাদীসটি তাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"যতক্ষণ তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষা করো ততক্ষণ তোমরা নামাযরত বলে পরিগণ্য হবে আর তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ফেরেশতারা এই দোয়া করতে থাকে যে, হে আল্লাহ্! তুমি একে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্! এ ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করে তুমি এর প্রতি কৃপা করো।"** (তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত, বাব মা জাআ ফীল কুয়ুদি ফীল্ মাসজিদ...)

এ সমাজে বসবাসরত প্রত্যেক মানুষ এর চাকচিক্যে প্রভাবিত হয়। বস্তুবাদিতার প্রতি আকর্ষণ তাকে বার বার আক্রমণ করতে থাকে। কোনো ব্যক্তিকে যেভাবেই হোক কাবু করে খোদার কাছ থেকে দূরে সরানোর জন্য শয়তান নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। অনেক সময় মানুষ বলে, এখন এ কাজটি রয়েছে, পার্থিব এই ছোটো কাজটি করে নেই, এখনো অনেক সময় আছে– নামায পরে পড়ে নেব। আর এভাবে সেই ব্যক্তি নিজের আধ্যাত্মিকতার রক্ষা-প্রাচীরকে দুর্বল করতে থাকে। তা যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন শয়তান আক্রমণ করে তাকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। আবার অনেক সময় এমনও হয়, (সে নিজেকে প্রবোধ দেয় যে) ঠিক আছে, পড়ে নেব এবং কিছুক্ষণ পর পড়ে নেব, পরবর্তীতে দেখা যায়, সেই নামায আর পড়া হয় না কিংবা এত দ্রুত পড়া হয় যেভাবে কোনো বোঝা

মানুষ ঘাড় থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। অতএব এমন অলসতা পরিহার করা উচিত। মুমিনের হৃদয়ে সর্বদা নামাযের চিন্তা থাকা উচিত আর বর্তমান বস্তুজগতে এটিই সবচেয়ে বড়ো জিহাদ।

হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আমি কি তোমাদের সেই কর্ম সম্পর্কে অবগত করব না– যা করার ফলে আল্লাহ্ তা'লা গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?** তিনি (সা.) বলেন, **সেটি হলো, মন না চাইলেও ভালোভাবে ওযূ করা, দীর্ঘ পথ হেঁটে মসজিদে যাওয়া আর একই সাথে এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা আর এটিই হলো রিবাত, এটি হলো রিবাত এবং এরই নাম রিবাত"** (অর্থাৎ সীমান্তে ঘোড়া বেঁধে রাখা অর্থাৎ জিহাদের প্রস্তুতি)। (সুনান আন্ নিসাঈ, কিতাবুত্ তাহারাত, বাব আল আমরু বিইসবাগিল ওযূ)

অতএব প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো, সে যেন নিজের আধ্যাত্মিক সীমান্তের সুরক্ষা করে, কেননা সবাই মিলে যখন এভাবে সীমান্তের সুরক্ষা করবে, মসজিদে আসবে এবং মসজিদসমূহ আবাদ করবে তখন কোনো শত্রু কখনো আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। আর মহানবী (সা.) আমাদেরকে এই সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, যদি এমনটি করো তবে সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে এবং প্রত্যেক শত্রু থেকে বেঁচে থাকবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"বাড়িতে কিংবা বাজারে একা নামায পড়ার চেয়ে জামা'তের সাথে নামায পড়লে পঁচিশগুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ভালোভাবে ওযূ করে এবং কেবল নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, খোদা তা'লা মসজিদে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিদানে একটি করে গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার মর্যাদা একগুণ বৃদ্ধি করেন। মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করে সে সময়ের পুরোটাই নামায বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য ফেরেশতারা এই দোয়া করতে থাকে যে, আল্লাহুম্মাগফির লাহু আল্লাহুম্মারহামহু। এই অবস্থা ততক্ষণ বিরাজ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোনো কাজে কিংবা কথায় ব্যস্ত না হয়ে পড়ে।"** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, বাব আস্ সালাতু ফীল মাসজিদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আমাদের এই মসজিদে যে ব্যক্তি কল্যাণের কথা শেখার কিংবা ভালো কথা জানার অভিপ্রায়ে প্রবেশ করে, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসে, সে সেই ব্যক্তির ন্যায়– যে কিনা এমন জিনিস দেখে, যা হস্তগত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।"** (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ০২, পৃ. ৩৫০, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

মসজিদে এসে নফল নামায পড়াও পছন্দনীয় কাজ। হযরত আবু কাতাদাহ্ আল-আসলামী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মসজিদে আসে তবে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকাত (নফল) নামায পড়ে।'** (বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, বাব ইযা দাখালাল্ মাসজিদি ফালইয়ারকায়া' রাকাতাইন)

হযরত ফাতিমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মসজিদে প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়তেন, আল্লাহ্‌র নামে এবং তাঁর রসূলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করুন অর্থাৎ এটি বলুন যে, **বিসমিল্লাহি ওয়াস্ সালামু আলা রসূলিল্লাহ্** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে (প্রবেশ করছি) এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি শান্তি কামনা করছি। এরপর বলো, **আল্লাহুম্মাগ ফিরলী যুনূবী** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার পাপ ক্ষমা করো। **ওয়াফতাহ্ লী আবওয়াবা রহমাতিকা** অর্থাৎ এবং আমার জন্য তোমার আশিসের দ্বার খুলে দাও। আর মসজিদ থেকে যখন বের হবে তখন এই দোয়া পড়ো, **বিসমিল্লাহি ওয়াস্ সালামু আলা রসূলিল্লাহ্** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি) এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি শান্তি কামনা করছি। এরপর বলো, **আল্লাহুম্মাগ ফিরলী যুনূবী** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার পাপ ক্ষমা করো। **ওয়াফতাহ্ লী আবওয়াবা ফাযলিকা** অর্থাৎ এবং আমার জন্য তোমার ফযল বা কৃপার দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে মসজিদের আদবকায়দা বা শিষ্টাচার সম্পর্কে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা মসজিদে করা বৈধ নয়। (১) মসজিদকে যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়** (অর্থাৎ দূরত্ব কমানোর জন্য এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন)। **(২) মসজিদে যেন অস্ত্র প্রদর্শন করা না হয়। (৩) মসজিদে যেন ধনুক ধরা না হয় এবং তির নিক্ষেপ করাও না হয়। (৪) কাঁচা মাংস নিয়ে মসজিদের ভেতর দিয়ে যেন না যাওয়া হয়** (কেননা এর ফলে ময়লা এবং দুর্গন্ধ উভয়ই ছড়ায়)। **(৫) মসজিদে কারো বিরুদ্ধে যেন হদ** (বা শাস্তির রায়) **শোনানো না হয় এবং কিসাস** (অর্থাৎ হত্যার পরিবর্তে হত্যার) **প্রতিশোধ না নেওয়া হয়। একইভাবে মসজিদকে যেন বাজারে পরিণত করা না হয়** (অর্থাৎ মসজিদে যেন ক্রয়-বিক্রয় করা না হয়)। (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব মা ইয়াকরাহু ফীল মাসাজিদ)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানে ধনবানদের কষ্ট হয়ে থাকে আর অহংকার ও স্বার্থপরতা তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, নামাযের সময় একজন দরিদ্র ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে তার কাছে খারাপ লাগে। তাদেরকে নিজের পাশে বসাতে পারে না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানে ব্যর্থ থাকে, কেননা মসজিদ মূলত দরিদ্রের গৃহ হয়ে থাকে।"** (মলফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৬৮, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন, **"বর্তমানে আমাদের জামা'তের মসজিদের খুবই প্রয়োজন, (কেননা) এটি আল্লাহ্‌র ঘর। যে গ্রামে কিংবা শহরে আমাদের জামা'তের মসজিদ নির্মিত হয়ে গেছে ধরে নাও, সেখানে জামা'তের উন্নতির ভিত রচিত হয়ে গেছে। এমন কোনো গ্রাম কিংবা শহর যদি থাকে যেখানে মুসলমান কম হয় কিংবা মোটেও না থাকে, সেখানে ইসলামের উন্নতি চাইলে একটি মসজিদ নির্মাণ করা উচিত, তাহলে খোদা স্বয়ং সেখানে মুসলমানদের টেনে আনবেন। কিন্তু শর্ত হলো, নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তে যেন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই যেন তা নির্মাণ করা হয়। ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা কোনো দুরভিসন্ধির যেন এতে ভূমিকা না থাকে, কেবল তখনই খোদা তা'লা বরকত দেবেন।**

মসজিদ কারুকার্য খচিত কিংবা পাকা হওয়া আবশ্যক নয় বরং জমি নির্দিষ্ট করে মসজিদের সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। এরপর বাঁশ ও এ জাতীয় কিছু দিয়ে ছাত-ছানি দিয়ে দাও যেন বৃষ্টি ইত্যাদির সময় কষ্ট না হয়। আল্লাহ্ তা'লা কৃত্রিমতা পছন্দ করেন না। মহানবী (সা.)-এর মসজিদ কিছু খেজুরের ডালপালা দিয়ে তৈরি ছিল এবং এভাবেই তা চলে আসছিল। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর যেহেতু পাকা দালানের শখ ছিল তাই তিনি নিজ খিলাফতকালে তা পাকা করেন।" [কেবল এ ধারণা নিয়ে বসে থাকা উচিত নয় যে, কাঁচা ও ছাপরা মসজিদই নির্মাণ করতে হবে বরং পাকা মসজিদও বানানো হয়েছিল। আর আমি পূর্বেও বলেছি, মহানবী (সা.)-এর নির্মিত মসজিদকে হযরত উসমান (রা.) পাকা করেছিলেন।] হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"হযরত উসমান (রা.)-এর যেহেতু পাকা দালানের শখ ছিল তাই তিনি নিজ খিলাফতকালে তা পাকা করেন। আমার মনে হয়, হযরত সুলাইমান (আ.) এবং উসমান (রা.) শব্দের মাঝে ছন্দের মিল থাকার কারণে সম্ভবত তিনি এসব বিষয়ে শখ রাখতেন। যাহোক, জামা'তের নিজস্ব মসজিদ হওয়া উচিত যেখানে জামা'তের ইমাম থাকবেন এবং তিনি ওয়ায-নসীহত করবেন। জামা'তের লোকদের সবার সম্মিলিতভাবে সেখানে বাজামা'ত নামায পড়া উচিত। জামা'ত এবং একতার মাঝে প্রভূত কল্যাণ নিহিত। বিক্ষিপ্তভাবে থাকার ফলে ফাঁটল ও বিভেদ দেখা দেয়। বর্তমান সময়ে ঐক্য ও একতার ভিত অত্যন্ত দৃঢ় করা উচিত এবং নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে এমন ছোটো ছোটো বিষয়াদি উপেক্ষা করা উচিত।"** (আল-বদর, ২৪ আগস্ট ১৯০৪; মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৯৩)

তিনি (আ.) আরো বলেন, **"মসজিদের আসল সৌন্দর্য অট্টালিকা বা ভবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং সেই নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে। নতুবা দেখো! এসব মসজিদ বিরান পড়ে রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছোটো ছিল। খেজুরের ডালপালা দিয়ে ছাদ বানানো হয়েছিল, যা থেকে বর্ষার সময় পানি পড়ত। অতএব মসজিদের সৌন্দর্য মুসল্লীদের ওপর নির্ভর করে। মহানবী (সা.)-এর যুগে জগৎপূজারিরা একটি মসজিদ বানিয়েছিল। খোদা তা'লার নির্দেশে তা ভেঙে ফেলা হয়। সেই মসজিদের নাম ছিল, 'মসজিদে যিরার' অর্থাৎ ক্ষতিকারক ও কষ্টদায়ক মসজিদ। সেই মসজিদ ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। মসজিদের ব্যাপারে নির্দেশ হলো, তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে যেন (তা) নির্মাণ করা হয়।"** (আল-বদর, ৩১ অক্টোবর ১৯০৫; মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৪৯১)

আল্লাহ্ তা'লা সব আহমদীকে এই সামর্থ্য দিন, আমাদের নির্মিত প্রতিটি মসজিদ যেন খাঁটি তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় আর আমরা যেন সদা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হই। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হই এবং নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা তাঁর সমীপেই নিবেদন করি আর সেই খোদাকে সর্বশক্তিমান এবং সকল শক্তির আঁধার মনে করে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে যাই। তাঁর আদেশ ও পছন্দ অনুযায়ী যেন মসজিদসমূহ আবাদ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই মসজিদসহ যেখানেই জামা'তের মসজিদ রয়েছে তা যেন স্থান সংকুলানের দিক থেকে

ছোটো হয়ে যায় এবং নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। স্মরণ রাখবেন! বর্তমানে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বিজয় এই মসজিদসমূহ আবাদ করার সাথেই সম্পৃক্ত। অতএব হে আহমদীরা! ওঠো এবং মসজিদের দিকে ছুটে আসো আর সেগুলো আবাদ করো, যেন ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খুব দ্রুত ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বিজয়ের দিন তোমরা দেখতে পারো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই সামর্থ্য এবং এই দিন দেখার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

(২৫)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১০ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ১০ ইখা, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

গত জুমুআর পূর্বের জুমুআয় প্রদত্ত খুতবায় আমি হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে বয়আতের সেই দশটি শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার নিয়ে প্রবেশের পর আহমদীদের মধ্যে কী অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে– সে সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করেছিলাম। এখন একই বিষয়বস্তু আরো সম্প্রসারিত করছি।

পঞ্চম শর্তে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, "সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা; এককথায় পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন কখনো খোদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না। অবশ্যই তাঁর কৃপা যাচনায় রত থাকবে, তবে এই অঙ্গীকার সাপেক্ষে যে, সদা তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকবে।" অতএব এর কয়েকটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরছি।

সর্বপ্রথম থাকছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। ১৯০৫ সনের আগস্ট মাসে তাঁর (রা.) পুত্র সাহেবযাদা আব্দুল কাইয়্যুম হাম জ্বরে কয়েক দিন আক্রান্ত থেকে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র দু'বছর। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা হলো, তিনি মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুকরণে শিশু বাচ্চাটিকে চুমু খান এরপর তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় আর তিনি বলেন, "আমি কিছুটা শঙ্কিত তাই আমি শিশুসন্তানের মুখ খুলেছি"– বিষয়টি এমন নয় বরং মহানবী (সা.)-এর পুত্র ইবরাহীম যখন মারা যান, মহানবী (সা.) তখন তার কপালে চুমু খেয়েছিলেন আর তাঁরও (সা.) অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল এবং তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করেছেন আর বলেছেন, স্বল্প দিনের বিচ্ছেদও কষ্টকর তবুও আমরা খোদা তা'লার অনুগ্রহে সন্তুষ্ট। সেই একই সুন্নত পালন করার জন্য আমিও তার মুখের কাপড় খুলেছি আর চুমু দিয়েছি। এটা খোদা তা'লারই অনুগ্রহ। আর সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো, তিনি আমাকে মহানবী (সা.)-এর একটি সুন্নত পালনের সৌভাগ্য দিয়েছেন।

এটি অবশ্য সেই মহান ব্যক্তির ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত যার সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন–

'চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক যে উম্মত নূরে দীঁ বূদে
হামি বূদে আগার হার দিল পুর আয নূরে ইয়াকীন বুদে'

অর্থাৎ কত ভালো হতো, উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নূরউদ্দীন হয়ে যেত! তবে এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন প্রতিটি অন্তর দৃঢ়বিশ্বাসের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আরেকটি দৃষ্টান্ত মুকাররম হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) বলেন, "আমাদের এক ছোটো ভাই স্নেহের চৌধুরী শুকরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)– যে স্নেহের মরহুম চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের বড়ো ছিল, যার নাম ছিল হামীদুল্লাহ্ খান। ৮/৯ বছর বয়সে কয়েকদিন রোগ ভোগ করে মারা যায়, ফজরের সময় তার মৃত্যু হয়। বাবা সারা রাত তার সেবাশুশ্রূষায় নিয়োজিত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর, বাবা তার জানাযা, দাফন-কাফন ইত্যাদি সম্পন্ন করে আদালত খোলার পর যথারীতি নিজের কর্মস্থলে বা আদালতে যোগদান করেন। মক্কেলদের মধ্যেও কেউ বুঝতে পারে নি আর আদালতের কোনো কর্মকর্তা বা তার সহকর্মীদের মাঝেও কেউ আঁচ করতে পারে নি যে, তিনি তার কলিজার এক টুকরোকে মাটিতে সমাহিত করে মনিবের সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য যথারীতি কোমর বেঁধে উপস্থিত হয়েছেন।" (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ১১, পৃ. ১৬৫-১৬৬)

হযরত কাযী জিয়াউদ্দীন সাহেব (রা.) লিপিবদ্ধ করেছেন, একদিকে তার স্ত্রী আর তিন সন্তানের ইন্তেকাল হয় আর অন্য দিকে বিরুদ্ধবাদীদের হই-হট্টগোল ছিল চরমে। সম্মানহানী করা আর অর্থসম্পদের ক্ষতি করার কোনো প্রচেষ্টাই তারা হাতছাড়া করে নি। বাসস্থানে সিঁদ কাটার মামলাও করা হয়। যাবতীয় সমস্যা একসাথে সামনে রাখলে খুব ভালোভাবেই বোঝা যেতে পারে যে, এ অধম লেখকের অন্তরাত্মা কত ভয়াবহ ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত ছিল। এ সবই ছিল ঐশী বিপদাবলি ও সংকটের প্রকাশ, যে সম্পর্কে হুযূর (আ.) আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন। এই সংকটকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ কৃপা ও ভালোবাসার টানে সান্ত্বনামূলক একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই পত্রও এক ভবিষ্যদ্বাণী-সংবলিত ছিল যা পূর্ণ হয়েছে আর এখনও পূর্ণতা লাভ করে চলছে। হুযূর (আ.) লিখেছিলেন, সত্যিকার অর্থেই আপনার ওপর কঠিন পরীক্ষা আপতিত হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার রীতি, উদ্দেশ্য হলো, যেন তিনি তাঁর অবিচল বান্দাদের ঈমানের দৃঢ়তা লোকদের নিকট প্রকাশ করে দেন আর সেই সাথে ধৈর্যধারণের প্রতিদানে বড়ো বড়ো পুরস্কারে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা এই যাবতীয় সংকট থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি দেবেন। শত্রুরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে যেমনটা হয়েছিল সাহাবীদের (রা.) যুগে, খোদা তা'লা তাঁদের (সাহাবীদের) 'ডুবন্ত তরী' তীরে ভিড়িয়েছেন। এ ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটবে। তাদের অভিশাপ তাদের বিরুদ্ধেই বর্তাবে। অশুভ পরিণাম শেষ পর্যন্ত তাদের ওপরই বর্তাবে।

শতবার আলহামদুলিল্লাহ্, কেননা হুযূর (আ.)-এর দোয়াতে এমনটাই হয়েছে। এই অধম সর্বাবস্থায় অবিচলতা ও ধৈর্যে সবসময় সম্মুখ পানেই এগিয়েছে। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০৬, পৃ. ১২-১৩)

হযরত মৌলবি বুরহানুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর অনুপম এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছি। প্রাথমিক যুগে সিয়ালকোটে অবস্থানকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার ভাষণ দেবার জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছিলেন আর অন্যান্য সদস্যরাও হুযূরের সাথে ছিলেন। গলি পথে হেঁটে যাবার সময় ওপর থেকে কেউ দুষ্টামি করে টুকরিপূর্ণ এক গাদা ছাই ছুড়ে ফেলে। হুযূর (আ.) আল্লাহ্র অনুগ্রহে এ থেকে বেঁচে যান। কেননা তিনি রাস্তা

পার হয়ে গিয়েছিলেন। তবে টুকরির ময়লা গিয়ে পড়ে শ্রদ্ধেয় পিতার মাথার ওপর (এই বিবরণ তার পুত্র দিচ্ছেন)। এরপর কী হলো? তিনি তো এক বৃদ্ধ মানুষ, সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত, মানুষের জন্য এটা এক তামাশায় পরিণত হলো। যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার প্রেমিকসুলভ ভালোবাসা ছিল। অতএব এরপর কী ঘটল দেখুন! সে স্থানেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন আর একটি বিশেষ ভাবাবেগপূর্ণ অবস্থা তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে এবং একান্ত উৎফুল্লতার সাথে বলেন, "পা মাইয়ে পা, পা মাইয়ে পা"। অর্থাৎ নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে থাকেন, এখানে ঢালো! এখানে ফেলো। তিনি বলতেন, আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই কল্যাণে আমি এই পুরস্কার পেয়েছি।

অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত সাহেব (আ.) যখন সিয়ালকোট থেকে ফেরত আসেন, সেবকরা তাঁকে (আ.) গাড়িতে তুলে দেবার পর নিজেদের বাড়ি ফিরছিল। কোনো কারণে তিনি (বর্ণনাকারীর বাবা) পেছনে একা থেকে গেলেন, বিরুদ্ধবাদীরা তাকে ধরে ফেলে আর তার সাথে অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণ করে। এমনকি তাঁর মুখে গোবর দিয়ে দেয়। শ্রদ্ধেয় বাবা এই লাঞ্ছনার মাঝে এবং এমন দুঃখে সুখ বোধ করতেন আর বার বার বলতেন "বুরহানেয়া এ নে'মাতা কিথ্থোঁ" অর্থাৎ হে বুরহানুদ্দীন! এই পুরস্কার (তুমি) কোথায় পাবে! অর্থাৎ ধর্মের কারণে প্রদত্ত দুঃখ, দুঃখ নয় এটা তো সৌভাগ্যজনক প্রাপ্তি। (মাসিক আনসারুল্লাহ, রাবওয়া, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১৪-১৫)

হযরত মৌলবি বুরহানুদ্দীন সাহেব (রা.) সম্পর্কে হযরত মৌলবি আব্দুল মুগনী সাহেব (অর্থাৎ তার পুত্র) লিখেছেন, "আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, অভাব-ক্লিষ্টতার ঐ দিনগুলোতে আমরা গৃহবাসীরা মাসের পর মাস কখনো 'ঘি'-এর চেহারাও দেখতাম না। জ্বালানি কেনার পরিবর্তে শিশম বৃক্ষের ঝরে পড়া শুকনো পাতা চুলায় জ্বালাতাম। কিন্তু শুকনো পাতায় জ্বালানো উনুনে খাবার রান্না হতো না। এজন্য প্রথমে ডাল ভেজে নেওয়া হতো এরপর সেগুলো পিষে নিয়ে হাড়িতে পানি, লবন, মরিচ মিশিয়ে তা চুলায় চাপিয়ে নীচে পাতা জ্বালিয়ে দিত। পানি ফুটতে শুরু করলে ভুনা ও পিষা ডাল এতে ঢেলে দিত। এটাই ছিল আমাদের তরকারি যা দিয়ে আমরা রুটি খেতাম।

সাধারণত জোয়ার, বাজরা ও গমের রুটি খেতাম, কখনো সখনো অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে ঘি এর পরিবর্তে তিলের তেল ব্যবহার করা হতো। শাকের পরিবর্তে গাছের কচি কুঁড়ি রান্না করে খাওয়া হতো। জমকালো পোশাক ছিল ভূস্বামীদের, মৌলবিদের জন্য নয়। বলা হয়ে থাকে, হুযূর (আ.)-এর সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতপক্ষেই বাবার মাঝে এক অসাধারণ প্রেম-ভালোবাসা আর আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আর সেই প্রেমানুরাগ আর আত্মবিলীনতার কারণে তার (পিতার) নিজের আরাম-আয়েশ আর খাবার-দাবারের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ধ্যান ছিল একটাই, যে প্রেমানল তার অভ্যন্তরে ছিল, সেই ঐশী প্রেম রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেমানুরাগের আগুন মানুষের অন্তরে জ্বালিয়ে দিই। সর্বদাই এই চিন্তা-ভাবনা এই উদ্দীপনা, এই প্রেম আর এই উৎকণ্ঠা, আর এই প্রচেষ্টা ছিল– 'আহমদীয়াতের বিস্তার কীভাবে ঘটানো যায়'।

না খাদ্যের, না পানীয়ের আর না কাপড়চোপড়ের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল। আমি এবং আমার মা, তখন কীভাবে যে দিনাতিপাত করেছি তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। এতো অভাব-অনটন ও দৈন্যতা সত্ত্বেও আত্মমর্যাদা, ধৈর্য ও দৃঢ়তার এক পাহাড় ছিলেন। আর ধর্মীয় বিষয়াদিতে এমন আত্মাভিমানী ছিলেন যে, কোনো লোভ-লালসা বা কোনো ধরনের বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার এমন কোনো সম্পর্ক মাঝখানে বাদ সাধতে পারে নি, আলহামদুলিল্লাহ্, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্! সব প্রশংসা আল্লাহ্র, আবারো প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই। আর আমরাও এমন পরিবেশে বেড়ে উঠেছি যে, ইহজগৎ ও এর সবকিছু আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ। আর জগতের প্রতি এই ঔদাসীন্য দেখে শেষ পর্যন্ত লোকেরা বলা শুরু করে দেয় যে, মির্যা সাহেব (আ.) মৌলবি সাহেবকে মাসিক ভাতা দেন"। (মাসিক আনসারুল্লাহ্, রাবওয়া, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১১-১২)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত নুসরত জাহাঁ বেগম (রা.)-এর ধৈর্যের দৃষ্টান্ত এমনই, যার তুলনা পাওয়া ভার। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) দুনিয়াদার নারীদের ন্যায় অযথা কান্নাকাটি করা এবং অধৈর্যপূর্ণ কথাবার্তা উচ্চারণ করার পরিবর্তে কেবল আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সিজদাপ্রণত হয়ে অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে ও বিনয়ের সাথে দোয়া যাচনা করার পুণ্যময় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। শেষ সময়ে যখন সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হয় আর হুযূর (আ.)-এর পবিত্রাত্মা উত্থিত হয়ে নিজ পবিত্রতম প্রকৃত প্রেমাস্পদ সত্তার সমীপে উপস্থিত হয়ে যায় তখন হযরত উম্মুল মু'মিনীন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে নিশ্চুপ হয়ে যান। কোনো ধরনের হা-হুতাশ করেন নি। অন্দর মহলে কয়েকজন মহিলা কান্নাকাটি করতে শুরু করলে তিনি (রাযিআল্লাহু আনহা) ঐ মহিলাদেরকে জোরে ধমক দিয়ে বলেন, আমার তো স্বামী ছিলেন, আমি কাঁদছি না, তবে তোমরা কান্নাকাটি করছ কেন? যে নারী প্রতিপালিত হয়েছেন ঐশ্বর্যের মাঝে আর যার এমন এক আধ্যাত্মিক বাদশা ও পরম মূল্যায়নকারী স্বামীবিয়োগ ঘটেছে, তার পক্ষ থেকে এমন ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রকাশিত হওয়া একটি নিদর্শন বইকি। (তারীখে আহমদীয়াত, খণ্ড: ০২, পৃ. ৫৪৭)

আবার সন্তানদেরকেও এ উপদেশই দিয়েছেন, "এটা ভেবো না, তোমাদের বাবা তোমাদের জন্য কিছুই রেখে যান নি বরং তিনি দোয়ার এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ে যা তোমাদের কাজে আসতেই থাকবে।"

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) চাইতেন, তাঁর (আ.) জামা'তে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলির মান্যকারী হোক, অথবা নিদেনপক্ষে আমল বা অনুশীলনের চেষ্টা করুক। কেউ যদি কোনো একটি হুকুমও মান্য না করে, তবে তিনি (আ.) বলেছেন, আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি (আ.) চাইতেন, তাঁর অনুসারীরা জাগতিক কুপ্রথার ঊর্ধ্বে থাকবে, পার্থিব লোভ-লালসা আর নিরর্থক কাজকর্ম থেকে মুক্ত থাকবে। আর সেসব নির্দেশ প্রতিপালনে প্রচেষ্টাকারী হবে যার নির্দেশ খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) প্রদান করেছেন। খোদার রসূল (সা.)-ও সেই নির্দেশই

দিয়েছেন যা খোদার বাণী পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করা হয়েছে। এজন্যই তো হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে নিবেদন করল, আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর জীবনাচার প্রসঙ্গে অবহিত করুন। তখন তিনি (রা.) বলেন, কেন? তুমি কি কুরআন শরীফ পাঠ করো না! পবিত্র কুরআনে যে জীবনাচার বর্ণিত হয়েছে, সেটাই মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত। এজন্যই হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমি তো আমার নেতা ও মনিবের অনুবর্তিতা করি আর পবিত্র কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ প্রতিপালন করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান করি, তোমরাও যদি এমনই অনুসরণ করতে চেষ্টা করো তাহলে তোমরা আমার জামা'তভুক্ত বলে বিবেচিত হবে, আর বয়আত গ্রহণ করার পর সেই দৃষ্টান্তই জামা'ত প্রদর্শন করে চলেছে।

সর্বপ্রথম একজন মহিলার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি, তিনি ছিলেন হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-এর মা। তাঁর ভাগ্নে চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেছেন, তিনি চৌধুরী সাহেবকে বলেছেন আর চৌধুরী সাহেব (রা.) একথা লিখেছেন, আমার শ্রদ্ধেয় মায়ের কদাচার ও কুপ্রথার প্রতি কত বেশি ঘৃণা ছিল তা একটি ঘটনা দ্বারা এর ধারণা লাভ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, আমার বিয়ের সময়ের ঘটনা (চৌধুরী বশীর সাহেবের বর্ণনা), বিয়ের পর আমাকে মেয়ে মহলে ডাকা হয়, আমি দেখি গ্রামাঞ্চলের প্রথা অনুযায়ী দুটি আসন মুখোমুখি করে পাতা রয়েছে আর আমার কাছে আশা করা হচ্ছে, এক আসনে বসব আমি আর অপরটিতে কনেকে বসানো হবে। এরপর প্রথাগত কিছু রীতিনীতি পালন করা হবে। পাঞ্জাবি ভাষায় যাকে বলা হয়, 'বের অওড় ঘোড়ী খেলনা।' আমার মনে ভয় ঢুকে গেল, কিন্তু আমি ভাবলাম এই সময়ে মহিলাদের সাথে বিতর্কে জড়ানো বা জিদ ধরে থাকা ঠিক হবে না। তাই আমি আমার জন্য প্রস্তুতকৃত সেই আসনে তো বসে পড়লাম আর সেই প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের জন্য যে-সব বস্তু প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেদিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। এটুকু করতেই মামি সাহেবা (চৌধুরী সাহেবের মা) আমার হাতের কবজি দৃঢ়ভাবে ধরে পেছনে সরিয়ে দেন আর বলেন, ভাগনে! এমনটি করবে না, এটা তো শিরক। এতে আমার সাহস বৃদ্ধি পায় আর নিজ হাতে সেসব জিনিস এলোমেলো করে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম আর বললাম, 'আমি এসব কদাচারে জড়াবো না'। আর এভাবে আমি এসব থেকে মুক্তি পাই।

মহিলাদের এসব বিষয়ে এখনো সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত, কেবল নিজস্ব এলাকার বা দেশীয় আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণ করবেন না, বরং যেখানেই এমন কুপ্রথা চোখে পড়ে আর তাতে যৎসামান্য শিরকও যদি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত। সব আহমদী নারী এই প্রেরণার সাথে নিজেদের আর নিজ বংশধরদের তরবিয়ত করবেন, আল্লাহ্‌র কাছে এ দোয়াই আমার থাকবে। আমাদের দেশে, পাকিস্তান, ভারত ইত্যাদি দেশের মুসলমানদের মধ্যেও এ কুপ্রথা রয়েছে যে, মেয়েদেরকে সম্পত্তির প্রাপ্য পুরো অংশ দেওয়া হয় না। পুরো অংশ তো দূরের কথা, মোটেই দেয় না, বিশেষভাবে গ্রামের লোকেরা, কৃষিজমির মালিকরা। চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের পরিবারে এর একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। চৌধুরী সাহেব লেখেন, আমার মরহুমা

বোনকে সেই যুগের প্রথা অনুযায়ী বিবাহকালে পিতাজি অঢেল উপঢৌকন দেন আর পরবর্তীতে তিনি এই ওসিয়্যতও করেন যে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যেন ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ভাগবণ্টন করা হয়, অর্থাৎ পুত্র-কন্যা উভয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। অতএব তদনুযায়ী তার মৃত্যুর পর কন্যাকেও শরীয়ত মোতাবেক প্রাপ্য অংশ যথারীতি দেওয়া হয়েছে।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৯৬ সনে জলন্ধর সফরে যান। হুযূর (আ.)-এর অবস্থান স্থল ছিল ওপরের তলায়। কোনো মহিলা গৃহকর্মী ঘরে হুক্কা রেখে কাজে বেরিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে হুক্কা মাদুরে পড়ে গেলে মাদুরের কিছু অংশ পুড়ে যায়। নামায শেষে সে আগুন চোখে পড়ে এবং নিভিয়ে দেওয়া হয়। এতে হুযূর (আ.) হুক্কা পানকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন আর হুক্কা পানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন। নীচে অবস্থানরত আহমদীদের কাছে এই খবর পৌঁছায়, যাদের বেশ কয়েকজন হুক্কা পান করত আর তাদের হুক্কাও ঘরেই রাখা ছিল। তারা হুযূরের অসন্তুষ্টির কথা যখন জানল তখন সব হুক্কা পানকারীরা হুক্কা ভেঙে ফেলে ও হুক্কা পান করা পরিত্যাগ করে। সেদিন থেকে জামা'তের সদস্যরা জানতে পেরেছে যে, হুযূর (আ.) হুক্কা অপছন্দ করেন। এতে অনেক দৃঢ়প্রত্যয়ী আহমদী তাৎক্ষণিকভাবে হুক্কা সেবন বর্জন করেন। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ১০, পৃ. ১৫৭)

মির্যা আহমদ বেগ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একবার আমার মামা মির্যা গোলামুল্লাহ্ সাহেবকে বলেন, মির্যা সাহেব! বন্ধুদেরকে হুক্কা সেবন পরিত্যাগ করার উপদেশ দিন। মামু সাহেব নিজেই হুক্কা পান করতেন, তিনি হুযূরকে আশ্বস্ত করেন, খুবই ভালো কথা হুযূর। ঘরে এসে নিজের যে হুক্কাটি দেয়ালের সাথে হেলান দেওয়া অবস্থায় রাখা ছিল তা নিজ হাতে ভেঙে ফেলেন। মামিজান ভাবলেন, সম্ভবত হুক্কা আজ হয়ত বাইরে রোদে পড়ে ছিল, এ কারণে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশে এই ঘটনা। কিন্তু মামুজান যখন কাউকে কিছুই বললেন না তখন মামি সাহেবা জিজ্ঞাসা করলেন, আজ হুক্কার প্রতি এই অসন্তোষ কেন? উত্তরে বললেন, আজ আমাকে হযরত সাহেব বলেছেন, 'লোকদেরকে হুক্কা না পান করার উপদেশ দিন' অথচ আমি নিজেই তো হুক্কা পান করি, তাই প্রথমে আমি নিজের হুক্কাটি ভাঙলাম। মামুজান আজীবন আর কখনো হুক্কায় হাত লাগান নি আর অন্যদেরকেও হুক্কা ছাড়ার উপদেশ দিতেন। (সওয়ানে ফযলে ওমর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৩৪)

এখনো কারো কারো হুক্কাপানের এই বদঅভ্যাস, ধূমপান হিসেবে (সিগারেট খাওয়া) চালু আছে। অতএব যারা ধূমপায়ী, তাদের ধূমপান ছেড়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। কেননা বিশেষভাবে অল্প বয়সে ধূমপানের অভ্যাস যার রয়েছে পরবর্তীতে সিগারেট পানের কারণে তা নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এতে নেশাদ্রব্য ও মাদক জাতীয় দ্রব্যাদি মিশিয়ে পান করা হয়ে থাকে। অতএব এটি দাজ্জাল কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া যুবসমাজ ধ্বংসকারী এক পদক্ষেপ। আর দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোও এই অভিশাপের শিকার। যাহোক, আমাদের যুবকদের ধূমপান পরিহার করার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুন্সি বরকত আলী খান সাহেব

শিমলায় চাকুরি করতেন। আহমদী হবার পূর্বে তিনি একটি লটারি ধরেছিলেন, আর সেই লটারিতে তার ভাগে সাড়ে সাত হাজার রুপি আসে (সে যুগে)। তিনি হুযূর (আ.)-এর কাছে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, হুযূর এটিকে জুয়া আখ্যা দেন এবং বলেন, এ থেকে নিজের প্রয়োজনে এক পয়সাও ব্যয় করবে না। হযরত মুন্সি সাহেব লটারিতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দরিদ্র-মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেন। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৩)

আর সেই একই লটারির প্রথা আজকাল এখানে ইউরোপে ও (বৃহত্তর) পাশ্চাত্যেও প্রচলিত। যারা লটারি ধরে আর এতে জিতে টাকা-কড়ি পেয়ে যায় তা অবশ্যই তাদের জন্য ঠিক সেভাবে বৈধ নয় বরং নিষিদ্ধ; যেমনটা জুয়া খেলায় জেতা অর্থকড়ি নিষিদ্ধ (তথা হারাম)। প্রথমত লটারির টিকেট ক্রয় করা থেকেই বিরত থাকা উচিত, দৈবক্রমে কারো লটারি লেগে গেলেও নিজের জন্য তা ব্যয় হওয়া সমীচীন নয়।

এখানকার এক ঘটনা, আপনাদের দেশ ইংল্যান্ডের মোহতরম বশীর অর্চাড সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে। আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর নিজের জীবনে তিনি পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করেন আর এরপরে নিজের জীবনও উৎসর্গ করেন। ১৯৪৪ সালে আহমদী হন আর কাদিয়ানে কিছুকাল ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। আমি যেমনটি বলেছি, তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আর এই উৎসর্গের পর তার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। খোদার ইবাদতে এবং দোয়ার প্রতি সীমাহীন আগ্রহ-উদ্দীপনা জন্মেছে। কাদিয়ানে অবস্থানকালে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের প্রথম যে ফল লাভ হয়েছে তা হলো, মদের নেশা পরিত্যাগ করা। তিনি অধিক পরিমাণে মদের নেশায় আসক্ত ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে প্রথমে তিনি জরুরি ভিত্তিতে মদপান করা পরিত্যাগ করেন। জুয়া খেলা আর মদ পান করা ছেড়ে দেন। ঐ উভয় অপকর্ম না করার শপথ করে চিরকালের জন্য তা বর্জন করেন। (আল-ফযল, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৮; আযীম যিন্দেগী, পৃ. ৮-৯)

এ যুগে, সম্প্রতি মাত্র কয়েক বছর পূর্বে কয়েকজন আহমদী এখানেও, জার্মানি ইত্যাদি দেশে এবং অন্যান্য দেশেও এমন সব ব্যাবসাবাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল, যেমন- রেস্টুরেন্ট, হোটেল, পানশালা ইত্যাদিতে মদের বেচাকেনা করত। হাদীস অনুযায়ী মদ প্রস্তুত করা, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রেতা, মদ মজুদ করে রাখা, মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা সবাই জাহান্নামী। এজন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ঘোষণা দিয়েছিলেন, আহমদী যে-ই এই ব্যাবসার সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত আছে, তাদের অতি শীঘ্র এ ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্টতা পরিত্যাগ করা উচিত, নইলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ খলীফা (রাহে.) নিজেই বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বৃহৎ সংখ্যা এ ব্যাবসা পরিত্যাগ করেছে। আর তাদের অনেককে খোদা তা'লাই অতি শীঘ্র খুবই ভালো ব্যাবসা বা কর্মসংস্থান প্রদান করেছেন, আবার কাউকে কাউকে আল্লাহ্ তা'লা পরীক্ষাতেও ফেলেছেন আর তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, তবুও তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল আছেন, তাদের কেউই আর এই নোংরা ব্যবসায় হাত লাগানোর চেষ্টা করে নি।

অমৃতসরের অআহমদী এক ব্যক্তি মিয়াঁ মোহাম্মদ আসলাম সাহেব ১৯১৩ সনের মার্চ

মাসে কাদিয়ান আসেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "মৌলবি নূরুদ্দীন সাহেব মির্যা সাহেবের খলীফা হবার কারণে এই সময় আহমদী জামা'তের সর্বজন গৃহীত নেতা। দু'দিন ধরে তাঁর তরবিয়তমূলক বৈঠকে, পবিত্র কুরআনের দরসে উপস্থিত থেকে তাঁর কাজকর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি, অত্যন্ত পবিত্রচেতা আর একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ধর্মীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি। কেননা মৌলবি সাহেবের কর্মপন্থা লোক-দেখানো আর কপটতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র এবং তাঁর হৃদয়-দর্পণে ইসলামের সত্যতার এক অসাধারণ উচ্ছ্বাস-আবেগ বিরাজমান, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের তফসীর করার মাধ্যমে যা ইসলামী তত্ত্বজ্ঞানের স্বচ্ছ ঝরনাধারার আদলে সর্বদাই তাঁর অকপট-অকৃত্রিম হৃদয় থেকে ক্রমাগত ধারায় উৎসারিত হয়ে একত্ববাদের জন্য একাগ্রতা ও পিপাসা রাখে এমন লোকদের পরিতৃপ্ত করে চলেছে।

প্রকৃত ইসলাম যদি পবিত্র কুরআনই হয়ে থাকে তাহলে কুরআন মজীদের প্রতি বিশ্বস্ততাপূর্ণ ভালোবাসা যেভাবে সম্মানিত মৌলবি সাহেবের মাঝে আমি দেখেছি তা আর কারো মাঝেই দেখি নি। এমন নয় যে, অনুকরণপ্রিয়তায় তিনি এমনটি করতে বাধ্য হয়েছেন বরং তিনি এক বিখ্যাত দার্শনিক আর একান্তই গভীর সমালোচনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে তিনি কুরআন-প্রেমে মত্ত। কেননা পবিত্র কুরআনের যে অসাধারণ দর্শনভিত্তিক তফসীর আমি তার দরসে শুনেছি, সম্ভবত এ যুগে পৃথিবীর গুটি কয়েক মানুষ এমন তফসীর করার যোগ্যতা রাখে। (বদর, ১৩ মার্চ ১৯১৩, হায়াতে নূর, পৃ. ৬১১-৬১২)

হযরত ডাক্তার আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেবের পক্ষ থেকে নিজ সন্তানদেরকে দেওয়া একটি উপদেশ লক্ষণীয়। তিনি (সন্তানদের) বলেন, "কুরআন শরীফকে নিজেদের জীবনের নীতি ও কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ কর। আর রসূল (সা.)-এর সুন্নতের আনুগত্য করো এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উন্নতি আর ইসলাম প্রচারে সর্বদা নিয়োজিত থাকো। আর নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও এই শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রস্তুত করো।" (সীরাত সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব, পৃ. ১৯৩)

হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেব, হযরত মালেক মওলা বখশ সাহেব (রা.) সম্পর্কে লিখেছেন, পবিত্র কুরআনের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ছিল। অসুস্থতা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান আর গূঢ় রহস্য সম্পর্কে জানা ও শোনার ব্যবস্থাদিতে তিনি রীতিমতো অংশ নিতেন। এমনই একবার তিনি এক নাগাড়ে কয়েক মাস পর্যন্ত শীতকালে ফজরের নামায দারুল ফযল মহল্লা থেকে দারুর রহমতে এসে পড়তেন, যেন মোকাররম মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.)-এর কুরআনের দরসে যোগ দিয়ে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বভাণ্ডার থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারেন। আবার রমযানে মসজিদে আকসায় কুরআন মজীদের যে দরস দেওয়া হতো তাতেও তিনি সাগ্রহে সযত্নে অংশগ্রহণ করতেন এবং বেশি বেশি করে কুরআন পাঠ করতেন, গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়তেন, যা থেকে নিজে উপকৃত হতেন আর অন্যদেরকেও এতে শামিল করে নিতেন। বয়সের শেষ প্রান্তে তিনি (মির্যা আব্দুল হক সাহেব) বলতেন, দিনে যতবারই তাঁকে দেখি কুরআন শরীফ পাঠে রত আছেন আর নোট করার জন্য কাগজ কলম সাথেই রাখতেন।

যখনই কোনো আয়াতের সুন্দর ব্যাখ্যা বোধগম্য হতো সাথে সাথেই তা নোট করতেন আর পরে নিজের পরিবার-পরিজনকেও তা শোনাতেন। মির্যা সাহেব লিখেছেন, তিনি গৃহবাসীদের যখন শোনাতেন তখন তার চেহারা দেখে এমনই মনে হতো যে, তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা হলো তার সন্তানরাও যেন পবিত্র কুরআনের প্রেমিক হয়ে যায়। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০১, পৃ. ১২৪-১২৫)

গ্যাম্বিয়ার এক খ্রিষ্টান যুবক আহমদীয়াত গ্রহণ করলে তার মা তার চরম বিরোধিতা শুরু করে দেয়। প্রথম দিকে সে সহ্য করত, কিন্তু তার মা পবিত্র কুরআনের অবমাননা শুরু করলে সে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় আর কখনো পুনরায় সে ঐ গৃহে ফেরত যায় নি। (মাসিক আনসারুল্লাহ্, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ৬)

এ যুগেও আফ্রিকার দূরদূরান্তের দেশগুলোতে এই নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে চলেছে।

ইসলামে চারটি পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি রয়েছে, কিছু লোক একে অবশ্যপালনীয় নির্দেশ বানিয়ে নিয়েছে। আফ্রিকাতে প্রচলিত আছে, যে ব্যক্তি প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন, সম্পদশালী অথবা গোত্র-প্রধান হয়ে থাকে, সে কখনো কখনো কোনো কোনো গোত্রের রীতি অনুসারে চারের অধিক ৯ বা ১০টা পর্যন্ত বিয়ে করে থাকে। সিয়েরালিয়নের আলী রোজার্স সাহেব যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, সেই সময়ে তিনি যুবক ছিলেন, আর তার ১২জন স্ত্রী ছিল। জামা'তের মুরব্বী মওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেব তাকে জানিয়ে দেন যে, এখন আপনি আহমদী হয়ে গেছেন, এজন্য কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী চারজন স্ত্রী রাখতে পারেন, বাকিদেরকে তালাক দিয়ে ও ভরণপোষণ দিয়ে বিদায় করে দিন। তিনি এই নির্দেশের কেবল আমলই করেন নি, বরং শরীয়তের নির্দেশমূলক তার এই আহ্বানে স্ত্রীদের মধ্যে প্রথম যে চারজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাদেরকে নিজের কাছে রাখেন আর যুবতী স্ত্রীদেরকে বিদায় করে দেন। এই যে পরিবর্তন, এটাই হলো এক বিপ্লব।

আমাদের আরো একজন মুরব্বী ছিলেন, ইউনুস খালেদ সাহেব, তিনি লিখেছেন, ভিভি কাহলু সাহেব কাশফ দেখে, মওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী সাহেবের যুগে আহমদী হয়েছেন, পরবর্তীতে তিনি আহমদীয়া জামা'ত সিয়েরালিয়নের আমীরও ছিলেন। আহমদী হবার পূর্বে সম্পূর্ণভাবেই স্বাধীন বাছবিচারহীন বেপরোয়া জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, আর তার সহমতের লোকেরাও এমনই ছিল, পেশাও ছিল তার তেমনই, তিনি ড্যান্সার (তথা নৃত্যশিল্পী) ছিলেন। কিন্তু বয়আতের অব্যবহিত পরেই নিজের ভেতর পরিবর্তন সৃষ্টি করেন, তাকওয়া ও পবিত্রতা, ইবাদত, খোদাভীতি আর বিশ্বস্ততায় এক মর্যাদাকর অবস্থান তৈরি করে নেন। আর আল্লাহ্ তাকে খুবই উন্নত মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তিনি নিজ এলাকার প্যারামাউন্ট চিফও ছিলেন। তিনি যে এলাকার প্যারামাউন্ট চিফ ছিলেন, সেখানে হীরার অনেক বড়ো একটি খনি ছিল, তিনি ক্ষমতাধিকারী ছিলেন। কেননা ঐ অঞ্চলে চিফ যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। তিনি চাইলে লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি রুপি উপার্জন করতে পারতেন কিন্তু আহমদীয়াতের অনিন্দ্য সুন্দর আর পবিত্র শিক্ষার কারণে এই ধরনের ধনসম্পদ নিজের জন্য হারাম জ্ঞান করেন আর এজন্য তিনি সাদাসিধে দরবেশী

জীবন কাটিয়েছেন। ওপর মহলেও তার সুনাম ছিল। মিস্টার ভিভি কাহলু এক অসাধারণ বিশ্বস্ত প্যারামাউন্ট চিফ। তিনি নিজেও ঘুষ নিতেন না, আর সরকারি আমলাদেরও ঘুষ নিতে দিতেন না। তিনি আরো বলেন, অসুস্থ থাকাকালে একদিন আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি আমায় ডেকে নিয়ে বলেন, ইউনুস! আমার চোখের সামনে সবসময় কলেমা তৈয়বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' সবুজ রঙে লেখা দেখতে পাই। এর কারণ কী? আমি তাকে বললাম, চিফ! আল্লাহ্ তা'লা আর তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি আপনার প্রেম ও ভালোবাসা রয়েছে, এটি তারই ফল। তিনি (অর্থাৎ মুবাল্লিগ সাহেব) বলেন, আমি দু'মাস পর্যন্ত তাকে দেখার জন্য যাতায়াত করতে থাকি আর তিনি ঐ একই কথা বলতে থাকেন যে, উজ্জ্বল সবুজ রঙের লেখায় কলেমা তৈয়বা সবসময় আমার দৃষ্টিতে ভাসছে। এরপর তিনি হাসপাতালে ভর্তি হলে বেহুঁশ অবস্থায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় এক আহমদী বন্ধু মিস্টার কুজি তার হাত শক্ত করে ধরে বলে, চিফ! পাঠ করুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তার সাথে চিফও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করেন, অতঃপর মিস্টার কুজি বলে, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' সাথে চিফও পাঠ করেন 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' আর তা পাঠ করার সাথে সাথেই তার মাথা ঢলে পড়ে।

সপ্তম শর্তে এ-ও ছিল যে, বিনয়, সদ্ব্যবহার এবং দীনতা ইত্যাদির প্রতি যেন মনোযোগ থাকে। নবীদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেসব লোকই মানে, যারা অর্থসম্পদের দিক থেকে স্বল্পবিত্তের অধিকারী-বিনয়ী, তবে কুরবানীতে বিত্তশালীদের চেয়েও এরা বেশি দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়ে থাকে। সেই সাথে অর্থকড়ি ব্যয়কারীও হয়, বরং জীবনও যদি উৎসর্গ করতে হয় তবুও এরা পিছপা হয় না। অধিকন্তু কখনো বড়াই করা, অহংকার বা আত্মম্ভরিতা দেখানোর অভ্যাস তাদের থাকে না। ছোটো-বড়ো সবার সামনে অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র হয়ে জীবন কাটান আর বিনয় ও নম্রতায় অতি উন্নতমান প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে থাকেন। ঐশী জামা'তের উন্নতী সাধনের রহস্য এরই মাঝে নিহিত যে, মানুষ যত বেশি বিনয়ী, দীনতা অবলম্বনকারী, বিনয় ও নম্রতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হবে উন্নতি ও অগ্রগতিও তত দ্রুত হবে। আর নবীর মান্যকারীরাও এমনই লোক হয়ে থাকে, যেমনটা আমি পূর্বেই বলেছি। অতএব নবীগণের দৃষ্টি যখন এমন হৃদয়বানদের ওপর পতিত হয় তখন তাদের অন্তঃকরণ অধিকতর উজ্জ্বল করে তাদের আলোকিত করে তোলে। আর যারা বিনয়ী হয়ে থাকে, তাদেরকে যদি অন্যের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে জুতার ওপর গিয়ে বসতে হয় তবুও সেখানে বসে থাকাটাকেই তারা প্রাধান্য দেয় কারণ, যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের দৃষ্টি মানুষ চিনতে এতটাই দক্ষতা রাখে যে, এমন লোকদের তারা শনাক্ত করে নেয় আবার সেই বিনয়ের প্রতিদান দেবার জন্য আর নিজের জামা'তকে বোঝানোর জন্য যে, আমার জামা'তে বিনয়ী ও কাঙালদের মর্যাদাই সবার ওপরে, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ বিনম্র লোকদেরকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিজ সন্নিধানে বসান আর খাবার সময়ে ডেকে নিয়ে নিজের সাথে নিজেরই প্লেট থেকে খাবার খাইয়ে থাকেন। অতএব নবীগণ এই সম্মান তাদেরকে এজন্যই করেন যে, এই বিনয়ের কারণে এমন মানুষ দ্রুত ধর্ম গ্রহণ করে আর ধর্মীয় শিক্ষার ওপর পরিপূর্ণরূপে আমলকারী হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "দরিদ্র লোকেরা অহংকার করে না এবং পূর্ণ বিনয়ের সাথে সত্য গ্রহণ করে।" তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমি সত্য সত্যই বলছি, বিত্তশালীদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই রয়েছে যারা এই পুণ্য বৈশিষ্ট্যের এক-দশমাংশও অর্জনে সক্ষম, যা দরিদ্ররা পূর্ণরূপে অর্জন করে।" (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫৩৭)

এজন্য তিনি (আ.) বলেছেন, জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য বিনয় আর বিনয়ই হচ্ছে শর্ত, যেন ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝতে পারো আর এর ওপর আমল করতে পারো। এখন এই পরিবর্তন কতটা কীভাবে ঘটেছে, এ সংক্রান্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি–

হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ সাহেব (রা.) একজন বিদগ্ধ আলেম হবার পাশাপাশি এক বিত্তশালী পরিবারের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। এ সত্ত্বেও তার পবিত্রতা, বিনয় ও সরলতা ছিল অনুকরণীয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আর হুযূর (আ.)-এর দাসত্বের জোয়াল ঘাড়ে তুলে নিয়ে তিনি জাগতিক ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তর থেকে বের করে দেন। আহমদীয়া মাদ্রাসায় চাকুরিকালীন পুরো মেয়াদকাল তিনি এক ছোটো আবাসগৃহে কাটিয়ে দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে যা এক চাপরাসির জন্যও উপযোগী ছিল না। হুযূর (আ.)-এর দাসত্ব করার জন্য যেখানে তিনি সারা জগৎকে পরিত্যাগ করেছেন সেখানে জাগতিক সাজসরঞ্জাম-সংক্রান্ত আরাম-আয়েশ সন্ধানের প্রশ্নই তো ওঠে না। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০৫, তৃতীয় অংশ, পৃ. ৯)

এখানে বিনয় প্রসঙ্গে মৌলবি বুরহানুদ্দীন সাহেবের আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি– একবার হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে খোদা জানে তাঁর কী চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, তিনি কাঁদতে শুরু করেন। হুযূর (আ.) পরম স্নেহের সাথে জিজ্ঞাসা করেন, মৌলবি সাহেব! ভালোই তো আছেন! নিবেদন করলেন, হুযূর! প্রথমে আমি কোথ্ হয়েছি, পরে বাওলী বনেছি, এরপর গজনী আর এখন মির্যায়ী হয়েছি। কান্নার কারণ হলো, বয়স তো পেরিয়ে গেছে। আমি অজ্ঞই রয়ে গেলাম অর্থাৎ প্রথমে আমি কোঠা ওয়ালা পীর সাহেবের কদমবুছি করতাম, এরপর বাউলি ওয়ালা বুযূর্গ-এর সেবারত ছিলাম, এরপর মৌলবি আব্দুল্লাহ্ সাহেব গজনবির সকাশে গিয়েছি আর এখন আমি হুযূর (আ.)-এর কাছে আসলাম। কিন্তু আমি সেই অধমই রয়ে গেছি (এটি ছিল তাঁর বিনয়)। এই কথাতে হুযূর (আ.) মৌলবি সাহেবের প্রতি গভীর আদর ও স্নেহ প্রদর্শন করেন। প্রবোধ দিয়ে বলেন, মৌলবি সাহেব! উদ্‌বিগ্ন হবেন না, আপনার যেখানে পৌঁছানোর সেখানে পৌঁছে গেছেন। এখন বিচলিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই আশ্বস্ততার পর তিনি শান্ত ও সুস্থির হন। (মাসিক আনসারুল্লাহ, রাবওয়া, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১৪)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, হিব্বী ফিল্লাহ্ (যাকে আমি খোদার জন্য ভালোবাসি)! সৈয়দ ফযল শাহ সাহেব লাহোরী, পৈত্রিক নিবাস জম্মু স্টেট। অত্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী, ভালোবাসা ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ বিশ্বাসের জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত আর ধনসম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করার জন্য সোচ্চার এবং শিষ্টাচার ও সুধারণা যা পথের আবশ্যকীয় পাথেয়– তা এক অভাবনীয় বিনয়রূপে তার মাঝে বিদ্যমান। সত্য ও

পবিত্র আর পরিপূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে এই অধমের সাথে আল্লাহ্ তা'লারই খাতিরে সম্পর্ক ও বন্ধুত্বে উঁচু মানে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। অদ্বৈততা ও বিশ্বস্ততার গুণ তার মাঝে অতি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তার আপন ভাই নাসের শাহও এই অধমের সাথে বয়আতের সম্পর্ক রাখে এবং তার মামা মুন্সি করম ইলাহী সাহেবও এই অধমের সাথে অকপট বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখেন। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫৩২)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, হিব্বী ফিল্লাহ্ (যাকে আমি খোদার জন্য ভালোবাসি)!! মুন্সি রুস্তম আলী, রেলওয়ে ইন্সপেক্টর পুলিশ (আমাদের দেশে সাধারণত পুলিশের অনেক দুর্নাম রয়েছে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার অতীত পর্যবেক্ষণ করা হলে বুঝা যাবে) ইনি একজন পুণ্যবান, নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ যুবক, যিনি আমার প্রথম সারির বন্ধুদের একজন। স্বার্থহীনতা ও আন্তরিক নিষ্ঠা তার চেহারায় স্পষ্ট। কোনো পরীক্ষায় কখনো আমি এই বন্ধুকে দোদুল্যমান দেখি নি। আর যেদিন থেকে তিনি ভালোবাসার সাথে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তার সেই ভালোবাসায় ঘাটতি বা শৈথিল্য আসে নি বরং প্রতিনিয়তই তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ উন্নতির দিকেই ধাবিত হচ্ছেন। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫৩৬)

আবার (বয়আতের ঐ শর্তে) একথাও ছিল **'দম্ভ ও অহংকার পরিহার করবে'** এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ সাহেব (রা.)-এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। "জ্ঞান-গরিমায় অনেক উঁচু মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সেই যুগের নামসর্বস্ব আলেমদের স্বভাবের ব্যতিক্রমে তাঁর (রা.) মাঝে সরলতা ও বিনয় এত বেশি ছিল যে, যে-কোনো সময়ে ছোটো শিশুরাও তার সাথে কথাবার্তা বলতে চাইলে নির্দ্বিধায় তাঁর (রা.) সাথে আলাপচারিতা করতে পারত। তিনি খুবই স্নেহের সাথে তার কথা শুনতেন আর তার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মৌলবি মোহাম্মদ হাফেয বাকাপুরী, তার নিজের শৈশবের ঘটনা শোনাতেন যে, এই অধমের কোনো নিকটাত্মীয়ের ঘরে এক সন্তানের জন্ম হয়। পত্রযোগে সেই সংবাদ পেয়ে আমি হযরত মৌলবি সাহেব (রা.)-এর কাছে বাচ্চাটির নাম রাখার জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেই। সম্ভবত সে সময় তিনি মসজিদে আকসায় দরস দেবার জন্য যাচ্ছিলেন অথবা দরস দিয়ে ফেরত আসছিলেন। আমি তার সামনে এগিয়ে যাই, এই অধমকে তার নিজের দিকে আসতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে যান। বড়োই স্নেহের সাথে আমার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে নবজাত শিশুর নাম প্রস্তাব করে তার জন্য দোয়া করেন।" (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০৫, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩৫)

এরপর এ প্রসঙ্গে হযরত মৌলবি বুরহানুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, পূর্বেও উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, তাঁর (রা.) মাঝে নাম জাহির করা বা লোক-দেখানো বা বাহ্যিকতা ইত্যাদির কোনো বালাই ছিল না আবার জ্ঞান নিয়ে আত্মম্ভরিতা ও অহংকার জাতীয় কোনোকিছুই তার মাঝে ছিল না, অথচ তিনি একজন উঁচু মাপের আলেম ছিলেন। কাদিয়ানে অবস্থানকালে যখনই কেউ তাঁকে 'মৌলবি সাহেব' বলে সম্বোধন করত তৎক্ষণাৎ তিনি বাধা দিয়ে বলতেন, আমাকে মৌলবি ডেকো না, আমি তো

মির্যা সাহেবের কাছ থেকে অক্ষর শেখা শুরু করেছি মাত্র। অর্থাৎ আলিফ, বে পড়া শুরু করেছি। (মাসিক আনসারুল্লাহ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১২)

নম্রতা ও বিনয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত যা সব দৃষ্টান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ (রা.) সম্পর্কে বলেন, "নিরহংকার এবং বিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি এমন মানে উপনীত ছিলেন যে, ফানাফিল্লাহ (আল্লাহ্-তে বিলীন) না হলে কেউ এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ খ্যাতি এবং জ্ঞানের গরিমায় কিছুটা হলেও নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করতে আরম্ভ করে আর এই জ্ঞান ও খ্যাতিই তার সত্যান্বেষণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ব্যক্তি এরূপ আত্মগরিমামুক্ত ছিলেন যে, যদিও তিনি বহু শ্রেষ্ঠত্বের সমাহার ছিলেন কিন্তু তাঁর জ্ঞান, কর্ম এবং বংশগত মর্যাদা প্রকৃত সত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। অবশেষে তিনি সত্যের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন এবং আমার জামা'তের জন্য এরূপ একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন– যার অনুসরণের মাঝে খোদার প্রকৃত সন্তুষ্টি নিহিত।" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৪৮)

ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেবার কথা বয়আতের অষ্টম শর্তে এভাবে রয়েছে যে, **"নিজ জীবন, ধনসম্পদ, মানসম্মান সবকিছুই উৎসর্গ করবে।"**

আহমদীয়া জামা'তে আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে ধর্মকে পার্থিবতার ওপরে প্রাধান্য দেবার দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিতে অহরহ পড়তে থাকে। মায়েরা নিজ সন্তানদের সঁপে দেয়, বাবারা ইবরাহীমী আদর্শের ওপর আমল করে নিজেদের সন্তানদেরকে আঙুল ধরে নিয়ে এসে থাকে আর বলে, এই সন্তান জামা'তের আর জামা'ত যেভাবে যেখানে চায় এর কুরবানী নিক। সন্তানরাও নিজ সত্তাকে কুরবানীর জন্য উপস্থাপন করে বলে, আমরাও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ন্যায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। এ দৃশ্য পূর্বেও বিদ্যমান ছিল আর আজও তা সচল ও সজীব আছে। এর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১৯২৩ সনে হিন্দুরা শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করলে এটি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামা'তের নেওয়া উদ্যোগে ছোটোরাও বড়োদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। পাঁচ বছরের শিশুও মালকানা এলাকায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। ১২ বছরের এক ছেলে তার পিতাকে লেখে, সত্যধর্মের সেবা করা কেবল বড়োদেরই কাজ নয় আমাদের জন্যও এটি আবশ্যক। তাই আপনি যখন তবলীগের জন্য যাবেন আমাকেও সাথে নিয়ে যাবেন আর আপনি না গেলে আমাকে অবশ্যই পাঠিয়ে দিন। (তারীখে আহমদীয়াত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৩৩৬)

যেমনটা আমি পূর্বেও বলেছি এসব অতীতের কোনো কল্পকাহিনি নয়। এখনো এই দৃশ্য চোখে পড়ে। আর এখনো 'ওয়াকেফীনে নও' শিশুরা আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য যখন আসে, তাদের নিজেদের মহলেও তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বড়ো হয়ে কী করবে, কী হবার ইচ্ছা? এই উত্তরই তারা দিয়ে থাকে, আপনি আমাদেরকে যা-ই হতে বলবেন, আমরা তা হবার চেষ্টা করব। আমাদের করণীয় সম্পর্কে জামা'ত আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিক! এই হলো আহমদী শিশুদের প্রেরণা-উদ্দীপনা। আর এই উদ্দীপনা

যতদিন জীবিত থাকবে আর ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত এই চেতনা-উদ্দীপনা প্রতিষ্ঠিতই থাকবে, আর এ কারণে এই জামা'তের চুল পরিমাণ ক্ষতিও কেউ করতে পারবে না।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, এখন আমার সাথে জামা'তের অনেক এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা স্বয়ং ধর্মকে পার্থিবতার ওপরে প্রাধান্য দিয়ে নিজেরা দরবেশের রূপধারণ করেছেন আর প্রিয় স্বদেশবাসীদের পরিত্যাগ করে এবং নিজেদের পুরোনো বন্ধুবান্ধব ও নিকট আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিরদিনের জন্য আমার সাহচর্যে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০৫, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩০)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ভেরা নিবাসী হিব্বী ফিল্লাহ্! (আল্লাহর খাতিরে যাকে ভালোবাসি) মৌলবি হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব... তাঁর অর্থকড়ি দ্বারা আমার যত বেশি উপকার হয়েছে তেমনটা আমি অন্য কারো ক্ষেত্রে দেখি না, যা তার মোকাবিলায় বর্ণনা করতে পারি। আমি তাকে সহজাত প্রেরণায় সুগভীর আন্তরিক একাগ্রতা নিয়ে ধর্মসেবায় নিবেদিতপ্রাণ পেয়েছি। যদিও তাঁর দৈনন্দিন জীবন এ কাজেই নিবেদিত অর্থাৎ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সত্যিকার সেবক আর এ জামা'তের সাহায্যকারীদের মধ্যে তিনি তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫২০)

তিনি (আ.) হযরত মৌলবি আব্দুল করীম সাহেব প্রসঙ্গে বলেন, "এক নিষ্পাপ অবস্থার ভেতর তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস থেকে তিনি কোনো অংশই গ্রহণ করেন নি। চাকরি তিনি এজন্যই ছেড়ে দিয়েছেন যে, এতে ধর্মের অবমাননা করতে হয়। সম্প্রতি মাসিক দু-শো রুপি বেতনের একটি চাকুরি তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সরাসরি না করে দিয়েছেন। বিনয়ের মাঝে তিনি নিজ জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তার শখ হলো, কেবল আরবী পুস্তকাদি পাঠ করা। ইসলামের প্রতি অভ্যন্তরীণভাবে আর বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করার মাঝে সারাটা জীবন তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন। এত অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও সদা তার কলম সচল থাকত।" [সীরাত হযরত মৌলবি আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি (রা.), পৃ. ১০৮]

মালির কোটলার রঈস হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব, আপন সহোদরকে এক পত্রে লেখেন, "আমি যে-সব বিষয়ের জন্য কাদিয়ানে বসতি গেড়েছি, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা আমি প্রকাশ করছি যে, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ ও মাহদীয়ে মাশহুদ-এর হাতে বয়আত গ্রহণের পর ১২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আমি ১১ বছর পৈত্রিক নিবাসেই ছিলাম আর কাদিয়ানের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল বিচ্ছিন্ন। কেবল কখনো সখনো স্বল্প কিছুদিনের জন্য আসা-যাওয়া করেছি, বস্তুজগতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিজ জীবনের অনেকটা সময় বিনষ্ট করেছি। শেষে যখন চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারলাম, জীবনটা তো হাওয়া হয়েই রইল, না ধর্মের কিছু করতে পারলাম আর না দুনিয়ার।

ছয় মাস অবস্থান করার ইচ্ছা নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম (অর্থাৎ কাদিয়ানে), তবে এখানে এসে আমি আমার সমস্ত কাজের ওপর চিন্তাভাবনা করলে শেষ পর্যন্ত আমার অন্তর

এ ঘোষণাই দেয় যে, দুনিয়ার কাজ, ধর্মের কাজের সাথে যুক্ত হয়ে নিজ থেকেই সম্পন্ন হয়ে যায়, কিন্তু দুনিয়ার পেছনে যখন মানুষ ছুটতে থাকে তখন দুনিয়াও হস্তগত হয় না আর ধর্মও ধ্বংস হয়ে যায়। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি আর আমি দেখেছি, এই এগারো বছরে না আমি কিছু করতে পেরেছি, না আমার সম্মানিত ভাইয়েরা কোনোকিছু গড়তে পেরেছেন। বরং প্রতিনিয়ত এই অবস্থা নৈরাশ্যকর হতে থাকা সত্ত্বেও আমাদের ধর্মকেও ধ্বংস করছি। শেষ পর্যন্ত বুঝলাম, জাগতিক কাজের কোনো শেষ নেই, তাই কোটলাকে বিদায় জানাই আর আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আমি হিজরত করব।

অতএব আলহামদুলিল্লাহ্! আমি খুবই আনন্দের সাথে প্রকাশ করছি যে, আমি কোটলা থেকে হিজরত করেছি, এ কারণে আমি এখন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাজির আর তাই নিজের ইচ্ছায় স্বদেশে ফেরত আসতে পারি না, অর্থাৎ সে স্থানকে (স্থায়ী) আবাসগৃহ বানাতে পারি না। অতিথির ন্যায় আসলে আসা যেতে পারে। অতএব স্বদেশে এই অবস্থায় আমার আসা অসম্ভব। আমি খুবই আনন্দে আছি আর খুবই ভালো আছি। আমরা যে প্রেমাস্পদের প্রেমিক, তাঁর থেকে পৃথক কীভাবে হতে পারি!

সম্মানিত প্রিয় ভাই আমার! খোদার জন্যই এখানে এসেছি আর আমার বন্ধুত্ব, আমার ভালোবাসাও খোদারই জন্য। আমি কোটলা থেকে বিচ্ছিন্ন আছি বটে, কিন্তু কোটলার মন্দ অবস্থা আমাকে প্রচণ্ডভাবে পীড়া দেয়। খোদা তা'লা আপনাকে আমাদের সকল আত্মীয়স্বজন ও সমগ্র কোটলাবাসীকে বুঝার শক্তি দান করুন, যেন আপনারা সবাই ইসলামের পরিপূর্ণ সেবক হয়ে যেতে পারেন আর আমাদের সবার জীবন-মৃত্যু যেন কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য হয়। আমরা সবাই যেন মহান খোদার পূর্ণ আনুগত্যকারী ও মুসলিম হয়ে যাই। আমাদের বয়আতের শর্তে রয়েছে, আমরা যেন ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেই, নিজেদের শুভাকাঙ্ক্ষী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি, তাদের পূর্ণ আনুগত্য করি। এ বিষয়টি আমাকে, এখানে থেকে যেতে অনুপ্রাণিত করছে। আমার ঈমান যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই বস্তুজগৎ ক্রমশ তুচ্ছ মনে হচ্ছে আর ধর্ম ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে। মহান খোদা আর মানুষের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ বেড়ে চলছে, একইভাবে সরকারের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা অন্তরে পরিপূর্ণরূপে ঘর করে চলেছে।" (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০২, পৃ. ১২৬-১২৯)

অতঃপর হাকীম ফযল দ্বীন সাহেবের ইসলামের প্রতি অনুরাগের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হিব্বী ফিল্লাহ্ (খোদার খাতিরে আমি যাকে ভালোবাসি)! ভেরা নিবাসী হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব। হাকীম সাহেব ভাই মৌলবি হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের একজন বন্ধু আর তার নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য ও গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। আমি জানি, আল্লাহ্ ও রসূলের (সা.) সাথে তার সত্যিকারের ভালোবাসা রয়েছে। আর সে কারণেই তিনি এই অধমকে ধর্মের সেবক দেখতে পেয়ে আল্লাহ্‌র সাথে শর্ত পূর্ণ করছেন। মনে হয় যেন ইসলাম ধর্মের সত্যতার বিস্তার ঘটানোর সেই প্রেমময় আবেগের অনেক বড়ো অংশ তিনি লাভ করেছেন যা শুরু থেকেই আমার প্রিয় ভাই মৌলবি নূরুদ্দীন সাহেবকে দেওয়া হয়েছে। ধর্ম প্রচার-প্রসারে এই জামা'তের

খরচাদির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করে তিনি সর্বদা এই চিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, চাঁদার মাধ্যমে এসব ব্যয় নির্বাহের যদি কোনো উত্তম ব্যবস্থা হতো! (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫২২)

১৯২৩ সনে শুদ্ধি আন্দোলন যখন চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, আহমদী মুবাল্লিগদের এই অবস্থা ছিল যে, তারা প্রচণ্ড দাবদাহে প্রতিদিন মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন। কখনো কখনো খাবার তো দূরের কথা পানিও পেতেন না। অধিকাংশ সময়ে সিদ্ধ অর্ধসিদ্ধ বাসি খাবার খেতেন অথবা ভাজা ছোলা এবং পানি পান করে দিনাতিপাত করতেন। কখনো কখনো ছাতুও সাথে রাখতেন এবং তা খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। সুফি আব্দুল কাদির সাহেব নিয়াজ বি.এ. প্রতিদিন গড়ে ১৬ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করে মিনপুরী ও মিথরা জেলার চল্লিশটি গ্রাম সফর করেন। (তারীখে আহমদীয়াত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৩৪৩)

আমেরিকার এক ভদ্রলোক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, যিনি একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। সমসাময়িক যুগে এত দ্রুত তিনি সংগীত জগতে উন্নতি করেছিলেন যে, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমগ্র আমেরিকার সংগীতাঙ্গনে খ্যাতি লাভ করেন। তার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, তিনি এত মহান একজন সংগীতশিল্পী রূপে উত্থিত হতে যাচ্ছেন যে, সংগীত জগতে তাকে নিজ যুগের অনেক বড়ো একজন গায়ক হিসেবে স্মরণ করা হবে। আহমদী হবার পর, মিউজিকের ভ্রুক্ষেপই করেন নি আর না মিউজিকের মাধ্যমে সম্ভাব্য আয়ের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গানবাজনা ছেড়ে দেন। এখন তিনি এক দরবেশের মতো জীবনযাপন করছেন। আর নিয়মনিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করেন, যথারীতি তাহাজ্জুদও পড়ছেন। মহানবী (সা.)-এর নাম নিতেই তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। (মাসিক খালেদ, জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ৪০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, (তাঁর খিলাফতকালের পূর্বের একটি ঘটনা লিখেছেন) "আমি এখানে কেন এসেছি? দেখো! ভেরাতে আমার পাকা বাড়ি রয়েছে আর এখানে আমি কাঁচা ঘর বানিয়েছি আর সব রকমের সুযোগ-সুবিধা এখান থেকে বেশি সেখানে লাভ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আমি দেখলাম, আমি রুগ্ণ, আর খুবই রুগ্ণ, অতিশয় সাহায্য-মুখাপেক্ষী, নিরুপায় আর একান্তই নিরুপায়। অতএব আমি আমার এসব দুঃখ লাঘবের জন্য এখানে এসেছি। যদি কোনো ব্যক্তি কাদিয়ানে আসে আমার নমুনা দেখার জন্য, দেখে নেয় কিংবা এখানে এসে, কিছুদিন অবস্থানের পর এখানকার লোকদের সম্পর্কে অভিযোগ করে তাহলে এটি তার ভ্রান্তি আর তার চোখও প্রতারণার শিকার! কেননা সে রোগাক্রান্তদের স্বাস্থ্যবান ভেবে তাদের পরীক্ষা নিচ্ছে। এখানকার বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক এখানে আসা আর এখান থেকে চলে যাওয়া অথবা এখানে বসবাস করা এ সবকিছুই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অধীনে হওয়া উচিত, নতুবা খাওয়া-দাওয়া আর আরামদায়ক বিছানাপত্রের জন্য যদি আসো তবে শোনো! তোমাদের অধিকাংশেরই নিজ নিজ গৃহে ভালো খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে, তাই এখানে আসার প্রয়োজনটা কী! তোমরা এই অঙ্গীকারে যথার্থভাবে তখন প্রতিষ্ঠিত গণ্য হবে যদি তোমাদের সব কাজ খোদার জন্য হয়।" (খুতবা জুমুআ, ২২ জানুয়ারি ১৯০৪, খুতবাতে নূর, পৃ. ১৬০, নব সংস্করণ)

হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এই মরহুম বুযূর্গের মধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষণীয় এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি সত্যিই ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপর অগ্রগণ্য করে রেখেছিলেন। তিনি বস্তুতই ঐসব সরলপ্রাণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা খোদাকে ভয় করে নিজেদের তাকওয়া ও খোদার আজ্ঞানুবর্তিতাকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করে থাকেন এবং খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ও তাঁর প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন, অর্থসম্পদ ও সম্মানকে মূল্যহীন এক খড়কুটার ন্যায় নিজ হাতে বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তার ঈমানের শক্তি এতটা উন্নত ছিল যে, আমি যদি তাকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর পর্বতের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে আমার আশঙ্কা হয়, আমার এই তুলনা না আবার দুর্বল প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ মানুষ বয়আত করা সত্ত্বেও এবং আমার দাবির সত্যায়ন করা সত্ত্বেও পার্থিবতাকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দেবার বিষাক্ত বীজ হতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ লাভ করে না বরং তাদের মধ্যে কিছু সংমিশ্রণ– অবশিষ্ট থেকেই যায়। তা জীবন সম্বন্ধেই হোক, সম্মান-সংক্রান্তই হোক, সম্পদ সম্বন্ধেই হোক বা চারিত্রিক অবস্থা সম্পর্কে হোক না কেন, একটি প্রচ্ছন্ন কৃপণতা তাদের অসম্পূর্ণ সত্তায় বিদ্যমান থাকে। এ কারণে তাদের সম্বন্ধে সর্বদা আমার হৃদয়ে যে অবস্থা বিরাজ করে তা হলো, কোনো ধর্মীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করতে গিয়ে আমার আশঙ্কা হয়, তারা আবার পরীক্ষায় না পড়ে যায় এবং এই সেবাকে নিজেদের ওপর একটি বোঝা মনে করে নিজেদের বয়আতকে বিদায় না জানিয়ে বসে। কিন্তু এই মরহুম পুণ্যবানের প্রশংসা আমি কোন ভাষায় করব, যিনি স্বীয় প্রাণ, সম্পদ ও সম্মানকে আমার আনুগত্যে এমনভাবে ছুড়ে ফেলেছেন, যেভাবে অকেজো-অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। অধিকাংশ লোককে আমি দেখি, যাদের সূচনা আর সমাপ্তি সমান হয় না এবং সামান্যতম হোঁচট বা শয়তানী কুপ্ররোচণা, বা কুসঙ্গের দরুন তারা পদস্খলিত হয়। কিন্তু এই মরহুম বীরপুরুষের অবিচল দৃঢ়তার কথা আমি কোন ভাষায় বর্ণনা করব, তিনি বিশ্বাসের জ্যোতিতে প্রতিটি মুহূর্তে উন্নতির রাজপথে এগিয়ে গেছেন।" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ১০)

অতঃপর তিনি (আ.) আরো বলেন, শহীদ মরহুম প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমার জামা'তের জন্য এক আদর্শ রেখে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমার জামা'ত একটি বড়ো দৃষ্টান্তের মুখাপেক্ষী ছিল। এখনো তাদের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যে সামান্য একটু কাজ করে মনে করে, অনেক বড়ো কাজ সে করে ফেলেছে আর আমার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোনো অনুগ্রহ করেছে বলে ভাবতে আরম্ভ করে। অথচ এটা তার প্রতি একান্ত খোদার অনুগ্রহ যে তিনি তাকে এই সেবার তৌফিক দান করেছেন। কেউ কেউ এমনও আছে, যারা সর্বান্তঃকরণে ও পুরো নিষ্ঠার সাথে এদিকে আসে নি এবং ঈমানের যে শক্তি পরম মার্গের নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার দাবি করে শেষ পর্যন্ত তারা তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। জড় জগতের ভালোবাসায় তারা ধর্মকে খুঁইয়ে ফেলে এবং সামান্য পরীক্ষায়ও পাশ করে না। খোদার জামা'তে প্রবেশ করেও তাদের দুনিয়াদারী হ্রাস পায় না, কিন্তু খোদা তা'লার চরণে হাজার হাজার কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য, এরূপ লোকও আছে, যারা সত্যিকার অন্তঃকরণে ঈমান এনেছে এবং সত্যিকার অন্তঃকরণে এই পথ অবলম্বনও

করেছে, এই পথে যে-কোনো কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই বীরপুরুষ, যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেসব শক্তি জামা'তের আজও প্রকাশ পাওয়া বাকি আছে। খোদা সবাইকে ঐ ঈমান এবং ঐ দৃঢ়চিত্ততা দান করুন, যার দৃষ্টান্ত এই শহীদ মরহুম প্রদর্শন করেছেন। এই পার্থিব জীবন– যার সাথে শয়তানী হামলার সংমিশ্রণ রয়েছে, তা মানুষের উৎকর্ষতা লাভের পথে অন্তরায়। এই জামা'তে অনেকেই প্রবেশ করবে কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অতি অল্প লোকই এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করবে। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৫৭-৫৮)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, সাহেবযাদা আব্দুল লতীফের জন্য যে শাহাদত নির্ধারিত ছিল, তা ঘটে গেছে। এখন অত্যাচারীর শাস্তি পাবার পালা।

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٥﴾

(তাহা: ৭৫)

অর্থাৎ "নিশ্চয় যে তার প্রতিপালক-প্রভুর কাছে অপরাধীরূপে আসবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম রয়েছে। তাতে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।"

আক্ষেপ! এই আমীর, "মাইঁ ইয়াকতুলু মু'মিনান মুতাআ'ম্মিদান" (আন-নিসা: ৯৪) এর অধীনে এসে গেছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনেশুনে মুমিনকে হত্যা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে –অনুবাদক)। একবিন্দুও খোদা তা'লাকে ভয় করে নি। অন্যদিকে মুমিনও এরূপ মহান, যদি সমস্ত কাবুলে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করা হয় তবুও তা পাওয়া যাবে না। এরূপ ব্যক্তিরা হলেন, অমূল্য রত্ন, যারা নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও সত্যের জন্য জীবনও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না আর স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির জন্য কোনো ভ্রুক্ষেপই করেন না। হে আব্দুল লতীফ! তোমার প্রতি হাজার হাজার রহমত। তুমি আমার জীবদ্দশায়ই স্বীয় নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছ। আমার মৃত্যুর পর আমার জামা'তে যারা থাকবে, আমি জানি না তারা কী করবে! (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৬০)

তিনি (আ.) আরো বলেছেন, আমি যখন সাহেবযাদা মৌলবি আব্দুল লতীফ মরহুম কর্তৃক প্রদর্শিত দৃঢ়চিত্ততা ও আত্মোৎসর্গের প্রতি লক্ষ করি, তখন আমার জামা'ত সম্বন্ধে আশা ও প্রত্যাশা অনেক বেড়ে যায়! কেননা যে খোদা এই জামা'তের কোনো কোনো ব্যক্তিকে এমন শক্তি দান করেছেন যে, তাঁরা কেবল ধনসম্পদই উৎসর্গ করেন নি বরং এ পথে নিজেদের প্রাণও বিসর্জন দিয়েছেন; সেই খোদার এই সুস্পষ্ট ইচ্ছা রয়েছে বলে মনে হয়, তিনি এমন বহু লোক জামা'তে সৃষ্টি করবেন যারা সাহেবযাদা মৌলবি আব্দুল লতীফের প্রেরণাসমৃদ্ধ হবেন আর তারা হবে তাঁর আধ্যাত্মিকতার এক নতুন চারা বিশেষ। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৭৫)

আজ থেকে ঠিক একশ বছর পূর্বে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবকে শহীদ করা হয়েছিল।

হে শেষ যুগের মসীহ্! ধন্য আপনি, আপনার প্রিয় জামা'ত, জামা'তের প্রতি আপনার

নিজ প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেছে। আপনার যে-সব প্রত্যাশা নিজস্ব জামা'তের প্রতি ছিল তা তারা পূর্ণ করেছে। তারা নিজেদের ধনসম্পদ, সময় আর জীবন উৎসর্গ করতে কখনো পিছপা হয় নি। এর দৃষ্টান্ত আমরা আজও অবলোকন করছি। তাঁর পরেও জামা'তে এমন লোক জন্মলাভ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চিন্তা ছিল, জানা নেই আমার পর কী হবে! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার পরেও এমন ব্যক্তিবর্গ জন্ম লাভ করছেন আর করতে থাকবেনও, যাঁরা পার্থিব লোভলিপ্সায় লালায়িত হন নি আর নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেন নি। বাবা স্বচক্ষে ছেলেকে শহীদ হতে দেখেছে আবার ছেলেও পিতাকে নিজেরই চোখের সামনে শাহাদত বরণ করতে দেখেছে, তবুও দৃঢ় থেকেছেন, দোদুল্যমান হন নি, বরং এরপর নিজেই জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

হে পবিত্র মসীহ্ (আ.)! কল্যাণ হোক আপনার, আপনার বংশধরদের মধ্য থেকে, আপনার নিজস্ব প্রজন্মও জীবন উৎসর্গ করে জামা'তকে অনেক বড়ো বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব শহীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকুন, আমাদেরকেও তৌফিক দিন যেন আমরা জাগতিকতার ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দিতে পারি এবং সকল ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকি আর নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে একই আবেগ-উদ্দীপনা সজীব রাখি। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান করতে থাকুন। আমীন।

(২৬)

লন্ডনের বাইতুল ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৭ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ১৭ ইখা, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

সৃষ্টিসেবা আর মানবকল্যাণ সাধনের প্রতি আমাদের জামা'তে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সদা সচেষ্ট ও (অপেক্ষারত থাকে) কখন তাদের সুযোগ আসবে (আর কখন) তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দ্যেশ্য সৃষ্টিসেবার কাজ সম্পাদন করবে। প্রত্যেক আহমদীর হৃদয় সৃষ্টিসেবার ক্ষেত্রে কেন এত উদার ও উন্মুখ? কারণটি হলো, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা যা আমরা ভুলে বসেছিলাম তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অন্বেষী হয়ে থাকলে তাঁর সৃষ্টিকুলের সাথে উত্তম আচরণ করো, তাদের চাহিদা পূরণে যত্নবান হও। এটিও একটি মস্তবড়ো মাধ্যম যা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য দান করে ধন্য করবে। সৌন্দর্যপূর্ণ এই অনুপম শিক্ষাকে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত গ্রহণের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি মৌলিক শর্ত নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ [তিনি (আ.) বলেছেন,] আমার সাথে সম্পৃক্ত হবার পর নিজের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য এবং অর্থসম্পদ দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকুলের প্রতি কেবল সহানুভূতিই প্রদর্শন করবে না বরং তাদের উপকারও সাধন করবে। এজন্যই ভূমিকম্পে বিধ্বস্তদের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলে আহমদীরা থাকে সর্বাগ্রে, বন্যাকবলিতদের সাহায্যের দরকার হলে আহমদীরা এগিয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিও এসেছে যে, প্রচণ্ড ঢলের মুখে আহমদী যুবকরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে নিমজ্জমান লোকদেরকে কূলে পৌঁছে দিয়েছে।

আবার যুগ-খলীফা যখন এ ঘোষণা দেন যে, আফ্রিকার দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য, রোগবালাইয়ে জর্জরিত মানবগোষ্ঠী যাদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই (তাদের জন্য) স্কুল ও হাসপাতাল খোলার জন্য এত অর্থের প্রয়োজন তখন জামা'তের সদস্যরা সেই প্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে এই অর্থের সংস্থান করে যা একজন আহমদীর অন্তরে দুঃখী মানুষের জন্য থাকা উচিত। আর প্রিয় এই জামা'তের সদস্যরা যুগ-খলীফার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চাহিদার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অর্থ যুগ-খলীফার সমীপে উপস্থাপন করে। এরপর যুগ-খলীফা যখন আবার বলেন, অর্থের সংস্থান তো হলো এখন ঐসব স্কুল ও হাসপাতাল চালু রাখার জন্য এখন আমার লোকবলের প্রয়োজন, তখন চিকিৎসক ও শিক্ষকরা পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেন। বর্তমানে আফ্রিকার অবস্থা পূর্বের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো। ৭০-এর দশকে যখন নুসরত জাহাঁ স্কিমের সূত্রপাত হয় তখন অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশ ছিল আর সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই তারা সেখানে দিনাতিপাত করেছেন। কোনো কোনো চিকিৎসক ও শিক্ষক ভালো চাকুরি করতেন, কিন্তু আত্মোৎসর্গের পর নিরেট পল্লীগ্রামে গিয়ে বসবাস করেন। অধিকাংশ হাসপাতাল ও

স্কুলগুলো স্থাপন করা হয়েছিল গ্রামে, যেখানে কোনো বিদ্যুৎ ও পানির সুব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু দুঃখী মানুষের সেবা করার বয়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে হবে, তাই কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি তারা কোনো ভ্রুক্ষেপই করেন নি। প্রথম দিকে হাসপাতালের অবস্থা এতটাই করুণ ছিল যে, কাঠের টেবিলের ওপর রোগীকে শোয়ানো হতো, আলোর স্বল্পতা মেটাতে ব্যবহার করা হতো হারিকেন বা গ্যাস ল্যাম্প। অপারেশনের জন্য যতটা ছুরি, চাকু, কাঁচি বা অপরেশনের উপকরণ পাওয়া যেত তা দিয়েই সারা হতো রোগীর শল্য-চিকিৎসা এবং এই বলে নিবিড়ভাবে দোয়া করতেন যে, হে আমার খোদা! আমার কাছে সম্ভাব্য যা কিছু ছিল তা দিয়ে আমি চিকিৎসা করে দিয়েছি। খলীফা আমাকে বলেছেন, দোয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করো, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হাতে অনেক আরোগ্য ক্ষমতা দান করবেন। অতএব তুমিই আরোগ্য দান করো। আল্লাহ্ তা'লাও ঐ আত্মোৎসর্গকারী ডাক্তারদের কদর করেছেন আর দুরারোগ্য এমন সব রোগী আরোগ্য লাভ করেছে যা দেখে জগৎ হতবাক হতো। খোদা তা'লা এমনভাবেও অর্থের সংস্থান করেছেন যে, বিত্তবান লোকেরা পর্যন্ত নিজেদের সুচিকিৎসা গ্রহণের জন্য শহরের বড়ো বড়ো নামিদামি হাসপাতাল বাদ দিয়ে আমাদের ছোটো ছোটো গ্রামীণ হাসপাতালগুলোতে এসে চিকিৎসা গ্রহণকে প্রাধান্য দিত। অনুরূপভাবে শিক্ষকরাও মানবের হিতসাধনের অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে শিশুদেরকে জ্ঞানের অলংকারে সুসজ্জিত করেছেন। ডাক্তার ও শিক্ষকদের সেবাদানের এই কর্মযজ্ঞ আজও সচল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই ধারাবাহিকতা সর্বদা সচল রাখুন আর এসব সেবাদানকারীর প্রতি মহান প্রতিদানের ধারা প্রবহমান রাখুন।

জলসায় আমি ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম, আমাদের আফ্রিকার হাসপাতালগুলোর জন্য ডাক্তাররা স্থায়ী কিংবা সাময়িককালের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করুন। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অবস্থা অনেক ভালো। এখন সেসব সমস্যা বা প্রতিকূলতাও নেই যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল প্রাথমিক যুগের সেবাদানকারী জীবন উৎসর্গকারীদের। এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা অনেক ভালো আর সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সামান্য কোনো অসুবিধা হলেও বয়আতের সেই অঙ্গীকার দৃষ্টিতে রাখুন যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানবকল্যাণে নিয়োজিত থাকব। এগিয়ে আসুন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত এই অঙ্গীকার পূর্ণ করুন এবং তাঁর (আ.) দোয়ার উত্তরাধিকারী হোন। অনুরূপভাবে রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালের জন্যও চিকিৎসকের প্রয়োজন রয়েছে। সেখানেও ডাক্তার সাহেবদের উচিত নিজেদেরকে উপস্থাপন করা।

এছাড়া পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশেও শিশুদের পড়াশোনা ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে সামর্থ্যবান ব্যক্তিবর্গ আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। পাকিস্তান ও ভারতের ন্যায় দেশগুলোতে যেখানে দারিদ্র্য অনেক বেশি সেখানে এ উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা দানকারীরা এই সেবার কারণে রোগীদের দোয়া পাচ্ছে। অতএব জামা'তের বন্ধুদের সেই সৎকর্মগুলোও সচল রাখা উচিত, বরং আগের চেয়ে আরো বেশি করা উচিত, কেননা দুঃখকষ্টও দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছে।

এখন আমি পুরোনো বুযূর্গদের কতিপয় ঘটনা তুলে ধরব, যারা ছিলেন সৃষ্টিসেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ।

হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব (রা.)-এর অনুকরণীয় আদর্শ প্রসঙ্গে বর্ণনাকারী লেখেন, মরহুম এমন আদর্শের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন যা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নিজের ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করতেন যেটি নিজের জন্য পছন্দ করতেন আর কখনো নিজের ভাইয়ের সাথে এমন আচরণ করতেন না যা নিজের কাছে অসহনীয়। তিনি সবসময় সুযোগের সন্ধানে থাকতেন যে, তিনি এমন কোনো সেবা করতে পারবেন বা এমন কোনো সুযোগ পাবেন যাতে তিনি তার কোনো ভাই বা বন্ধুর সাহায্য করবেন। কাজেই তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যখন তিনি কলেজে পড়াশোনা করছিলেন সেসময় জামা'তের (অনুষ্ঠানাদিতে) যখন বক্তৃতা হতো তখন তিনি আসতেন এবং সেখানে গিয়ে সব আহমদীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কোনো (আহমদী) ভাই অসুস্থ হলে তার গৃহে যেতেন, অসুখ-বিসুখের খোঁজখবর নিতেন। অনেক সময় প্রায় প্রতিদিনই সেই রোগীদের দেখতে যেতেন। একবার মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে মরহুম [আইয়ুব বেগ সাহেব (রা.)] কয়েকদিন ধরে মুফতি সাহেবের সেবার মানসে তার (রা.) গৃহে অবস্থান করে রাতদিন তার সেবাশুশ্রূষা করেন। এমনকি অসুস্থতার সময় মাঝেমধ্যে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিলে তা-ও তিনি করতেন। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৯৯-২০০)

হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.) তার মা সম্পর্কে আরো লেখেন, তিনি বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা শত্রু না হলে অন্য কোনো শত্রু কিবা ক্ষতি করতে পারে! এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তো কাউকেই শত্রু মনে করি না আর শত্রুদের সাথেও খুবই সদ্ব্যবহার করে থাকি। তিনি বলতেন, যার প্রতি হৃদয় সন্তুষ্ট তার প্রতি ভালো আচরণ করতে তো এমনিতেই মন চায়, এতে পুণ্যের কী আছে। আল্লাহ্ তা'লাকে খুশি করতে চাইলে মানুষের উচিত, সেসব লোকের সাথেও অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার করা, যাদের প্রতি অন্তর সন্তুষ্ট নয়।

তিনি (রা.) আরো লেখেন, ডেস্কায় বসবাসকালে সেখানকার লোকদের সাথে খুবই উদারতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং লোকেরাও তাকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে দেখত। আহরারীদের নৈরাজ্য আরম্ভ হলে এর প্রভাব উক্ত এলাকাতেও পড়ে, এতে যেসব লোক সাহায্য নিত তারাই শত্রুতা আরম্ভ করে। কিন্তু তাদের ঐ শত্রুতাও তাঁর মায়ের ওপর কোনো মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে নি। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ যদি একথাও বলত যে, আপনি অমুক ব্যক্তিকে সাহায্য করছেন অথচ সে আমাদের বিরোধিতা করছে এবং আহরারীদের দলভুক্ত। এতে তিনি তাদের এমন কথা খুবই অপছন্দ করতেন আর বলতেন, তোমরা আমার এই মানবসেবায় কেন বাদ সাধছ?

একবার বর্ণনাকারী লেখেন, তিনি কিছু গরম কাপড় বুনছিলেন। তখন তিনি (অর্থাৎ বর্ণনাকারী) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কার জন্য কাপড় বুনছেন? উত্তরে চৌধুরী

সাহেবের মা বলেন, এটা অমুকের সন্তানদের জন্য বানাচ্ছি। এতে সেই ব্যক্তি বলে, আপনি তো অদ্ভুত মানুষ! সে তো আহরারী আর জামা'তের চরম বিরোধিতা করে, অথচ তার জন্য আপনি এই কাপড় তৈরি করছেন? জবাবে তিনি বলেন, সে যদি দুষ্কৃতি করে তবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সুরক্ষা করবেন আর যতক্ষণ তিনি (আল্লাহ্) আমাদের সাথে আছেন বিরুদ্ধবাদীদের শত্রুতা আমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু এই ব্যক্তি অভাবী। নিজের ছেলেমেয়ে ও নাতিনাতনিকে পরনের কাপড় দেবার মতো সাধ্য তার নেই। কাজেই আমি তাকে অভাবী মনে করে তার জন্য এসব কাপড় বুনছি। তুমি যেহেতু আপত্তি করছ, তাই তোমার শাস্তি হলো, আমি এই কাপড়গুলো তৈরি করার পর সেগুলো তোমাকেই তার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, কিন্তু একই সাথে তিনি আরো বলে দেন, সে তো আহরারী, অন্য আহরারীদেরও তার প্রতি দৃষ্টি থাকবে, তাই রাতের বেলায় যাবে, যেন কেউ তাকে আহমদীদের কাছ থেকে কাপড় নিয়েছ– একথা বলে কষ্ট না দেয়। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ১১, পৃ. ১৭৫-১৭৬)

তাঁর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, বিধবা ও এতিমদের দেখাশোনা করা তাঁর পছন্দের কাজ ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, বিভিন্ন মেয়ের বিয়ের জন্য যখন জেহেয তথা উপঢৌকনের ব্যবস্থা করতেন তখন অত্যন্ত যত্নসহকারে স্বহস্তে তৈরি করতেন, (তাদেরকে) পোশাক-আশাক বানিয়ে দিতেন। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ১১, পৃ. ১৮৬)

অনুরূপভাবে হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)-ও এতিমদের দেখাশোনার প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন। দারুল ইয়াতামায় এত এতিম ছিল, তিনি 'দারুল শুইয়ূখ' আখ্যায়িত হতেন। অতএব তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একবার তিনি জ্বরের কারণে বিশ্রাম করছিলেন, তাপমাত্রা খুব বেশি ছিল, দুর্বলতা ছিল। (এমন সময়) কর্মচারী এসে বলে, খাবারের জন্য চাল-আটার ঘাটতি রয়েছে আর কোনো জায়গা থেকে এর ব্যবস্থা হচ্ছে না। সকাল থেকে ছেলেরা নাস্তাও করে নি। তিনি বলেন, অবিলম্বে টমটম নিয়ে আসো। এরপর তিনি টমটমে বসে স্বচ্ছল লোকদের বাড়ি বাড়ি যান আর শস্য সংগ্রহ করে একত্র করেন। এভাবে এসব ছেলের খাদ্যের ব্যবস্থা হয়। অতএব এটিই ছিল আমাদের জ্যেষ্ঠদের আদর্শ, জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায়ও নিজের বিশ্রাম ত্যাগ করে এতিম শিশুদের জন্য নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন আর এমনটি হবেইবা না কেন? তাঁর (রা.) দৃষ্টি তো তাঁর নেতা ও মনিব (সা.)-এর এই সুসংবাদের প্রতি ছিল যে, আমি ও এতিমের প্রতিপালক এমনভাবে জান্নাতে সহাবস্থান করব যেভাবে এই দুই আঙুলের অবস্থান। একথা বলে তিনি (সা.) শাহাদত আঙুল ও মধ্যমাকে যুক্ত করে দেখিয়েছেন। অতএব এমনই ছিল আমাদের জ্যেষ্ঠদের দৃষ্টান্ত।

হাফেয মঈনুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দেখতে পেতেন না, দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি বলেন, শীতের এক অন্ধকার রাতে কাদিয়ানের কাঁচা গলিপথ ছিল খুবই কর্দমাক্ত। বহু কষ্ট-পড়িমরি করে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন কোনো এক বন্ধুর জিজ্ঞেস করায় উত্তরে বলেন, ভাই! এখানে একটি মাদি কুকুর বাচ্চা দিয়েছে, আমার কাছে একটি রুটি ছিল, তাই আমি ভাবলাম, বৃষ্টিবাদলের দিন, অর্থাৎ বর্ষণ হচ্ছিল,

সেই রুটিটি একে দিয়ে আসি। হাফেয সাহেব যা করেছেন তা-ও (এ) সুন্নতের অনুসরণে ছিল যে, প্রাণীদের প্রতিও দয়ার্দ্র হও। এছাড়া সেই ঘটনাটিও স্মরণ রেখো! যখন কেউ কূপে নেমে নিজের জুতায় পানি ভরে কুকুরকে পানি পান করানোর ফলে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার এই পুণ্যকর্মের প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই কথায় সাহাবীরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে নিবেদন করেন, প্রাণীদের (সাথে সদয় ব্যবহারের) কারণেও কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? জবাবে তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক জীবের সাথে কৃত সদাচরণ ও অনুগ্রহের প্রতিদান পাওয়া যায়।

এক আহমদী হযরত নূর মোহাম্মদ সাহেবের আরো একটি ঘটনা রয়েছে। প্রচণ্ড শীতের মৌসুম ছিল। তাঁর কাছে (পরিধানের মতো) কোনো কোটও ছিল না আর কম্বলও ছিল না। কেবল ওপরে একটি আর নীচে একটি জামা পরে রেলগাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল, এক প্রতিবন্ধি বৃদ্ধ খালি গায়ে কাঁপছে। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের গায়ের একটি জামা খুলে সেই বৃদ্ধকে পরিয়ে দেন। একজন শিখ বন্ধুও সাথে সফর করছিল, সে এই দৃশ্য দেখে বলে ওঠে, 'ভাইয়াজি! তোমার নৌকা তো পার পেয়ে যাবে, আমার নৌকার কী ঘটবে জানা নেই।' অতএব এই ছিল উত্তম আদর্শ। আবার কয়েকদিন পর যা ঘটে তা হলো, এই নূর মোহাম্মদ সাহেবই নতুন একটি কম্বল গায়ে দিয়ে মুঘল পুরার মসজিদে ফজরের নামাযের জন্য আসেন আর দেখতে পান, ফতেহ দ্বীন নামে এক ব্যক্তি যে এক সময় অনেক বিত্তবান ছিল, রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে শীতে কাঁপছে। কাজেই নূর মোহাম্মদ সাহেব তখনই তার নতুন কম্বলটি খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দেন। (রূহ পুরূর ইয়াদেঁ, পৃ. ৬৮৭)

১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে, লক্ষ লক্ষ লুণ্ঠিত মুহাজির দলে দলে কাদিয়ান অভিমুখে যাত্রা করত। তখন অবস্থা ছিল খুবই দুর্বিষহ। মুসলমান নারীদের মানসম্ভ্রমের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না আর সকল মুসলমান মনে করত, কাদিয়ানে পৌঁছাতে পারলে আমরা নিরাপদ হয়ে যাব। তখন জামা'তের যে-সব সদস্য সেখানে অবস্থান করছিল এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে সেই সময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেখানে ইনচার্জ নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। তখন আগমনকারী সবাই অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় সেখানে পৌঁছাচ্ছিল, যাদের কারো কারো পরিধানের মতো তেমন কোনো কাপড়চোপড়ও ছিলনা, হুযূর সর্বপ্রথম নিজ গৃহের আর আত্মীয়স্বজনের বাক্সে তুলে রাখা কাপড়চোপড় বের করে তাদেরকে দেন। অতঃপর এক বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে কাফেলা যাত্রা করে আর পর্যায়ক্রমে পাকিস্তানে পৌঁছাতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে খুবই নিরাপদভাবে পৌঁছাতে থাকে আর আহমদীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে সেসব লোকের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের শর্তাবলির মধ্যে একটি হলো, আমরা এখন এই অঙ্গীকারের সাথে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি যে, বয়আত করার পর এখন আমাদের নিজের বলতে আর কিছু নেই। এখন সকল আত্মীয়তা এবং সমস্ত সম্পর্ক শুধু সেই সময় পর্যন্ত অটুট থাকবে যতক্ষণ তারা জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও হুযূর আকদাস

(আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। কোনো আত্মীয়তা বা কোনো সম্পর্ক আমাদেরকে হুযূর (আ.) থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে না। আমরা তো সেই দুয়ারের ভিক্ষুক আর এটিই আমাদের কাছে অগ্রগণ্য। অতএব এই অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়েছে আর খুব ভালোভাবে করা হয়েছে। এরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। সেগুলোর অধিকাংশই এমন যেগুলোর প্রশংসা যুগের ইমাম তাঁর নিজ ভাষায় করেছেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "একইভাবে আমাদের আন্তরিক বন্ধু মৌলবি মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী যিনি এই জামা'তের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য বিভিন্ন উন্নতমানের প্রকাশের ক্ষেত্রে সচেষ্ট। এছাড়া সাহেবযাদা পীরজি সিরাজুল হক সাহেব তো হাজার হাজার মুরিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানকার দরবেশী জীবনকেই বরণ করে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী সাহেব, মৌলবি বুরহানুদ্দীন জেহ্লেমী সাহেব, মৌলবি মোবারক আলী সিয়ালকোটি সাহেব, কাযী জিয়াউদ্দীন কাযী কোটি সাহেব, মুন্সি চৌধুরী নবী বখশ বাটালা সাহেব, জেলা গুরুদাসপুর, মুন্সি জালাল উদ্দীন ইয়ালানী সাহেব প্রমুখ বন্ধু নিজ নিজ সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী (ধর্ম) সেবায় নিয়োজিত আছেন। আমি আমার জামা'তের (সদস্যদের) ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। কেননা তাদের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিবর্গ যেমন- মিয়াঁ জামাল উদ্দীন, খাইরুদ্দীন এবং ইমাম দ্বীন কাশ্মিরী আমার গ্রামের নিকটেই বসবাস করেন। এ তিনজনই (আমার) দরিদ্র ভাই, যারা সম্ভবত দৈনিক তিন আনা বা চার আনায় শ্রমিকের কাজ করা সত্ত্বেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে নিয়মিত মাসিক চাঁদা প্রদানে অংশ নেন। তাদেরই বন্ধু মিয়াঁ আব্দুল আযীয পাটোয়ারীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখেও আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। কেননা আর্থিক অনটন সত্ত্বেও একদিন তিনি এসে একশ রুপি দিয়ে বলে গেছেন, আমি চাই এই অর্থ যেন খোদার পথে ব্যয় হয়। এই দরিদ্র ভাই সম্ভবত বেশ কয়েক বছরে এই অর্থ জমা করে থাকবেন। তবে ধর্মসেবার প্রেরণা খোদার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। (আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১১, পৃ. ৩১৩-৩১৪)

তিনি (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রসঙ্গে বলেন, "অঢেল সম্পদ থেকে খোদার রাস্তায় যৎসামান্য ব্যয় করতে আমি অনেক মানুষকেই দেখেছি, তবে নিজে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে নিজের প্রিয় সম্পদ খোদার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে উজাড় করে দেওয়া এবং নিজের জন্য এ জগতে কিছুই না করার এই বৈশিষ্ট্য আমি উল্লিখিত মৌলবি সাহেবের মাঝেই পরিপূর্ণরূপে দেখতে পেয়েছি... তাঁর সম্পদে আমি যতটা উপকৃত হয়েছি তার দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত আমার কাছে নেই।" (নিশানে আসমানী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৪০৮)

আবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল মৌলবি নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে লেখেন, "আমি আপনার সমীপে নিবেদিত, যা কিছু আমার তা আমার নয়, বরং আপনার। হযরত পীর ও মুর্শিদ! আমি পরিপূর্ণ সততার সাথে নিবেদন করছি, আমার সমস্ত ধনসম্পদ ধর্ম-প্রচারের কাজে ব্যয়িত হলে আমি আমার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি।' (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৬)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব প্রসঙ্গে বলেন, "হিব্বী ফীল্লাহ্ (খোদার পথে আমার বন্ধু)! মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব, যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ যুবক এবং স্বল্পভাষী, নিষ্ঠাবান ও সূক্ষ্মচিন্তার অধিকারী ব্যক্তি, অর্থাৎ খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁর ভেতর অবিচলতার জ্যোতি বিদ্যমান। বিশ্বস্ততার নিদর্শন ও লক্ষণাবলি বিরাজমান। প্রমাণিত সত্যের উত্তম ব্যুৎপত্তি রাখেন আর এর স্বাদ তিনি আস্বাদন করে থাকেন। আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর প্রতি তিনি প্রকৃত ভালোবাসা পোষণ করেন। এছাড়া যাবতীয় কল্যাণ লাভের ভিত্তি যে শিষ্টাচার এবং এই পথে সফলতা লাভের বাহন যে সুধারণা– সেই উভয় জীবনাচার তার মাঝে পাওয়া যায়, অর্থাৎ কল্যাণমণ্ডিত হওয়া আর সুধারণা পোষণ করা, যেগুলোর তিনি সমাবেশ স্থল, অর্থাৎ এই উভয় গুণই তার মাঝে বিদ্যমান। জাযাহুমুল্লাহু খায়রাল জাযা, (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন –অনুবাদক)।"

আবার হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রা.) প্রসঙ্গে বলেন, "হিব্বী ফীল্লাহ্ (খোদার পথে আমার বন্ধু)! মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রা.) সৎ ও ন্যায়পরায়ণ যুবক ছিলেন। নিজের স্বভাবগত সামঞ্জস্যের কারণে সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, তিনি সেসব বিশ্বস্ত বন্ধুর অন্তর্গত যাদেরকে কোনো পরীক্ষা টলাতে পারে না।" অর্থাৎ কোনো পরীক্ষাই তাদের নিজ অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। "বিভিন্ন সময়ে সে দুই-দুই, তিন-তিন মাস পর্যন্ত বরং এরও চেয়ে অধিক সময় ধরে আমার সাহচর্যে অবস্থান করে এবং আমি গভীরভাবে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি।" অর্থাৎ আমি গভীরভাবে লক্ষ করে আসছি। "অতএব আমার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এর গভীরে অবগাহন করে যা কিছু উদ্ধার করেছে তা হলো, এই যুবক আসলেই আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার এক গভীর প্রেরণা রাখে আর আমার সাথে এতটা ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যে, এটা ছাড়া আর অন্য কোনো কারণ নাই যে, তার অন্তরে এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, এই ব্যক্তি খোদা ও রসূল (সা.)-এর প্রেমিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।" (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫৩১)

অতঃপর হযরত মুন্সি আরোড়া সাহেব (রা.) প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হিব্বী ফীল্লাহ্ (যাকে খোদার খাতিরে ভালোবাসি)! মুন্সি মুহাম্মদ আরোড়া সাহেব হলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের নকশাকার (ড্রাফট্সম্যান)। মুন্সি সাহেব ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ একজন মানুষ। সত্যের প্রেমিক আর সত্যকে বুঝতে তাঁর সময় লাগে না। সেবাকর্মকে একান্ত উদ্দীপনার সাথে পালন করেন।" খুবই আগ্রহের সাথে কার্য সম্পাদন করেন। "বরং তিনি তো দিনরাত খেদমতের সুযোগ সন্ধানে নিমগ্ন থাকেন। স্নেহাস্পদ একজন উদার মনের অধিকারী ও নিবেদিতপ্রাণ মানুষ।" অর্থাৎ খোলা মনে সত্য গ্রহণকারী ও আত্মোৎসর্গকারী ছিলেন। "এই অধমের সাথে তার এক প্রেমময় সম্পর্ক আমি লক্ষ করে থাকি। নিজস্ব শক্তিসামর্থ্য, অর্থকড়ি আর নিজ সত্তার প্রতিটি শক্তিবৃত্তি দিয়ে কোনো না কোনো সেবা করার সুযোগ লাভের চেয়ে বড়ো কোনো আনন্দের বিষয় সম্ভবত তার জন্য আর নেই। তিনি হলেন মনেপ্রাণে একজন বিশ্বস্ত, অবিচল ও সাহসী এক ব্যক্তি।"

সর্বাবস্থায় তিনি বিশ্বস্ত, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী এবং নির্ভীক এক ব্যক্তি। "খোদা তা'লা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।"

অতঃপর তিনি (আ.) আরো বলেন, "হিব্বী ফীল্লাহ্ (যাকে খোদার খাতিরে ভালোবাসি)! মিয়াঁ মোহাম্মদ খান সাহেব কপুরথলা স্টেটে চাকুরিরত আছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, স্বচ্ছ হৃদয়, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল ও সত্যপ্রেমিক।" অর্থাৎ সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তিসম্পন্ন, সত্য সচেতন ও সত্যের প্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। আমার প্রতি তার যে কী পরিমাণ ভালোবাসা, আত্মনিবেদন ও সুধারণা রয়েছে তা কল্পনাতীত! তার ব্যাপারে আমার কোনো আশঙ্কা ও ভয় নেই যে, আমার প্রতি তার এই ভক্তিতে কখনোই ব্যত্যয় ঘটতে পারে, বরং আমি চিন্তিত, এটি না আবার সীমাতিক্রম করে বসে। সত্যিকার অর্থেই তিনি বিশ্বস্ত, উৎসর্গীকৃত ও দৃঢ়চিত্ত এক ব্যক্তি। আল্লাহ্ তার সাথি হোন, তার ছোটো ভাই সর্দার আলী খানও বয়আত করে আমাদের জামা'তভুক্ত হয়েছে। তার ভাইয়ের ন্যায় এই যুবকও অত্যন্ত পুণ্যবান ও সুস্থ চিন্তার অধিকারী।" অর্থাৎ অত্যন্ত নেক ও সরল পথের অনুসারী। "আল্লাহ্ তা'লা তাদের উভয়কেই নিরাপদ রাখুন।" (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫৩২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "পটিয়ালার সামানা অঞ্চলের রঈস আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই মরহুম মির্যা আজম বেগ সাহেবের তিরোধান আমাদেরকে শোকে মুহ্যমান করেছে। তিনি হিজরী ১৩০৮ সনের রবিউস সানী মাসের ২ তারিখে ইহজগৎ ত্যাগ করে পরলোকবাসী হয়েছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বলা হয় যে, 'আল আইনু তাদমাউ ওয়াল কালবু ইয়াহ্যুনু ওয়া ইন্না বিফিরাকিহি লামাহ্যুনুন', অর্থাৎ চোখ হতে অশ্রু প্রবহমান, অন্তর দুঃখভারাক্রান্ত আর আমরা তাকে হারিয়ে শোকাকুল। মির্যা সাহেব মরহুম যেভাবে কেবল আল্লাহ্র খাতিরে আমার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং আমার মাঝে বিলীন ছিলেন সেই প্রেমময় অবস্থা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তার অকাল মৃত্যুতে আমি এতটাই মর্মাহত যে, অতীতে আমার এমন অনুভূতি খুবই বিরল। তিনি আমাদের (পছন্দের) মানুষ এবং আমাদের কাফেলার নেতা ছিলেন, অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে তার মহান মর্যাদা রয়েছে, উন্নতির পথে তিনি ছিলেন খুবই অগ্রগামী। তাঁর ভেতর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল। যিনি দেখতে দেখতেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। যত দিনই আমরা জীবিত থাকব তার বিরহ বেদনা আমরা ভুলতে পারব না। তার বিরহের কথা মনে হলে প্রকৃতিতে দুঃখের ভাব এবং কষ্টের আতিশয্যে বুকে তীব্র ব্যথা, মনে দুঃখ আর চোখ বেয়ে নামে অশ্রু ধারা। তার পুরো সত্তা ছিল ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। মরহুম মির্যা সাহেব প্রেমাতিশয্য প্রকাশে খুবই সাহসী ছিলেন।" (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৯)

হযরত কাযী জিয়াউদ্দীন সাহেব লেখেন, দোয়া করি। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে তিনি বিবৃতি দিচ্ছিলেন, হে আমার নেতা ও মনিব! আমি আমার অন্তরে পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা তরঙ্গায়িত হতে দেখছি। একদিকে তো আমি খুবই নিষ্ঠার সাথে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, হুযূর (আ.)-এর সত্যতাও আধ্যাত্মিক জ্যোতি সম্পর্কে বহির্বিশ্ব শীঘ্র অবগত

হয়ে যাক এবং সকল জাতি ও বিশ্বাসের মানুষ এসে এই ঝরনাধারা থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হোক, যা আল্লাহ্ তা'লা এখানে উৎসারিত করেছেন। কিন্তু অপরদিকে এই সদিচ্ছার সাথে সাথেই এ ধারণায় আমার অন্তর একান্তই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে যে, অন্য লোকেরাও যখন হুযূর (আ.) সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে এবং বহু সংখ্যায় এখানে আসতে থাকবে তখন তো আমি হুযূর (আ.)-এর সেই পবিত্র সাহচর্য ও নৈকট্য হতে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হবো। এমন অবস্থায় তিনি অন্য লোকদের বাড়িঘরেও যাবেন।

পরম শ্রদ্ধেয় হুযূর! আমার প্রিয় নেতা ও মনিবের সাহচর্যে বসা এবং কথাবার্তা বলার যে আনন্দদায়ক সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে তা থেকে তো আমি বঞ্চিত হয়ে যাব। এমন বহুমুখী চিন্তাচেতনা আমার মানসপটে অহরহ উদিত হয়ে চলেছে।

কাযী সাহেব বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার এসব কথা শুনে মুচকি হাসেন। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০৬, পৃ. ১০)

কাযী জিয়াউদ্দীন সাহেব (রা.)-এর আরো একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাযী আব্দুর রহীম সাহেব (রা.) লোকদের শোনাতেন, একবার পিতা মহোদয় আনন্দের সাথে বলেন, আমিও যুবক ছিলাম এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে তাঁর সেবক হযরত হাফেয হামেদ আলী সাহেব (রা.) আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে? উত্তরে হুযূর (আ.) আমার নাম ও ঠিকানা বলেন আর একইসাথে আরো বলেন, এই ব্যক্তি আমার ভক্ত। কাযী সাহেব (রা.) এ বিষয় নিয়ে গর্ব করতেন আর (বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে) বলতেন, হুযূর (আ.) আমার অন্তরের অবস্থা কী করে জানলেন? এটি ছিল এই প্রেমানুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ যে, কাযী সাহেব তার মৃত্যুকালে নিজ সন্তানদের ওসিয়্যত করেছিলেন, তোমাদেরকে আমি খুবই কষ্ট করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দ্বারে নিয়ে এসেছি, এখন আমার মৃত্যুর পর এই দ্বার কখনোই পরিত্যাগ করবে না। ফলে তাঁর (রা.) সন্তানরাও একথার ওপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড: ০৬, পৃ. ৮-৯)

হযরত মৌলবি নিয়ামত উল্লাহ্ সাহেবকে ১৯২৪ সনে কাবুলে শহীদ করা হয়। শাহাদত লাভের পূর্বে তিনি জেলখানা থেকে এক আহমদী বন্ধুকে পত্র লেখেন আর সেই পত্রে উল্লেখ করেন, "আমি জেলখানায় প্রতিটি মুহূর্তে খোদার সমীপে এই দোয়ায় রত থাকি যে, হে আমার খোদা! এই অযোগ্য বান্দাকে ধর্মের কাজে সাফল্য দান করো। আমি কারাবন্দি জীবন হতে মুক্তি কামনা করি না বরং আমি নিবেদন করি, হে আমার মা'বুদ! এই অধম সত্তার প্রতিটি কণা আহমদীয়াতের জন্য নিবেদিত হোক। (তারীখে আহমদীয়াত, খণ্ড: ০৫)

আবার এই দশম শর্তের অধীনেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এমন এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে যা হবে অতুলনীয়। এটি সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেবের একটি ঘটনা। ১৯০৭ সনে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারাত্মক টাইফয়েডে আক্রান্ত হন। তার অসুস্থতার যুগে কেউ একজন স্বপ্নে দেখে, মোবারক আহমদের বিয়ে হচ্ছে। আর

স্বপ্ন-বিশারদরা লিখেছেন, অপরিচিত নারীর সাথে বিয়ে হওয়া দেখলে এর অর্থ হয় মৃত্যু। তবে স্বপ্ন-বিশারদদের কারো কারো মতে এমন স্বপ্ন যদি বাস্তবে পূর্ণ করে দেওয়া হয় তাহলে কখনো কখনো তা টলে যায়। অতএব স্বপ্ন দর্শনকারী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্নটি শোনালে তিনি (আ.)-ও বলেন, এর ব্যাখ্যা মৃত্যুই, তবে বাস্তবে পূর্ণ করে দেওয়া হলে কখনো কখনো স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা বদলে যায়। এজন্য চলো! এসো মোবারক আহমদের বিয়ে দিয়ে দেই। যদিও সেই শিশু যার বিয়েশাদির কোনো ধারণাই ছিল না, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার বিয়ের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। হুযূর (আ.) যখন এসব কথা বলছিলেন তখন ঘটনাচক্রে হযরত ডাক্তার সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেব (রা.)-এর স্ত্রী সৈয়্যদা সাঈদাতুন নেসা বেগম সাহেবাকে উঠানে দেখা যায়, তিনি এখানে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে ডেকে বলেন, আমার মোবারক আহমদকে বিয়ে করাতে চাই। মরিয়ম আপনার কন্যা, আপনি পছন্দ করলে তার সাথে মোবারক আহমদের বিয়ে দেওয়া যায়। তিনি বলেন, হুযূর! এতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু হুযূর কিছুটা সময় দিলে ডাক্তার সাহেবকেও জিজ্ঞেস করে নিতে চাই। সেই দিনগুলোতে মরহুম ডাক্তার সাহেব এবং তার পরিবার গোল কামরায় থাকতেন। তিনি (অর্থাৎ ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী) নীচে যান। ডাক্তার সাহেব সম্ভবত সেখানে ছিলেন না, হয়ত বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি চলে আসেন। ডাক্তার সাহেব আসার পর তিনি তার সাথে এভাবে কথা শুরু করেন যে, আল্লাহ্ তা'লার ধর্মে কেউ প্রবেশ করলে অনেক সময় তার ঈমানের পরীক্ষা হয়। আল্লাহ্ তা'লা যদি আপনার ঈমানের পরীক্ষা নেন তাহলে কি আপনি এই বিশ্বাসে অবিচল থাকবেন? তখন তার মাথায় দুটি চিন্তা কাজ করছিল যে, ডাক্তার সাহেব হয়ত তার জন্য এই আত্মীয়তা করতে দ্বিধা করবেন। প্রথমত, ইতিপূর্বে তাদের পরিবারের কোনো মেয়ের সৈয়্যদ বংশের বাইরে বিয়ে হয় নি। আর দ্বিতীয়ত, মোবারক আহমদ এক প্রাণহারী রোগে আক্রান্ত ছিল। মরহুম ডাক্তার সাহেব স্বয়ং তার চিকিৎসা করছিলেন আর এ কারণে তিনি ভাবতে পারেন, এই বিয়ে ৯৯ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ। আর এর ফলে মেয়ের কপালে শীঘ্রই বৈধব্যের তিলক লেগে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। এসব বিষয়ের জন্য ডাক্তার সাহেবের গৃহিণীর এই ধারণা ছিল যে, ডাক্তার সাহেব না আবার দুর্বলতা দেখিয়ে বসেন আর তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, এজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার ঈমানের পরীক্ষা নিলে আপনি কি দৃঢ়চিত্ত থাকবেন? উত্তরে ডাক্তার সাহেব বলেন, আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ঈমানে দৃঢ়তা দান করবেন। একথা শুনে মরিয়ম বেগমের মরহুমা মাতা তার নিজের কথা জানিয়ে বলেন, এভাবে আমি ওপরে গিয়েছিলাম আর তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রস্তাব দিয়েছেন, মোবারক আহমদের সাথে মরিয়মের বিয়ে দিন। একথা শুনে ডাক্তার সাহেব বলেন, ভালো কথা! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যদি একে পছন্দ করেন তাহলে আমাদের আর কী আপত্তি থাকতে পারে? তার এই উত্তর শুনে মরিয়ম বেগমের মরহুমা মাতা কেঁদে ফেলেন আর অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা সর্বদা বৃদ্ধি করতে থাকুন। এতে মরহুম ডাক্তার সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কী হলো! এই সম্বন্ধ কি তোমার পছন্দ নয়? তিনি বলেন, আমার পছন্দ; কিন্তু কথা হলো, হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.) বিয়ের কথা বলার পর থেকেই আমার বুক ধড়ফড় করছিল আর আমি ভয় পাচ্ছিলাম পাছে আপনার ঈমানটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখন আপনার উত্তর শোনার পর আনন্দে আমি আর অশ্রু ধরে রাখতে পারছি না। ফলে এই বিয়ে হয়ে যায় আর কয়েক দিন পর সেই মেয়েটি বিধবা হয়ে যায় (কেননা রোগটি ভয়ানক ছিল)। এখন দেখুন! আল্লাহ্ তা'লাও ডাক্তার সাহেবের নিষ্ঠা বিফলে যেতে দেন নি। পরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সাথে তার বিয়ে হয় যার নাম ছিল হযরত উম্মে তাহের মরিয়ম সিদ্দীকা (রা.)। (দৈনিক আল-ফযল, কাদিয়ান, ০১ আগস্ট ১৯৪৪, পৃ. ১-২ এবং সীরাত সৈয়্যদ আব্দুস সাত্তার শাহ, পৃ. ১২২-১২৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেব (রা.) সম্পর্কে লেখেন, "এ দিনগুলোতেই যখন আমার প্রতি অনবরত খোদার এই ওহী অবতীর্ণ হয় এবং অত্যন্ত জোরালো ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রকাশিত হয় আর আমার মসীহ্ মওউদ হবার দাবি দলিলপ্রমাণসহ পৃথিবীতে প্রচারিত হয় তখন ঘটনাক্রমে কাবুলের খোস্ত অঞ্চলের আখুয়ান্দযাদা মৌলবি আব্দুল লতীফ নামে একজন বুযূর্গের কাছে আমার পুস্তকাদি পৌঁছায়। সেসব দলিলপ্রমাণ যা আমি যুক্তি, প্রমাণ এবং ঐশী সাহায্যের বরাতে নিজের বইপুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছিলাম, (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে আমি আমার বইপুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি) সেসব দলিলপ্রমাণ তাঁর গোচরীভূত হয়। যেহেতু সেই পুণ্যাত্মা পরম পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, খোদাভীরু ও মুত্তাকী ছিলেন, তাই তার হৃদয়ে এসব দলিলপ্রমাণের গভীর প্রভাব পড়ে এবং এই দাবির সত্যায়নে তাঁকে কোনো বেগ পেতে হয় নি। কাজেই তাঁর পবিত্র বিবেক তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নেয় যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মনোনীত এবং এই দাবি সঠিক। তখন তিনি আমার পুস্তকগুলো গভীর অনুরাগের সাথে পড়তে শুরু করেন এবং তাঁর অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সত্য গ্রহণেচ্ছু আত্মা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনকি আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে দূরে বসে থাকা তাঁর জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে এই শক্তিশালী আকর্ষণ, অনুরাগ ও আন্তরিকতার যে ফলাফল দাঁড়ায় তা হলো, হজ্জের জন্য দৃঢ়সংকল্প করেছেন, তাই তিনি কাবুল সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভের প্রত্যাশায় কাবুলের আমীরের নিকট এই সফরের অনুমতির জন্য আবেদন করেন। যেহেতু কাবুলের আমীরের দৃষ্টিতে তিনি অনেক বড়ো একজন আলেম ছিলেন আর তাঁকে সকল আলেমের নেতা মনে করা হতো, তাই তাঁকে কেবল অনুমতিই দেওয়া হয় নি, বরং উপহারস্বরূপ কিছু অর্থও প্রদান করা হয়। অতএব তিনি অনুমতি লাভের পর কাদিয়ানে পৌঁছেন। সেই খোদার কসম করে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার সাথে সাক্ষাৎ হবার পর আমি তাঁকে আমার আনুগত্যে এবং আমার দাবির সত্যায়নে এতটা বিলীন দেখতে পাই যার চেয়ে বেশি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেভাবে একটি শিশি আতরে পরিপূর্ণ থাকে, অনুরূপভাবে আমি তাঁকে আমার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ দেখতে পাই, তাঁর চেহারার মতোই তাঁর হৃদয়ও আমার কাছে জ্যোতির্ময় মনে হচ্ছিল।" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ৯-১০)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) প্রসঙ্গে বলেন,

"আমি এখানে একথা প্রকাশ না করে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না, কেননা খোদা তা'লার কৃপা ও করুণা আমাকে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে নি। আমার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনকারীরা এবং খোদা তা'লার নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত এ জামা'তে যোগদানকারীরা ভালোবাসা ও আন্তরিকতার রঙে এক বিস্ময়করভাবে রঙিন। আমার নিজের পরিশ্রমে নয়, বরং খোদা তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে সততায় পরিপূর্ণ এসব পবিত্রাত্মাকে আমাকে দান করেছেন। সবার আগে আমি আমার এক আধ্যাত্মিক ভাইয়ের নাম বলার জন্য হৃদয়ে এক গভীর প্রেরণা অনুভব করি। তাঁর নাম তাঁরই আন্তরিকতার জ্যোতির ন্যায় 'নূরে দ্বীন'।

আমি তাঁর সেসব ধর্মসেবাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি, যে সেবাগুলোতে তিনি ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার জন্য নিজের বৈধ ধনসম্পদকে অকাতরে ব্যয় করে যাচ্ছেন। হায়! সেসব সেবা যদি আমার দ্বারাও সম্পাদিত হতো। তাঁর হৃদয়ে সত্যধর্মের সমর্থনে যে উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস বিরাজমান তা ভাবলে ঐশী কুদরত বা ক্ষমতার চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অর্থাৎ তিনি কীরূপে তাঁর বান্দাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন! তিনি তার সমস্ত সম্পদ এবং সকল শক্তি আর তার সম্ভাব্য সকল উপকরণসহ (অর্থাৎ যে সম্পদ তাঁর হস্তগত রয়েছে তা নিয়ে) আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর আজ্ঞাপালনের জন্য সদা সোচ্চার। কেবল সুধারণার বশবর্তী হয়ে নয়, বরং আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি শতভাগ নিশ্চিত জ্ঞান রাখি যে, তিনি আমার হাতে শুধু ধনসম্পদই তুলে দেন নি বরং প্রাণ ও সম্মান উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত নন। আমি যদি অনুমতি দিতাম তবে তিনি এ পথে সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে তাঁর আত্মিক বন্ধুত্বের ন্যায় বাহ্যিক বন্ধুত্ব এবং সর্বদা সাহচর্যে অবস্থানের কর্তব্যও পালন করতেন। তাঁর কোনো কোনো চিঠির কয়েকটি লাইন নমুনাস্বরূপ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি, যেন তারা জানতে পারেন জম্মু রাজ্যের রাজ-চিকিৎসক আমার প্রিয় ভাই মৌলবি হেকীম নূরুদ্দীন ভেরবী ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় কতটা উচ্চমার্গে আরোহণ করেছেন, আর সেই লাইনগুলো হলো:

"মওলানা, মুর্শিদানা ও ইমামানা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মহাত্মন! আমার দোয়া হলো– আমি যেন সর্বদা হুযূরের সমীপে উপস্থিত থাকতে পারি এবং যুগ-ইমামকে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সংস্কারক করা হয়েছে তা যেন অর্জন করি। অনুমতি পেলে আমি চাকুরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে দিন-রাত মহাশয়ের সেবায় পড়ে থাকব। অথবা আদিষ্ট হলে এই সঙ্গ ত্যাগ করে জগৎময় ঘুরে ঘুরে লোকদেরকে সত্যধর্মের দিকে আহ্বান জানাবো এবং এ পথেই প্রাণ বিসর্জন দেবো। আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, বরং আপনার। হযরত পীর ও মুর্শিদ! আমি পূর্ণ সততার সাথে নিবেদন করছি, আমার সমস্ত সম্পদ যদি ধর্মপ্রচারে ব্যয় হয়ে যায় তাহলে আমি (মনে করব) আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে আমি পৌঁছে গেছি।... আপনার সাথে আমার 'ফারুকী' সম্পর্ক রয়েছে। এ পথে আমি সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। দোয়া করুন! আমার মৃত্যু যেন সিদ্দীকদের ন্যায় মৃত্যু হয়।"

জনাব মৌলবি সাহেবের নিষ্ঠা, সাহসিকতা, তাঁর সহমর্মিতা ও দিয়ানতদারী তাঁর কথায়

যেভাবে প্রকাশ পায় তার চেয়েও বেশি প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর বাস্তব জীবনাচার এবং একনিষ্ঠ সেবার মাধ্যমে। পরম ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ প্রেরণায় তিনি সবকিছু, এমনকি তাঁর পরিবারিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও এই পথে বিলিয়ে দিতে চান। তাঁর আত্মা ভালোবাসার আবেগময় উচ্ছ্বাসে তাঁর শক্তির চেয়েও বেশি অগ্রসর হতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করছে। আর প্রতিটি মুহূর্ত এবং ক্ষণ তিনি সেবায় রত রয়েছেন। (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৫-৩৮)

এক আপত্তিকারীকে উত্তর দিতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখেন, "আপনি বলে থাকেন, একমাত্র হেকীম নূরুদ্দীন সাহেবই এই জামা'তে ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের অধিকারী, অন্যরা এমন বা তেমন। এই মিথ্যা অপবাদের কী উত্তর আপনি দেবেন তা আমি জানি না তবে আমি শপথ করে বলতে পারি যে, আমার জামা'তে অন্ততপক্ষে এক লাখ লোক এমন রয়েছে যারা সর্বান্তঃকরণে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর সময়োপযোগী সৎকর্মও করে। আলোচনা শোনার সময় তারা এত কাঁদেন যে, কাঁদতে কাঁদতে তাদের বুক পর্যন্ত ভিজে যায়। আমার হাতে বয়আতকারী হাজার হাজার মানুষের মাঝে আমি এমন পবিত্র পরিবর্তন লক্ষ করি যা মূসা নবীর অনুসারীদের চেয়ে হাজার গুণ ভালো মনে করি যারা তাঁর [অর্থাৎ মূসা (আ.)] জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। আমি তাদের (অর্থাৎ বয়আতকারীদের) চেহারায় সাহাবীদের অনুরূপ বিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধির জ্যোতি দেখতে পাই। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতিগত ত্রুটি ও দুর্বলতার কারণে আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে বিরল কেউ যদি কিছুটা পিছিয়ে থাকে তবে তা ব্যতিক্রমই বটে।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমি লক্ষ করছি, আমার জামা'ত পুণ্যকর্ম ও আত্মশুদ্ধিতে যতটা উন্নতি সাধন করছে সেটিও একটি নিদর্শন। হাজার হাজার মানুষ আন্তরিকতার সাথে নিজেদের উৎসর্গ করে রেখেছে। তাদেরকে যদি বলা হয়, আজ নিজেদের যাবতীয় ধনসম্পদ ও সহায়সম্বলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো, তবে তারা তা-ও করতে প্রস্তুত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে আরো অধিক উন্নতি করার বিষয়ে আমি সর্বদা অনুপ্রাণিত করে থাকি এবং তাদের পুণ্যের কথা তাদেরকে না শোনালেও মনে মনে আমি খুবই আনন্দিত হই।" (সীরাতুল মাহদী, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৬৫)

এ তো মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছিল যা আমি তুলে ধরেছি। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় এই জামা'তে এমন হাজার হাজার, বরং লাখ লাখ দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজ যুগে লাখ লাখ সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এখন তো সে সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা তাদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকেই এমন আছেন যাদের বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, সম্পর্ক-বন্ধন, ভালোবাসা ও আনুগত্যের ঘটনা দৃশ্যপটে আসে নি। এসব লোক নীরবে এসেছেন আর প্রেম, বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক এবং আনুগত্যের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অগোচরেই চলে গিয়েছেন। এমনসব নিষ্ঠাবান ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সন্তানদের উচিত তাদের নিজেদের ধর্মপরায়ণ পূর্বপুরুষদের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করে রাখা আর জামা'তের কাছেও তা সংরক্ষিত করানো। নিজেদের প্রজন্মকেও জানাতে থাকুন যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা, প্রবীন

ধার্মিকগণ উঁচু মানের এসব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন আর তাদের সেই ঐতিহ্য আমাদেরও ধরে রাখতে হবে। আমরা যেখানে আমাদের প্রবীনদের ঈর্ষা করি, কীভাবে তারা কুরবানী করে যুগ-ইমামের দোয়ার উত্তরাধিকারী হয়েছেন, সেখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখুন, আজ পর্যন্ত ঐ দোয়ার ফল লাভের সুযোগ বিদ্যমান। আসুন! ক্রমাগতভাবে আমরা সেসব বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, আনুগত্য, সম্পর্ক-বন্ধন ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণের উত্তরাধিকারী হই। স্মরণ রাখুন! যতদিন এমন দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে, ততদিন জাগতিক এসব বিরোধিতা আমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্য সর্বদা স্মরণ রাখবেন "যমীন তুমহারা কুছ ভি বিগাড় নেহি সাকতি আগার তুমহারা আসমান সে পোখ্তা তায়াল্লুক হো" (অর্থাৎ জগৎ তোমাদের কোনোই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না– স্বর্গের সাথে তোমাদের সম্পর্ক যদি সুদৃঢ় হয় –অনুবাদক।)

পবিত্র সেসব পরিবর্তন অন্যরাও প্রত্যক্ষ করে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। সেসব পরিবর্তন এতই সুস্পষ্ট ছিল যে, তারাও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তারা স্বীকার করেছে, যুগ-ইমামকে মান্য করে আহমদীদের ভেতর অনেক পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তবুও তাদের এই জপন যে, 'আমি মানব না'। যাহোক, তাদেরই সেসব স্বীকারোক্তিমূলক উদ্ধৃতি থেকে কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

আল্লামা ইকবাল লিখেছেন, "পাঞ্জাবে ইসলামী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খাঁটি নমুনা, সেই জামা'তের আদলে প্রকাশিত হয়েছে যাদের কাদিয়ানী ফির্কা বলা হয়।" (কওমী যিন্দেগী অর মিল্লাতে ব্যয়যা পর এক ওমরানী নাযার, পৃ. ৮৪)

আল্লামা নিয়াজ ফতেহপুরী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে লিখেছে, "এটা অস্বীকার করা যায় না যে, সত্যই তিনি ইসলামী চারিত্রিক মূল্যবোধ পুনর্জীবিত করেছেন আর এমন এক জামা'ত সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন যাদের আচরিত জীবনকে নিশ্চয় আমরা নবীর জীবনাদর্শের প্রতিফলন বলতে পারি।" (মুলাহেযাতে নিয়াজ ফতেহপুরী, পৃ. ২৯)

দিল্লি থেকে প্রকাশিত স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন, "কাদিয়ানের পবিত্র শহরে এক ভারতীয় নবী জন্ম লাভ করেছেন, যিনি তাঁর চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশকে পুণ্য ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ করেছেন। এই উত্তম গুণাবলি তাঁর মান্যকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনাচরণেও ছাপ ফেলেছে"। (স্টেটস্ম্যান দিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯)

আব্দুর রহীম আশরাফ আযাদ, আহমদীয়া জামা'তের অভ্যন্তরীণ উন্নতিতে উদ্ভূত বিপ্লব প্রসঙ্গে লিখেছেন, "হাজার হাজার এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা এই নূতন বিশ্বাসের জন্য নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করেছেন। জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি সয়ে নিয়েছেন আর নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ উৎসর্গ করেছেন... আমরা অকপটে স্বীকার করছি, কাদিয়ানীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা এমন– যারা একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে একে সত্য

জ্ঞান করে, এর জন্য ধনসম্পদ ও প্রাণ এবং জাগতিক সহায়সম্বল এবং সকল সম্পর্ককে বিসর্জন দেয়। এরাই এমন– যাদের কোনো কোনো ব্যক্তিত্ব কাবুলে মৃত্যুদণ্ডকে সানন্দে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে আবার কেউ কেউ সুদূর বহির্বিশ্বে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন অবলম্বন করছে।" (সাপ্তাহিক আল-মিম্বর, লায়ালপুর, ২ মার্চ ১৯৫২, পৃ. ১০)

এতৎসত্ত্বেও ঐসব লোকদের দুর্ভাগ্য যে, মেনে নেবার সৌভাগ্য তাদের হয় নি। আলহামদুলিল্লাহ্, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র, তাদের এই স্বীকারোক্তি আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। আর আমরা যেন বয়আতের অঙ্গীকারের প্রতিটি শর্ত নিজেদের জন্য আবশ্যক মনে করে, এর প্রতিপালনকারী ও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উত্তরাধিকারী হই– একান্তভাবে এ দোয়াই থাকবে। আমীন।

(২৭)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৪ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ২৪ ইখা, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٤﴾
اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ
اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٥﴾

(আল-বাকারা: ১৮৪-১৮৫)

দু-তিন দিনের মধ্যে রমযান শুরু হবে, ইনশাআল্লাহ্। এই কল্যাণময় মাস নিজের সাথে অগণিত আশিস নিয়ে আসে। আর যারা মুমিন, তাকওয়ার পথে বিচরণকারী, তাকওয়াসজ্জিত জীবনযাপনকারী এবং এই দিনগুলোতে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যারা রোযা রাখে, তাদেরকে অজস্র কল্যাণে ধন্য করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই কল্যাণরাজি লুফে নেবার সামর্থ্য দিন।

এইমাত্র যে আয়াতগুলো আমি পাঠ করলাম তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, **"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য (সেভাবে) রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। (তোমরা রোযা রাখবে) হাতেগোনা কয়েকটি দিন মাত্র! তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে সেক্ষেত্রে (তাকে) অন্যান্য দিন থেকে গণনা পূর্ণ করতে হবে। আর যারা এর (অর্থাৎ রোযা রাখার) সামর্থ্য রাখে না তাদের 'ফিদিয়া' হলো একজন দরিদ্রকে খাবার খাওয়ানো। অতএব যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুণ্যকর্ম করে তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি জানতে (তাহলে বুঝতে) রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।"**

এখানে 'হে যারা ঈমান এনেছ!' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এ সম্বন্ধে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"মুমিন তারা– যাদের কর্ম তাদের ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যাদের হৃদয়ে ঈমান গ্রথিত করা হয় এবং যারা খোদা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়, আর খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই খোদাভীতির সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ পথ বেছে নেয় এবং তাঁর ভালোবাসায় বিভোর হয়ে যায়।**

আবার প্রতিমার ন্যায় যে-সব বস্তু খোদাপ্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়, তা চারিত্রিক অবস্থাই হোক বা অপকর্ম হোক অথবা আলস্য ও উদাসীনতাই হোক; সবকিছুর সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করে।"

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদত্ত মুমিনের এই সংজ্ঞার মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল, মুমিন হওয়া এত সহজ কাজ নয়। তোমাদেরকে তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথ অবলম্বন করতে হবে, তবেই মুমিন আখ্যায়িত হতে পারবে। তাকওয়ার এই সূক্ষ্ম পথ বলতে আসলে কী বুঝায়? তিনি (আ.) বলেন, "এই পথ তখনই তোমরা অবলম্বন করতে পারবে যখন তোমাদের নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তোমাদের প্রতিটি কাজকর্ম খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অর্জনের উদ্দেশ্যে হবে। যদিও খাবার খাওয়া তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম এবং হালাল খাবার খাওয়া বৈধ; কিন্তু যদি খোদা বলেন, আমার সন্তুষ্টির খাতিরে এই এক মাস তোমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে আর যে জিনিসগুলো তোমাদের জন্য বৈধ, সেগুলোও ফজর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত তোমাদের জন্য অবৈধ হয়ে যায়। আমার সন্তুষ্টির খাতিরে এখন তোমাদেরকে এসব বৈধ এবং হালাল জিনিসগুলোকেও বর্জন করতে হবে। সকল প্রকার আলস্য পরিত্যাগ করতে হবে। এমনটি যেন না হয় যে, আলস্য ও উদসীনতা দেখিয়ে আমার আদেশাবলিকে অবজ্ঞা করবে। তোমরা যদি রমযান মাসে ভ্রক্ষেপহীন জীবন কাটাও এবং রোযাকে কোনো গুরুত্ব না দাও বা ঘরের সবাই রোযা রাখছে বিধায় তুমিও লজ্জার বশবর্তী রোযা রাখো আর অন্যদিকে নামায নফল ইবাদত ও পবিত্র কুরআন পাঠে আলস্য প্রদর্শন করো, অথচ রমযান মাসে প্রত্যেককে নূন্যতম এক বার কুরআন খতম করা উচিত। অতএব এই আলস্য যদি চলতে থাকে তবে তোমাদের রোযা রাখা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অর্জনের উদ্দেশ্যে হবে না। এটি কেবল লোক-দেখানো রোযা হবে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, খোদা তা'লার এমন লোকদেরকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখার কোনো প্রয়োজন নেই কিংবা এমন লোকদের অনাহারে রাখার বিষয়ে তোমাদের খোদার কোনো আগ্রহ নেই, কেননা এমন মানুষ মুমিনই নয় আর রোযা তো বিধিবদ্ধ করা হয়েছে মুমিন এবং মুত্তাকীদের জন্য। কিছু লোক নিছক অলসতার কারণে রোযা পরিত্যাগ করে থাকে। ঘুম খুবই প্রিয়, কষ্ট করে ওঠার প্রয়োজন কী! তারা রোযার দিনগুলোতে সামান্য ক্লান্তি কিংবা ক্ষুধা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত নয় বিধায় রোযা ছেড়ে দেয়। কাজেই, এগুলো এমন বিষয় যা ঈমান থেকে দূরে নিয়ে যায়। এজন্যই বলেছেন, পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বনের ফলে এবং সঠিক অর্থে রোযা রাখার ফলে পরিপূর্ণ ঈমান সৃষ্টি হয়। নফলের জন্য রাতে জাগ্রত হও, যথারীতি নামায পড়ো, নিয়মিত কুরআন পাঠ করো এবং তা অনুধাবনের চেষ্টা করো– এর ফলে তোমাদের মাঝে তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি হবে আর তাকওয়া সৃষ্টি হবার পাশাপাশি তোমাদের ঈমানও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকবে।"

তিনি (আ.) বলেন, ঈমান এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করার এটিই রহস্য যে, তোমরা খোদা তা'লার খাতিরে বৈধ জিনিস থেকেও নিজেদের বিরত রাখো। তোমাদের পূর্বে যে-সব লোক ছিল এবং যে-সব ধর্ম ছিল, তাদের জন্যও রোযা রাখার আদেশ ছিল। তাদের মধ্য থেকেও তারাই ঈমান এবং তাকওয়ায় উন্নতি করত, যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে

রোযা রাখার আবশ্যিক দায়িত্বটি পালন করত। আর তোমাদের জন্য এর চেয়েও উত্তম ও সুনির্দিষ্টভাবে রোযার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রোযা পালনকারী ব্যক্তির জন্য পুরস্কার স্বয়ং আমি নিজেই। আর যে কাজের প্রতিদান ও পুরস্কার খোদা স্বয়ং, তার কি অন্যকিছুর প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকতে পারে? তবে শর্ত হলো, রোযা রাখার প্রকৃত বিধান অনুযায়ী রোযা রাখতে হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী সব অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর তোমরা যদি জানতে যে, রমযান মাসের কী কী মাহাত্ম্য রয়েছে, তাহলে তোমরা অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করতে যেন সারা বছর রমযান থাকে। এখানে দুটি শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হলো, ঈমান এবং দ্বিতীয়টি আত্মজিজ্ঞাসা। অতএব রোযার মধ্যে প্রত্যেকের আত্মজিজ্ঞাসায় লেগে থাকা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবা উচিত, এটি রমযান মাস আর আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে যে, আমার মাঝে কী কী দোষত্রুটি রয়েছে। এর মধ্যে কোন কোন মন্দকাজ আমি সহজে ছাড়তে পারব আর ছেড়ে দেবো, কোন কোন পুণ্যকাজ রয়েছে যা আমি করি নি কিংবা করতে পারি না এবং কোন কোন সৎকাজ আছে যা আমি অবলম্বনের চেষ্টা করতে পারি। অতএব প্রত্যেকে যদি দু-একটি করে পুণ্য করে ও মন্দ বর্জন করার চেষ্টা করে এবং সেটির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সে ধরে নিতে পারে, রমযানের কল্যাণসমূহ থেকে সে একটি অনেক বড়ো অংশের ভাগী হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে যেখানে মহানবী (সা.) বলেছেন, "এই মাস তোমাদের জন্য ছায়া বিস্তৃত করেছে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) হলফ করে বলেছেন, মুমিনের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো মাস নেই এবং মুনাফিকদের জন্য এর চেয়ে মন্দ কোনো মাস নেই। এ মাসে প্রবেশ করার পূর্বেই মহাপ্রতাপান্বিত খোদা মুমিনদের জন্য প্রতিদান ও অতিরিক্ত পুরস্কার নির্ধারণ করে দেন এবং মুনাফিকদের অদৃষ্টে (পাপের) বোঝা ও দুর্ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন। একইভাবে (এ মাসে) মুমিন আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য নিজের শক্তি সঞ্চয় করে, পক্ষান্তরে মুনাফিকরা উদাসীন মানুষের অনুসরণ ও তাদের দোষত্রুটির অনুকরণে অধঃপাতে যায়। অতএব প্রকৃত অর্থে এমন অবস্থা মুমিনদের জন্য পুরস্কারস্বরূপ এবং পাপাচারীর জন্য (তার অবস্থা অনুযায়ী অপকর্মে) সহায়ক হয়ে থাকে।" [(মুসনাদ আহমদ, খণ্ড: ০২, মুসনাদ আবি হুরায়রা (রা.)]

আর্থিক ত্যাগস্বীকার অর্থাৎ দানখয়রাত অনেক বেশি করা উচিত। এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, রমযানের এ দিনগুলোতে তাঁর (সা.) বদান্যতার মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেত।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর তফসীরে বলেন, "রোযার মাহাত্ম্য এবং এর আবশ্যকীয় দিকগুলো সম্পর্কে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ শব্দের মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তোমাদের ওপর রোযা এ কারণে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যেন তোমরা

রক্ষা পাও। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এর একটি অর্থ হলো, আমি তোমাদের ওপর এ কারণে রোযা আবশ্যক করেছি, যেন তোমরা সেসব জাতির আপত্তিসমূহ থেকে রক্ষা পাও যারা পূর্বে রোযা রাখত, ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করত, আবহাওয়ার বৈরিতা সহ্য করত– যারা আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় রত থাকত। তোমরা যদি রোযা না রাখো তাহলে তারা বলবে, 'তোমরা দাবি করো তোমরা নাকি অন্যান্য জাতির চেয়ে আধ্যাত্মিকতায় এগিয়ে আছো? কিন্তু সেই তাকওয়া তোমাদের মাঝে নেই যা অন্যান্য জাতিসমূহে বিদ্যমান ছিল।' لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -এর মাঝে দ্বিতীয় একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আর তা হলো, রোযা রাখার ফলে আল্লাহ্ তা'লা রোযাদারদের রক্ষাকর্তা হয়ে যান। কেননা 'ইত্তিক্বা' শব্দের অর্থ হলো, ঢাল বানানো, মুক্তির মাধ্যম বানানো, প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইত্যাদি। অতএব এই আয়াতের অর্থ তোমাদের জন্য রোযা রাখা এ কারণে আবশ্যক করা হয়েছে, যেন তোমরা খোদা তা'লাকে নিজেদের ঢাল বানিয়ে নাও আর প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে এবং পুণ্যহীনতা থেকে রক্ষা পাও। ... রোযা একটি ধর্মীয় বিষয় বা মানুষের স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে জাগতিক বিষয়ের সাথেও এর কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। অতএব لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -এর অর্থ হলো, তোমরা যেন ধর্মীয় এবং জাগতিক সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকো। ধর্মীয় কল্যাণ এবং আশিস যেন তোমরা হেলায় না হারাও আর তোমাদের স্বাস্থ্যেরও যেন কোনো ক্ষতিসাধিত না হয়। কেননা অনেক সময় রোযা বিভিন্ন ধরনের রোগমুক্তির কারণ হয়ে থাকে। ... আমি নিজে দেখেছি, সুস্থ অবস্থায় রোযা রাখলে রমযান মাসে কিছুটা অস্বস্তি লাগলেও রমযানের পরে দেহে এক নতুন শক্তি এবং সতেজতা সৃষ্টি হয় আর সেটি বুঝা যায়। এটি কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে কল্যাণের কথা বললাম। রোযা রাখার ফলে আধ্যাত্মিক কল্যাণও লাভ করা যায়। যারা রোযা রাখে, খোদা তা'লা তাদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ কারণেই রোযার কথা বলার পরে খোদা তা'লা দোয়া গৃহীত হবার কথা বলেছেন এবং আরো বলেছেন, আমি আমার বান্দার নিকটেই রয়েছি আর তাদের দোয়া গ্রহণ করি। অতএব 'রোযা' খোদা তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করে থাকে এবং রোযাদার খোদা তা'লাকে নিজের ঢাল হিসেবে গ্রহণ করে, যা তাকে সকল প্রকার দুঃখকষ্ট ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫)

এটির বিশদ ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ বলেন, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -এ আরো একটি কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। তা হলো, রোযাদার ব্যক্তি মন্দকর্ম এবং পাপ কাজ থেকে মুক্ত থাকে। অর্থাৎ জাগতিকতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রখর হয়ে যায় এবং সে নিজের সেসব দোষত্রুটি দেখতে পায় যা পূর্বে তার দৃষ্টিগোচর হতো না। একইভাবে মানুষ আরেকটি উপায়ে পাপ থেকে রক্ষা পায়। মহানবী (সা.) বলেন, কেবল সারাদিন পানাহার না করা এবং নিজের মুখ বন্ধ রাখার নামই রোযা রাখা নয়। বরং রোযা রাখার অর্থ হলো বাহ্যিক পানাহার বর্জনের পাশাপাশি নিজেকে আধ্যাত্মিক অর্থে ক্ষতিকর বিষয়সমূহ থেকেও যেন বিরত রাখা হয়। মিথ্যা বলা, গালমন্দ করা, পরচর্চা এবং ঝগড়াবিবাদ থেকেও বিরত থাকতে হবে। যেমন, ভাষাকে সংযত রাখার নির্দেশটি

স্থায়ী নির্দেশ যা সবসময়ের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু রোযাদারকে বিশেষভাবে নিজের ভাষা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কেননা এমনটি না করলে তার রোযা ভেঙে যায়।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৩৭৭)

একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, রোযাদার যদি গালমন্দ করে, ঝগড়া করে, পরচর্চা করে কিংবা পরনিন্দা করে, তাহলে এসবের কারণে রোযা ভেঙে যায়। এই দিকটি সূক্ষ্মতার সাথে পরিলক্ষণীয়। "আর কোনো ব্যক্তি যদি এক মাস পর্যন্ত তার ভাষাকে সংযত রাখে তবে এ কাজটি বাকি এগারো মাসেও তার সুরক্ষার মাধ্যম হয়ে যায়। এভাবেই রোযা স্থায়ীভাবে তাকে পাপ থেকে রক্ষা করে থাকে।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৩৭৭)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "রোযার আরো একটি কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো– এর ফলে তাকওয়ার ক্ষেত্রে অবিচলতা লাভ হয় এবং মানুষ আধ্যাত্মিকতায় উচ্চমর্যাদা লাভ করে। অতএব রোযার ফলে শুধু ধনীরাই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করে এমনটি নয়, বরং দরিদ্ররাও নিজেদের মাঝে একটি নতুন আধ্যাত্মিক বিপ্লব অনুভব করে এবং তারাও খোদা তা'লার সাক্ষাতের স্বাদ পায়। দরিদ্ররা সারা বছর কষ্টের ভেতর দিনাতিপাত করে, কখনো কখনো তারা দিনের পর দিন অনাহারে কাটায়। আল্লাহ্ তা'লা রমযানের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন যে, তারা এই অনাহার-যাপনকে কাজে লাগিয়েও পুণ্য অর্জন করতে পারে। খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য অনাহার-যাপন এত বড়ো পুণ্যের কারণ যে, হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **আস-সওমু লি ওয়া আনা উজযা বিহি।** অর্থাৎ সকল পুণ্যকর্মের কল্যাণ ও প্রতিদান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে কিন্তু রোযার প্রতিদান স্বয়ং আমার সত্তা। খোদা তা'লার সাথে মিলিত হবার বা সাক্ষাতের পর মানুষের আর কী চাই? বস্তুত রোযার মাধ্যমে দরিদ্রদেরকে এ গূঢ় কথাটি শেখানো হয়েছে যে, এই কষ্টের মুখে যদি তারা অধৈর্য এবং অকৃতজ্ঞ না হয় আর অভিযোগ-অনুযোগ না করে যেমনটি কিনা কতক অজ্ঞ ব্যক্তি বলে, আমাদেরকে খোদা তা'লা এমন কী দিয়েছেন যে, আমাদের নামায পড়তে হবে আর রোযা রাখতে হবে?– তাহলে এই ক্ষুধার্ত থাকাই তাদের জন্য পুণ্য পরিগণিত হবে আর খোদা স্বয়ং তাদের প্রতিদান হবেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা দরিদ্রদের জন্য রোযাকে প্রশান্তির কারণ করেছেন, যেন তারা হতাশ না হয় এবং এটি যেন বলে না বসে, আমাদের অভাব-অনটনের জীবন কোন কাজের? আল্লাহ্ তা'লা রোযার মাধ্যমে তাদের জন্য এই রহস্য উন্মোচন করেছেন যে, তারা যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানে এই অভাব-অনটনের জীবনকে বরণ করে নেয় তবে এটিই তাদেরকে খোদা তা'লার সাথে মিলিত করতে পারে বা (তাদের জন্য) খোদার সাক্ষাতের কারণ হতে পারে।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "রোযার প্রকৃত তাৎপর্য হলো, এর ফলে অবাধ্য প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হয় এবং মানুষ মুত্তাকী হয়ে যায়। এর পূর্ববর্তী রুকূতে পবিত্র রমযান সম্পর্কে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, মানুষের যে-সব চাহিদা রয়েছে তার মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত এবং কিছু শ্রেণিগত। প্রজন্মের স্থায়িত্বের জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলোর মধ্যে রয়েছে পানাহার আর শ্রেণিগত বা সমষ্টিগত চাহিদা, যেমন- বংশ বা

প্রজন্ম চলমান রাখার জন্য স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। স্বভাবজ এই দুই ধরনের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে রোযা শক্তি যুগিয়ে থাকে এবং এর প্রকৃত তাৎপর্য হলো, মানুষের খোদাভীরুতাকে রপ্ত করা। বর্তমানে দিনগুলো ছোটো।" (কাকতালীয়ভাবে এই রমযানও শীতকালে এসেছে আর দিনগুলোর দৈর্ঘ্য ছোটো।) "শীতকাল হবার কারণে রমযান মাস খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে গেছে কিন্তু গরমকালে যারা রোযা রাখেন, তারা ভালোভাবেই জানেন ক্ষুধা এবং পিপাসায় অবস্থা কেমন হয়ে থাকে। যুবকরা ভালোভাবে জানে স্ত্রীর আবশ্যকতা কেমন। গরমকালে যখন মানুষের পিপাসা পায়, ঠোঁট শুকিয়ে যায়, ঘরে দুধ, বরফ এবং সুস্বাদু পানীয় থাকা সত্ত্বেও একজন রোযাদার তা পান করেন না! কিন্তু কেন? এ কারণে যে, তাদের প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে এগুলো খাবার বা পান করার অনুমতি নেই। রোযা রাখলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুধা লাগে আর ঘরে সব ধরনের নিয়ামত তথা জর্দা, পোলাও, কোরমা, ফিরনি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রোযাদার ব্যক্তি সেদিকে হাত বাড়ান না কেন? কেবল এ কারণে যে, তার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে অনুমতি নেই।" পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, "রোযাদার পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে কেবল এ কারণেই যান না যে, খোদা তা'লা অসন্তুষ্ট হবেন এবং এমনটি করলে তাঁর আদেশ অমান্য করা হবে।" একথাগুলোর মাধ্যমে রোযার তাৎপর্য অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায় অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে মানুষ প্রবৃত্তির ওপর আধিপত্য করে, সে ঘরে প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহার্য ও বৈধ জিনিসপত্র থাকা সত্ত্বেও নিজ প্রতিপালক-প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বীয় রিপুর চাহিদা মেটানোর জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করে না। তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে, যা তার কাছে নেই, সেসব বস্তুর আকর্ষণে সে মাথা নত করবে? পবিত্র রমযানের অনেক মূল্যবান একটি শিক্ষা হলো, যত বড়ো প্রয়োজনই দেখা দিক না কেন, খোদাপ্রেমিকরা স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির খাতিরে সবকিছুকে উপেক্ষা করে এবং সেগুলোর ধারেপাশে যায় না। কুরআন মজীদ রোযার তাৎপর্য এবং দর্শনের প্রতি নিজেই ইঙ্গিত প্রদান করে এবং বলে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

রোযা তোমাদের জন্য এ কারণে আবশ্যক করা হয়েছে, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বনে অভ্যস্ত হয়ে যাও। একজন রোযাদার কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অর্জনের লক্ষ্যে সেসব জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত এ কারণে পরিত্যাগ করে যে, সে সময় তার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে এই বৈধ জিনিসগুলোর ব্যবহারের অনুমতি নেই, যদিও শরীয়ত সেগুলোকে বৈধ আখ্যা দিয়েছে এবং সেগুলো খাবারও অনুমতি দিয়েছে তাই এটি কীভাবে সম্ভব যে, একই ব্যক্তি সেসব জিনিস হস্তগত করার চেষ্টা করবে যা শরীয়ত কখনো অনুমতি দেয় নি আর সে নিষিদ্ধ পানাহারে লিপ্ত হবে ও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে রিপুর ক্ষুধা মেটাবে?" (আল-হাকাম, ২৪ জানুয়ারি ১৯০৪, পৃ. ১২)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এগুলো হাতেগোনা কয়েকটি দিন মাত্র। একজন মুমিনকে তাকওয়ার দাবি পূরণ করতে গিয়ে যদি কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়েও যেতে হয়, তবে তা-ই করা উচিত। এখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, বছরের বাকি এগারো মাস বৈধ জিনিস ব্যবহার করার অনুমতি আমার পক্ষ থেকে রয়েছে আর তোমরা তা

করে আসছ, কিন্তু এখন আমি বলছি, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তোমরা দিনের একটি অংশে এই বৈধ জিনিসগুলো ব্যবহার করবে না। প্রশ্ন হলো, তোমরা কি এখন অজুহাত দেখাবে? এমনটি করা তোমাদের ঈমান এবং তাকওয়ার পরিচায়ক নয়। তোমাদের মাঝে যারা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে প্রত্যেক প্রকার ত্যাগস্বীকারে সদা সচেষ্ট, তাদের সুরক্ষার্থে খোদা নিজে সোচ্চার থাকেন। অল্প কিছুদিনের এই রোযা কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনেরই কারণ হয় না, বরং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী হয়ে থাকে। এটি প্রমাণিত সত্য যে, বছরে কিছু সময় এমন থাকা চাই যখন মানুষ ন্যূনতম পরিমাণ খাবার গ্রহণ করবে। এর ফলে আমরা দুভাবে লাভবান হচ্ছি। স্বাস্থ্যগত দিক দিয়েও এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টির ক্ষেত্রেও। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না, কষ্ট এবং কাঠিন্যে ফেলতে চান না তাই তোমরা যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাকো, তবে সেই দিনগুলোতে রোযা রেখো না। আর এই রোযা অন্য দিনগুলোতে যখন সুযোগসুবিধা হয়, পূর্ণ করে নিও। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, কারো মনোবৃত্তি যেন এমন না হয় যে, বাড়ির সবাই যেহেতু এখন রোযা রাখছে তাই ওঠা সহজ, বেশি কষ্ট করতে হয় না, তাই কোনোভাবে রোযা রেখেই ফেলি, পরবর্তীতে কে রোযা রাখবে? এটিও আল্লাহ্ তা'লার আদেশবিরোধী কাজ। পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হয় যে, (সবকিছুর) মূলভিত্তি হলো তাকওয়ার ওপর। নির্দেশ পালন করতে হবে আর নির্দেশ হলো, তোমরা অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে এটি হিসেব করতে যাবে না যে, সফরের দূরত্ব কতটুকু। তোমরা সফরের সংকল্প নিয়ে যে যাত্রা করো তাকেই সফর বলে আর তখন রোযা রাখা উচিত নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দুই-তিন ক্রোশ দূরত্বের সফরকেও সফর বলা হয় যদি সেটি সফরের সংকল্পে করা হয়ে থাকে। কিছু মানুষ বলে, আমাদের সহ্যক্ষমতা রয়েছে, আমরা সহ্য করতে পারব। এ ধরনের লোকদের এ বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "প্রকৃত বিষয় হলো, কুরআন করীম প্রদত্ত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। খোদা তা'লা মুসাফির এবং অসুস্থদেরকে অন্য সময়ে রোযা রাখার ছাড় দিয়েছেন, তাই এই নির্দেশের ওপরও আমল করা উচিত। আমি পড়েছি, উম্মতের বেশিরভাগ জ্যেষ্ঠরা এ মত রাখতেন যে, কেউ যদি সফর কিংবা অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখে তাহলে সে অবাধ্যতা করে, কেননা উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন, নিজের ইচ্ছার দাসত্ব করা নয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি পূর্ণ আনুগত্যের মাঝে নিহিত। তিনি যে আদেশ দেন, তা-ই পালন করা উচিত এবং নিজের পক্ষ থেকে এতে বাড়তি কোনোকিছু সংযোজন করা উচিত নয়। তিনি এ নির্দেশই দিয়েছেন–

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

এখানে কোনো বিশেষ শর্ত দেন নি যে, অমুক ধরনের সফরে থাকলে কিংবা তমুক ধরনের অসুখ হলে রোযা রাখতে পারবে বা পারবে না। আমি সফরে রোযা রাখি না, একইভাবে অসুস্থ অবস্থায়ও না। আজকেও আমার শরীর ভালো নেই বিধায় আমি রোযা রাখি নি।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ১১, চতুর্থ সংখ্যা, ২১ জানুয়ারি ১৯০৭)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং মুসাফির অবস্থায় রমযান মাসের রোযা রাখে সে খোদা তা'লার আদেশের অবাধ্য হয়। আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, অসুস্থ এবং মুসাফির ব্যক্তি যেন রোযা না রাখে। আরোগ্য লাভ ও সফর শেষ হবার পর যেন রোযা রাখে। খোদা তা'লার এই আদেশ মেনে চলা উচিত, কেননা কোনো ব্যক্তি নিজের আমলের জোর দেখিয়ে নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ফলেই মুক্তি লাভ করতে পারে। খোদা তা'লা সামান্য রোগ বা বেশি রোগ কিংবা সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ সফরের কথা বলেন নি। অসুস্থতার রকমভেদ বর্ণনা না করে একটি সাধারণ আদেশ দেওয়া হয়েছে, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অসুস্থ এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তবে তার ওপর আদেশ লঙ্ঘনের ফতোয়া আরোপিত হবে।" (আল-বদর, ১৭ অক্টোবর ১৯০৭)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা শরীয়তের ভিত্তি রেখেছেন সহজসাধ্যতার ওপর। যে-সকল মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তি (রোযা রাখার) সামর্থ্য রাখে না তাদের ফিদিয়া দেওয়া উচিত। একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর নামই হলো ফিদিয়া।" (আল-বদর, খণ্ড: ০৬, সংখ্যা: ৪২, ১৭ অক্টোবর ১৯০৭)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমার মতে, মানুষের নিজের ওপর খুব বেশি কাঠিন্য চাপানো উচিত নয়। সফর বলতে যা বুঝায় তা দুই-তিন ক্রোশের হলেও, তাতে নামায কসর করা এবং সফরের মাসলা-মাসায়েলের অনুসরণ করা উচিত। ইন্নামাল আ'মালু বিন্ নিয়্যাত। কখনো কখনো আমি আমার বন্ধুদের সাথে দুই-তিন মাইল পর্যন্ত ভ্রমণে চলে যাই অথচ কারো মাথায়ও এ ধারণা আসে না যে, আমরা সফরে আছি। কিন্তু মানুষ যখন নিজের পুটলি (অর্থাৎ ব্যাগ ইত্যাদি জিনিসপত্র) নিয়ে সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়, সে মুসাফির হিসেবে পরিগণ্য হবে। শরীয়তের ভিত্তি কাঠিন্য নয়। পরিভাষাগতভাবে যাকে সফর বলা হয় সেটিই সফর আর যেভাবে খোদা তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যকীয় দায়িত্বাবলি কার্যে রূপায়িত করা হয়, ঠিক সেভাবে তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া সুযোগ বা ছাড়সমূহকেও কাজে লাগানো উচিত, কেননা ফরয বা অবশ্যপালনীয় দায়িত্বাবলিও খোদা কর্তৃক নির্ধারিত আর ছাড়ও তিনিই দিয়েছেন।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৫, সংখ্যা: ০৬, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০১)

তিনি (আ.) বলেন, "অর্থাৎ অসুস্থ এবং মুসাফির ব্যক্তি রোযা রাখবে না– এটি একটি আদেশ। আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেন নি যে, যার সামর্থ্য আছে রোযা রাখো আর যার সামর্থ্য নেই রেখো না। আমার দৃষ্টিতে, মুসাফিরের রোযা রাখা উচিত নয়। সাধারণত বেশিরভাগ মানুষই (সফরে) রোযা রেখে থাকে, তাই কেউ যদি অভ্যাসবশত রেখে ফেলে তবে কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু তারপরও 'ইদ্দাতুম্ মিন আইয়ামিন উখার'-এর বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হওয়া আবশ্যক। সফরে কষ্ট করে যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সে আল্লাহ্‌র আদেশের আনুগত্য করে না বরং নিজের রোযার মাধ্যমে জোরপূর্বক আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। এটি ভ্রান্ত রীতি। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাঝেই প্রকৃত ঈমান নিহিত।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৩, সংখ্যা: ০৪, ৩১ জানুয়ারি ১৮৯৯)

ফলে এমন মানুষ যারা বর্তমানে নিজ বাড়িতে থাকার সুবাদে রোযা রাখার সুবিধা আছে

বলেই রোযা রাখছেন (অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও), তাদের এই আদেশ অনুযায়ী স্মরণ রাখা উচিত, পরবর্তীতে রোযা পূর্ণ করার মাঝেই পুণ্য নিহিত। এভাবে নিয়মের বাইরে গিয়ে যে রোযা রাখা হয়– তা প্রকৃত রোযা নয়।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) একটি সফরে ছিলেন। তিনি (সা.) লোকদের ভিড় দেখতে পেলেন আর দেখলেন, এক ব্যক্তির ওপর ছায়া করা আছে। তিনি (সা.) বলেন, ঘটনা কী? উত্তরে তারা বললেন, এই ব্যক্তি রোযাদার। তিনি (সা.) বললেন, সফরে রোযা রাখা কোনো পুণ্যের কাজ নয়। [বুখারী, কিতাবুস্ সওম বাব কৃওলুন্ নাবীয়্যি (সা.) লিমান যালালা আলাইহি ওয়াশতাদ্দা ....]

আরো একটি অত্যন্ত স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রমযান মাসে সফররত অবস্থায় রোযা এবং নামায সম্বন্ধে এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) বলেন, "রমযানে সফররত অবস্থায় রোযা রেখো না।" এটি শুনে এক ব্যক্তি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখি। নবী করীম (সা.) তাকে বললেন, **"আনতা আক্বওয়া আমিল্লাহ্"** অর্থাৎ তুমি বেশি শক্তিশালী নাকি আল্লাহ্ তা'লা। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা আমার উম্মতের মাঝে অসুস্থ এবং মুসাফির ব্যক্তিদের জন্য রমযান মাসে সফরকালে রোযা না রাখাকে সদকাস্বরূপ একটি ছাড় আখ্যা দিয়েছেন। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, সে তোমাদের কাউকে সদকাস্বরূপ কিছু দেবে আর সেই সদকা তাকে ফেরত দেওয়া হবে? (আল-মুসান্নিফ লিল্ হাফিযিল কাবীর আবু বকর আব্দুর রায্যাক বিন হামাম-আস্ সিয়াম ফিস্ সফর)

অতএব এর ফলে আরো স্পষ্ট হলো, সফরে রোযা রাখা মোটেও উচিত নয়। কিন্তু কখনো কখনো কিছু লোক এর বিপরীত দিকে অনেক বেশি ঝুঁকে যায়। অসুস্থদের ছাড় রয়েছে বলে কেউ কেউ অন্যায় সিদ্ধান্ত করে বসে যে, আমি অসুস্থ বিধায় রোযা রাখতে পারব না। যদি জিজ্ঞেস করো, তুমি তো দিব্যি যুবক ছেলে, স্বাস্থ্যবান, চলাফেরা করতে পারো, হাটেবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছো, তোমার আবার কীসের অসুখ? আর যদি অসুস্থতা থেকেই থাকে তবে ডাক্তার দেখাও। তখন তার উত্তর এটিই হয়ে থাকে, তেমন কোনো অসুস্থতা নেই, ইফতারী পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে যাই, দুর্বল হয়ে যাই। সমস্যা একই (যার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ) খোদাভীরুতার অভাব। প্রবৃত্তির মিথ্যা অজুহাতের বশবর্তী হয়ো না। সর্বদা স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হৃদয়ের চিত্র সম্পর্কে অবগত। আল্লাহ তা'লাকে ভয় করা উচিত, এমন যেন না হয় যে, মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে (ঐশী) নির্দেশ লঙ্ঘন করে তুমি সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়বে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের আদেশ যে, সফরে এবং অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা উচিত নয়। আমরা এর ওপর জোর দিয়ে থাকি, যেন কুরআনের আদেশের অসম্মান না হয়। কিন্তু এ অজুহাত দেখিয়ে যারা রোযা রাখতে পারে অথচ রোযা রাখে না অথবা কিছু অসম্পূর্ণ রোযা যা তারা চেষ্টা করলে পূরণ করতে পারত, কিন্তু সেগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করে না, তারা ঠিক তাদের মতোই গুনাহগার– যারা

কোনো কারণ ছাড়াই রোযা রাখে না। এ কারণে অলসতার বশবর্তী হয়ে কিংবা কোনো শরীয়তী বিধিনিষেধের কারণে যে রোযা কেউ রাখে নি, সেগুলো পরবর্তীতে প্রত্যেক আহমদীর পূর্ণ করা উচিত।" (ফিকাহ্ আহমদীয়া, পৃ. ২৯৩)

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ফতোয়া। অতএব এ ধরনের বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য– উভয়টি অন্যায়। সর্বদা তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে রোযা রাখা বা না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা শক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য রাখে তারা যদি কোনো কারণে রোযা না রাখতে পারে তবে যেন ফিদিয়া দেয়। আর ফিদিয়া হলো একজন মিসকিনকে সে অনুযায়ী খাওয়ানো যা তোমরা নিজেরা খাও (সেটিই মানদণ্ড)। কেননা মানুষের আত্মসম্মানের বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অতএব উত্তম খাবার খাওয়াও। এটি যেন না হয় যে, আমি নিজে রোযা থাকলে ভালো খাবার খেতাম কিন্তু তুমি যেহেতু কম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ তাই তোমার জন্য ফিদিয়াস্বরূপ এই উচ্ছিষ্ট খাবারই রয়েছে। মোটেও এমনটি করা উচিত নয়। তোমাদের পুণ্যকাজ তখনই প্রকৃত পুণ্য বলে বিবেচিত হবে যখন তোমরা সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে করুণার পাত্র মনে করে খাওয়াবে না, বরং কেবল খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই এটি করবে। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ফিদিয়া দিলে হয়ত খোদা তোমাদের এর সুবাদে আরোগ্যও দান করতে পারেন, কেননা তিনি বলেন, রোযা রাখা সার্বিক অর্থে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"ওয়া আলাল্লাযীনা ইউতিকূনাহু ফিদয়াতুন ত্বয়ামু মিসকীন।** একবার আমার মনে প্রশ্নের উদয় হলো, ফিদিয়া কী কারণে নির্ধারণ করা হয়েছে? তখন বুঝলাম যে, এটি সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে করা হয়েছে, অর্থাৎ ফিদিয়া এজন্যে দিতে হবে, যেন রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই সেই সামর্থ্য দান করে থাকেন এবং প্রতিটি জিনিস খোদার কাছেই যাচনা করা উচিত। খোদা তা'লা সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে একজন যক্ষা রোগীকেও রোযা রাখার শক্তি দিতে পারেন।" অর্থাৎ অনেক বেশি দুর্বল অসুস্থ একজন মানুষ কিংবা যক্ষা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও রোযা রাখার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। "অতএব ফিদিয়া দেবার উদ্দেশ্য হলো, যেন সে শক্তি অর্জিত হয়, আর এটি কেবল খোদা তা'লার অনুগ্রহেই হয়ে থাকে। আমার মতে উত্তম পন্থা হলো, মানুষের এ বলে দোয়া করা যে, হে আল্লাহ্! এটি তোমার কল্যাণময় একটি মাস আর আমি এ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। কে জানে আগামী বছর বেঁচে থাকব কিনা অথবা অবশিষ্ট রোযাগুলো সম্পন্ন করতে পারব কিনা? এভাবে যদি তাঁর নিকট শক্তি প্রার্থনা করা হয় তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, খোদা তা'লা এমন হৃদয়বান ব্যক্তিকে শক্তি দেবেন।" কিন্তু কিছু লোকের অসুস্থতা এমন হয়ে থাকে যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে পারে না এবং সারাজীবন ফিদিয়া দিতে হয়। এমন লোকদের ক্ষেত্রে যেভাবে আমি বলেছি, নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ফিদিয়া দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা মনের অবস্থা সম্পর্কে জানেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও এখানে একথাই বলেছেন। তিনি (আ.) এরপর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যদি চাইতেন তাহলে অন্যান্য উম্মতের মতো এই উম্মতের মাঝেও কোনো বিধিনিষেধ রাখতেন না, কিন্তু এই বিধিনিষেধ কল্যাণার্থেই নির্ধারণ

করেছেন। "আমার মতে প্রকৃত বিষয় হলো, মানুষ যখন সততা এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে খোদা তা'লার দরবারে এই নিবেদন করে যে, এ মাসে আমাকে বঞ্চিত রেখো না, তবে খোদা তা'লা তাকে বঞ্চিত রাখেন না। এমতাবস্থায় যদি রমযান মাসে মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়, এই অসুস্থতা তার জন্যকল্যাণরূপে বিবেচিত হয়, কেননা প্রত্যেক কর্মের ভিত্তি সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। মুমিনদের উচিত নিজের ব্যক্তিত্বকে খোদার দৃষ্টিতে সাহসী প্রমাণ করা।" অর্থাৎ বীর-বাহাদুর প্রমাণ করা "যার আন্তরিক সদিচ্ছা থাকে যে হায়! যদি আমি সুস্থ হতাম এবং রোযা রাখতে পারতাম! আর এজন্য তার মন কাঁদে; এমন ব্যক্তি যদি রোযা থেকে বঞ্চিত থাকে, তবে ফেরেশতারা এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখবে।" তিনি বলেন, এর কারণে তার হৃদয় ছটফট করে, অস্থিরচিত্তে আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ করে, তাহলে ফেরেশতারা তার জন্য রোযা রাখবে। "কিন্তু শর্ত হলো, সে যেন কোনো অজুহাত সন্ধানী না হয়, তাহলে খোদা তা'লা কখনো তাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।" (আল-বদর, ১২ ডিসেম্বর ১৯০৩, মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ২৫৮-২৫৯)

রোযার সাথে সম্পৃক্ত বিবিধ কিছু বিষয় রয়েছে। এখন আমি সেগুলো সম্পর্কে কিছু কথা বলব। কিছু লোক অলসতার কারণে কিংবা কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে রোযা রাখে না। তবে তাদের মনে এ ভাবনার উদ্রেক হয় ঠিকই যে, রোযা রাখা উচিত। একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হবার পর কিছু লোকের মানসপটে এই ভাবনা দানা বাধে যে, বয়স তো কম হলো না, একসময় স্বাস্থ্য ছিল, শক্তি ছিল, আর্থিক সংগতি ছিল, সকল সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখি নি। আমার যে-সব পুণ্য করার ছিল তা করতে পারি নি। এখন উপায়? এমনই একজন লোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকটে উপস্থিত হলেন এবং নিবেদন জানালেন, "আমি আজকের পূর্বে কখনো রোযা রাখি নি, আমি এর কী ফিদিয়া দেবো? তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কোনো ব্যক্তিকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্বের ফিদিয়া আদায় করো এবং আগামীতে সব রোযা রাখবে মর্মে অঙ্গীকার করো।" (আল-বদর, খণ্ড: ০১, সংখ্যা: ১২, ১৬ জানুয়ারি ১৯০৩)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, তিনি (রা.) বলেন, আমি রসূলে করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে এবং রোযার দাবিগুলো অনুধাবন করে আর যে এই রমযান মাসে সেসব বিষয় থেকে বিরত ছিল যা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, এমন ব্যক্তির রোযা তার পূর্ববর্তী সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আবি সাঈদ, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৪৫৭)

দেখা যায়, কিছু লোক সেহরী করে না। তারা অভ্যাসবশত খায় না কিংবা বড়াই করার উদ্দেশ্যে এমনটি করে থাকে। তারা অষ্ট প্রহরের রোযা রেখে থাকে। তাদের জন্য হাদীসে আদেশ বিদ্যমান। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেন, সেহরী খাও, কেননা এতে কল্যাণ নিহিত আছে।

আবার প্রশ্ন জাগতে পারে, এই সেহরীর সময় কতক্ষণ পর্যন্ত থাকে? সেহরী খেতে খেতে যে গ্রাস আপনার হাতে রয়েছে বা যে পানীয় আপনি পান করছেন, সেটি আযান হয়ে

গেলেও শেষ করার আদেশ রয়েছে। বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সা.) বলেন, তোমাদের মাঝে কেউ যদি আযান শুনে আর খাবারের পাত্র তার হাতে থাকে তবে সে যেন ততক্ষণ সেটিকে না ছাড়ে যতক্ষণ তার প্রয়োজন পূর্ণ না হয়, অর্থাৎ সে যা খাচ্ছে তা যেন শেষ করে।

আবার কিছুসময় ভুলে বুঝে উঠতে পারে না যে, রোযার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে কিনা। অনেক সময় কয়েক মিনিট বাড়তি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এই রোযা সঠিক হলো কিনা তা কীভাবে বুঝা যাবে? হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট কেউ একজন প্রশ্ন করলেন, আমি বাড়ির ভেতরে বসে ছিলাম এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এখনো সেহরীর সময় শেষ হয় নি। তাই আমি কিছু খেয়ে রোযা রাখার নিয়ত করলাম। কিন্তু পরে অন্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম, সেসময় প্রভাতের শুভ্রতা ফুটে উঠেছিল। এখন আমি কী করব? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এমতাবস্থায় তার রোযা হয়ে গেছে। পুনরায় রোযা রাখার প্রয়োজন নেই, কেননা নিজের পক্ষ থেকে সে সাবধানতা অবলম্বন করেছে এবং তার নিয়ত বা ইচ্ছায় কোনো খুঁত নেই। অনুমানে ভুল হয়েছে বা কয়েক মিনিটের হেরফের হয়ে গেছে, এই যা।

এছাড়া ইফতারী প্রথম সুযোগে করার আদেশ রয়েছে। আবি আতিয়্যা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এবং মাসরুক হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে দুইজন এমন আছেন যাদের কেউই পুণ্য এবং মঙ্গলজনক কাজ করতে কখনো আলস্য প্রদর্শন করেন না। কিন্তু তাদের মাঝে একজন তাড়াতাড়ি ইফতারী করেন এবং নামাযও দ্রুত পড়েন অর্থাৎ নামাযের সময় হতেই তা আদায় করেন, আর দ্বিতীয়জন ইফতারী এবং নামায, উভয় বিষয়ই বিলম্ব করেন। হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মাঝে কে তাড়াতাড়ি করে থাকেন? বলা হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, মহানবী (সা.)-ও এমনটিই করতেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি ইফতারী করার অর্থ কী? এটি কীভাবে নির্ধারিত হবে? সে বিষয়ে এ হাদীসের মাধ্যমে আলোকপাত হয়। মহানবী (সা.)-এর হাদীস হলো, সূর্যাস্তের পর এক ব্যক্তিকে তিনি (সা.) ইফতারী আনতে বললেন। সেই ব্যক্তি নিবেদন করলেন, হুযূর (সা.)! আরেকটু অন্ধকার হতে দিন। তিনি (সা.) বললেন, ইফতারী নিয়ে আসো। সেই ব্যক্তি আবারো নিবেদন করলেন, হুযূর (সা.)! এখনো সূর্যাস্ত হয় নি। মহানবী (সা.) বললেন, ইফতারী নিয়ে আসো। সেই ব্যক্তি ইফতারী নিয়ে আসলে মহানবী (সা.) রোজা খোলার পর স্বীয় আঙুল দিয়ে পূর্বদিকে ইশারা করে বলেন, সূর্যাস্তের পর যখন তোমরা পূর্বদিক থেকে অন্ধকার ছেয়ে যেতে দেখবে, তখনই ইফতারী করে ফেলবে।

এছাড়া কোনো কোনো সময় মানুষ রোযার অবস্থায় ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেলে। এ সম্পর্কে হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে, কেননা তাকে আল্লাহ্ তা'লা-ই পানাহার করান। এতে তার রোযা ভাঙে না, তার রোযা পূর্ণ করা উচিত।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট একবার প্রশ্ন করা হলো, রোযাদার ব্যক্তি আয়না দেখতে পারবে কিনা? অর্থাৎ আয়না দেখা বৈধ নাকি অবৈধ? এর উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, বৈধ।

লোকেরা অদ্ভুত প্রশ্ন করে থাকে। একজন প্রশ্ন করল, রোযাদার ব্যক্তির দাঁড়িতে তেল লাগানো বৈধ নাকি অবৈধ? তিনি (আ.) বলেন, বৈধ।

আবার প্রশ্ন করা হলো, সুগন্ধি লাগানো বৈধ নাকি অবৈধ? তিনি (আ.) বলেন, বৈধ।

পুনরায় একটি প্রশ্ন করা হয়, চোখে সুরমা লাগানো বৈধ নাকি অবৈধ? কেননা উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানে বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে সুরমা লাগানোর যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, এটি মাকরূহ্ (অপছন্দনীয়)। আর বলেন, দিনের বেলা সুরমা লাগানোর এমন কী প্রয়োজন রয়েছে? চোখে যদি কোনো সমস্যা থাকে তবে রাতে সুরমা লাগাতে পারেন। (আল-বদর, সংখ্যা: ০৬, পৃ. ১৪, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)

আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যে কখনো কখনো রমযান এমন মৌসুমে আসে যখন কৃষকরা ব্যস্ত থাকে, যেমন- বীজ বপন কিংবা হাল চালানো প্রভৃতি। প্রশ্ন হলো, এমন শ্রমিক যাদের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম খেতখামারে কাজ করা, তারা প্রচণ্ড গরমের কারণে রোযা রাখে না। তাদের সম্বন্ধে নির্দেশনা কী? তিনি (আ.) বলেন, ইন্নামাল আ'মালু বিন্ নিয়্যাত। এ লোকেরা নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তির তাকওয়া এবং পবিত্রতার চেতনা নিয়ে নিজের অবস্থা বিশ্লেষণ করা উচিত। কেউ যদি নিজের জায়গায় শ্রমিক হিসেবে কাউকে নিযুক্ত করতে পারে তার এমনটিই করা উচিত নতুবা সে অসুস্থদের মাঝে গণ্য হবে। পরে যখনই সুযোগ আসবে তার উচিত হবে রোযা রাখা।

তিনি (আ.) বলেন, "রমযানের আগমনে যে ব্যক্তির হৃদয় পুলকিত হয়, অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে অপেক্ষায় থাকে, কবে রমযান আসবে আর কবে আমি রোযা রাখার সুযোগ পাবো, সে যদি অসুস্থতার দরুণ রোযা রাখতে না পারে, তবে ঊর্ধ্বলোকে রোযার পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে না। এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ অজুহাতপ্রবণ হয়ে থাকে আর তারা মনে করে, আমরা যেভাবে জগদ্বাসীকে ফাঁকি দিয়ে থাকি সেভাবে খোদা তা'লাকেও ফাঁকি দিতে পারব। অজুহাত সন্ধানীরা নিজেদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকারের অজুহাত গড়ে থাকে। বিবিধ কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে সেগুলোকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করে, কিন্তু খোদা তা'লার হিসেবে তা ধোপে টেকে না। কৃত্রিমতার গণ্ডি অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষ যদি চায় তবে কৃত্রিম অজুহাত দেখিয়ে সারাজীবন বসে বসেই নামায পড়তে পারে (কখনো দাঁড়িয়ে নামায পড়বে না, অসুস্থ সেজেই থাকবে এবং বসে বসেই নামায পড়বে)। আর রমযানে কখনো রোযা রাখবে না। কিন্তু খোদা তা'লা তার সততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়ত এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। আল্লাহ্ তা'লা জানেন, তার ভেতর সত্যিই আন্তরিক বেদনা রয়েছে। খোদা তাকে প্রাপ্য পুরস্কার থেকে বাড়িয়ে দেন, কেননা হৃদয়ের বেদনা একটি মূল্যবান বিষয়। বাহানা সন্ধানীরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর ভরসা করে থাকে, কিন্তু খোদার নিকট এসব মূল্যহীন। আমি যখন ছয় মাস রোযা রেখেছিলাম তখন একবার একদল নবীর

সাথে দিব্যদর্শনে আমার সাক্ষাৎ হয় যারা আমাকে বলেন, তুমি নিজের আত্মাকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ? এ থেকে বেরিয়ে আসো। এভাবে মানুষ যখন নিজেকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কষ্টে নিপতিত করে, তখন তিনি স্বয়ং পিতামাতার মতো স্নেহপ্রদর্শনপূর্বক বলেন, তুমি কেন এত কষ্ট করছ?

এসব লোক কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করে আর কষ্টবিমুখ হয়ে থাকে। এ কারণে খোদা তাদেরকে অন্য কষ্টে নিপতিত করেন এবং তা থেকে পরিত্রাণ দেন না। অন্যদিকে যারা স্বেচ্ছায় কষ্টে নিপতিত হয়, তাদেরকে তিনি নিজে সেই কষ্ট থেকে বের করে আনেন। মানুষের নিজ প্রাণের প্রতি অন্যায় করুণা করা উচিত নয়, বরং তার এমন হওয়া উচিত যেন খোদা তা'লা তার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করতে পারেন। কেননা মানুষের নিজের প্রতি নিজের করুণা প্রদর্শন জাহান্নামস্বরূপ হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে খোদা তা'লার করুণা হলো জান্নাত ।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে রমযানের এই কল্যাণ ও বরকতসমূহ থেকে অনেক বেশি লাভবান হবার সৌভাগ্য দান করুন এবং এই রমযান যেন আমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনে। আমীন।

(২৮)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ৩১ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ৩১ ইখা ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰي مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٦﴾
وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۭ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ
فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٧﴾

(আল-বাকারা: ১৮৬-১৮৭)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় রমযান মাস আরম্ভ হয়ে গেছে এবং ইতোমধ্যে পাঁচটি রোযা যে অতিবাহিত হয়ে গেছে তা টেরও পাওয়া যায় নি। হাদীসে আছে মহানবী (সা.) বলেছেন, এটি অত্যন্ত মহান এবং কল্যাণমণ্ডিত একটি মাস। আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ভূষিত করার একটি সুযোগ খুঁজতে থাকেন অর্থাৎ বান্দাদেরকে শয়তানের থাবা থেকে মুক্ত করে তিনি নিজের বান্দা বানাতে চান। বান্দা যখনই আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হয় তখনই তাঁর ঈমান ও অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত পায়, কিন্তু রমযান মাসে আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাদের প্রতি পূর্বের চেয়ে বেশি স্নেহপ্রবণ হয়ে থাকেন আর এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি অনুগ্রহ যে, যারা ইবাদত, নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে আলস্য দেখায়, তাদের জন্য তিনি সুশৃঙ্খল-কার্যক্রমসজ্জিত একটি মাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার ফলে ইবাদতকারী, নফল আদায়কারী এবং কুরআনের বিধিবিধান অনুসরণকারীরা এ মাসে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগী হয়ে ইবাদত করার চেষ্টা করবে আর অলস ব্যক্তিরাও তাদের অনুকরণে কিছু না কিছু ইবাদত করবে। এতে তাদের ওপরও পরিবেশের কিছুটা হলেও প্রভাব পড়বে এবং তারাও এই পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণ করবে। এভাবে তারাও পুণ্যকর্মে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এমন লোকদের মধ্যে কতক স্থায়ীভাবে এসব পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং শয়তানকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন মানুষের জন্য আমি আমার দয়া ও কৃপার দ্বার অবারিত করে দেবো। এমন বিভ্রান্ত লোকদের তাঁর দিকে ফিরে আসায় আল্লাহ্ তা'লা কত বেশি আনন্দিত হন, তার বর্ণনা দিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, একজন মা তার হারানো

শিশুকে খুঁজে পেলে যতটা আনন্দিত হন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হারিয়ে যাওয়া বান্দার নিজের দিকে প্রত্যাবর্তনে ও তাঁর ইবাদত করায় এর চেয়ে অধিক আনন্দিত হন। রমযান মাসে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রহমতের সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন যা মানুষকে তাঁর দিকে ধাবিত করে এবং যা পাঠ করলে আল্লাহ্ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এর সাথেও রমযানের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে রমযান মাসে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত।

আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"রমযান সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (এই কুরআন সমগ্র) মানবজাতির জন্য এক মহান হিদায়াতরূপে এবং সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে)। অতএব তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি এ মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিন থেকে গণনা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর (তিনি চান) তোমরা যেন (রোযার নির্ধারিত) সংখ্যা পূর্ণ করো এবং তিনি তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো আর তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বলো,) 'নিশ্চয় আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যেন তারা সঠিক পথ পায়।"** (সূরা আল-বাকারা: ১৮৬-১৮৭)

সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "সূর্যের উত্তাপকেও রমযান বলা হয়। রমযান মাসে একদিকে মানুষ পানাহার ও যাবতীয় ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন করে, দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র বিধিনিষেধ পালন করার উদ্দেশ্যে এক ধরনের (ভালোবাসার) উষ্ণতা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। অতএব রমযান হলো, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক– এ উভয় তাপের সমন্বয়। আভিধানিকগণ বলে থাকেন, রমযান গ্রীষ্মকালে এসেছিল বলে একে 'রমযান' বলা হয়েছে। আমার মতে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা আরবের জন্য এতে (অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে রমযান আবশ্যক করা হয়েছে বলে মনে করাতে) কোনো বিশেষত্ব থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক অর্থে রমযানের অর্থ হলো, আধ্যাত্মিক কর্মে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ধর্মীয় প্রেরণা। 'রমযান' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যার কারণে পাথর ইত্যাদি উত্তপ্ত হয়।" (আল-হাকাম, ২৪ জুলাই ১৯০১; মলফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৯০২)

কাজেই এই উদ্ধৃতিতে তিনি (আ.) বলেন, সূর্যের উত্তাপকে রমযান বলা হয় আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যারা বসবাস করে তারা জানে, সূর্যের তাপে কী অবস্থা হয়? একই সাথে বাতাস বন্ধ হওয়া বা ভ্যাপসা ভাব যুক্ত হলে কষ্ট আরো বেড়ে যায় আর ঘামাচি ইত্যাদি বেরিয়ে আসে। যাদের কাছে এই গরম থেকে পরিত্রাণ লাভের কোনো উপায়-উপকরণ নেই তারা এ অবস্থায় শরীরে এক প্রকার প্রদাহ এবং ঘামাচিতে চুলকানি ইত্যাদি অনুভব করে যা কখনো কখনো সহ্যের বাইরে চলে যায়। বর্তমানে ইউরোপের দেশগুলোতেও বেশ গরম

পড়ছে এবং ছায়া থেকে একটু বের হলেই রোদের তীব্রতা অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। কাজেই, এই যে কষ্ট হয় সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পানাহার পরিহার করে এবং দৈহিক আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে আমার সন্তুষ্টির খাতিরে কিছুটা সময় কষ্ট সহ্য করো– এটিও সে ধরনেরই এক কষ্ট যা কোনো কোনো সময় (গ্রীষ্মপ্রধান দেশে) হয়ে থাকে। তিনি (আ.) আরো বলেন, খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে যদি তোমরা কষ্ট সহ্য করে থাকো তবে তোমাদের ভেতর থেকেও একটি আবেগের স্ফূরণ ঘটা উচিত। খোদাপ্রেমের উষ্ণতা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলির অনুসরণ এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। তিনি (আ.) বলেন, দৈহিক বা বাহ্যিক কষ্ট ও ক্ষুৎপিপাসার সাথে যখন অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা এবং খোদাপ্রেমের উষ্ণতা মিলিত হয় তখন একে বলা হয় রমযান।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ -এই আয়াতের মাধ্যমে রমযানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। সুফিগণ লিখেছেন, হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করার জন্য এ মাস খুবই উত্তম একটি মাস। এই মাসে বহুল পরিমাণে কাশ্ফ বা দিব্যদর্শন লাভ হয়। নামাযের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি হয় এবং রোযার মাধ্যমে অন্তর আলোকিত হয়। আত্মার পবিত্রকরণ বলতে বুঝায়, অবাধ্য আত্মার কামনা-বাসনার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া এবং অন্তর বিকশিত হবার অর্থ হলো, কাশ্ফের দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত হয়, যেন খোদাকে সে দেখতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ -এ সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, রোযার পুরস্কার অনেক বড়ো কিন্তু রোগবালাই এবং স্বার্থ এ পুরস্কার থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখে। তিনি (আ.) বলেন, আমার মনে আছে যৌবনে একবার স্বপ্নে দেখেছি যে, রোযা রাখা আহলে বায়তের সুন্নত বা রীতি। আমার পক্ষে মহানবী (সা.) বলেন, **সেলমান তথা আস্ সুলহান** অর্থাৎ দুটি সন্ধি যা এই ব্যক্তির মাধ্যমে স্থাপিত হবে। একটি অভ্যন্তরীণ এবং অপরটি বাহ্যিক। আর এই ব্যক্তি নিজের কাজ তরবারির মাধ্যমে নয় বরং বিনম্রভাবে বা ভালোবাসার মাধ্যমে আদায় করবেন। আমি যেহেতু হোসাইনী পন্থার অনুসারী নই, যিনি যুদ্ধ করেছেন বরং হাসান (রা.)-এর রীতির অনুসারী যিনি যুদ্ধ করেন নি তাই আমি বুঝলাম যে, রোযার দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অতএব আমি একাধারে ছয় মাস রোযা রাখলাম। সে দিনগুলোতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, লাগাতার জ্যোতির স্তম্ভ একের পর এক আকাশের পানে আরোহণ করছে। এ বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল যে, আলোর স্তম্ভভূমি থেকে আকাশের দিকে আরোহণ করছিল নাকি আমার অন্তর থেকে। কিন্তু এ সবকিছু যৌবনেই করা সম্ভব। আর আমি যদি চাইতাম তবে সে সময় একাধারে চার বছর রোযা রাখতে পারতাম।

অতএব এখানে বিশেষভাবে যৌবনের উদাহরণ দেবার মাধ্যমে তিনি (আ.) যুবকদেরকে বুঝাচ্ছেন যে, অনেক সময় অসুস্থতার কারণে এক বয়সে গিয়ে রোযা রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু যৌবনকাল এমন একটি সময় যখন সঠিকভাবে রোযা রাখা সম্ভব এবং এই বয়সের সুবিধা গ্রহণ করা উচিত। পক্ষান্তরে আরেকবার তিনি (আ.) বলেছিলেন যে, এত লম্বা রোযা রাখা সবার জন্য উচিত নয়, বরং সম্ভবও নয়। আমাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণা জুগিয়েছেন এবং সাথে তাঁর সাহায্য-সমর্থন ছিল আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শক্তি

প্রদান করেছিলেন বিধায় আমি তা রাখতে পেরেছিলাম। কিন্তু রমযানের রোযাগুলো এমন যা অবশ্যই রাখা উচিত, কেননা অসুস্থতা কিংবা কোনো কারণ না থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক সকল মুসলমানের জন্য রমযানে রোযা রাখা আবশ্যক। রোযার গুরুত্ব এবং রোযা রাখার ফলে মানুষ যে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হয়– সে সম্পর্কে কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি।

রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.) বলেন, প্রতিটি জিনিসের একটি দরজা থাকে আর ইবাদতের দরজা হলো রোযা। (জামেউস্ সগীর)

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, রোযা ঢালস্বরূপ এবং আগুন থেকে রক্ষাকারী একটি নিরাপদ দুর্গ (মুসনাদ আহমদ)। অর্থাৎ একটি সুরক্ষিত দুর্গ যা আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করে।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমরা হযরত উমর (রা.)-এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি (রা.) বলেন, ফিতনা বা নৈরাজ্য সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর কোনো নির্দেশনা কি তোমাদের কারো মনে আছে? হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি বললাম, মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন হুবহু সেভাবেই মনে আছে। অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) বললেন, কথা বলার ব্যাপারে তুমি তো খুব সাহস দেখাচ্ছো। যাহোক, হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, বাড়িঘর, সম্পদ, সন্তানসন্ততি কিংবা প্রতিবেশীর মাধ্যমে মানুষ যে পরীক্ষায় নিপতিত হয় তার প্রায়শ্চিত্ত হয় নামায, রোযা, সদকা এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে। (সহীহ বুখারী, কিতাব মাওয়াকীতুস্ সালাত)

এরপর হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, জান্নাতের মধ্যে নিশ্চয় এমন এক বালাখানা থাকবে যার ভেতর থেকে বাইরের দৃশ্য এবং বাহির থেকে ভিতরের দৃশ্য দেখা যাবে। এটি শুনে এক বেদুঈন তথা মরুবাসী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই বালাখানা কাদের জন্য নির্ধারিত? তিনি (সা.) বলেন, এটি তাদের জন্য নির্ধারিত যারা মিষ্টভাষী, অভাবীদের খাবার খাওয়ায়, সঠিকভাবে রোযা পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা নামায আদায় করে। (সুনান আত্ তিরমিযী, কিতাব সিফাতুল জান্নাত)

অতএব এই হাদীসগুলো থেকে রোযার গুরুত্ব আরো সুস্পষ্ট হয়। এখানে শর্ত হলো, কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকলেই চলবে না বরং এরইসাথে সকল মন্দকর্ম পরিহার করতে হবে, পুণ্যকর্ম অবলম্বন করতে হবে, দরিদ্রদের প্রতি যত্নবান হতে হবে, তাদের চাহিদাসমূহ পূরণ করতে হবে, নামায পড়তে হবে, ফরয ছাড়াও নফল নামায আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। এসবের পাশাপাশি অর্থাৎ তোমরা রোযা রাখো, সকল বৈধ জিনিস ও খাদ্যদ্রব্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করে শরীয়তের সকল শর্ত পূরণ করো, তবেই যে-সব ফিতনা বা পরীক্ষা রয়েছে অর্থাৎ সন্তানসন্ততি, ব্যাবসাবাণিজ্য, প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে তোমরা যে-সব ফিতনা বা পরীক্ষায় নিপতিত হও ও ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত থাকো– তা থেকে তোমাদের পুণ্যকর্মের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেতে পারো। এসব পুণ্যকর্ম সেসব ফিতনার বিপরীতে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কাজ করবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা আমার জন্য আর আমি নিজেই এর পুরস্কার হয়ে যাই অর্থাৎ সকল শর্ত পূরণ করে যদি কেউ রোযা রাখে তাহলে এর মাধ্যমে তার আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য লাভ হয়। রোযার মাসে আমার বান্দারা আমার জন্য নিজের সমস্ত বৈধ কামনা-বাসনা এবং পানাহার পরিত্যাগ করার কারণেই এটি হয়। তিনি (সা.) বলেন, পাপের বিরুদ্ধে রোযা হলো ঢালস্বরূপ। রোযাদারদের জন্য দুটি আনন্দ নির্ধারিত। একটি আনন্দ তখন অর্জিত হয়, যখন সে খোদা তা'লার কৃপায় রোযা পূর্ণ করে আর এই আনন্দ সে পৃথিবীতেই লাভ করে। আরেকটি আনন্দ লাভ করবে পরকালে যখন সে নিজ প্রভুর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। অধিকন্তু মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তা'লার নিকট কস্তুরির সুগন্ধের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। (বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ, বাব কওলুল্লাহ্ তা'লা ইউরিদুনা আই ইউবাদ্দিলূ কালামাল্লাহ্)

অতঃপর হযরত আবু মাসউদ গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন, রমযান মাস আরম্ভ হবার পর একদিন আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রোযার কল্যাণ সম্পর্কে মানুষ যদি জানত তাহলে আমার উম্মত চাইত যেন সারা বছরই রমযান হয়। এটি শুনে বনু খুযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাদেরকে রমযানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত করুন। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, কেবল রমযানের জন্যই বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয় এবং রমযানের প্রথম দিন আরম্ভ হলে আল্লাহ্র আরশের নীচ দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়।

সুতরাং না খেয়ে থাকার ফলে রোযাদারের মুখে যে গন্ধ সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ্ তা'লার নিকট কেবল এজন্যই প্রিয় যে, (আল্লাহ্ বলেন) 'আমার বান্দারা আমার সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এবং আমার ইবাদতে মগ্ন থাকে।' তাই আল্লাহ্ তা'লা এমন রোযাদারদের অনেক মূল্যায়ন করেন এবং এমন মানুষের প্রতি স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহের সুশীতল বাতাস প্রবাহিত করেন। এই পৃথিবীতেও তিনি তাদেরকে নিজ আশ্রয়ে রাখেন এবং পরকালেও জান্নাতের উত্তরাধিকারী করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সঠিক অর্থে রোযার গুরুত্ব বোঝার এবং সে অনুযায়ী রমযান মাস অতিবাহিত করার সামর্থ্য দান করুন।

রোযা পালনে যারা অলসতা প্রদর্শন করে তাদের জন্য হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নামাযের কথা তো আমি পূর্বেই বলেছি, এরপর রয়েছে রোযার বিষয়টি; দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমানে মুসলমান নামধারী কিছু এমন মানুষও আছে যারা এসব ইবাদতে পরিবর্তন আনতে চায়। তারা অন্ধ বরং খোদা তা'লার নিখুঁত প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অজ্ঞ। আত্মার পবিত্রতার জন্য এই ইবাদতসমূহ আবশ্যক। যে জগৎ সম্পর্কে এদের কোনো জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে এরা অনধিকার চর্চা করে থাকে এবং যে দেশ তারা ভ্রমণ করে নি, সে দেশের সংশোধনের জন্য মিথ্যা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে। জাগতিক মোহের মাঝে তাদের জীবন কেটে যায়। ধর্মীয় বিষয়াদির বিষয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কম খাওয়া এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মিক পবিত্রতার জন্য জরুরি। এর ফলে দিব্যদর্শনশক্তি বৃদ্ধি

পায়। মানুষ কেবল খাবার খেয়েই বাঁচে না। চিরস্থায়ী জীবনের ধারণা বা পরকালের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া নিজের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানানোর নামান্তর। একজন রোযাদারের এটি চিন্তা করা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই রোযার মূল উদ্দেশ্য নয় বরং যিকরে এলাহীতে অনেক বেশি মগ্ন থাকা উচিত। হতভাগা সেই ব্যক্তি– যে বাহ্যিক খাবার পেলো কিন্তু আধ্যাত্মিক খাবারের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করল না। বাহ্যিক খাবারের ফলে যেভাবে শরীর শক্তি লাভ করে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক খাবার আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং এর ফলে আধ্যাত্মিক শক্তিবৃত্তি প্রখর হয়। খোদার পক্ষ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবার চেষ্টা করো, কেননা খোদাপ্রদত্ত তৌফিকের মাধ্যমে সকল (কল্যাণের) দ্বার উন্মোচিত হয়। (জলসা সালানার বক্তৃতা-১৯০৬, পৃ. ২০-২১)

অতঃপর এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কুরআন মানবজাতির জন্য হিদায়াতস্বরূপ নাযিল করা হয়েছে যাতে পথনির্দেশনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর একটি অর্থ হলো, মানুষ যখন এটিকে মনোযোগের সাথে পড়ে তা বুঝার চেষ্টা করে এবং এর আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করতে সচেষ্ট হয়, তখন সে খোদা তা'লার মারেফত বা তথা খোদা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে। আল্লাহ্ তা'লা এমন বান্দাদেরকে নিজ প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন–

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ

অর্থাৎ কুরআনের তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, যে-সব ধর্মীয় জ্ঞান মানুষ বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সেগুলোর পানে পথনির্দেশনা প্রদান করে। দ্বিতীয়ত, যে-সব ধর্মীয় জ্ঞান পূর্ব থেকে সংক্ষিপ্তাকারে চলে আসছিল, সেগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করে। তৃতীয়ত, যে-সব বিষয়ে মতবিরোধ ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল, কুরআন সেগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করে। [তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৪৭]

অতএব যে তিনটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে। পূর্ববর্তীদের সকল ধর্মীয় জ্ঞান দান করা হয় নি, বরং কেবল অঞ্চলভিত্তিক কিংবা যুগের চাহিদা অনুসারে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর প্রতি এ পরিপূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দিকনির্দেশনা এতে প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর এমন সব শিক্ষা যা পূর্বে স্পষ্ট ছিল না এবং পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষামালায় নির্দিষ্ট করা ছিল না কিংবা এমন জ্ঞান যা সুনির্দিষ্টভাবে কেউ জানত না তা-ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। একই সাথে দলিলপ্রমাণের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা এবং সঠিক ও ভ্রান্ত বিষয়ের মাঝে পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সামর্থ্য অনুযায়ী এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে থাকুন আর এ কারণেই অনেক বেশি পবিত্র কুরআন পাঠ করা উচিত, এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালার ওপর আমল করে এ

থেকে লাভবান হওয়া উচিত। সর্বোপরি রমযান এবং কুরআনের মাঝে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যেভাবে হাদীসে এসেছে, প্রত্যেক রমযানে তখন পর্যন্ত যতটুকু কুরআন অবতীর্ণ হতো, জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলে ততটুকু পুনরাবৃত্তি করতেন। এ কারণেও এই দিনগুলোতে কুরআন পাঠ, তা বুঝা এবং দরসে অংশগ্রহণ করার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত, যেন কুরআনের ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়, সেটি বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এরপরে রোযার দিনগুলোতে কী কী ছাড় রয়েছে এবং কতটা থাকা উচিত সে বিষয়ে আমি গত খুতবায় সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দাদেরকে বলে দাও যে, আমি তোমাদের নিকটে আছি অর্থাৎ দোয়ার বিষয়ে বলছেন যে, আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই। কিন্তু তোমরা যদি দোয়া করার পদ্ধতি এবং রীতি যদি জানো কেবল তবেই তোমরা আমাকে কাছে পাবে। রোযাকে আবশ্যক বা বিধিবদ্ধ করা-সংক্রান্ত আয়াতের সাথে এই আয়াতকে রাখা হয়েছে এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহেও রমযান সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা বিধৃত রয়েছে। অতএব যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তো আমার নিকট প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনে থাকি কিন্তু তোমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হলো আমার শিক্ষা পালন করা, পুণ্যকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং মন্দকর্ম পরিহার করা। এমনটি যেন না হয় যে, কেবল কথার খই ফোটাবে আর আমার সাথে তোমাদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না; শুধু যখন কোনো সমস্যায় নিপতিত হবে তখনই আমার নিকট ছুটে আসবে! যারা কেবল (বিপদে পড়লেই) আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকে এমন লোকদেরকেও বিপদগ্রস্ত দেখে তিনি সাহায্য করেন কিন্তু তাদের বিপদ যখন কেটে যায় তখন তারা আবার সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণই করে। অতএব এ ধরনের আচরণ তো জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও শোভনীয় নয়। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি আমার সেসব বান্দাদের নিকটে আছি এবং তাদের দোয়া শুনে থাকি যারা আমার নিকটে আছে এবং আমার সত্তার সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে আর যারা কেবল জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই আমার কাছে ছুটে আসে না। এখন আমার কথামতো যখন তোমরা রোযা রাখছ, বহু মন্দকাজ পরিত্যাগ করছ, সৎ কর্মের উপদেশ দিচ্ছ, নিয়মিত নামায পড়ছ এবং নফল ইবাদতের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করছ, তাই আমিও তোমাদের দোয়া শুনে থাকি এবং তার উত্তর দেই। আমি এই অপেক্ষায় থাকি যে, আমার কোনো বান্দা একনিষ্ঠভাবে আমার নিকট প্রার্থনা করবে আর আমি তার প্রার্থনার উত্তর দেবো। এখন যেহেতু তোমরা আমাকে একনিষ্ঠভাবে ডাকছ, আমার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখো, আমার বান্দাদের প্রাপ্য দিচ্ছ, তাদের যত্ন নিচ্ছ, রমযানে দরিদ্রদের সেহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা করছ, ঝগড়াবিবাদ থেকে বিরত থাকছ, ক্ষমা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছ, প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত হচ্ছো; কেননা পূর্ণ ঈমানের অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার সকল গুণাবলির ওপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা, সেহেতু আমার গুণাবলি যদি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখো এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেগুলো আয়ত্ত করো, তাহলে হে আমার বান্দারা! জেনে রাখো আমি তোমাদের নিকটে আছি, তোমাদের পাশে আছি এবং তোমাদের দোয়া শুনছি। এখন তোমাদের আর কোনো দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা থাকা উচিত নয়। আর রমযান মাসে তো আমি আমার রহমতের দ্বার (এমনিতেই) অবারিত করে দেই।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন– فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي অর্থাৎ যদি আমি বলে থাকি যে, আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনি– এর অর্থ এটি ধরে নেবে না যে, আমি সবার দোয়া গ্রহণ করব। আমি দুটি শর্ত সাপেক্ষে প্রার্থনা শুনে থাকি। প্রথমত, আমি সেই ব্যক্তির দোয়া শুনে থাকি, যে আমার কথা শোনে। দ্বিতীয়ত, আমি তার দোয়া শুনে থাকি যে আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং আমার প্রতি কোনো কুধারণা পোষণ করে না। কেননা আমার শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে যদি প্রার্থনাকারীর দৃঢ়বিশ্বাসই না থাকে তাহলে আমি তার প্রার্থনা কেন শুনব? সুতরাং দোয়া কবুলিয়তের জন্য শর্ত হচ্ছে দুটি আর যে দোয়ার মাঝে এই দুটি শর্ত পাওয়া যাবে, সেটিই কবুল হবে। আর এ কারণে এখানে আল্লাহ্ তা'লা **'আদ্ দা'** শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হলো, এক বিশেষ প্রার্থনাকারী এবং এরপর শর্তসমূহ উল্লেখ করেছেন যা **'আদ্ দা'** শব্দে বিদ্যমান। আর তা হলো, তারা আমার কথা শুনবে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে। অর্থাৎ সেই দোয়া যেন আমার নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী হয়, বৈধ হয়, অবৈধ যেন না হয় এবং চারিত্রিক মূল্যবোধ ও সুন্নত অনুযায়ী যেন হয়। কোনো ব্যক্তি যদি এমন দোয়া করে তবে আমিও তার দোয়া শুনব। কিন্তু যদি কেউ এটি বলে যে, হে আল্লাহ! আমার অমুক আত্মীয় মারা গিয়েছে। তুমি তাকে জীবিত করে দাও, তবে এই দোয়া কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা পরিপন্থি। সে যখন কুরআনের কথাই মানল না, মহানবী (সা.)-এর কথাই শুনল না, খোদা তার কথা কেন গ্রহণ করবেন?

অতএব فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ -এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের উচিত আমার কথা শিরোধার্য করা এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখা। আমার প্রতি তোমাদের যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে আমি কীভাবে তোমাদের দোয়া শুনতে পারি? সুতরাং দোয়া গৃহীত হবার জন্য দুটি শর্ত আর তা হলো ১) فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي অর্থাৎ তোমরা আমার কথা শিরোধার্য করো এবং ২) وَلْيُؤْمِنُوا بِي অর্থাৎ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখো। যারা এই শর্তসমূহ পালন করে না তারা ধার্মিক নয়। তারা যেহেতু আমার শিক্ষা অনুসারে চলে না তাই আমিও তাদের সাথে এই প্রতিশ্রুতি দেই না যে, আমি তাদের দোয়া শুনব। নিঃসন্দেহে আমি তাদের দোয়াও শুনে থাকি, কিন্তু এই নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রত্যেক দোয়া গ্রহণ করব না। তবে যারা এই নিয়ম মেনে চলে এবং দোয়াও করে আমি তাদের প্রতিটি দোয়া শুনি বা গ্রহণ করি। (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৪০৫-৪০৬)

তিনি (রা.) আরো বলেন, সুতরাং দোয়া গৃহীত হবার সাথে রমযান মাসের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এটিই সেই মাস যেখানে প্রার্থনাকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা قَرِيبٌ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নিকটে হওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁকে না পাওয়া যায় তাহলে আর কবে পাওয়া যাবে? বান্দা যখন দৃঢ়তার সাথে তাঁকে আঁকড়ে ধরে এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেয় যে, এখন সে আল্লাহ্‌র দ্বার ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না, তবেই আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর فَإِنِّي قَرِيبٌ -এর ধ্বনি তার কানে পৌঁছে, যার অর্থ এটি ছাড়া আর কী হতে পারে যে, খোদা তা'লা সর্বদা তার সাথে থাকেন

এবং কোনো বান্দা যখন সেই মর্যাদায় উপনীত হয় তখন তার বুঝা উচিত যে, সে খোদাকে পেয়েছে।

হাদীসে আছে, হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, রমযানে আল্লাহ্‌র যিকরকারী বা আল্লাহকে যে স্মরণ করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং এই মাসে আল্লাহ্‌র নিকট যাচনাকারী কখনো ব্যর্থ হয় না।

আরেকটি হাদীস হলো, রোযাদারের জন্য তার ইফতারীর সময়ের দোয়া এমন যা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুস্ সিয়াম)

এর ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "মানুষ যদি জিজ্ঞেস করে, রোযার মাধ্যমে কীভাবে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করা যায় তবে তাকে বলো–

فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ

অর্থাৎ আমি নিকটে আছি এবং এই মাসে আমি প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা শুনি। অতএব তাদের উচিত প্রথমে আমার আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং ঈমান লাভ করা যাতে তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে আর এভাবে অনেক উন্নতি হবে।" (আল-হাকাম, ১৭ নভেম্বর ১৯০৭, পৃ. ৫)

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো বলেন, "রোযা যেমন তাকওয়া শেখার একটি মাধ্যম তেমনই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করারও একটি মাধ্যম। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাসের কথা বলে সাথে এটিও বলেছেন–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

এটি রমযান মাসের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এ থেকে রমযান মাসের মাহাত্ম্য ও ঐশী রহস্য সম্পর্কে জানা যায়। অর্থাৎ এ মাসে যদি তারা দোয়া করে তাহলে আমি তা গ্রহণ করব, কিন্তু তাদের উচিত আমার কথা শিরোধার্য করা এবং আমাকে মান্য করা। খোদার কথা মান্য করার ক্ষেত্রে মানুষ যত বেশি দৃঢ় হবে খোদা তা'লাও তার কথা তত বেশি শুনবেন। لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ থেকে বুঝা যায়, এ মাস হিদায়াতের সাথেও বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর এর মাধ্যম হলো, খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর নির্দেশাবলি মেনে চলা এবং দোয়া করা। আরো কিছু বিষয় রয়েছে যার মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভ করা যায়।" (আল-হাকাম, ২৪ জানুয়ারি ১৯০৪, পৃ. ১২)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "রমযান মাস একটি কল্যাণময় মাস এবং দোয়ার মাস।" (আল-হাকাম, ২৪ জানুয়ারি ১৯০১)

অতঃপর এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ
فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

অর্থাৎ আমার বান্দারা যখন আমার বিষয়ে প্রশ্ন করে যে, খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ কী তখন এর উত্তর হলো, আমি অনেক নিকটে আছি অর্থাৎ অনেক বড়ো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে খুব সহজেই বুঝা সম্ভব এবং অতি সহজে আমার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় আর তা হলো, কোনো প্রার্থনাকারী যখনই আমাকে ডাকে, আমি তার প্রার্থনা শুনি এবং ইলহামের মাধ্যমে তাকে সফলতার সুসংবাদ দিয়ে থাকি। এর ফলে কেবল আমার অস্তিত্বে বিশ্বাসই জন্মে না বরং আমার সর্বশক্তিমান হবার বিষয়েও পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু মানুষের (নিজের মাঝে) তাকওয়া ও খোদাভীতির এমন অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত, যাতে আমি তাদের প্রার্থনা শুনি। এছাড়াও তাদের উচিত আমার প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে তাদের একথা স্বীকার করতে হবে যে, খোদা বিরাজমান এবং সকল শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী। কেননা যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তাকেই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা হয়। (আইয়ামুস সুলহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৪, পৃ. ২৬০-২৬১)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লাকে অনেক বেশি স্মরণ করো, যেন লোকেরা বলে– এই ব্যক্তি পাগল। এটিই হলো আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করার পদ্ধতি।

হাদীসে রয়েছে, রমযান মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ্ তা'লা একজন ঘোষক ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যিনি এই ঘোষণা দেন যে, হে কল্যাণকামী! সামনে অগ্রসর হও, সামনে অগ্রসর হও। এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে– যে দোয়া করবে আর তার দোয়া গ্রহণ করা হবে? এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে– যে ইস্তিগফার করবে আর তাকে ক্ষমা করা হবে? এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে– যে তওবা করবে আর তার তওবা গ্রহণ করা হবে? (কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ০৮, কিতাবুস্ সওম, কিসমুল আউয়াল)

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, রাতের অর্ধেক কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হবার পর আল্লাহ্ তা'লা নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, কোনো যাচনাকারী আছে কি যাকে দেওয়া হবে? কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি যার প্রার্থনা গ্রহণ করা হবে? কোনো ক্ষমাপ্রার্থী কি আছে যাকে ক্ষমা করা হবে? এমন অবস্থা ফজরের পূর্ব পর্যন্ত বিরাজ করে। এ কারণে নফল নামায আদায়ের জন্য ঘুম থেকে ওঠা খুবই জরুরি। এমন যেন না হয় যে, কেবল সেহরী খাওয়ার জন্য উঠলেন– বরং নফল নামাযের জন্যও সময় নির্ধারণ করা উচিত।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আমি তার সাথে ব্যবহার করে থাকি। বান্দারা যখনই আমাকে স্মরণ করে আমি তাদের সাথে থাকি।

সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার অন্তরে তাকে স্মরণ করব।

কোনো বৈঠকে সে যদি আমার কথা স্মরণ করে, তাহলে আমি সেই বান্দাকে এর চেয়ে উত্তম বৈঠকে স্মরণ করব। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হবো। সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হবো। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে ছুটে আসব। (তিরমিযী, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত ফি হুসনিয্ যান্নি বিল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা ...)

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা খুবই লজ্জাশীল, কৃপালু এবং দানশীল। বান্দা যখন তাঁর সমীপে নিজের দুই হাত প্রসারিত করে তখন তিনি তাকে খালি হাতে এবং বিফলমনোরথ ফেরত পাঠাতে লজ্জা পান অর্থাৎ নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ের প্রার্থনা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, বরং তা গ্রহণ করেন। [তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব ফি দুআইন্ নাবিয়্যি (সা.)]

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "দোয়ার মাঝে গৃহীত হবার লক্ষণাবলি তখন সৃষ্টি হয় যখন তা একান্ত নিরুপায়ের ব্যাকুলতাসমৃদ্ধ হয়। (দোয়ার মাঝে) যখন চরম উপায়হীনের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তা গৃহীত হবার লক্ষণাবলি এবং উপকরণ সৃষ্টি হয়। প্রথম উপকরণ সৃষ্টি করা হয় ঊর্ধ্বলোকে এবং পরবর্তীতে তা পৃথিবীতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। এটি সামান্য কোনো বিষয় নয়, বরং একটি মহান সত্য। সত্য কথা হলো, খোদার বিকাশ যদি কেউ দেখতে চায় তবে তার উচিত দোয়া করা।" [আল-হাকাম, খণ্ড: ০৮, সংখ্যা: ১৩, ২৪ এপ্রিল ১৯০৪, পৃ. ৬; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৫৫]

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "দোয়ার দৃষ্টান্ত একটি সুমিষ্ট ঝরনাধারার ন্যায় যার পাশে একজন মুমিন বসে আছে আর সে যখনই চাইবে তা থেকে নিজেকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে। পানি ছাড়া মাছ যেমন বাঁচতে পারে না তদ্রূপ মুমিনের পানি হলো দোয়া– যা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। আর সেই দোয়ার সঠিক স্থান হলো নামায অর্থাৎ দোয়া করার সঠিক জায়গা হলো নামায যেখানে একজন মুমিন সেই প্রশান্তি এবং আনন্দ লাভ করে যার বিপরীতে একজন ভোগবিলাসী মানুষের কোনো পাপাচারের মাঝে যা পাওয়া সম্ভব তা নিতান্তই তুচ্ছ। দোয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে বড়ো যে বিষয়টি অর্জিত হয় তা হলো খোদা তা'লার নৈকট্য। দোয়ার মাধ্যমে মানুষ খোদার নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং তিনি তাকে নিজের দিকে টেনে নেন। মুমিনের দোয়ার মাঝে যখন পূর্ণ নিষ্ঠা এবং পূর্ণ জগৎবিমুখতা সৃষ্টি হয় তখন খোদাও তার প্রতি দয়ার্দ্র হন আর তিনি তার তত্ত্বধায়ক হয়ে যান (অর্থাৎ তার সব কাজ নিজের হাতে নিয়ে নেন)। মানুষ যদি নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ করে তবে দেখতে পাবে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মানবজীবন একেবারেই তিক্ত বা ছন্দহীন।" [আল-হাকাম, খণ্ড: ০৮, সংখ্যা: ১৯, ১৭ জুন ১৯০৪, পৃ. ৬; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৫৬]

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমার বান্দারা যদি আমার অস্তিত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করে যে, তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ কীভাবে পাওয়া সম্ভব এবং কীভাবে বুঝব, খোদা আছেন? তাহলে এর উত্তর হলো, আমি খুবই নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার জবাব দেই,

আমাকে যে ডাকে তার ডাকে সাড়া দেই এবং তার সাথে বাক্যালাপ করি। অতএব তাদের নিজেদের মাঝে এমন পরিবর্তন আনা উচিত, যেন আমি তাদের সাথে বাক্যালাপ করতে পারি এবং আমার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা উচিত, যেন তারা আমার পথ পায়।" [লেকচার লাহোর, পৃ. ১৩; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৪৯]

এবার একটি দোয়া উপস্থাপন করছি যা হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)-এর উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখে পাঠিয়েছিলেন আর বলেছিলেন যে, এই দোয়া করুন। দোয়াটি হলো, "হে বিশ্বপ্রতিপালক-প্রভু! তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সামর্থ্য আমার নেই। তুমি পরম দয়ালু এবং কৃপালু। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ সীমাহীন। আমার পাপ ক্ষমা করো, যেন আমি ধ্বংস না হয়ে যাই। আমার হৃদয়ে তোমার বিশুদ্ধ ভালবাসা সঞ্চার করো যাতে আমি জীবন লাভ করি এবং আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখো আর আমার দ্বারা এমন কাজ করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমি তোমার বদান্য সত্তার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যেন তোমার ক্রোধ আমার উপর নিপতিত না হয়। করুণা করো, কৃপা করো ও দয়ার্দ্র হও আর ঐহিক ও পারলৌকিক শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করো, কেননা সকল অনুগ্রহ ও কৃপা তোমারই হাতে। আমীন।"

অতঃপর আরেকটি দোয়া রয়েছে যা মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের দিনে আরাফাতের ময়দানে করেছিলেন। দোয়াটি হলো, "হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শোনো এবং আমার অবস্থা দেখো। আমার গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে তুমি সবিশেষ অবহিত। আমার কোনো বিষয় তোমার নিকট আদৌ গোপন নয়। আমি বিধ্বস্ত, অভাবগ্রস্ত এবং তোমার মুখাপেক্ষী এক বান্দা। আমি তোমার সাহায্য ও আশ্রয়প্রার্থী। আমি শঙ্কিত এবং নিজের পাপ স্বীকার করছি ও কবুল করছি। আমি তোমার নিকট একজন বিনীত মিসকীনের ন্যায় যাচনা করছি এবং তোমার দরবারে এক পাপী ও লাঞ্ছিতের ন্যায় আহাজারি করছি। এক অন্ধের মতো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তোমার নিকট দোয়া করছি, যার মস্তক সদা তোমার সম্মুখে অবনত এবং যার অশ্রু তোমার চরণে প্রবহমান। যার দেহ তোমার চরণে ভূলুণ্ঠিত এবং তোমার জন্য তার নাক ধুলোমলিন। হে আল্লাহ্! তোমার দরবারে দোয়ার করার পর তুমি আমাকে দুর্ভাগার ন্যায় ফিরিয়ে দিও না এবং আমার সাথে দয়া ও কৃপার আচরণ করো। হে সেই সত্তা! যিনি সবচেয়ে বেশি কাকুতিমিনতি গ্রহণ করেন এবং সর্বাধিক দানশীল (তুমি আমার দোয়া কবুল করো)।" [আল জামিউস্ সাগীরু লিস্ সুইউতী (রহ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ৫৬, প্রকাশ: আল মাকতাবাতু লিইসলামিয়্যাতি লাইলপুর; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ তিবরানী, খণ্ড: ১১, পৃ: ১৭৪, প্রকাশ: বৈরূত]

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রমযানে তাঁর প্রিয়দের মতো দোয়া করার সামর্থ্য দিন আর মহানবী (সা.) নিজ উম্মতের জন্য এবং নিজ প্রিয় মাহদীর মান্যকারীদের কল্যাণার্থে যে-সব দোয়া করেছিলেন, সেসব দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর সত্যিকার ইবাদতকারী বান্দা করুন। আমরা যেন তাঁর প্রতি অবনত হই, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষণ করুন এবং আমাদেরকে নিজেদের জীবনে আহমদীয়াত তথা খাঁটি

ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয় লাভের দৃশ্য দেখার সুযোগ দিন। হে আল্লাহ্! এ রমযানের সকল কল্যাণ হতে তুমি আমাদেরকে অঢেল দাও। সকল অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো এবং স্বীয় রহমত ও কৃপার চাদরে আমাদেরকে সর্বদা আবৃত রাখো। আমীন।

(২৯)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ৭ নভেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ৭ নবুওয়ত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

(আল-বাকারা: ২৬২)

আজ নিয়ম অনুসারে এবং ঐতিহ্যগতভাবে তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দেওয়া হবে কিন্তু এর পূর্বে কিছু কথা বলব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদেরকে বিভিন্নভাবে তাঁর পথে খরচ করার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং কীভাবে করতে হবে তা-ও বলে দিয়েছেন। কোথাও বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করো কেননা এটি তোমাদের জন্য উত্তম। আবার বলেছেন, আল্লাহ্র পথে খরচ করা থেকে হাত গুটিয়ে রেখে নিজেদের জন্য ধ্বংস ডেকে এনো না। কখনো বলেন, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে তোমরা ব্যক্তিগতভাবেও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। আর জাতির মাঝে যদি ত্যাগের স্পৃহা থাকে আর তারা যদি ত্যাগস্বীকার করে তাহলে জাতিগতভাবে তোমরা আমার কাছ থেকে ধ্বংস হতে পরিত্রাণের নিশ্চয়তা পাবে। অতঃপর বলেন, নিজেদের সৎ-উপার্জন থেকে খরচ করো, যেন তা অধিক কল্যাণ বয়ে আনে। গোপনেও খরচ করো আবার প্রকাশ্যেও। দরিদ্রদের প্রতি যত্নবান হও, তাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করো এবং যাকাত দাও, যেন জাতিগত সকল চাহিদাও পূর্ণ হয় আর দরিদ্রদের চাহিদাও পূরণ হয়। খরচ করার ক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে, নিজেদের কল্যাণের জন্যই তোমরা এই বাণিজ্য করছ। তাই কখনো অনুগ্রহের খোঁটা দেবার কথা মাথায়ও এনো না। অতএব নিজের লাভের জন্যই যেহেতু বাণিজ্য করছ তাই বিবেকের দাবি হলো, সর্বোত্তম বিনিয়োগ করা যাতে মুনাফাও অনেক বেশি হবে। আর এর ফলে ধনসম্পদ যতটুকু বৃদ্ধি পাবার তা পাবেই পাশাপাশি তোমরা এই পুণ্যের প্রতিদানও পাবে। এ কারণে প্রিয় সম্পদ থেকে ব্যয় করো, তোমাদের প্রিয় বস্তু বা সামগ্রী থেকে খরচ করো এবং উত্তম সম্পদের মধ্য থেকে খরচ করো। অস্বচ্ছল অবস্থায় অর্থাৎ অভাব-অনটনের মধ্যে যতবেশি খরচ করবে পুণ্যও তত বেশি হবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সর্বাবস্থায় প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে স্বীয় অনুগ্রহ ও কল্যাণরাজিতে ভূষিত করেন এবং করতে থাকবেন যারা তাঁর পথে ব্যয় করে কিংবা তাঁর রাস্তায় ত্যাগস্বীকার করে। আর প্রত্যেকেই নিজ ঈমানের মান অনুযায়ী খরচ করে। প্রত্যেকে স্বীয় মর্যাদা এবং নিজের খোদার প্রতি নির্ভরতার মান অনুসারে খরচ করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নবীরা

সবচেয়ে বেশি দানশীল হয়ে থাকেন আর নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এ কারণেই তিনি (সা.) একস্থানে বলেছেন, আমার মনের অবস্থা হলো– আমার কাছে উহুদ পাহাড়সম স্বর্ণ থাকলেও আমি পুরোটাই অকাতরে বিলিয়ে দেবো। নবীদের পর স্বীয় মর্যাদার নিরিখে প্রত্যেকেই এই সৎকাজে অংশ নেয় আর সে এর প্রতিদানও পায় এবং সে অনুযায়ী সে খরচও করে। একবার হযরত উমর (রা.)-এর মনে এই ভাবনার উদয় হয় যে, আজ আমার ঘরে যথেষ্ট ধনসম্পদ রয়েছে তাই আমি মহানবী (সা.)-সমীপে তা উপস্থাপন করি আর অর্ধেক সম্পদ নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন আর মনে মনে ভাবেন, আজ হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে এগিয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে কেননা তার চেয়ে আজ আমি বেশি কুরবানী করব। তখনই হযরত আবু বকর (রা.) নিজের সম্পদ নিয়ে হাজির হলে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি নিবেদন করেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে। এটি শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি (মনে মনে) নিজেকে বললাম, তুমি কখনোই আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে পুণ্যে অগ্রগামী হতে পারবে না। যাহোক, আমি বলছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদেরকে তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেন আর আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্য চান (এর চেয়েও) বৃদ্ধি করে দেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞ। (আল-বাকারা: ২৬২)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা (সাধারণ) মানুষের উপমা দিয়েছেন কিন্তু মূলত এখানে মুমিনদের কথা বলা হচ্ছে। এমন মুমিন বা বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য ব্যয় করে। আমরা সবাই জানি, এখন কেবল ইসলামই হচ্ছে একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্ম। আর এ যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তই সত্যিকার অর্থে মুমিনদের জামা'ত আখ্যা পাবার যোগ্য এবং এটিই মুমিনদের জামা'ত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কারী বলতে আপনাদেরকেই বুঝানো হচ্ছে যারা ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের সর্বোত্তম সম্পদ সানন্দে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এমন সদিচ্ছা লালনকারী লোকদের সুসংবাদ দিয়ে বলছেন, হে লোকসকল! তোমরা যারা আমার পথে ব্যয় করো, আমি তোমাদের খালি হাতে ফেরাবো না। বরং আমি তোমাদের এসব কুরবানীকে সাতশ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়েও বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখি। স্মরণ রেখো! তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে যত বেশি মুক্তহস্ত হবে তিনি তোমাদেরকে ততই আর্থিক সমৃদ্ধি দান করতে থাকবেন। তোমরা এ পৃথিবীতেও তাঁর অনুগ্রহের ভাগী হবে বরং পরকালেও কেননা এই প্রতিদান কেবল এ জগতেই সীমিত থাকবে না বরং তোমাদের পরবর্তী বহু প্রজন্মও এর প্রতিদান পেতে থাকবে। এবার দেখুন! আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা তাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিদের কুরবানীর কল্যাণে আর্থিক প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা লাভ করেছেন। এই চেতনা আমাদের নিজেদের মাঝে সর্বদা সমুন্নত রাখা উচিত জাগ্রত রাখা উচিত এবং এর বরাতে

পূর্বসূরিদের জন্য দোয়াও করা উচিত। অধিকন্তু পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও এই চেতনা সৃষ্টি করা উচিত যে, পূর্বসূরিদের ত্যাগের ফলেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি এত করুণা করেছেন।

হযরত ইমাম রাযী (রহ.)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه

مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًاحَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা সম্পদ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর আয়াতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে (অর্থাৎ তা কীভাবে হয় তার বিবরণ)। এ উভয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা জীবিত করা ও মৃত্যু দেবার ক্ষেত্রে স্বীয় কুদরত বা ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। খোদার যদি এই শক্তি বা কুদরত না থাকত তাহলে ব্যয় করার নির্দেশ যুক্তিসংগত হতো না, কেননা শাস্তি-পুরস্কার 'দাতা' কেউ না থাকলে খরচ করাটা অর্থহীন সাব্যস্ত হতো। অন্য ভাষায় বলা যায়, আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীকারীকে বলছেন, তুমি জানো যে, আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি আর তোমার প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করেছি এবং তুমি আমার প্রতিদান ও পুরস্কার দেবার ক্ষমতা সম্পর্কেও জ্ঞাত। কাজেই তোমার এই জ্ঞান তোমাকে যেন আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে, কেননা তিনিই অর্থাৎ খোদা অল্পের বিনিময়েও অনেক বেশি দিয়ে থাকেন। এখানে অঢেল দেবার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন অর্থাৎ যে একটি শস্যবীজ বপন করে আমি তার জন্য সাতটি শীষ উৎপন্ন করি এবং প্রত্যেকটি শীষে একশটি শস্যদানা থাকে, মোটকথা একটি থেকে সাতশ দানা হয়ে থাকে।

অতঃপর তিনি লেখেন, يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه অর্থাৎ তারা খোদার রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। এখানে 'সাবিলিল্লাহ্' বলতে ধর্ম বুঝানো হচ্ছে অর্থাৎ খোদার ধর্মের খাতিরে ব্যয় করে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে লেখেন, "তোমরা ধর্মীয় কাজের জন্য যদি নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে একটি শস্যদানা থেকে সাতশ দানা সৃষ্টি করেন তদ্রূপ তিনি তোমাদের ধনসম্পদও বৃদ্ধি করবেন বরং এর চেয়েও বেশি উন্নতি দান করবেন; 'وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ'-তে সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। অতএব ইতিহাস সাক্ষী যে, এমনটিই হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) নিঃসন্দেহে অনেক ত্যাগস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূল (সা.)-এর প্রথম খলীফা বানিয়ে যে মহান পুরস্কারে তাকে ভূষিত করেছেন সে তুলনায় তার কুরবানী কিবা মূল্য রাখত। একইভাবে হযরত উমর (রা.) অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু (বিনিময়ে) তিনি কত বড়ো পুরস্কার পেয়েছেন। হযরত উসমান (রা.)-ও যা কিছু ব্যয় করেছিলেন তিনিও এই পৃথিবীতেই তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি পেয়ে গেছেন। অনুরূপভাবে একে একে সাহাবীদের অবস্থার দিকে তাকালে সেক্ষেত্রে খোদা তা'লার একই ব্যবহার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কেই দেখুন। মৃত্যুকালে তার কাছে তিন কোটি টাকা সংরক্ষিত ছিল। এছাড়া তিনি নিজ জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ টাকা (পুণ্যকর্মে) ব্যয় করেছেন। একইভাবে সাহাবীরা দেশান্তরিত হবার পর তুলনামূলক উত্তম দেশ পেয়েছেন। ভাইবোন ত্যাগ করেছেন তখন এর চেয়েও উত্তম ভাইবোন পেয়েছেন। নিজেদের পিতামাতাকে ছেড়েছেন, বিনিময়ে পিতামাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল রসূল (সা.)-কে পেয়েছেন। মোটকথা, আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানীকারী কখনো উত্তম প্রতিদান থেকে বঞ্চিত থাকে নি। (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৬০৪)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে আরো লেখেন, " وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم -বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন, খোদা তা'লার কাছে কোনোকিছুর ঘাটতি থাকলে পুরস্কার দেবার ক্ষেত্রে কৃপণতা প্রকাশ পাবার প্রশ্ন আসবে। কিন্তু তিনি তো মহাপ্রাচুর্যশালী ও সমৃদ্ধিদাতা। এছাড়া তিনি সর্বজ্ঞও বটে। তিনি জানেন, সে ব্যক্তি কতটুকু পুরস্কার পাবার যোগ্য। কেউ যদি কোটি কোটি গুণ পুরস্কার পাবারও যোগ্য হয়, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই পুরস্কার দেবার ক্ষমতা রাখেন। পৃথিবীতে এই দৃশ্য আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই যে, কৃষক জমিতে একটি বীজ বপন করে কিন্তু খোদা তা'লা সেটিকে সাতশ গুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করবে সেই ব্যয়কৃত সম্পদ কীভাবে বিনষ্ট হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়কৃত সম্পদের কমপক্ষে সাতশ গুণ বিনিময় অবশ্যই লাভ হয় আর এর অধিক প্রাপ্তির তো কোনো সীমাপরিসীমা নেই। চূড়ান্ত সীমা যদি নির্ধারণ করে দেয়া হতো তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সত্তাকেও সীমাবদ্ধ মানতে হতো যা আল্লাহ্ তা'লার জন্য একটি খুঁত বলে সাব্যস্ত হতো। এজন্যই বলেছেন, তোমরা খোদার পথে একটি শস্যদানা খরচ করলে এর বিনিময়ে কমপক্ষে সাতশ গুণ বেশি প্রতিদান পাবে। এছাড়া বেশির পরিমাণ যে কত তার কোনো শেষ নেই আর এর কোনো ইয়ত্তা নেই। **হযরত ঈসা (আ.) তো ইনজীলে শুধু এতটুকু বলেছিলেন যে, 'নিজেদের জন্য স্বর্গে ধনসম্পদ সংরক্ষণ করো কেননা সেখানে পোকাও নষ্ট করে না, মরিচাও ধরে না এবং চোর সিঁদ কেটেও চুরি করে না।'** (মথি, ৬:২০)

পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন বলে, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার ভাণ্ডারে নিজেদের ধনসম্পদ জমা রাখো তাহলে সেগুলো যে কেউ চুরি করতে পারবে না কেবল তা-ই নয়, বরং এর বিনিময়ে কমপক্ষে সাতশ গুণ বেশি পুরস্কার পাবে আর এর চেয়েও যে কত অধিক পেতে পার তার কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। অথচ হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, সেখানে কোনো পোকা ফসল খেয়ে ফেলতে পারবে না। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন বলে, কেবল পোকামাকড় থেকেই তা সুরক্ষিত থাকে না বরং একটির বিনিময়ে সাতশ গুণ বর্ধিত আকারে ফেরত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লা যদিও কোনো মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে কোনো কাজ করার সুযোগ দিলে তা এজন্য যে, তিনি তাদের পদমর্যাদা উন্নত করতে চান।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৬০৪-৬০৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, **"ভালোভাবে স্মরণ রেখো! নবীরা**

আর্থিক কুরবানীর যে আহ্বান জানান তা তাদের নিজেদের জন্য নয়, বরং সেই আর্থিক কুরবানীকারীদের (খোদার হাত দ্বারা) কিছু দেবার উদ্দেশ্যেই এটি করেন। আল্লাহ্‌র কাছে মানুষকে দেবার অনেক পন্থা রয়েছে তার মধ্যে একটি পন্থার উল্লেখ প্রথম সূরার শুরুতেই ' مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ' (আল-বাকারা: ৪)-এ করা হয়েছে। এরপর ' اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ' (আল-বাকারা: ১৭৮) এবং এই একই পারায় ' اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ ' (আল-বাকারা: ২৫৫)-আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কুরবানীর বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হচ্ছে। ইনজীলে কেবল একটি বাক্য রয়েছে যে, কেউ চাইলে তাকে দান করো। কিন্তু দেখুন!পবিত্র কুরআন এই বিষয়টি পাঁচটি রুকূতে সম্পন্ন করেছে। প্রথম প্রশ্ন হলো, কাউকে কেন দেবে? অতএব এর উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র নামকে সমুন্নত করার জন্য। যেমন আর্থিক কুরবানীকারীদের একটি উপমা হলো, কেউ জমিতে কারো বাজরার বীজ বপন করার ন্যায় যাতে অনেকগুলো শীষ উৎপন্ন হয়।"

তিনি (রা.) আরো বলেন, ' وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ' কোনো স্থানে একটির বিনিময়ে দশটি আবার কোনো স্থানে সাতশর উল্লেখ রয়েছে। প্রয়োজন, পরিমাণ, সময় এবং ক্ষেত্রবিবেচনায় এই পার্থক্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে এক ব্যক্তি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টিও হচ্ছে। এমন সময়ে কাউকে যদি গ্লাস ভর্তি করে পানি দেওয়া হয় তাহলে সেটি বড়ো কোনো বিষয় নয়, কিন্তু কেউ যদি জঙ্গলের মধ্যে দুপুরের তপ্ত রোদে পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ও গরমে অস্থির একজন মানুষকে পানি পান করায় তাহলে সেটি এক মহান পুণ্য বলে বিবেচিত হয়। কাজেই অবস্থার পার্থক্যের কারণে প্রতিদানেও ভিন্নতা দেখা দেয়।

অতঃপর তিনি হযরত রাবেয়া বসরী (রা.)-এর একটি উদাহরণ দেন। একবার তিনি নিজ গৃহে বসেছিলেন, তখন বিশজন অতিথি আসেন অথচ বাড়িতে রুটি ছিল মাত্র দুটি। তিনি তার গৃহপরিচারিকাকে বললেন, এই দুটি রুটিও কাউকে দিয়ে আসো। সেই সেবিকা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং মনে মনে ভাবে, পুণ্যবান লোকেরাও অদ্ভুত রকমের বোকা হয়ে থাকে। বাড়িতে অতিথি এসেছে আর সে বলে যে, দু-একটি রুটি আছে সেগুলো দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে আসো। অল্প কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে এক মহিলার আওয়াজ আসে। কোনো ধনাঢ্য মহিলা তাকে আঠারোটি রুটিসহ পাঠিয়েছিল। হযরত রাবেয়া বসরী (রা.) তা ফেরত দিয়ে বলেন, এগুলো আমার নয়। তখন সেই পরিচারিকা আবার বলে, আল্লাহ্ তা'লা এই রুটি পাঠিয়েছেন তাই আপনি এগুলো রাখুন। তিনি বললেন, না, এগুলো আমার নয়। পরক্ষণেই প্রতিবেশী সেই ধনাঢ্য মহিলা ডাক দিয়ে বলে, তুমি কোথায় চলে গেলে? রাবেয়া বসরীর ঘরে তো বিশটি রুটি নিয়ে যাবার কথা ছিল। তখন তিনি [অর্থাৎ হযরত রাবেয়া বসরী (রা.)] বলেন, আমি দু'টি রুটি পাঠিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যাবসা করেছিলাম যাতে তিনি তা দশগুণ করে ফেরত পাঠান। কাজেই, দুটির বিনিময়ে বিশটি আসার কথা ছিল আর তাই (বলেছিলাম), এই আঠারোটি আমার নয়। অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এটি সত্য ঘটনা আর আমারও এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আমি কয়েকবার এভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। কিন্তু একইসাথে তিনি (রা.)

এটিও বলেন, আল্লাহ্ তা'লাকে পরীক্ষা কোরো না, কেননা তিনি তোমাদের পরীক্ষার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না।

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, কেন দেবো? এ প্রশ্নের উত্তর এসে গেছে, এখন কীভাবে দেবো? সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রথমত, কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দান করো, অনুগ্রহ বশে নয়। প্রথম কথা ছিল, কেন দেবো? আল্লাহ্র ধর্মের খাতিরে দান করা অপরিহার্য, তাই দাও। অতঃপর কীভাবে তা দেবো? উত্তর হলো, অনুগ্রহবশে নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্র জন্য দান করো।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আল্লাহ্র রাস্তায় যারা অর্থ ব্যয় করে তাদের সম্পদ আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বৃদ্ধি করেন তা হলো, বীজ যখন বপন করা হয় তখন সেটি একটিই থাকে, কিন্তু খোদা এর মধ্য হতে সাতটি শীষ উৎপন্ন করতে পারেন এবং প্রতিটি শীষে একশটি শস্যবীজ সৃষ্টি করতে পারেন। অর্থাৎ আসল জিনিসের চেয়ে বেশি করে বা বাড়িয়ে দেওয়া এটি খোদা তা'লার কুদরত বা শক্তিমত্তার অন্তর্গত বিষয় আর সত্যিকার অর্থে আমরা সবাই খোদার এই কুদরত বা শক্তির কারণেই বেঁচে আছি। আল্লাহ্ তা'লা যদি কোনো জিনিসকে নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে দেবার ক্ষমতা না রাখতেন তাহলে গোটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত এবং একটি প্রাণীও ভূপৃষ্ঠে জীবিত থাকত না।"** (চশমায়ে মা'রেফাত, পৃ. ১৬২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, **"স্বপ্নের ব্যাখ্যায় কলিজা দ্বারা ধনসম্পদ বুঝায়। আর এ কারণেই দানখয়রাত করা প্রাণ-বিসর্জন দেবার মতো বিষয় হয়ে থাকে (অর্থাৎ আর্থিক ত্যাগস্বীকারের অনেক গুরুত্ব রয়েছে)। মানুষ দান-খয়রাত করার সময় কত-না নিষ্ঠা ও অবিচলতা প্রদর্শন করে। আসল কথা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যত কোনোকিছু করে দেখানো না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু কথার খই ফোটানো অর্থহীন। এটিকে সদকা এজন্যই বলা হয়, কেননা তা সত্যবাদীদের চিহ্নিত করে দেয়।"** (আল-হাকাম, খণ্ড: ০২, সংখ্যা: ২, ৬ মার্চ ১৯৭৯, পৃ. ২)

হাদীসে রয়েছে, হযরত খুরায়ম বিন ফাতেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কিছু ব্যয় করে বিনিময়ে তার সাতশ গুণ প্রতিদান লাভ হয়।"** (তিরমিযী, কিতাব ফাযায়েলুল জিহাদ, বাব ফাযলুন্ নাফাকাতি ফি সাবিলিল্লাহ)

অতঃপর আরেকটি হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **"আমি কি তোমাদেরকে দানশীলদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দানশীলের নাম বলব না? আল্লাহ্ তা'লা হলেন সকল দানশীলের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল এবং মানুষের মধ্যে আমি [অর্থাৎ মহানবী (সা.) নিজের সম্পর্কে বলছেন] সর্বাধিক দানশীল।"** (মাজমাউয্ যাওয়াইদ ওয়া মামবাউল্ ফাওয়াইদ, আল্লামা হিশামীর রচিত পুস্তক, খণ্ড: ০৯, পৃ. ১৩, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

হযরত সা'দ বিন মা'আয (রা.) তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'নামায, রোযা এবং যিকরে এলাহী আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কৃত ধনসম্পদকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে'**। অতএব এ সুসংবাদ তাদের জন্য যারা আর্থিক কুরবানী করেছেন। অর্থাৎ এখন রমযান চলছে আর এ দিনগুলোতে রোযার পাশাপাশি যিকরে এলাহী তথা

আল্লাহ্‌কে স্মরণ এবং নামাযের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। তাই এদিকে পূর্ণ মনোযোগ থাকলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **তোমাদের এই আর্থিক ত্যাগস্বীকারের প্রতিদান আমি সাতশ গুণ বৃদ্ধি করে দেবো।**

আরেকটি রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে বলল, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সওয়াব বা পুণ্যের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো সদকা কী? তিনি (সা.) বলেন, তোমার সুস্থ-সবল অবস্থায় প্রদানকৃত সদকা হলো সবচেয়ে বড়ো সদকা যখনকিনা তুমি সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করো, দারিদ্রকে ভয় পাও আর সচ্ছলতা কামনা করো। দানখয়রাতে বিলম্ব কোরো না, পাছে এমন না হয় যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হলে তুমি বলো, অমুককে এত দাও আর তমুককে অত দাও।** তিনি (সা.) বলেন, **সেই সম্পদ এখন আর তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই বরং তা এখন অন্যের।** কাজেই সুস্থাবস্থায় চাঁদা এবং দানখয়রাতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একবার একটি গল্প বলেছিলেন যে, এক ব্যক্তি মরুময়-নির্জন প্রান্তর অতিক্রম করছিল। চারদিক ছিল মেঘে ঢাকা। সে মেঘের মধ্য হতে শব্দ শুনতে পায়, হে মেঘ! তুমি অমুক পুণ্যবান ব্যক্তির বাগানে পর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষিত হও। তখন সেই মেঘ সেদিকে ভেসে যায়। পাথুরে মালভূমিতে বারি বর্ষণ শুরু হয়। (বৃষ্টির) পানি একটি ছোট্ট নর্দমায় প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হয়। সেই ব্যক্তিও নর্দমার তীর ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। সে দেখে, এই নর্দমাটি একটি বাগানে গিয়ে প্রবেশ করছে আর বাগানের মালিক কোদাল দিয়ে সেই পানি বিভিন্ন কেয়ারিতে (অর্থাৎ চারা রোপণের জন্য আলে ঘেরা বাগানের নির্দিষ্ট ছোটো জায়গায়) পরিচালিত করছে। সে ব্যক্তি বাগানের মালিককে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার নাম কী? সে সেই নামই বলল যা সেই পথিক মেঘের গর্জনে শুনেছিল। এরপর বাগানের মালিক সেই পথিককে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার নাম জানার তোমার কেন প্রয়োজন পড়ল– তা বলো? সে বলল, যে মেঘের পানি তুমি ব্যবহার করছ আমি সে মেঘ থেকে এই আওয়াজ শুনেছিলাম যে, হে মেঘ! তুমি অমুক ব্যক্তির বাগানে পর্যাপ্ত মাত্রায় পানি সরবরাহ করো। (আমি জানতে চাই,) তুমি এমন কী পুণ্যকাজ করেছ যার প্রতিদান তুমি পাচ্ছো? বাগানের মালিক বলল, আপনি শুনতে চাইলে শুনুন। আমার রীতি হলো, এই বাগানের উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করি এবং এক-তৃতীয়াংশ নিজ পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্য রেখে দেই আর শেষাংশ পুনরায় এই ক্ষেতে বীজ হিসেবে ব্যবহার করি। এই (ঘটনাটি) তাদের জন্যও শিক্ষণীয় যারা ব্যবসায়ী কিংবা চাকুরিজীবী। নিজের আয় থেকে যে চাঁদা আপনাদের দিতে হবে তা প্রতি মাসে কিংবা প্রতিবার ব্যাবসার লভ্যাংশ থেকে পৃথক করে রাখলে অনেক সুবিধা হয়, (ফলে) বছরের শেষে গিয়ে কোনো চাপও পড়ে না।

একটি হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.) একবার তাঁর শ্যালিকা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা আসমাকে উপদেশ প্রদান করেন যে, **'আল্লাহ্‌র রাস্তায় গুনে গুনে খরচ কোরো**

না; নইলে আল্লাহ্ও তোমাকে গুনে গুনেই দেবেন। তোমার টাকার থলের মুখ (কার্পণ্যবশত) বেঁধে রেখো না অর্থাৎ কার্পণ্য করে লুকিয়ে রেখো না অন্যথায় তা বন্ধই রাখা হবে। কেননা টাকা বের না হলে আসবেও না। সাধ্যমতো মুক্ত হস্তে ব্যয় করো।'
(বুখারী, কিতাবুল হিবা ওয়া ফাযলিহা বাব হিবাতুল মারআতি লিগাইর ...)

কপুরথলা নিবাসী হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের প্রথম দিকের একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন তা হলো, শুরুর দিকের কথা– যখনকিনা চাঁদা ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় নি এবং জামা'তের সদস্য সংখ্যাও কমই ছিল। তখন একদিন হঠাৎ করে অনেক অতিথির আগমন ঘটে। সে সময় অর্থাভাব ছিল। হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) আমার সামনে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অর্থাভাবের অভিযোগ করেন পাশাপাশি একথাও বললেন যে, অনেক অতিথি এসেছে। তখন তিনি (আ.) বাড়ির অন্দরমহলে যান আর হযরত উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর অলংকার এনে মীর সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো বিক্রি করে খরচ চালিয়ে নিন।

গহনা বিক্রি করে যে টাকা এসেছিল তা দু-তিন দিনের মাথায় শেষ হয়ে যায়। মীর সাহেব (রা.) আবার উপস্থিত হয়ে ব্যয়ভারের কথা উল্লেখ করেন। তখন হুযূর (আ.) বলেন, আমরা সুন্নত অনুযায়ী বাহ্যিক উপকরণ যথাসাধ্য কাজে লাগিয়েছি এখন তিনিই ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ আমাদের কাছে যা ছিল, রীতি অনুসারে আমরা তা দিয়ে দিয়েছি এবং খরচ করেছি। এখন যাঁর অতিথি তিনিই অর্থাৎ খোদা তা'লা স্বয়ং ব্যবস্থা করবেন। তিনি (রা.) বলেন, পরের দিনই মানি অর্ডারে এত টাকা এসে যায় যা গণনায় শত-শত হবে। সে যুগে শত-শত রুপির মূল্যমান অনেক ছিল। এরপর তিনি (আ.) খোদানির্ভরতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি (আ.) বলেন, বস্তুবাদীরা যেভাবে সিন্দুকে গচ্ছিত টাকার ওপর নির্ভর করে, অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী যতটা চাইবে সিন্দুক খুলে বের করে নেবে, আল্লাহ্র প্রতি ভরসাকারী ব্যক্তির খোদার সত্তায় বিশ্বাস ও আস্থা এমনই থাকে যে, যখন চাইবে (খোদা) বের করে দেবেন আর আল্লাহ্র ব্যবহার এমনটিই হয়ে থাকে।

অতএব দেখুন! এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দার বিবিধ প্রয়োজন পূর্ণ করেন। আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য তিনি আমাদেরকেও সেসব সৌভাগ্যবান লোকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা এসব পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণ করে ও পুরস্কার লাভ করে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হয়।

হযরত হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ করে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আমি যদি অনুমতি দিতাম তাহলে তিনি সবকিছু এ পথে (অর্থাৎ ধর্মসেবার পথে) বিলিয়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক সাহচর্যের ন্যায় দৈহিক সাহচর্য এবং সর্বদা সাথে থাকার দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করতেন। তার কোনো কোনো চিঠির কয়েকটি ছত্র উদাহরণস্বরূপ পাঠকদের দেখাচ্ছি। তিনি লেখেন, 'আমি আপনার জন্য নিবেদিত। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয় বরং আপনার। হযরত পীর ও মুর্শিদ! আমি পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিবেদন করছি, আমার সমস্ত ধনসম্পদ যদি ধর্মপ্রচারে ব্যয় হয় তাহলে আমি**

ধন্য। বারাহীনের ক্রেতারা যদি গ্রন্থের মুদ্রণ কাজ বিলম্বিত হবার কারণে অস্থির হয়ে পড়েন তাহলে আমাকে তাদের প্রদত্ত সমস্ত মূল্য নিজের পক্ষ থেকে ফেরত দেবার মতো এই নগণ্য সেবার অনুমতি দিন'।" (ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৫-৩৬)

অর্থাৎ এখন যারা বারাহীনে আহমদীয়ার ক্রেতা রয়েছেন তারা যদি এ মুহূর্তে টাকা দিতে না পারেন তাহলে আমাকে তা সম্পূর্ণ নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করার অনুমতি দিন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, **"আমি বার বার তাকিদ দিয়ে বলি যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করো। এটি খোদা তা'লার নির্দেশে বলি, কেননা বর্তমানে ইসলাম পতনোন্মুখ অবস্থায় রয়েছে। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ দেখে মন অস্থির হয়ে পড়ে আর ইসলাম অন্যান্য বিরোধী ধর্মের শিকারে পরিণত হচ্ছে। অবস্থা যেখানে এমন সঙিন সেখানে আমরা কি ইসলামের উন্নতিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করব না? খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যেই এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব এর (অর্থাৎ ইসলামের) উন্নতির জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং ইচ্ছারই বাস্তবায়ন। তাই এ পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে তিনি সে বিষয়ে সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।**

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতিও রয়েছে, খোদা তা'লার জন্য যে ব্যক্তি দান করবে আমি তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবো। এ দুনিয়াতেই সে অনেক কিছু পাবে এবং মৃত্যুর পর পারলৌকিক পুরস্কারও লাভ করবে অর্থাৎ সেই সুখ ও আরামের মহান দিকগুলো সে প্রত্যক্ষ করবে। মোটকথা, এখন আমি তোমাদের সবার দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছি, ইসলামের উন্নতির জন্য নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করো।" (আল-হাকাম, ৩১ জুলাই ১৯০৬; মলফুযাত, খণ্ড: ০৮, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪)

এখন আমি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দেবার পূর্বে গত বছর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি স্বীয় যে কৃপাবারি বর্ষণ করেছেন প্রথমে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলছি। আপনারা জানেন, তাহরীকে জাদীদের বছর ৩১ অক্টোবরে শেষ হয়। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার চরণে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক খাতে সম্মিলিতভাবে জামা'তের মোট আর্থিক কুরবানীর পরিমাণ হলো ২৮ লক্ষ ১২ হাজার পাউন্ড, আলহামদুলিল্লাহ্। এটি গত বছরের চেয়ে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ্ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্।

গত বছরও এ খাতে এক লাফে এত বেশি চাদা সংগ্রহ হয়েছিল যে, ধারণা করা হচ্ছিল, হয়ত এ খাতে এ বছর বেশি আদায় হবে না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা স্বীয় অনুগ্রহে জামা'তকে ভূষিত করেন আর এবারও গত বছরের তুলনায় অধিক চাঁদা আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

আর্থিক কুরবানীর নিরিখে এখন যেহেতু ক্রমধারায় বিভিন্ন জামা'তের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় তাই এখন আমি তা তুলে ধরছি কেননা বিভিন্ন স্থানে আমীর এবং তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারিরা কী ফলাফল হলো তা জানার জন্য হয়ত ব্যাকুল হয়ে বসে আছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছরও পাকিস্তান জামা'ত নিজেদের অতীত ঐতিহ্য বজায়

রেখেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জামা'তগুলোর মধ্যে তারাই শীর্ষস্থানে আছে আর তারাই প্রথম হবার সম্মান লাভ করেছেন। পাকিস্তান এমন একটি দেশ যা সামগ্রিক আদায়ের দিক দিয়েও এবং তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদীনের সংখ্যার ক্ষেত্রেও সর্বাগ্রে রয়েছে। যদিও উকীলুল মাল সাহেব কিছুদিন যাবৎ চিন্তিত ছিলেন যে, জানি না কী হবে? আর (দোয়ার জন্য) অনেক ফ্যাক্সও আসছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন আর তাদের যে প্রত্যাশা ও টার্গেট ছিল তা পূর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

পরবর্তী স্থানে রয়েছে আমেরিকা। সেখানেও আমীর সাহেবের ধারণা ছিল, অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। কুরবানীর যে মান তাদের মাথায় আছে তা অর্জন সম্ভব হবে কিনা জানা নেই। কিন্তু এ বছরও আমেরিকা গত বছরের চেয়ে বেশি চাঁদা দিয়ে পাকিস্তানের বাইরে সারা বিশ্বের জামা'তগুলোর মধ্যে প্রথম হয়েছে। আর এটিও বলে দিচ্ছি, তারা যে আট শতাংশ চাঁদা আদায় করেছে এর হারও বিশ্বের অন্যান্য জামা'তগুলোর চেয়ে বেশি ছিল। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানি তৃতীয় স্থানে রয়েছে এবং জার্মানির বিশেষত্ব হলো, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই জামা'তের ৯৫ শতাংশ সদস্য তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দিয়েছেন, মাশাআল্লাহ্।

এবার মোট আদায়ের দিক থেকে প্রথম দশটি জামা'তের নাম ক্রমানুসারে বলে দিচ্ছি। প্রথম স্থান অধিকার করেছে পাকিস্তান, দ্বিতীয় আমেরিকা, তৃতীয় জার্মানি, চতুর্থ যুক্তরাজ্য, পঞ্চম কানাডা, ষষ্ঠ ভারত, সপ্তম মরিশাস, অষ্টম সুইজারল্যান্ড, নবম অস্ট্রেলিয়া এবং দশম বেলজিয়াম। যুক্তরাজ্য চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। যথেষ্ট উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে যে সম্পর্কে আমি পরবর্তীতে বলব।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব, আবু ধাবি এবং আফ্রিকায় নাইজেরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্ তা'লা এদের সবার প্রতি স্বীয় স্নেহদৃষ্টি রাখুন এবং অনুগ্রহরাজিতে ভূষিত করুন।

এখন তাহরীকে জাদীদ খাতে মোট চাঁদাদাতা বা মুজাহিদীনের সংখ্যা বলে দিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সর্বমোট তিন লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশর বেশি চাঁদাদাতা রয়েছে। গত বছরের চেয়ে এ বছর আল্লাহ্‌র কৃপায় ত্রিশ হাজার চারশ সদস্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই (সংখ্যা) বৃদ্ধির দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে ভারত, এরপর পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য এবং কানাডা জামা'ত। যুক্তরাজ্য গত বছরের সংখ্যায় ১৯১০ (এক হাজার নয়শ দশ) জন নতুন সদস্য তাহরীকে জাদীদ খাতে বৃদ্ধি করেছে যা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ। তাদের চাঁদা ও সংখ্যা উভয়টি বৃদ্ধি পেয়েছে। 'বাইতুল ফুতুহ' খাতেও তারা খরচ করেছে এবং বিভিন্ন জামা'তে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে, সেখানেও ব্যয় হচ্ছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও যুক্তরাজ্য জামা'ত উন্নতির দিকেই ধাবমান, মাশাআল্লাহ্।

এরপর কানাডার নাম এ কারণে উল্লেখযোগ্য যে, জামা'তের তাজনীদের (মোট সদস্য সংখার) দিক থেকে ৭৫ শতাংশ সদস্য তাহরীকে জাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। মাথাপিছু চাঁদা প্রদানের নিরিখে প্রথম পাঁচটি জামা'তের নাম বলে দিচ্ছি। প্রথম হলো আমেরিকা,

দ্বিতীয় সুইজারল্যান্ড, তৃতীয় যুক্তরাজ্য, চতুর্থ বেলজিয়াম এবং পঞ্চম অস্ট্রেলিয়া। ঐতিহ্যগতভাবে পাকিস্তানের যে-সব জেলা আর্থিক ত্যাগস্বীকারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে তাদের নামও পড়ে শোনানো হয়ে থাকে। এমনিতেও তাদের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে।

যাহোক, পাকিস্তানে প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া এবং তৃতীয় করাচি। এছাড়াও রয়েছে যথাক্রমে- রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, মুলতান, মিরপুর খাস, মরদান, শেখুপুরা, ঝং, ভাওয়াল নগর, ডেরাগাজী খান, ভিহাড়ী, ওয়াহ্ক্যান্ট, কুনরী, গুজরাত, এবটাবাদ, মিয়াঁওয়ালী, রাজনপুর, মুজাফফরগড়, সিন্ধুর বশীরাবাদ এবং চক নং ১৬৬ মুরাদকী। এগুলো জেলার নাম ছিল না, বরং জামা'তের নাম ছিল। জেলার দিক থেকে কুরবানীকারীদের মধ্যে যথাক্রমে এগিয়ে আছে– সিয়ালকোট, ফয়সালাবাদ, গুজরাঁওয়ালা, নারওয়াল, জেহলাম, মিরপুর খাস, মন্ডি বাহাউদ্দীন, মিরপুর আযাদ কাশ্মীর, খানেওয়াল, বদীন এবং টোবাটেক সিং।

আপাতত এই পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। এরইসাথে এখন আমি তাহরীকে জাদীদের প্রথম দফতর অনুযায়ী **৭০তম বছর, দ্বিতীয় দফতর অনুযায়ী ৬০তম, তৃতীয় দফতর অনুযায়ী ৩৯শ এবং চতুর্থ দফতর অনুযায়ী ১৯শ বছরের ঘোষণা দিচ্ছি**। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও এই আর্থিক কুরবানীকারীদের স্বাচ্ছন্দ্য দান করুন, ধনসম্পদে বরকত দিন, তাদেরকে পূর্বের চেয়ে বেশি ত্যাগস্বীকারের সামর্থ্য দান করুন এবং জামা'তের আরো বেশি বেশি সংখ্যক সদস্যকে এই তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত করার তৌফিক দান করুন।

তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, **"স্মরণ রেখো! তাহরীকে জাদীদ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সূচিত, এজন্য তিনি অবশ্যই একে উন্নতি দান করবেন। এ পথে যে-সব প্রতিবন্ধকতা দেখা দেবে তিনি তা দূর করে দেবেন। আর ভূপৃষ্ঠে যদি এর ব্যবস্থা না হয় তাহলে ঊর্ধ্বলোক থেকে এটিকে কল্যাণমণ্ডিত করবেন। অতএব সৌভাগ্যবান তারা– যারা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এই তাহরীকে অংশ নেয় কেননা তাদের নাম অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে ইসলামের ইতিহাসে জীবিত থাকবে। খোদা তা'লার দরবারে এসব মানুষ বিশেষ মর্যাদা পাবে, কেননা তারা নিজেরা কষ্ট করে ধর্মের দৃঢ়তার জন্য চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের সন্তানদের অভিভাবক হবেন আর ঐশী জ্যোতি তাদের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হয়ে পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করতে থাকবে।"**

তিনি (রা.) আরো বলেন, **"অতএব প্রত্যেক আহমদী পুরুষ এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কা নারীর জন্য এই তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক, বরং শিশুদেরকেও অনুপ্রাণিত করা উচিত আর নামমাত্র অংশগ্রহণ হলেও তাদেরকে নিজেদের সাথে শামিল করানো উচিত। উদাহরণস্বরূপ, নিজের অঙ্গীকারের সাথে তাদের পক্ষ থেকেও কিছু না কিছু দিতে পারে, তা সে এক পয়সা, দুই পয়সা কিংবা এক আনাই হোক না কেন (এটি সে যুগের মুদ্রা)। এর ফলে তাদের হৃদয়ে প্রেরণা জাগবে। শিশুদের পক্ষ থেকে আপনি ওয়াদা না লিখিয়ে বরং তাদেরকে বলুন ওয়াদা লেখাতে। এর ফলে তাদের মধ্যে এই চেতনা সঞ্চার হবে যে,**

আমি চাঁদা দিচ্ছি। অনেকে সন্তানের পক্ষ থেকে চাঁদা (ওয়াদা) লিখিয়ে দিলেও তাকে বলে না। শিশুর যেহেতু প্রশ্ন করার অভ্যাস থাকে তাই তাকে যখন আপনি বলবেন, যাও নিজে গিয়ে চাঁদার (ওয়াদা) লেখাও তখন সে জিজ্ঞেস করবে, চাঁদা কী জিনিস? এরপর আপনি যখন চাঁদার ব্যাখ্যা দেবেন তখন সে বলবে, চাঁদা কেন দিতে হয়? তখন আপনি তার সামনে ইসলামের বিপদাপদ এবং গুণাগুণ বর্ণনা করবেন। শিশুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা বেশি বেশি প্রশ্ন করার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। আপনারা যদি এমনটি করেন তাহলে তাদের মধ্যে একটি নতুন স্পৃহা জাগ্রত হবে এবং বাল্যকাল থেকেই তাদের মাঝে ইসলাম-সেবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।"

নিজ সন্তানদের উপদেশ দিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, **"পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যতদিন ইসলাম বিস্তার লাভ না করবে এবং বিশ্বের সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেন ইসলাম প্রচারে আলস্য না দেখায়। বিশেষভাবে আমার সন্তানদের প্রতি আমার ওসিয়্যত হলো, তারা যেন কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন রাখে এবং প্রজন্ম পরম্পরায় নিজ সন্তানসন্ততিদের এই নসীহত করতে থাকে যে, তারা যেন ইসলাম প্রচারের কাজ কখনো পরিত্যাগ না করে আর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখে।"** (আল-ফযল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ২; তারীখে আহমদীয়াত, খণ্ড: ০৮, পৃ. ১৫৩-১৫৪)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"হে আমার প্রিয় বন্ধুবর্গ! আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, খোদা তা'লা আপনাদের প্রতি সহমর্মিতার সত্যিকার প্রেরণায় আমাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন এবং আপনাদের ঈমান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধির জন্য আমাকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়েছে। আপনাদের এবং আপনাদের সন্তানসন্ততিদের জন্য এই মারেফত বা তত্ত্বজ্ঞানের খুবই প্রয়োজন রয়েছে। অতএব আমি এ লক্ষ্যে সদা সোচ্চার। আপনারা আপনাদের পবিত্র সম্পদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ পাক-পবিত্র ধনসম্পদ থেকে) নিজেদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সাহায্য প্রদান করুন এবং খোদাপ্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই পথে খরচে কেউ কার্পণ্য করবেন না। নিজেদের সম্পদকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন না আর আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব আমি আমার রচনাবলির মাধ্যমে সেই জ্ঞানভাণ্ডার ও কল্যাণরাজি যা খোদা তা'লার পবিত্র সত্তা আমাকে প্রদান করেছেন এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেবো।"** (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৫১৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দিন আর আমাদের সামর্থ্যকে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করতে থাকুন যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা সকল কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকি এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও যেন এই কুরবানীর স্পৃহা জাগ্রত হয়। আমীন।

(৩০)

লন্ডনের গ্রীসেনহলস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৪ নভেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১৪ নবুওয়ত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআববুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

(আল-কাদর: ১-৬)

এর অর্থ হলো, "পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত দাতা (ও) বার বার কৃপাকারী। নিশ্চয় আমরা একে (তথা কুরআনকে) 'কাদর'-এর রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর তোমাকে কীসে অবহিত করবে, 'কাদর'-এর রাত কী? 'কাদর'-এর রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এতে ফেরেশতারা এবং পবিত্রাত্মা প্রত্যেক বিষয়ে তাদের প্রতিপালক-প্রভুর সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ এক অনাবিল প্রশান্তি! ঊষার উদয়েও তা বিরাজমান থাকবে।" (আল-কাদর: ১-৬)

আগামীকাল থেকে রমযানের শেষ দশক শুরু হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বসবাসকারী আহমদীরা এই দশকে নিজেদের সাধ্যমতো ইতিকাফে বসবে আর তারা দোয়া করার সুযোগ পাবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে গ্রহণযোগ্য দোয়া করার তৌফিক দান করুন। যারা ইতিকাফে বসবে না তারা নিজেদের বাড়িতেই এই রাতগুলোকে জীবন্ত করে রাখবে, ইনশাআল্লাহ্। আমি যে সূরাটি তিলাওয়াত করেছি সেখানে আল্লাহ্ তা'লা এই শেষ দশকে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য এমন একটি রাতের কথাও উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি তা লাভ করে তবে সে বড়োই সৌভাগ্যবান। কেননা সেই রাতে যে দোয়াই করা হবে তা গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করবে। এছাড়াও এর আরো গভীর অর্থ রয়েছে এবং এতে আরো অন্তর্নিহিত বিষয়াদি রয়েছে। এ রাতেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা শরীয়তের সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ। এর অর্থ হলো, সুদীর্ঘ এক অমানিশাপূর্ণ যুগের পর এমন একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে যাঁর ওপর আল্লাহ্ তা'লা সর্বশেষ শরীয়তবাহী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং ধর্মকে পরিপূর্ণ করেছেন। এছাড়া নিজের সমস্ত নিয়ামত সেই নবীকে প্রদান করেছেন, যাকে তিনি খাতামুল আম্বিয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তার অনুসারীদেরকে এই সুসংবাদও দিয়েছেন যে, এই নবীর শরীয়তই কিয়ামত পর্যন্ত সঠিক পথের দিশা দেবার জন্য চলমান থাকবে। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আর কোনো নবী নতুন কোনো শরীয়ত নিয়ে এই

পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন না। তবে এটি সত্য যে, ধর্মের মাঝে বিকৃতি দেখা দিলে যুগের প্রয়োজনে মুজাদ্দিদদের ধারা চলমান থাকবে– যারা খাতামান নাবিয়্যীন (সা.)-এর শরীয়ত এবং তাঁর সঠিক শিক্ষাকে মুসলমানদের মাঝে চলমান রাখার কাজ করে যাবেন। অধিকন্তু মহানবী (সা.) এই ভবিষ্যদ্‌বাণীও করেছেন যে, এক দীর্ঘ যুগাবসানে ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটবে। সর্বোপরি এই সূরায় নানাবিধ বিষয় প্রচ্ছন্ন আছে, যা আমি বিভিন্ন মুফাস্‌সির ও হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি এবং হাদীস থেকে যতটা পারা যায় স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম জানা দরকার যে, এই রাত কবে আসে আর কীভাবে বুঝা যাবে যে, এ রাতের সন্ধান পাওয়া গেছে? এ সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "এমন কোনো লক্ষণ কি আছে যা থেকে বুঝা যাবে যে, এই রমযানে অমুক রাত লাইলাতুল কদর ছিল? এর উত্তর হলো, কিছু হাদীস অনুসারে, তখন একটু বিদ্যুৎ চমকায়, বাতাস বইতে থাকে, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয় এবং একটি আলো আকাশের দিকে যেতে বা (সেখান থেকে) আসতে দেখা যায়। কিন্তু প্রথমোক্ত লক্ষণ (প্রকাশ পাওয়া) আবশ্যক নয়। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হলো, এমনটি হয়ে থাকে আর শেষ লক্ষণটি অর্থাৎ আলো দেখার অভিজ্ঞতাও পুণ্যবানদের হয়েছে। এটি এমন কোনো বাহ্যিক লক্ষণ নয় যে, সবাই দেখতে পাবে বরং এটি হলো কাশফী বা দিব্যদর্শনমূলক দৃশ্য। আমি নিজেও এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, কিন্তু তাতে আমি যা দেখেছি তা অন্যরা দেখে নি। আসল বিষয় হলো, মুমিনের সারা রমযান জুড়ে আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করতে থাকা এবং নিষ্ঠার সাথে রোযা রাখা হলে আল্লাহ্ তা'লা কোনো না কোনোভাবে তার কাছে লাইলাতুল কদর প্রকাশ করবেন। (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৯, পৃ. ৩২৯)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব নামায বাজামা'ত আদায় করল, সে লাইলাতুল কদরের একটি বৃহৎ অংশ লাভ করল। তাই লাইলাতুল কদর কেবল শেষ দশ দিনে অন্বেষণ করবেন না, বরং পুরো রমযান মাস জুড়ে সঠিকভাবে সকল ইবাদত পালন করুন।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, রমযান শুরু হয়ে গেছে যা একটি কল্যাণময় মাস। খোদা তা'লা এই মাসে রোযা রাখা তোমাদের জন্য আবশ্যিক করেছেন। এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দ্বারগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে– যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এর কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে সে বঞ্চিতই রয়ে গেল। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ০২, পৃ. ৪২৫)

অতএব এসব হাদীস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পুরো রমযানে রোযা রাখার প্রতি, কুরআন পাঠের প্রতি বা নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ থাকবে না অথচ শেষ দশক শুরু হতেই এসব ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে– এটি ঠিক নয়। বরং রমযানের শুরু থেকেই এসব ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং নিজেদের মাঝে যে-সব মন্দ বিষয় রয়েছে, সেগুলো পরিত্যাগ করার প্রতি, ভাইবোনের অধিকার প্রদানের প্রতি,

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি এবং পুত্রবধু-শাশুড়ি একে অপরের প্রাপ্য প্রদানের প্রতি মনোযোগী হোন। অতএব রমযানের শুরু থেকেই যদি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার মাধ্যমে এসব পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেন তাহলে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ হবে ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে যাবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেবেন ঠিকই কিন্তু সেসব পুণ্যকর্ম না করা বরং জেনেশুনে এসব মন্দকর্ম করা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করা মূলত ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের দরজা খোলার চেষ্টা করারই নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এ থেকে রক্ষা করুন। অতএব আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদান করলে শেষ এই রাতগুলোর মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হবেন; যার উল্লেখ অন্যান্য হাদীসেও পাওয়া যায়। কেননা দায়সারা ইবাদতের ফলে কিংবা কেবল শেষ দশ দিনের সাময়িক ইবাদত করে এই উচ্চমর্যাদা লাভ হতে পারে না, বরং এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রমযানের শেষ দশদিনে ইবাদতের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এতটা সচেষ্ট হতেন যেমনটি অন্য সময়ে পরিলক্ষিত হতো না। (সহিহ্ মুসলিম, কিতাবুল ই'তিকাফ বাব আল ইজতিহাদ ফিল আশরিল আওয়াখির ...)

সাধারণ দিনগুলোতে অর্থাৎ বছরের অন্য সময়ও মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের দৃষ্টান্ত এমন ছিল যা কোনো সাধারণ মানুষই পালন করতে পারবে না, সেখানে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রমযানে এর চিত্রই ভিন্ন হতো।

হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, মহানবী (সা.) শেষ দশকে প্রবেশ করলে কোমর বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন এবং রাতগুলোকে জীবিত করতেন আর পরিবারের সদস্যদের জাগাতেন। ফলে এটিও একটি শিক্ষা যে, বাড়ির পুরুষ লোকেরা যখন উঠবে তখন তারা যেন স্ত্রী-সন্তানদেরকেও নামাযের জন্য জাগায়, বিশেষভাবে নফলের জন্য যেন জাগায়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, তাহাজ্জুদ নামায কখনো পরিত্যাগ কোরো না, কেননা মহানবী (সা.) কখনো তা বাদ দিতেন না। অসুস্থ বোধ করলে কিংবা শরীর ভালো না লাগলে তিনি (সা.) বসে বসে তাহাজ্জুদ পড়তেন। (আবু দাউদ)

এখানে লক্ষ করুন! মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারিক আচরণ কীরূপ ছিল? এই কর্মপন্থা অবলম্বন করলেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার রহমত ও কৃপা লাভের আশা রাখতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সামর্থ্য দান করুন।

শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার বিষয়ে আরো একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। বুখারী এবং মুসলিম উভয়েই হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এবং আমরা রমযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফে বসলাম। সে দশ দিন শেষ হলে জিবরাঈল এলো এবং মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দিল যে, আপনি যা (অর্থাৎ লাইলাতুল কদর) খুঁজছেন তা আরো (কিছুদিন) পরে রয়েছে। এটি শুনে মহানবী (সা.)-সহ আমরা সবাই মধ্যবর্তী দশ দিনে ইতিকাফ করলাম। সে দিনগুলো শেষ

হলে জিবরাঈল এলো এবং বলল, আপনি যা খুঁজছেন তা আরো পরে রয়েছে। তখন মহানবী (সা.) বিশতম রমযানের ভোরে বক্তৃতা করেন এবং বলেন, "আমাকে লাইলাতুল কদরের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। এ কারণে তোমরা এখন এই শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে তা অন্বেষণ করো। আমি দেখলাম, লাইলাতুল কদর এলো আর আমি কাঁদামাটিতে সিজদা করছি।" সে সময়ে মসজিদে নববীর ছাদের ছাউনী ছিল খেজুর পাতার এবং যেদিন মহানবী (সা.) ইতিকাফে বসেছিলেন সেদিন বৃষ্টির কোনো লক্ষণই ছিল না। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন, হঠাৎ এক টুকরো মেঘ আকাশে দেখা গেল এবং বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মহানবী (সা.) যখন আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন তখন আমি দেখলাম, তাঁর কপালে কাঁদার ছাপ লেগে আছে। মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য এমনটি হয়েছিল এবং এই ঘটনা সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে, এই ঘটনাটি ২১ রমযানে ঘটেছিল। তিনি (রা.) বলেন, ইমাম শাফীর (রহ.)-এর ভাষ্যানুসারে, এ সম্পর্কে এটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ২৭ রমযানের রাত যদি জুমুআর রাত হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কৃপায় তা সাধারণত লাইলাতুল কদরই হয়ে থাকে। (আল-ফযল, লাহোর, ৮ জুলাই ১৯৫০)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন–

'مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরের রাতে পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে এবং পুণ্য লাভের নিয়তে আত্মবিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ইবাদত করে তার পূর্বেকার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুস্ সওম বাব মান সামা রমাযান.... সহীহ মুসলিম কিতাবুস্ সওম)

এই হাদীসে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হলো, পরিপূর্ণ ঈমান আর দ্বিতীয়টি হলো, আত্মবিশ্লেষণ। এগুলোর প্রতি যদি মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় তাহলে দেখা যাবে, প্রকৃত ঈমানের অবস্থা তো সেটিই যখন মানুষ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত গুণাবলির প্রতি ঈমান আনয়ন করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি এই বিশ্বাস থাকে, আল্লাহ্ তা'লা সকল দয়ালুর চেয়ে বড়ো দয়ালু, বড়ো দাতা, সকল পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখেন আর ক্ষমাও করেন পাশাপাশি তিনি শাস্তি দেবারও পূর্ণ অধিকার রাখেন, অনুরূপভাবে খোদার ভয়ে ভীতত্রস্ত হয়ে যদি হৃদয় বিগলিত হয় এবং (মানুষ) আত্মবিশ্লেষণ ও ইস্তিগফার করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি গূঢ় কথা বলেছেন আর তা হলো, ইস্তিগফার এবং তওবা দুটি পৃথক বিষয়। ইস্তিগফার হলো, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ও

শক্তি। আর তওবা হলো, নিজের পায়ে দাঁড়ানো। তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লার রীতি হলো, তাঁর কাছে যখন সাহায্য ও শক্তি যাচনা করা হয় তখন তিনি তা দান করেন এবং পুণ্য করার শক্তি প্রদান করেন আর এভাবে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। মানুষ যখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন সে যেহেতু আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চেয়ে থাকে তাই পুণ্য করার শক্তিও বলবৎ থাকে; এরই নাম **'তু-বু ইলাইহি'**। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ যখন আত্মবিশ্লেষণ করে তখন পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায় এবং পুণ্যকাজ করার সামর্থ্যও লাভ হতে থাকে।

একটি হাদীসে হযরত ইবনে উমর (রা.) মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে বলেন, আমলের দিক থেকে খোদা তা'লার নিকট এই দিনগুলো অর্থাৎ রমযানের শেষ দশ দিনের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ এবং প্রিয় অন্য কোনো দিন নেই। সুতরাং এই দিনগুলোতে অজস্র ধারায় তাহলীল অর্থাৎ **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ** পাঠ করো, আল্লাহ্‌র পূর্ণ দাসত্ব বরণ করো, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করো, আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং অধিকহারে তাঁর মহিমা ও গরিমা প্রকাশ করো।

এই হাদীসটিও একই বিষয় বর্ণনা করছে। মহানবী (সা.) বলেন, রমযানের এই শেষ দশকে আল্লাহ্‌র পূর্ণ দাসত্ব করো। কোনো মিথ্যা উপাস্য যেন তোমাদেরকে পুণ্যকর্ম থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। এই দিনগুলোতে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার বড়ত্ব ও তাঁর মাহাত্ম্য যেন তোমাদের মন-মস্তিষ্কে বিরাজ করে আর এজন্য তাঁর গুণকীর্তন করো কেননা তিনি তোমাদেরকে এত নিয়ামত দান করেছেন, এত পুরস্কারে ভূষিত করেছেন এবং তোমাদেরকে সেই দিন দিয়েছেন যে দিনগুলোতে তিনি তোমাদের জন্য ক্ষমা লাভের পরিবেশ-পরিস্থিতি বা উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি একান্তই তাঁর বান্দা হবার সৌভাগ্য আমাদেরকে দিয়েছেন এবং সেই দিন আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন– যেদিন আমরা সম্পূর্ণরূপে তার নিকট বিনত হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাই; এর জন্য যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না।

একটি হাদীসে রমযানের কল্যাণ সম্পর্কে হযরত সালমান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) শাবান মাসের শেষ দিন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের নিকট মহামহিমান্বিত এবং কল্যাণমণ্ডিত বসন্তের সুবাতাস বিশিষ্ট একটি মাস আসতে যাচ্ছে। এতে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্ তা'লা এ মাসে রোযা রাখাকে তোমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন এবং এর রাতগুলোতে তাহাজ্জুদ পড়াকে নফল ইবাদতরূপে সাব্যস্ত করেছেন।

هُوَشَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ

অর্থাৎ এটি এমন মাস যার প্রথম দশ দিন রহমতের, মাঝের দশ দিন মাগফিরাতের এবং শেষ দশ দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের কারণ। (সহীহ ইবনে খাযিমাহ্, কিতাবুস্ সিয়াম, বাব ফাযাইলু শাহরু রমাযান)

অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন

করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! লাইলাতুল কদরের রাত কোনটি তা যদি আমি বুঝতে পারি তবে সেই রাতে কী দোয়া করব? তিনি (সা.) বলেন, তুমি এই দোয়া করো যে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তুমি মূর্তিমান ক্ষমা এবং ক্ষমা করা পছন্দ করো। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা ও মার্জনা করো। (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুদ্ দুআ, বাব আদ্ দুআ বিল আফ্‌ভ...)

এই হাদীসে খুবই সুন্দর ও উৎকর্ষ দোয়া শেখানো হয়েছে। এর অর্থ কেবল এটি নয় যে, আমার পাপ ক্ষমা করো এবং আমাকে মার্জনা করো। মহানবী (সা.) বুঝাতে চাচ্ছেন, রমযানের কল্যাণে হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে কল্যাণমণ্ডিত করেছ, আমাকে রোযা রাখার, তোমার ইবাদত করার, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার, নিজের পাপ-পঙ্কিলতার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা যাচনা করার সামর্থ্য দান করেছ এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান আমার অর্জিত হয়েছে। আজকের এ দিনে আমার কাছে একথা প্রকাশার্থে যে, তুমি আমার দোয়া কবুল করেছ, আমার আহাজারি শুনেছ, তুমি আমাকে লাইলাতুল কদরের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা দান করেছ এবং লাইলাতুল কদর দেখিয়েছ। তাই আমার দোয়া হলো, আমার ভেতরকার সমস্ত পাপের চিহ্নগুলোও মুছে ফেলো এবং আমার গুনাহসমূহ এমনভাবে ধুয়েমুছে ফেলো যেন এগুলো কখনো ছিলই না। তুমি বাদশা! আমার সাথে যদি এমন ব্যবহার করো তাহলেও তোমার ধনভাণ্ডারে কোনো ঘাটতি আসবে না। তুমি এমনটি করো যে, সেসব কথা ও অপকর্মের ধারণাও যেন আমার মাথায় না আসে যা আমি অতীতে করেছি। রমযানের পর আমি যেন সর্বদা পাক-পবিত্র হয়ে এবং তোমার দাস হয়ে থাকতে পারি। এটিই সেই জিনিস যা তুমি নিজ বান্দাদের জন্য পছন্দ করে থাকো।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সূরার তফসীর করতে গিয়ে বলেন, "হাদীসসমূহে বর্ণিত লাইলাতুল কদরও একদিক থেকে সেই লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্ক রাখে যাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল এবং এই অর্থের দিক থেকে প্রকৃত লাইলাতুল কদর হলো সেই রাত যাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল। কেবল এর স্মৃতি অমলিন রাখতে এবং সেই প্রতিশ্রুতি ধরে রাখার জন্য যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করার মাধ্যমে এই উম্মতের সাথে করেছেন অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই লাভের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে লাইলাতুল কদর নির্ধারণ করেছেন যে, উম্মতের দুর্বল লোকেরা কমপক্ষে দশটি রাত তো ইবাদতের জন্য উঠেপড়ে লাগবে। তিনি রমযানের শেষ দশটি দিনের মধ্যে সেটিকে লুকিয়ে রেখেছেন এবং কোনো নির্দিষ্ট রাত নির্ধারণ করেন নি, যেন সেই রাতের ইবাদত প্রথাসর্বস্ব থেকে না যায় যেটিকে ইসলাম খুবই অপছন্দ করেছে। এখন যে চায় সে রমযানের শেষ দশ রাতে তা খুঁজে দেখতে পারে। এই দশটি রাতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অন্বেষণ করবে সে পূর্বের চেয়ে বেশি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে এবং তার হৃদয়ে ধর্মের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, এছাড়াও তার কাছ থেকে এটি আশা করা যাবে যে, সে পূর্ববর্তী ভুলভ্রান্তি পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দরবারে মাথা নত করবে এবং অতি সত্বর তার প্রতিটি রাত যে লাইলাতুল কদর হয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৯, পৃ. ৩২৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "**লাইল** শব্দের অর্থ যুলমাত (তথা অন্ধকার) এবং 'দাল' অক্ষরে সাকিনযুক্ত কদ্‌র শব্দের অর্থ হলো, মর্যাদা। এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করা হয়েছে। পবিত্র রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে লাইলাতুল কদর এমন একটি বিশেষ রাত, যার উল্লেখ সূরা আল-ফাজরে এভাবে করা হয়েছে, **ওয়াল্ লাইলি ইযা ইয়াসরি** (আল-ফাজর: ৫)। আরেক স্থানে আছে, **শাহরু রমাযানাল্লাযি উনযিলা ফিহিল কুরআন** (আল-বাকারা: ১৮৬)। অন্যত্র বলা হয়েছে, **ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিল কাদ্‌র** (আল-কাদর: ২)। এই আয়াত দুটিকে একত্রিত করার ফলে বুঝা গেল যে, লাইলাতুল কদর পবিত্র রমযান মাসেই আসে। মহানবী (সা.) আরো বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলে দিয়েছেন যে, রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতেই লাইলাতুল কদর হয়ে থাকে। কোনো বছর ২১শ রাতে আবার কোনো বছর ২৩, ২৫, ২৭ কিংবা ২৯শ রাতে হয়ে থাকে। সহীহ হাদীসগুলোতে মহানবী (সা.) এই রাতের বহু শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন।"

তিনি (রা.) আরো বলেন, "**ইন্না আনযালনাহু** দ্বারা যেভাবে পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, অনুরূপভাবে এটি দ্বারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তাকেও বুঝানো হয়। এ কারণে **আনযালনাহু** বলা হয়েছে যাতে কুরআন এবং যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে উভয়কে বুঝানো যায়। অন্যথায় **আনযালনাহু হাযাল কুরআন** বললেই হতো। লাইল বলতে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বুঝায় যা মহানবী (সা.)-এর আগমনের পূর্বেকার যুগ ছিল, যেটিকে সাধারণত **আইয়ামে জাহিলিয়্যাত** নামে অভিহিত করা হয়। আর 'দাল'-এর ওপর সাকিনযুক্ত **কদ্‌র** শব্দটি দ্বারা সেই মর্যাদাপূর্ণ সময়কে বুঝানো হয় যখন মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের সূচনা হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র জীবনের মধ্যে এর সময়সীমা ছিল ২৩ বছর যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। একদিকে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটল অন্যদিকে মর্যাদাপূর্ণ যুগের সূচনা হলো। এ কারণেই **লাইল** এবং **কদ্‌র** শব্দদ্বয় বিরোধী বৈশিষ্ট্যের হওয়া সত্ত্বেও এখানে এসে একত্রিত হয়ে গেল।" (কাদিয়ানের বদর পত্রিকার পরিশিষ্ট, ২২ আগস্ট ১৯১২; হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৪২৭)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "**ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিল কাদ্‌র**-এর অর্থ হলো, আমরা কুরআন করীমকে লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ করেছি। প্রথম সূরায় যেহেতু কুরআন করীমের কথা এসে গিয়েছিল তাই এখানে **ইন্না আনযালনাল কুরআনা ফি লাইলাতিল কাদ্‌র** বলার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লা কেবল সেটির সাথে সর্বনাম ব্যবহার করে বলেছেন, **ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিল কাদ্‌রি** কেননা এটি প্রত্যেকে পূর্ববর্তী সূরায় লক্ষ করলেই সহজে বুঝতে পারা যায় আর এখানে কুরআন করীমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

লাইলাতুন এবং **লাইল** উভয় শব্দের অর্থই রাত। ... **লাইল** শব্দটি কুরআন করীমে ৭৯ বার ব্যবহার হয়েছে এবং **লাইলাতুন** শব্দটি মাত্র ৮ বার। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, **লাইলাতুন** শব্দটি আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হওয়া কিংবা সে সম্পর্কিত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে

ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যখন এমন বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে কিংবা শরীয়তের কথা বলা হয়েছে তখন লাইলাতুন্ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটিকে কোনো কাকতালীয় বিষয় বলা যায় না। এর মধ্যে অবশ্যই কোনো প্রজ্ঞা আছে আর **লাইল** এবং **লাইলাতুন** শব্দের মধ্যকার এই পার্থক্য অর্থহীন নয়।"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আরো বলেন, "এ আয়াতে মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ বুরূয বা প্রতিচ্ছবির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অপূর্ণ বুরূযও যেহেতু বুরূয হয়ে থাকে তাই এই আয়াত অপূর্ণ বুরূযের প্রতিও ইঙ্গিত করে অর্থাৎ এমন যুগের সংস্কারকদেরকেও বুঝাচ্ছে যখন ঘোর অন্ধকার ছাইবে না, কিন্তু মানুষ একটি নতুন জীবনের প্রয়োজন অনুভব করবে। হাদীসসমূহে রয়েছে, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে জগদ্বাসীকে সতর্ক করার জন্য একজন সতর্ককারীর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ইসলাম ধর্মে সেই প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করতে থাকবেন। এসব মুজাদ্দিদ সম্পর্কেও এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কেননা তারাও আংশিকভাবে মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধি হয়ে থাকেন এবং একটি আংশিক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে তাদের আবির্ভাব ঘটে।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৯, পৃ. ৩১৯)

জ্ঞানী ব্যক্তি– এই অর্থের নিরিখে এ আয়াতের অর্থ হবে, লাইলাতুল কদরে যে হিকমত ও তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচিত হবে তা সহস্র আলেমের (জ্ঞানের) চেয়ে উত্তম। ... এই বিষয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের এদিকেও মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়েছে যে, ইসলামের ওপর যখনই কোনো বিপদ আপতিত হবে তখন বাহ্যিকতার পূজারি আলেমদের সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি ভরসা করা উচিত হবে না (অর্থাৎ শিক্ষার জন্য মোল্লা-মৌলবিদের কাছে যাবে না)। বরং এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সাহায্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত, কেননা ঐশী সাহায্য ও ঐশী দিকনির্দেশনার ফলে তারা যা লাভ করবে তা জাগতিক সকল আলেম-উলামার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেও লাভ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলমানরা এই দিকনির্দেশনা কাজে লাগায় নি। বর্তমান যুগ ইসলামের পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন। মহানবী (সা.)-এর যুগের পর এমন কঠিন সময় ইসলামের ওপর কখনো আসে নি, কিন্তু মুসলমানরা এই বিপদ দূর করার জন্য খোদার চেয়ে মানুষের পথপানে বেশি চেয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা এমন সময়েও কুরআনের সুসংবাদ অনুযায়ী এবং **ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিল কাদ্‌র–** এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বীয় প্রত্যাদিষ্ট এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু মানুষের এদিকে কোনো মনোযোগ নেই বরং তারা নিজেদের বানানো চিকিৎসার প্রতিই আকৃষ্ট। আল্লাহ্ তা'লাই তাদের প্রতি করুণা করুন।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৯, পৃ. ৩৩২-৩৩৩)

বর্তমানেও লক্ষ করুন! এরা নামায পড়ছে, রোযা রাখছে, ইতিকাফে বসছে এবং বাহ্যত শরীয়তের বিধিনিষেধও মেনে চলছে, কিন্তু যেহেতু মহানবী (সা.)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রত্যাদিষ্টের প্রতি হাসিবিদ্রুপ করছে ও কাফির আখ্যা দিচ্ছে এবং তাকে অস্বীকার করছে তাই তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারও ভাগীদার সাব্যস্ত হচ্ছে না। বরং বর্তমানে অবস্থা এতটাই ভয়ংকর এবং ভয়ানক পরিস্থিতির

দিকে যাচ্ছে যে, আহমদীদের উম্মতে মুসলিমার জন্য দোয়া করতে থাকা উচিত। এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে রমযানের দিনগুলোতে এবং শেষ দশকের এ দিনগুলোতে দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শুভবুদ্ধি দান করুন। এত দীর্ঘ সময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত দেখেও তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হচ্ছে না। নামসর্বস্ব আলেম-উলামারা তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতকে নামধারী আলেমদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "এক হাজার মাসে ত্রিশ হাজার রাত হয়ে থাকে, এ কারণে **লাইলাতুল কাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহ্র**-এর অর্থ হলো, তোমরা কেবল এ যুগের কথা বলছ অথচ এটি তো ত্রিশ হাজার যুগের চেয়েও উত্তম। অন্ধকারাচ্ছন্ন ত্রিশ হাজার বছরও যদি আসে তবুও মহানবী (সা.)-এর যুগ মূল্যহীন সাব্যস্ত হবে না। তখনো এটি বলা হবে যে, সেই যুগ ভবিষ্যতের সকল যুগের চেয়ে উত্তম ছিল কেননা সে যুগে ইসলামী সরকার ব্যবস্থাপনার এমন কাঠামো দাঁড় করা হয়েছিল যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে সঠিক পথ দেখাবে এবং তাদের সমস্যাবলি সম্পূর্ণরূপে নিরসন করবে।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৯, পৃ. ৩৩৪)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "রাতের শেষ অংশে একটি লাইলাতুল কদর হয়ে থাকে যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বিকাশ ঘটান এবং নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এমন কোনো প্রার্থনাকারী ও ইস্তিগফারকারী ব্যক্তি আছে কি যার প্রার্থনা আমি কবুল করব? কিন্তু এর আরো একটি অর্থ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আলেম-উলামা এর বিরোধিতা ও অস্বীকার করে আর তা হলো, আমরা কুরআনকে এমন রাতে নাযিল করেছি যা ছিল গভীরভাবে তমসাচ্ছন্ন এবং যা একজন সুযোগ্য সংস্কারকের আকাঙ্ক্ষী ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, **ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন**। অতএব মানুষকে যেহেতু ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাই এটি হতেই পারে না যে, সে অন্ধকারে পড়ে থাকবে। এমন যুগে স্বভাবতই আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন যে, একজন সংস্কারক আবির্ভূত হোক। **ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিল কাদ্র** আয়াতটি যুগের চাহিদা অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর আগমনের আরো একটি প্রমাণ বহন করে।" [আল-হাকাম, খণ্ড: ১০, সংখ্যা: ২৭, ৩১ জুলাই ১৯০৬; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), পৃ. ৬৭১-৬৭২]

অতএব বর্তমানেও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এক দীর্ঘ তমসাচ্ছন্ন যুগের অবসানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন ছিল যুগের একান্ত চাহিদা। আমরা আহমদীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার মাধ্যমে এ যুগে একটি লাইলাতুল কদর দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা রমযানে আগত লাইলাতুল কদরের দৃশ্যও আমাদেরকে দেখান।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন মুজাদ্দিদদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে সেক্ষেত্রে **মিন কুল্লি আম্র**-এর অর্থ সকল বিষয়াবলি হবে না, বরং সমসাময়িক প্রয়োজনীয় জিনিস বা বিষয় হবে অর্থাৎ যে-সব রোগব্যাধির সংশোধনের জন্য

তাঁর ফেরেশতাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে সেসব খারাপ বিষয়ের সংশোধনের জন্য ফেরেশতা নাযিল করা হবে অথবা ইসলামের উন্নতির জন্য যে-সব বিষয়ের প্রয়োজন পড়বে সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা ফেরেশতাদের সাহায্য লাভ করবে। এককথায় **মিন কুল্লি আম্‌র**-এর অর্থ হবে, সকল প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যিনি পূর্ণ বুরূয বা প্রতিচ্ছায়া হিসেবে আবির্ভূত হবেন তিনি যেহেতু আল্লাহ্‌র নবী এবং মহানবী (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গীন ছায়া হবেন তাই রসূলে করীম (সা.) সম্পর্কে যেভাবে এ আয়াতের অর্থ করা হয়েছিল, কুরআনী শরীয়তকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ করা হবে তদ্রূপ তার সম্বন্ধেও এ আয়াতের অর্থ হবে, যে যুগে কুরআন করীমের সমস্ত গুণাবলি হারিয়ে যাবে আর তখন খোদা তা'লা আকাশ থেকে স্বীয় ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করবেন এবং কুরআনের সকল গুণাবলি পুনরায় পৃথিবীতে প্রকাশ করবেন। এক্ষেত্রে **মিন কুল্লি আম্‌র**-এর অর্থ কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি হবে না, বরং সকল বিষয় হবে অর্থাৎ এমন কোনো বিষয় অবশিষ্ট থাকবে না যার জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতা নাযিল করা হবে না।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৯, পৃ. ৩৩৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তিনি এ উম্মতকে কখনো ধ্বংস হতে দেবেন না, বরং যখনই তারা বিভ্রান্ত হবে আর অন্ধকারে নিপতিত হবে, তাদের জন্য লাইলাতুল কদরের যুগ আসবে এবং রূহুল কুদুস পৃথিবীতে অবতরণ করবে আর সূরা কদরে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যাঁকে পছন্দ করবেন তাঁর প্রতি ফেরেশতা প্রেরণ করবেন এবং তাঁকে যুগের মুজাদ্দিদ নিযুক্ত করবেন। অধিকন্তু রূহুল কুদুসের সাথে অনেক ফেরেশতা নাযিল হয় যারা মানব হৃদয়কে সত্য ও হিদায়াতের প্রতি আকর্ষণ করে। অতএব এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না।" (হামামাতুল বুশরা, পৃ. ৯২-৯৩; রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৭, পৃ. ৩২০; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ, পৃ. ৬৭০-৬৭১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার চলমান রীতি হলো, যখন কোনো রসূল বা নবী বা মুহাদ্দিস মানবজাতির সংস্কার সাধনের জন্য আকাশ হতে অবতীর্ণ হন, তখন অবশ্যই তাঁর সাথে তাঁর সহচররূপে এমন সব ফেরেশতা অবতীর্ণ হন যারা সকল সোচ্চার হৃদয়ে সঠিক পথের প্রেরণা সঞ্চার করে এবং পুণ্যের আগ্রহ সৃষ্টি করে। আর যতক্ষণ কুফরী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ঈমান ও সততার প্রভাতের উন্মেষ না ঘটে ততক্ষণ তারা অনবরত অবতীর্ণ হতে থাকে। যেমন- মহামহিম আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝
سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

(আল-কাদর: ৫-৬)

[অর্থাৎ এতে ফেরেশতারা এবং পবিত্রাত্মা প্রত্যেক বিষয়ে তাদের প্রতিপালক-প্রভুর সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ এক অনাবিল প্রশান্তি! ঊষার উদয়েও তা বিরাজমান থাকবে। –অনুবাদক] সুতরাং ফেরেশতা এবং রূহুল কুদুস-এর আকাশ থেকে অবতরণ

তখনই হয় যখন এক মহামর্যাদাবান ব্যক্তি খিলাফতের পোশাক পরিধান করে এবং ঐশীবাণীতে সম্মানিত হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সেই খলীফা বিশেষভাবে রূহুল কুদুস লাভ করেন এবং তার সাথে যে-সকল ফেরেশতা থাকে তাদেরকে পৃথিবীর সকল সোচ্চার হৃদয়ে অবতরণ করানো হয়। তখন পৃথিবীর যে যে স্থানে যোগ্য ব্যক্তিরা থাকে তাদের সকলের প্রতি সেই জ্যোতির প্রতিফলন ঘটে। সারা বিশ্বে এক জ্যোতির্ময়তা ছড়িয়ে পড়ে। আর ফেরেশতাদের পবিত্র প্রভাবে সকল হৃদয়ে আপনা-আপনিই সৎ ভাবনা সৃষ্টি হতে থাকে এবং তওহীদের প্রতি ভালোবাসা জন্মানো আরম্ভ হয়ে যায়। সকল সরল হৃদয়ে সততাপ্রিয়তা ও সত্যান্বেষার এক আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয় এবং দুর্বলদেরকে শক্তি প্রদান করা হয়। চারদিকে এমন বাতাস বইতে শুরু করে যা সেই সংস্কারকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়। এক গোপন হাতের প্রভাবে মানুষ আপনা-আপনিই সংশোধনের দিকে ধাবিত হয় এবং সব জাতিতে এক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তখন অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, জগতের চিন্তাধারা আপনা-আপনিই সত্যের দিকে ফিরে আসছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ কাজ হচ্ছে সেই ফেরেশতাদের দ্বারা– যারা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির সাথে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন আর সত্য গ্রহণ ও বুঝার নিমিত্তে আসাধারণ শক্তি জুগিয়ে থাকে এবং ঘুমন্ত লোকদেরকে জাগ্রত করে, মোহগ্রস্তদের সতর্ক করে, বধিরদের কান খুলে দেয়, মৃতদের মাঝে প্রাণসঞ্চার করে এবং যারা কবরে পড়ে আছে তাদেরকে বাইরে আনে। তখন হঠাৎ করে মানুষের চোখ খুলে যাওয়া আরম্ভ হয়ে যায় এবং তাদের সামনে সেসব বিষয় প্রকাশ পেতে থাকে যা পূর্বে গোপন ছিল। প্রকৃতপক্ষে এসব ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'লার এই খলীফা হতে পৃথক হয় না। বরং তারা তাঁরই চেহারার জ্যোতি এবং তাঁরই দৃঢ় মন ও মননের উজ্জ্বল ছাপ হয়ে থাকে যা স্বীয় চৌম্বিক শক্তি দিয়ে প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে যে তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আর তা সে দৈহিকভাবে নিকটেই থাকুক বা দূরে থাকুক, সে পরিচিত কিংবা সম্পূর্ণ অপরিচিতই হোক এমনকি তার নামও অজানা থাকুক না কেন। মোটকথা, সেই যুগে পুণ্যের দিক থেকে যে গতি সঞ্চার হয় এবং সত্য গ্রহণের জন্য যে প্রেরণা জন্মে সেই প্রেরণা এশিয়া, ইউরোপ কিংবা আমেরিকাবাসীদের মাঝেই হোক না কেন তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সেই প্রতিনিধির সাথে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের অনুপ্রেরণায় প্রকাশ পায়। আর এটি খোদার ঐশী বিধান যাতে কখনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।" (ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১২)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শেষ দশক থেকে পুরোপুরি কল্যাণমণ্ডিত হবার তৌফিক দান করুন এবং যে উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন সেই উদ্দেশ্যাবলি যেন আমরা আমাদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হতে দেখতে পাই। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র পৃথিবীকে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার দৃশ্য আমাদেরকে দেখান। এই দিনগুলোতে সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে সুরক্ষিত রাখুন এবং প্রকৃত ও খাঁটি মুসলিমে পরিণত করুন। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন, কেননা তারা সর্বদা দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতিতে পরিবেষ্টিত। কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে

আমাদের একটি মসজিদে একজন নিষ্ঠাবান আহমদীকে বিরুদ্ধবাদীরা শহীদ করেছে (রঘুনাথপুরবাগের শহীদ মোহাম্মদ শাহ আলম –অনুবাদক), ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লা এসব স্থানে বিরুদ্ধবাদীদেরকে শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত করুন। একইভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানেও অনিষ্ট ছড়ানোর সংবাদ আসছে এবং আহমদীদেরকে উত্যক্ত করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে সুরক্ষিত রাখুন। আর অনেক বেশি দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন এবং এই দিনগুলোতে বেশি বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সত্বর আমাদের বিজয় দান করুন। আমীন।

(৩১)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২১ নভেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ২১ নবুওয়ত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(আল-জুমুআ: ১০-১১)

এরপর হুযূর (আই.) বলেন– আজকে এই রমযানের শেষ জুমুআ যেটিকে 'জুমুআতুল বিদা' বলার একটি প্রচলন রয়েছে। অআহমদীরা ধর্মে এতটা বিকৃতি এনেছে যে, তারা এটিকে যা মন চায় তাই নাম দিক, যাচ্ছেতাই করুক, মন যা চায় তাই করুক এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা করুক; এটি তাদের ব্যাপার বরং তারা তো এটিও মনে করে যে, জুমুআতুল বিদা-র দিনে চার রাকাত নামায পড়ে নিলে জীবনের সকল কাযা নামায আদায় হয়ে যাবে, অর্থাৎ (সারাজীবন) যে-সব নামায পড়া হয় নি তা তিন-চার রাকাত নামাযের ফলে আদায় হয়ে যাবে। তাই এখন আর নামায পড়ার প্রয়োজন নেই, কেননা যে নামায পড়া হয় নি তা তো আদায় হয়ে গেছে। এছাড়া তাদের মাথায় এ অলীক ধারণাও আছে যে, জুমুআতুল বিদা আসবে আর চার রাকাত নামায পড়ে নেব, এরপর সারা বছরের জন্য ছুটি। কে কষ্ট করে মসজিদে যাবে আর পাঁচবেলার নামায পড়বে? তাদের এমন আচরণে মোটেও অবাক হই না, কেননা তারা তো এমনটি করবেই আর মুহাম্মদী মসীহ্র অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশাও করা যায় না। কিন্তু এ বিষয়টি চিন্তা করে অবশ্যই অবাক হতে হয় যে, যারা এ যুগের ইমামকে মেনেছে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার দাবি করার পরও তারা নিজেদের ধর্ম বা ঈমানের সুরক্ষা করে চলে না। অন্য সময় তারা এতটা গুরুত্ব সহকারে জুমুআর নামাযে আসে না যতটা গুরুত্ব সহকারে রমযানের এই শেষ জুমুআয় আসে আর এমন লোকদের সংখ্যা অনেক, অথচ নির্দেশ হলো, পাঁচবেলার নামাযের জন্যও মসজিদে এসো। অতএব আমরা যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবি করি, অন্যদের দেখাদেখি আমরাও জগতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাব আর নামায তো দূরের কথা জুমুআর নামাযও নিয়মিত আদায় করব না– এমনটি যেন না হয়। মসজিদে উপস্থিতি দেখে ধারণা করা যায় যে, আমাদের মধ্যেও কিছু আহমদী অবচেতন মনে জুমুআতুল বিদা-র গুরুত্বে

বিশ্বাসী হয়ে চলেছে। আমাদের মধ্যে যারা স্বাভাবিকভাবেই জুমুআর নামাযে অনিয়মিত এবং জুমুআকে অতটা গুরুত্ব দেয় না তারা যদি আজকে এ কারণে মসজিদে আসে যে, রমযান তাদের মাঝে পরিবর্তন সাধন করেছে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ পালন ও তাঁর ইবাদতের প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে আর তারা এই অঙ্গীকার করেছে যে, আগামীতে আমরা জুমুআর নামায সঠিকভাবে আদায় করব এবং নিয়মিত জুমুআর নামাযে উপস্থিত হবো তাহলে এটি ভালো কথা। কেননা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদেরকে যখন জুমুআর দিন নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে দ্রুত আসো এবং ব্যাবসাবাণিজ্য পরিত্যাগ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র কৃপা অন্বেষণ করো আর বেশি বেশি আল্লাহ্কে স্মরণ করো যেন তোমরা সফল হতে পারো। (আল-জুমুআ: ১০-১১)

এটি হলো সেই আয়াতসমূহের অনুবাদ যা আমি তিলাওয়াত করেছি। অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে এসব লোক আন্তরিক মোবারকবাদের দাবি রাখে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের সামর্থ্য দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই শক্তি প্রদান করুন যেন তারা ভবিষ্যতেও এভাবে তাঁর আদেশ-নিষেধ ভালোবাসার সাথে শিরোধার্য করে ও সেগুলো কর্মে রূপায়ণ করতে পারে এবং একই উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সেসব বিধিনিষেধ মানতে পারে।

এছাড়া আমরা সবাই যেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত সেই হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারি যাতে মহানবী (সা.) বলেন, পাঁচবেলার নামায, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ এবং এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান, তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে যদি সে কবীরা গুনাহ এড়িয়ে চলে। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত্ তাহারাত, বাব আস্ সালাতুল খুমস ...)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ তা'লা সামর্থ্য প্রদানের (বিষয়ের) প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। এই রমযান মাসে যে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছেন এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল্লাহ্র দরবারে অনুগ্রহ যাচনার ভিত্তিতে সকলকে কাজ করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং আমাদের মসজিদগুলো যেন একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আহমদীরা পাঁচবেলার নামাযের জন্য মসজিদে আসার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল। (রমযান মাসে) যেভাবে তারা মসজিদ আবাদ করেছিল তা রমযান শেষ হবার পর শূন্য হয়ে যায় নি বরং রমযানের মতো এখনো তা নামাযীতে পরিপূর্ণ রয়েছে। রমযানের পরবর্তী প্রতিটি জুমুআ যেন এ সাক্ষ্য দেয় যে, যুগ-ইমামকে মান্য করে নিজেদের মাঝে আমরা যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছি, এই রমযানে সেটিতে আরো বেশি ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছি। এই উজ্জ্বলতা যেন প্রত্যেক জুমুআতেই দৃষ্টিগোচর হয়। যারা কেবল জুমুআতুল বিদা-র দিনে সারাজীবনের বকেয়া নামায পরিশোধ করতে আসে– এরা তাদের অন্তর্গত নয় বরং এর সেসব লোক যারা নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছে। এরা তারাই– যারা তাকওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ

পূর্বের তুলনায় সম্মুখপানে অধিক অগ্রসরমান। এছাড়াও তারা (একথা ভেবে) আত্মপ্রসাদ নেন না যে, রমযান শেষ হয়ে গেছে তাই পরবর্তী রমযান আসলে আবার জুমুআতুল বিদা আদায় করে নেব বরং এমন লোক যারা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে তারা কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য মহানবী (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী যা আমি এখনই পড়লাম, এক জুমুআর পরে পরবর্তী জুমুআ আদায় করাকে আবশ্যক মনে করে অপেক্ষা করতে থাকে। রমযানের জন্য আমরা অবশ্যই অপেক্ষা করব, কিন্তু তা কাযায়ে উমরী (অর্থাৎ সারাজীবনের বকেয়া নামায) আদায় করার সুযোগ লাভের জন্য নয় বরং একারণে যে, রমযানে আল্লাহ্‌র রহমতের দ্বার যেন উন্মুক্ত করা হয় এবং শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়। এতে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের আরো বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে বিধায় আমরা আগামী রমযানের অপেক্ষায় থাকি।

কাযায়ে উমরীর বিষয়ে কথা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি নির্দেশনা রয়েছে, তা আমি পড়ে শুনাচ্ছি।

একবার তাঁকে (আ.) একটি প্রশ্ন করা হলো, জুমুআতুল বিদার দিনে মানুষ চার রাকাত নামায পড়ে এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে কাযায়ে উমরী যার উদ্দেশ্য হলো, যে-সব নামায আদায় করা হয় নি সেগুলোর যেন বিহিত হয়ে যায়। এর কোনো ভিত্তি আছে কিনা?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এটি একটি অর্থহীন বিষয়। একবার এক ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ছিল। তখন হযরত আলী (রা.)-কে একজন বলল যে, আপনি যুগ-খলীফা হয়ে তাকে নিষেধ করছেন না কেন? তিনি (রা.) বলেন, **আরাআইতাল্লাযি ইয়ানহা, আবদান ইযা সাল্লা** [অর্থাৎ তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আল্লাহ্‌র এক বান্দাকে নামায পড়তে নিষেধ করে? (আল-আলাক: ১০-১১) –অনুবাদক]-এর কারণে ভয় হয় যে, এই আয়াতের অধীনে না আবার অপরাধী সাব্যস্ত হই। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এ কারণে নামায পরিত্যাগ করে যে, কাযায়ে উমরীর দিনে পড়ে নেব তবে সে অবৈধ কাজ করল। অবশ্য অনুশোচনাস্বরূপ যা হারিয়ে গেছে বা যে শূন্যতা রয়ে গেছে তা পূরণের আশায় যদি পড়ে তবে পড়তে দাও, কেন নিষেধ করছ– দোয়াই তো করছে, তবে এতে হীনতা অবশ্যই প্রকাশ পায়! কোথাও নিষেধ করে আবার এ আয়াত অনুসারে দোষী না হয়ে যাও!" [আল-হাকাম, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩, ফতোয়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), পৃ. ৬৫]

তিনি (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সারাবছর নামায পরিত্যাগ করে, এটি এই ভেবে যে, কাযায়ে উমরীর দিনে তা আদায় করে নেব সে পাপী আর যে ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে তওবা করে এবং এই নিয়তে তা আদায় করে যে, ভবিষ্যতে আর কখনো নামায পরিত্যাগ করব না তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। আমরা তো এক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.)-এর উত্তরই প্রদান করে থাকি।" (আল-বদর, খণ্ড: ০২, সংখ্যা: ১৫, ০১ মে ১৯০৩, পৃ. ১১৪)

সুতরাং হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এ ধরনের নামায আদায়কারীদের নিয়ত তো বুঝা যায় না যে, তারা কোন কারণে নামায পড়ছে? নিজের মধ্যে একটি পবিত্র পরিবর্তন সাধন এবং তওবা ও ইস্তিগফার করার মাধ্যমে এই নিয়তে যদি নামায পড়ে যে,

আগামীতে কখনো নামায পরিত্যাগ করব না, সম্পূর্ণ মনোযোগের সাথে তা আদায় করব আর জুমুআর নামাযও পরিত্যাগ করব না তাহলে তাকে পড়তে দাও আর এতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু কাযায়ে উমরীর মানসে যদি হয় যে, এবার পড়ে নিলাম আবার পরে দেখব তাহলে তা ভুল এবং সে পাপিষ্ঠ।

এখন জুমুআর নামাযের আবশ্যকতা সম্পর্কে হাদীস উপস্থাপন করছি যাতে জুমুআর নামায কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিধৃত হয়েছে, কিন্তু জুমুআতুল বিদার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যে দিনগুলো সূর্যের চেহারা দেখেছে সেগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন হলো সর্বোত্তম, কেননা এ দিনে আদম (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন আর এ দিনই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং এ দিনই তিনি সেখান থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন। এছাড়া জুমুআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন মুসলমান বান্দারা আল্লাহ্‌র নিকট যা-ই চাইবে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তা-ই দেবেন। (জামে তিরমিযী, কিতাবুল জুমুআ, বাব ফিস্ সায়াতিল্লাতি তারজি ফি ইয়াওমিল জুমুআ)

অতএব লক্ষ করুন, জুমুআর কল্যাণ কত বেশি! প্রথমত, একে সর্বোত্তম দিন আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নিকট যে দিন উত্তম তা থেকে লাভবান হতে এবং তার কল্যাণরাজি পেতে কে না চাইবে? এখান থেকে তো এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, জুমুআতুল বিদা-ই সর্বোত্তম দিন। সুতরাং এই দিন পেয়ে আমাদের আরো বেশি ইবাদত করা উচিত ও আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হওয়া উচিত। কেননা আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে বলা হয়েছে যে, এখন তোমাদের কাজ হলো ইবাদত করা এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচা। তোমাদের মধ্য থেকে যারা আমার ভয়ে ভীত হবে ও আমার ইবাদত করবে তারা ইবাদুর রহমান তথা রহমান খোদার বান্দা আখ্যায়িত হবে আর যারা আমার শিক্ষার বিপরীতে চলবে তারা শয়তানের দাস আখ্যায়িত হবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবেই বলেই দিয়েছেন, যারা শয়তানের অনুসরণ করে চলবে তাদেরকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করব, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত তাঁর সৃষ্টির জন্য সদা উদ্‌বেলিত থাকে। তাই একথা বলা সত্ত্বেও তিনি সদা আমাদেরকে ক্ষমা লাভের রীতি শেখানো অব্যাহত রাখেন। এ কারণে তিনি বলেন, যারা আমার আদেশ-নিষেধ মান্য করে খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য সুসংবাদ হলো, তোমাদের জন্য আমি এমন একটি দিন (নির্ধারণ করেছি) এবং সেই দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছি যখন তোমরা আমার নিকট যা চাইবে আমি তা দেবো। আহমদীদের জন্য তো এটি বাড়তি এক খুশির কারণ, কেননা তারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী যুগ-ইমামকে চিনতে পেরেছে। তাই তাদের এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন আর অন্যান্য দোয়ার পাশাপাশি সর্বদা এ দোয়াও করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং দোয়া গৃহীত হবার মাধ্যম এখন মহানবী (সা.) ছাড়া আর কেউ নেই যা আমি পূর্বেও খুতবায় আলোচনা করেছি। এই

মাধ্যম অবলম্বন করলে দোয়া কবুল হবে। তাই সাধারণ দিনগুলোর চেয়ে জুমুআর দিনে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের প্রতি অধিক জোর দেওয়া উচিত।

একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, "তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে একটি দিন হলো জুমুআ, যেদিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর সেই দিনেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। সেই দিন বিউগল বাজানো হবে আর সে দিনেই সবাই মূর্ছা যাবে। অতএব তোমরা সে-দিন আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ প্রেরণ করো। **আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।** তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এটি শুনে সাহাবীরা (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার পবিত্র সত্তা যখন মাটিতে মিশে যাবে তখন আমাদের দরূদ কীভাবে আপনার নিকট পৌঁছানো হবে? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নবীদের সত্তাকে মাটির জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত বাব ফিল ইস্তিগফার)

অতঃপর জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "জুমুআর দিন মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। মসজিদে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করে তারা তার নাম প্রথমে লেখেন এবং ধারাবাহিকভাবে তারা আগমনকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে থাকেন আর ইমাম খুতবা দিয়ে বসে গেলে তারা তাদের রেজিস্টার বন্ধ করে দেন।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ, বাব ফাযলুত্ তাহজীর ইয়াওমিল জুমুআতি)

অপর এক হাদীসে হযরত আলকামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত দিবসে মানুষ জুমুআর নামাযে আসার ক্রম অনুসারে আল্লাহ্‌র দরবারে বসবে অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বসার যদি সুযোগ পায় তাহলে চতুর্থজনও (আল্লাহ হতে) দূরে থাকবে না।" (ইবনে মাজাহ্, কিতাব ইকামাতুস্ সালাত বাব মা জাআ ফিত্ তাহজীরি ইলাল জুমুআতি)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "এটি (অর্থাৎ জুমুআ) হলো ঈদের দিন যা আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যে জুমুআর নামাযে আসে তার উচিত গোসল করে, সুগন্ধি থাকলে তা লাগিয়ে এবং আবশ্যিকভাবে মিসওয়াক করে আসা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাবুস্ সালাতি ওয়াস্ সানাতি ফিহা বাব মা জাআ ফিয্ যীনাতি ইওয়ামিল জুমুআ)

অতএব লক্ষ করুন! এসব হাদীসের কোথাও এ ধারণা পাওয়া যায় না যে, ক্ষমা লাভের জন্য জুমুআতুল বিদা-ই যথেষ্ট বরং যারা মনে করে, এক দিন নামায পড়াই যথেষ্ট তাদের জেনে রাখা উচিত, প্রত্যেক জুমুআ গুরুত্বপূর্ণ, আবশ্যকীয় এবং ফরয। কিছু মানুষ তো জুমুআতুল বিদা আদায়কারীদের চেয়েও একধাপ অধঃপতিত। তারা জুমুআতুল বিদার দিনেও আসে না, বরং কেবল ঈদের দিনে আসে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করুণা করুন। আমি যে হাদীসটি পড়েছি তাতে তাদের জন্য বলে দেওয়া হয়েছে যে, জুমুআর

দিনও ঈদের দিন। এসব ঈদ একত্রিত হলে রমযানের কল্যাণরাজি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবার সামর্থ্যও লাভ হবে এবং রমযানের পর আগত ঈদসমূহ থেকেও কল্যাণ লাভ করবে আর পাপ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করবে।

অতঃপর জুমুআর দিনে প্রথমে আসা এবং ইমামের কাছাকাছি বসার বিষয়ে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত সুমরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, জুমুআর নামায পড়তে এসো এবং ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করো। কোনো ব্যক্তি জুমুআ হতে দূরে থাকার ফলে জান্নাত থেকেও দূরে চলে যায় অথচ সে-ও জান্নাতীদের একজন হবার যোগ্যতা রাখে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ০৫, পৃ. ১০, বৈরূত থেকে প্রকাশিত)

জুমুআ হতে পিছিয়ে থাকার অর্থ হলো, জুমুআ যদি বাদ দাও তাহলে বাদ দিতেই থাকবে অর্থাৎ এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এখানে মূল বিষয় হলো, জুমুআতে আসার জন্য যেন ব্যাকুলতা থাকে। ঈমানের কথা শোনার এবং তার ওপর আমল করার আকাঙ্ক্ষা যেন থাকে। মূলত দেখার বিষয়টি হলো নিয়ত। কিছু মানুষ এমন আছে যারা কিছু সময় নষ্ট করার পর মসজিদে যায় অর্থাৎ তারা ভাবে কিছুক্ষণ পর যাব, ধীরেসুস্থে যাব। (আবার অনেকে ভাবে যে,) ইমাম সাহেব দীর্ঘ খুতবা দিচ্ছেন, অনেকক্ষণ সেখানে বসে থাকতে হয়, অপেক্ষা করতে হয় তাই কে এতক্ষণ বসে থাকবে? পাঁচ-সাত মিনিট বাকি থাকতে গিয়ে উপস্থিত হবো। দুই-চার মিনিট খুতবা শুনব তারপর নামায পড়ে ফিরে আসব। এ ধরনের চিন্তা খুবই ভয়ংকর, কেননা প্রথমে এবং শেষে যাওয়া ব্যক্তির প্রতিদানের ক্ষেত্রে উট ও মুরগীর ডিমের যত পার্থক্য রয়েছে ততটা কিংবা কখনো কখনো উট ও চাউলের মতো পার্থক্য থাকে। এর বিপরীতে ইমামেরও পরিবেশ পরিস্থিতি বা আবহাওয়া অনুসারে সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে খুতবা প্রদান করা উচিত।

এখন জুমুআর গুরুত্ব ও তরবিয়ত সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি। কোনো কারণ ছাড়া জুমুআর নামায পরিত্যাগ করা উচিত নয়। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি পরপর তিনটি জুমুআ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা মোহর মেরে দেন। (তিরমিযী, কিতাবুল জুমুআ, বাব মা জাআ ফি তারকিল জুমুআতি মিন গাইরি উযর)

এমন ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে পিছিয়ে যায়। এ হাদীসে কঠিন এক সাবধানবাণী রয়েছে।

অতঃপর তারিক বিন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, চার ধরনের মানুষ ছাড়া সকল মুসলমানের জন্য জুমুআর নামায আদায় করা আবশ্যকীয় দায়িত্ব আর তারা হলো, দাস, মহিলা, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তি। (আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত বাব আল জুমুআতু লিল মুলুকি ওয়াল মারআতি)

অনেক মানুষ মনে করে, ইমামের খুতবা চলাকালে কথা বললে কোনো সমস্যা নেই। আবার অনেক মানুষ খুতবা চলাকালে তাদের শিশুদের চুপ করানোর জন্য সশব্দে কথা বলে, বিশেষ করে **মহিলা অঙ্গনে এটি দেখা যায়**। তাদেরকে স্মরণ রাখা উচিত, প্রথমত একেবারে ছোটো শিশু, যাদেরকে সামলানো কঠিন তাদেরকে নিয়ে মসজিদে আসবেন না

আর এমন পরিস্থিতিতে মহিলাদের মসজিদে আসা বাধ্যতামূলকও নয়। যে হাদীসটি আমি পড়েছি তাতে বাচ্চাদের জন্য এমনিতেই ছাড় রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে আনা উচিত যে, মসজিদের কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। তুমি সেখানে কথা বলবে না কিংবা হট্টগোল ইত্যাদি করবে না আর এভাবে যদি নিয়মিত শিশুদের মাথায় একথা ঢুকানো হয় তাহলে ধীরে ধীরে তারা তা বুঝতে বা অনুধাবন করতে পারে। বুঝানো না হলে আমি দেখেছি, কখনো কখনো আট দশ বছরের বাচ্চারাও খুতবা চলাকালে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে, পরস্পর খোঁচাখুঁচি এবং দুষ্টামি করতে থাকে। সুতরাং শিশুদের দৃষ্টি সবসময় এদিকে আকর্ষণ করতে থাকা উচিত আর পাশে বসা শিশুদেরকে কিংবা অন্য কাউকে যদি চুপ করাতে হয় তাহলে মুখে কখনো কিছু না বলে বরং ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝানো উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, জুমুআর দিনে ইমামের খুতবা চলাকালে তুমি যদি পাশের নামাযিকে বলো, 'চুপ থাকো' তাহলে তোমার একথা বলাও একটি বাজে কাজ। (মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ বাব ফিল ইনসাতি ইওয়ামিল জুমুআতি)

যে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়েছিল তার তফসীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, ইসলামে জুমুআর দিনের যে-সব বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত তা হলো, সেদিন যেন ছুটি রাখা হয়, ইবাদত যেন বেশি করা হয়। এটিকে যেন জাতীয় সম্মেলন-সমাবেশের দিন নির্ধারণ করা হয়। গোসল ও ধোয়ামোছা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অসুস্থদের সেবাশুশ্রূষা করা এবং একইভাবে অন্যান্য জাতীয় ও সামাজিক কাজও করা হয়। জুমুআর নামায শেষ হবার পর লোকদেরকে নিজ কাজে ব্যস্ত হবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু নামাযের পরেও মানুষের যিকরে এলাহীতে রত থাকাকে অধিক যুক্তিযুক্ত কাজ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় তার উপস্থিতিতে এমনই এক রমযানের শেষ জুমুআয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) খুতবা দিতে গিয়ে বলেন, আমাদের ইমাম বলেন, কত হতভাগা সেই ব্যক্তি যে রমযান পায় অথচ নিজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করে না। আর মাত্র পাঁচ-সাতটি রোযা বাকি আছে (সেটিও ছিল শেষ জুমুআ এবং এ বছরও মাত্র তিন-চারটি রোযা বাকি আছে)। এ দিনগুলোতে অনেক চেষ্টাপ্রচেষ্টা করো, বেশি করে দোয়া করো, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করো এবং বহুল পরিমাণে ইস্তিগফার ও 'লা হাওলা' পাঠ করো। পবিত্র কুরআন শোনো, ভালোভাবে বোঝো এবং (আলেমদের কাছ থেকে) বুঝে নাও। এছাড়া যতটা সম্ভব দানখয়রাত করো এবং নিজেদের সন্তানসন্ততিকেও এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করতে থাকো। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এবং তোমাদেরকে সেই সামর্থ্য দান করুন। আমীন। (খুতবাতে নূর, পৃ. ২৬৫, নতুন সংস্করণ)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যে নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছেন সেই নিয়ামত হলো এ ধর্ম যার নাম ইসলাম। এছাড়া নিয়ামতসমূহের মধ্যে রয়েছে জুমুআর দিনও, যে-দিন নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। এটি এদিকে একটি ইঙ্গিত যে, **ইউযহিরাহু আলাদ্ দীনি কুল্লিহি**-রূপে যে নিয়ামত পূর্ণতা পাবে তা-ও একটি মহান জুমুআ

হবে আর সেই জুমুআ এখন এসে গেছে। কেননা খোদা তা'লা সেই জুমুআকে মসীহ্ মওউদের জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারণ করেছেন। ... আমি সত্য সত্যই বলছি, এটি একটি উৎসব, আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য যেটির আয়োজন করেছেন। কল্যাণমণ্ডিত তারাই– যারা এ থেকে লাভবান হয়। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক গড়েছ তারা এ বিষয় নিয়ে কখনো অহংকার কোরো না যে, তোমাদের যা পাবার তা পেয়ে গেছ। .... বরং সত্য কথা হলো, তোমরা সেই ঝরনাধারার নিকটে এসে গেছ যা খোদা তা'লা বর্তমানে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এ থেকে পানি পান করা এখনো বাকি আছে। সুতরাং খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার দোহাই দিয়ে সামর্থ্য যাচনা করো যেন তিনি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এই ঝরনাধারা থেকে যে পান করবে সে কখনো ধ্বংস হবে না, কেননা এই পানি প্রাণপ্রদ আর তা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায় এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এই ঝরনাধারা থেকে পরিতৃপ্ত হবার উপায় কী? উপায় হলো, খোদা তা'লা তোমাদের জন্য যে দুই ধরনের অধিকার প্রদান করা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো প্রদান করো এবং ভালোভাবে তা আদায় করো। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ্‌র অধিকার এবং দ্বিতীয়টি বান্দার অধিকার।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০২, পৃ. ১৩৪-১৩৫)

অতএব আমাদের প্রত্যেক আহমদীকে এ বিষয়ের গুরুত্ব দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। অর্থাৎ যুগ-ইমামকে মান্য করার সুবাদে আমাদের ওপর অনেক বেশি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ইবাদতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী সকল ইবাদত করার চেষ্টা করা উচিত। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাঁর যুগের সাথেও জুমুআর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে আর এ বিষয়টির গুরুত্ব সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানে রমযান মাস চলছে এবং শেষ দশকের মাত্র কয়েকটি দিন বাকি আছে। এতে দোয়া গৃহীত হবার সুসংবাদও দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এ দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।

একটি হাদীসে হযরত নু'মান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "দোয়া-ই হলো প্রকৃত ইবাদত। অতঃপর মহানবী (সা.) কুরআন করীমের এই আয়াত পাঠ করেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝

(আল-মুমিন: ৬১)

অর্থাৎ আর তোমাদের প্রতিপালক-প্রভু বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। নিশ্চয় যারা নিজেদেরকে আমার ইবাদতের ঊর্ধ্বে মনে করে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।" (সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত, বাব মা জাআ ফি ফাযলিদ্ দুআ)

কত ভয়ংকর কথা দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তোমাদের নেক আকাঙ্ক্ষা ও দোয়াসমূহ গ্রহণ করার জন্য আমি অপেক্ষায় আছি তারপরও তোমরা আমার নিকট চাও না! এছাড়া আমি তোমাদেরকে এদিকেও অনুপ্রাণিত করছি যে, জুমুআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন তোমাদের দোয়াসমূহ গৃহীত হয় তবুও যতটা দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত ততটা তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই মুহূর্ত লাভের এবং দোয়া করার সামর্থ্য দান করুন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়ার চেয়ে বেশি প্রিয় বা বেশি সম্মানিত অন্য আর কিছুই নেই। (সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাব মা জাআ ফি ফাযলুদ্ দোয়া)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট চায় না তার প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। (সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাব মা জাআ ফি ফাযলুদ্ দোয়া)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের স্বীয় প্রতিপালক-প্রভুর নিকটেই সকল প্রকার প্রার্থনা করা উচিত। জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তা-ও আল্লাহ্র কাছেই চাও। আবার হযরত সাবিত আল বানানী (রা.) বর্ণনা করেন, লবণও যদি চাইতে হয় তবে তা আল্লাহ্র কাছেই চাও এবং জুতার ফিতাও যদি ছিঁড়ে যায় তবে তাঁর নিকটেই যাচনা করো। (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত ইয়াসআলুল হাজাতি মাহমা সুগরাতি)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দা যেখানেই আমাকে স্মরণ করে বা যখনই আমার স্মরণে তাদের ঠোঁট নড়ে আমি তার পাশে থাকি। (বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ বাব কাওলুল্লাহু তা'লা লা তুহাররিকু বিহি লিসানিকা)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য দোয়ার দ্বার খোলা হয়েছে তার জন্য রহমতের দ্বারও খোলা হয়েছে এবং আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় দোয়া হলো, তাঁর কাছে মার্জনা যাচনা করা। [তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত বাব ফিদ্ দুআইন্ নাবিয়্যি (সা.)]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, মানুষ তার প্রতিপালক-প্রভুর সবচেয়ে নিকটে তখনই থাকে যখন সে সিজদাবনত থাকে। তাই সিজদায় অনেক দোয়া করো। (মুসলিম, কিতাবুস্ সালাত, মা ইয়াকুলু ফির্ রুকুই ওয়াস্ সুজুদ)

হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, "কোনো মুসলমানের দোয়ার মাঝে যদি পাপ কিংবা সম্পর্ক ছিন্ন করার কোনো উপকরণ না থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই দিয়ে থাকেন আর সেই তিনটি বিষয় কী? হয় তার দোয়া দ্রুত কবুল করা হয় কিংবা সেই দোয়াসমূহ আখিরাত অর্থাৎ শেষ দিনে ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টির জন্য পুঞ্জীভূত করে রাখা হয় অথবা আল্লাহ্ তা'লা

সমপরিমাণ মন্দ বিষয় তার ভেতর থেকে দূর করে দেন। তার দোয়া যদি তদনুযায়ী পূর্ণ না-ও হয় তবে তার ভিতর থেকে কোনো না কোনো মন্দ বিষয় দূর হয়ে যায়। এটি শুনে সাহাবীরা (রা.) নিবেদন করলেন, আমরা তাহলে অনেক বেশি দোয়া করব। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এর চেয়ে বেশি দেবার ক্ষমতা রাখেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আবি সাঈদিল খুদরী, খণ্ড: ০৩, পৃ. ৩৯৪, হাদীস নম্বর: ১০৭৪৯)

অতএব দেখুন! মহানবী (সা.) কীভাবে আমাদেরকে দোয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের একান্ত দায়িত্ব হলো, রমযানের বাকি দিনগুলোতে নিজেদের জন্য, স্ত্রী-সন্তানের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য এবং জামা'তের জন্য অনেক বেশি দোয়া করা। মানুষ যখন নিজের জন্য দোয়া করে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। এ বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন। এ কারণে জামা'তের সেসব নিরুপায় ও অসহায় লোকদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন যারা কোনো না কোনোভাবে বিরুদ্ধবাদীদের হাতে কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিদানস্বরূপ এই তিন আঙ্গিকে দোয়া কবুল করার সামর্থ্যও রাখেন বরং এখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এর চেয়ে বেশি তিনি আমাদেরকে প্রদান করতে পারেন। তিনিই সকল শক্তিসামর্থ্যের আধার। তাঁকে কখনো সীমাবদ্ধ মনে কোরো না।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "... যে ব্যক্তি দোয়ার জন্য খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না সে সর্বদা অন্ধই থেকে যায় এবং অন্ধ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে।.....আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে দোয়া করে প্রকৃত অর্থে সে কখনোই বিফল হতে পারে না। অথচ সেই স্বাচ্ছন্দ্য যা কেবল ধনসম্পদ, ক্ষমতা কিংবা স্বাস্থ্যের মাধ্যমে লাভ হওয়া সম্ভব নয় তা রয়েছে কেবল খোদা তা'লার হাতে। তিনি যেভাবে চান তা দান করেন আর তা কেবল পরিপূর্ণ দোয়ার ফলেই প্রদান করা হয়। খোদা তা'লা চাইলে এক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি বিপদের চরম মুহূর্তে দোয়া করার পর সেই স্বাদ লাভ করে যা সিংহাসনে সমাসীন এক রাজা লাভ করতে পারে না। সুতরাং এরই নাম সত্যিকার সফলতা– যা কেবল প্রর্থনাকারীরাই লাভ করে থাকে। (আইয়ামুস্ সুল্হ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৪, পৃ. ২৩৭)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "কবুলিয়ত (বা খোদার দরবারে গৃহীত হবার) সাথে দোয়ার একটি সম্পর্ক রয়েছে। এই রহস্য আমরা যৌক্তিকভাবে অন্যদের হৃদয়ে গ্রথিত করতে পারি বা না পারি কোটি কোটি খোদাভীরুর অভিজ্ঞতা এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এ অদৃশ্য সত্য দেখিয়েছে যে, আমাদের দোয়া করা নিজের মাঝে এক ধরনের চৌম্বকীয় শক্তি রাখে আর তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে।" (আইয়ামুস্ সুল্হ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৪, পৃ. ২৪০-২৪১)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খোদা তা'লার বাণীতে চারটি কারণে মুসলমানদের জন্য দোয়া করাকে আবশ্যক আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তা হলো–

১) সবসময় এবং সর্বাবস্থায় খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার কল্যাণে যেন

তওহীদের ওপর দৃঢ়তা লাভ হয়, কেননা খোদার কাছে প্রার্থনা করার অর্থ হলো, এ বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া যে, একমাত্র খোদা-ই সকল উদ্দেশ্য সাধনের মালিক। ২) দোয়া গৃহীত হওয়া এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির কল্যাণে যেন ঈমান দৃঢ় হয়। ৩) অন্য কোনো আঙ্গিকে যদি খোদার সাহায্য লাভ হয় তাহলে যেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বৃদ্ধি ঘটে (অর্থাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং খোদাকে চেনার প্রতি যেন অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয়)। ৪) ইলহাম ও রুইয়ার আদলে যদি দোয়া গৃহীত হবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং সেভাবেই যদি তা প্রকাশিত হয় তাহলে ঐশী তত্ত্বজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে যেন আরো উন্নতি সাধন হয় আর সেই মারেফত থেকে পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ বিশ্বাস থেকে ভালোবাসা আর ভালোবাসা থেকে সকল পাপ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয় যা প্রকৃত মুক্তির কারণ। (আইয়ামুস্ সুল্হ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৪, পৃ. ২৪২)

তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমাদের আহাজারি যদি এমন ব্যাকুলতা ও আকুলতা পূর্ণ হয় যা তাঁর কৃপা ও করুণাকে উদ্‌বেলিত করে এবং তাকে প্রবলভাবে টেনে আনে অধিকন্তু আমি নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি যে, খোদার কৃপা ও অনুগ্রহ যা দোয়া গৃহীত হবার আদলে আসে তা আমি আমার দিকে আকৃষ্ট হতে অনুভব করেছি বরং আমি বলব, আমি তা দেখেছি।

তিনি (আ.) আরো বলেন, যারা এখন শুনছ, তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে! তোমাদের একমাত্র অস্ত্র হলো, দোয়া। অতএব দোয়ায় রত থাকো। স্মরণ রেখো! অবাধ্যতা ও পাপ-পঙ্কিলতাকে কোনো ওয়ায-নসিহত কিংবা অন্য কোনো কৌশল দূর করতে পারে না। এর জন্য একটি মাত্র উপায় আছে আর তা হলো, দোয়া। আল্লাহ্ তা'লা একথাই আমাদের বলেছেন। বর্তমান যুগে পুণ্যকর্মের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া এবং পাপকে পরিত্যাগ করা চাট্টিখানি কথা নয়। এটি এক বিপ্লবের দাবি রাখে আর সে বিপ্লব সাধনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে এবং এটি হবে দোয়ার ফলে। আমাদের জামা'তের সদস্যদের উচিত রাতে কেঁদে কেঁদে দোয়া করা, কেননা আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, **উদ্‌উনি আস্তাজিব লাকুম** (আল-মুমিন: ৬১)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "সেই দোয়া যা অন্তর্দৃষ্টি লাভের পর আশিসের মাধ্যমে (হৃদয় হতে) উদ্ভূত হয় তার ধরন ও বৈশিষ্ট্যই ভিন্ন হয়ে থাকে, সেটি বিলুপ্তি (বা ফানা-র দিকে ঠেলে দেবার মতো) একটি বিষয়, তা ভস্মকারী এক অগ্নি, কৃপা আকর্ষণকারী এক চৌম্বক শক্তি, তা একপ্রকার মৃত্যু কিন্তু অবশেষে জীবন দান করে, তা এক প্রবল বন্যা কিন্তু অবশেষে নৌকার রূপধারণ করে, এর মাধ্যমে সব বিশৃঙ্খল বিষয় সুবিন্যস্ত হয়ে যায় এবং সব বিষ এক পর্যায়ে প্রতিষেধকে রূপান্তরিত হয়।

সৌভাগ্যবান সেসব বন্দি যারা দোয়া করে ক্লান্ত হয় না, কেননা একদিন তারা মুক্তি পাবে। কল্যাণময় সেসব অন্ধ যারা দোয়াতে আলস্য দেখায় না, কেননা তারা একদিন দৃষ্টি লাভ করবে। সৌভাগ্যবান তারা যারা কবরে পতিত অবস্থায় দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্য কামনা করে। কেননা একদিন তাদেরকে কবর থেকে বের করা হবে। তোমরা যদি

কখনো দোয়া করার বিষয়ে ক্লান্তি না দেখাও; তোমাদের আত্মা যদি দোয়ার জন্য বিগলিত হয় ও তোমাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয়, তোমাদের বুকে একপ্রকারের আগুন লাগিয়ে দেয় এবং নির্জনতার স্বাদ উপভোগের জন্য তোমাদেরকে অন্ধকার ঘরে ও জনমানবশূন্য জঙ্গলে নিয়ে যায় আর তোমাদেরকে ব্যাকুল, পাগল ও উন্মাদপ্রায় করে তোলে তাহলে তোমরা সৌভাগ্যবান। কেননা পরিশেষে তোমাদের প্রতি আশিস বর্ষণ করা হবে। সেই খোদা যাঁর দিকে আমরা আহ্বান করি তিনি একান্ত সম্মানিত, দয়ালু, লজ্জাশীল, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত এবং বিনয়ীদের প্রতি দয়ার্দ্র। সুতরাং তোমরাও বিশ্বস্ত হয়ে যাও। পুরো আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে দোয়া করো। যার ফলে তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। এ পৃথিবীর হট্টগোল থেকে পৃথক হয়ে যাও। নিজের অবাধ্য প্রবৃত্তির মাধ্যমে ধর্মকে কলুষিত কোরো না। আল্লাহ্‌র জন্য হার মেনে নাও এবং পরাজয় বরণ করো, এর ফলে তোমরা বড়ো বড়ো সফলতার উত্তরাধিকারী হবে। প্রার্থনাকারীদের খোদা নিদর্শন দেখাবেন এবং যাচনাকারীদের একটি অসাধারণ নিয়ামত দেওয়া হবে। দোয়া খোদার পক্ষ থেকেই আসে আর খোদার কাছেই ফিরে যায়। দোয়ার ফলে খোদা এমনভাবে নিকটবর্তী হন যেভাবে তোমাদের প্রাণ তোমাদের নিকটে রয়েছে। **দোয়ার প্রথম পুরস্কার হলো, মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হওয়া।** এই পরিবর্তনের পর খোদা তা'লাও স্বীয় গুণাবলির মাঝে পরিবর্তন আনেন! তাঁর গুণাবলি অপরিবর্তনীয়; কিন্তু পরিবর্তিত লোকদের জন্য তাঁর একটি ভিন্ন বিকাশ ঘটে যা পৃথিবী জানে না। তিনি যেন ভিন্ন খোদা অথচ তিনি ভিন্ন খোদা নন। নতুন জ্যোতির বিকাশ তাঁকে নবরূপে প্রকাশ করে। তখন তিনি সেই বিকাশের মহিমায় পরিবর্তিত ব্যক্তির জন্য সেই কাজ করেন যা অন্যদের জন্য করেন না। এটিই সেই অলৌকিক বিষয়।

মোটকথা, দোয়া সেই মহৌষধ যা এক মুষ্ঠি ধুলোকে স্বর্ণ বানিয়ে দেয় এবং এটি একপ্রকার পানি যা অভ্যন্তরীণ আবর্জনাকে ধুয়ে ফেলে। সেই দোয়ার মাধ্যমে আত্মা বিগলিত হয় এবং পানির মতো প্রবাহিত হয়ে আল্লাহ্‌র আস্তানায় বর্ষিত হয়।" (লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ২২২-২২৩)

সুতরাং আসুন! আমাদের জামা'তের আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই মিলে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কান্নাকাটি করি এবং যে ঘাটতি রয়ে গেছে তা রমযানের এই অবশিষ্ট দিনগুলোতে পূরণ করার চেষ্টা করি। নিজেদের রাতগুলোকে ইবাদতের মাধ্যমে জীবিত করুন এবং দিনগুলোকে যিকরে এলাহীর মাধ্যমে সিক্ত করুন আর আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁর কৃপা ও করুণা কামনা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অলসতা ও দুর্বলতা ক্ষমা করুন, আমাদের পাপসমূহ ঢেকে রাখুন, আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি দিন আর তিনি আমাদের সেসব ভাইয়ের প্রতি দয়া ও কৃপা করুন যাদেরকে কেবল এ যুগের ইমামকে শনাক্ত করার কারণে এবং তাঁকে মান্য করার কারণে উত্যক্ত করা হচ্ছে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদীকে বিবেকবুদ্ধি দান করো, যেন তারা এ বিরোধিতা থেকে বিরত হয় এবং শয়তানরূপী যে-সব মানুষ নিষ্পাপ সাধারণ মানুষগুলোকে প্ররোচিত করছে তাদেরকে তুমি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে দাও। এছাড়া যে-সব স্থানে আহমদীরা নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত

করছে তাদের প্রতি তুমি নিজ করুণাবশত এই কষ্টের দিনগুলোকে স্বাধীনতায় বদলে দাও এবং আমাদেরকে চিরকাল তোমার ইবাদতকারী বান্দা বানিয়ে রাখো, অধিকন্তু এ রমযানে আমাদের প্রতি যে-সব অনুগ্রহ বর্ষিত হবে সেগুলোকে বহমান রেখো। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট তোমার বাণী **উদ্‌ঊনি আস্তাজিব লাকুম**-এর দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সমস্ত দোয়া কবুল করুন। আমীন।

(৩২)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৮ নভেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ২৮ নবুওয়ত ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

(আন-নামল: ৬৩)

অর্থ: "অথবা কে সেই মহান অস্তিত্ব– যিনি ব্যাকুল-অসহায় ব্যক্তির ডাক শোনেন, যখন সে তাঁর কাছে দোয়া করে এবং (তার) কষ্ট দূর করে দেন আর তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন? আল্লাহ্ ছাড়াও কি কোনো উপাস্য আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।"

পবিত্র রমযান অগণিত বরকত ও কল্যাণ নিয়ে এসেছে। এ থেকে যারা প্রকৃত অর্থে লাভবান হবার সামর্থ্য লাভ করেছেন অর্থাৎ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া, ফজরের পর অধিকাংশ স্থানে হাদীসের দরসের ব্যবস্থা ছিল তা শোনা, মসজিদে পাঁচবেলা বাজামা'ত নামায পড়তে আসা, কুরআনের দরস, রাতে তারাবীহর নামায আদায় করা ছাড়াও (তারা) নিজে এক, দুই কিংবা তিন বার পুরো কুরআন পড়ে শেষ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা সারা মাস রোযা রাখার সামর্থ্য দিয়েছেন; এককথায় আপনাদের মধ্যে যারা রমযানে এই সবকিছু পালন করার সামর্থ্য লাভ করেছেন, তারা নিশ্চয় অনুভব করে থাকবেন যে, রমযান এলো আর অত্যন্ত দ্রুত নিজের কল্যাণরাজি বিস্তৃত করে চলেও গেল! এর ফলে ইবাদতের স্বাদও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার নিকট আসা চিঠিপত্র পড়লে তা বুঝা যায়। পত্রে বিভিন্ন মানুষ লিখে থাকে যে, (তাদের) অনেককেই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় মারেফত বা তাঁকে চেনা এবং তাঁর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সৌভাগ্য দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা (তাদেরকে) এসব কল্যাণ ধরে রাখার সৌভাগ্য দান করুন। আমাদের কোনো যোগ্যতার কারণে নয় বরং কেবল নিজ অনুগ্রহের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আশিস দিয়ে আমাদের (শূন্য) পাত্র পূর্ণ করার তৌফিক দান করেছেন। তাই আমাদের কোনো অবহেলা, কোনো দুর্বলতা কিংবা আমাদের অহমিকার কারণে সেই কল্যাণে পূর্ণ পাত্র যেন খালি না হয়ে যায়।

বিগত কয়েকটি খুতবায় আমি দোয়া এবং ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে আসছি। এখন কারো এ ধারণা হতে পারে যে, রমযান ছিল বিধায় ইবাদত এবং দোয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজন ছিল। এখন অন্য কোনো বিষয় আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু দোয়ার বিষয়টি এমন– যা ছাড়া আমরা আহমদীরা এক পা-ও নড়তে পারি না। এ কারণে আজ আমি

আবারো জামা'তের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, আসুন! রমযানে যেভাবে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে আহাজারি করেছিলাম; এখনো সেই একই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাঁর দরবারে বিনত হই এবং চিরবিনত থাকি। আমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপা যাচনা করে সর্বদা তাঁরই সমীপে ঝুঁকি, কেননা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীদের একমাত্র অস্ত্রই হলো দোয়া। এটি ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে তরবারি ওঠানো হয়েছিল বিধায় তাঁকে তরবারি হাতে নেবার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ যুগে খোদা তা'লা স্বীয় মনোনীত মহাপুরষকে কেবল দোয়ার অস্ত্রই দিয়েছেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে কঠোরভাবে বলেন, বর্তমানে তরবারি, তোপ বা কামান কিংবা অন্য কোনো অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং একথা তিনি বানিয়ে বলছেন না বরং বর্তমানে এ সবকিছু হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী।

অতএব এ যুগে ইসলামের বিজয় লাভ হলে তা হবে যুক্তিপ্রমাণের পাশাপাশি কেবল দোয়ার মাধ্যমেই। এই অস্ত্র বর্তমান যুগে আহমদীয়া জামা'ত ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা গোত্রের নিকট নেই। অতএব আমরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে সেই অস্ত্র আমাদেরকে দিয়েছেন– যা অন্য কারো কাছেই নেই। কাজেই (আমরা যখন জানি,) এটি একটি অস্ত্র আর একমাত্র অস্ত্র যা অন্য কারো কাছে নেই, তাই আমাদের বিজয়ের দিন ও ক্ষণ দেখার বিষয়ে এটিকে গৌণ বিষয় মনে করা কীভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে? কিংবা দোয়ার প্রতি কম মনোযোগ নিবদ্ধ করা কীভাবে বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? বিধর্মীদের মতো আমরা একথা বলতে পারি না যে, দোয়ার ফলে কি কখনো পৃথিবী জয় করা গেছে? কিংবা ঠোঁট নাড়ালে কখনো কোনো লাভ হয়েছে কি? আমাদের বক্তব্য বরং আমাদের উত্তর এটিই হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণের জন্য যদি ঠোঁট নাড়ানো হয়, হৃদয়ের আকুতি যখন মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহ্র নিকট সাহায্য কামনা করা হয় তখন এর ফলে কেবল সাধারণ ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণই সাধিত হয় না, বরং এমন লোকদের বিরুদ্ধাচরণকারী অর্থাৎ এমন খোদাভীরু লোকদেরকে যারা উত্যক্ত করে তারা টুকরো-টুকরো ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কোনো সাধারণ মানুষ হোক কিংবা সরকারই হোক না কেন। আমাদের খোদা হলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, অতীব মহান, অসীম শক্তির অধিকারী এবং সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল। তাঁকে যদি কেউ আঁকড়ে ধরে তবে তিনিই তার আশ্রয়। তিনি এমন ভরসাস্থল যিনি নিজের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য ও সুরক্ষিত করার জন্য আমাদেরকে এভাবে ডাকছেন যে, হে আমার বান্দারা! পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আমার নিকট আসো এবং আমার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করো। শত্রু তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। অতএব আমাদের খোদা বরং আমাদের সবচেয়ে প্রিয় খোদা যেখানে এত নিশ্চয়তা প্রদান করছেন; সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে তাঁর নিকট যাচনা করা, তাঁর প্রতি বিনত হওয়া এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করার বিষয়কে অবজ্ঞা করতে পারি! জামা'তের এবং বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা অবলোকন করে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের তো পূর্বের চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিনত হওয়া প্রয়োজন।

আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি সেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, আমি

ব্যাকুল ও কাতরচিত্ত মানুষের প্রার্থনা শুনে থাকি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি দোয়া করা প্রয়োজন এবং এটি কেবল আমাদের জন্যই প্রযোজ্য কেননা ব্যাকুল মানে কেবল অস্থিরই নয় বরং এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার মুক্তির সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে কেবল আহমদীয়া জামা'তই এমন রয়েছে যাদের জাগতিক কোনো মাধ্যম ও পথ নেই। এই সমাজে বসবাস করার কারণে যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই তখন আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিংবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগকে অবগত করি, কিন্তু কখনো আমরা তাদেরকে খোদা মনে করি না। কেননা আমাদের খোদা বরং আমাদের জীবন্ত খোদা আমাদেরকে বলে রেখেছেন, যখনই তোমরা আমার প্রয়োজন অনুভব করবে বরং বাহ্যিকভাবেও যখন তোমরা নিরাপদে থাকো তখনও, বরং সর্বাবস্থায় এ বিশ্বাস নিয়ে আমাকে ডাকবে যে, আমি অসহায়দের আশ্রয়স্থল ও দোয়া শ্রবণকারী; তাহলে তোমরা নিজেদের প্রয়োজনের সময় সর্বদা আমাকে পাশে পাবে। পাশাপাশি এটিও স্মরণ রাখা উচিত, দোয়া যেন সেই ব্যাকুলতার সাথে করা হয় যাতে প্রার্থনাকারী বাস্তব অবস্থা কাতরচিত্তে বলে উঠবে যে, উপায়-উপকরণের দিক থেকে আমি রিক্তহস্ত কিন্তু তওবা গ্রহণকারী সম্মানিত আল্লাহ্ পাশে আছেন; তারপর দেখো! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তোমাদের কষ্ট দূর করেন! নিপীড়নকারী কর্মকর্তা, উৎপীড়ক মোল্লা এবং অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে তোমরা পরিত্রাণ লাভ করবে। কিন্তু কেবল কান্নাকাটি কিংবা আহাজারি করা যথেষ্ট নয় বরং যেভাবে আমি বলেছি, একটি অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতা প্রয়োজন। এই দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাই যে, খোদা তা'লাই সকল শক্তির আধার। আল্লাহ্ তা'লা যদি সহায় হন তাহলে জাগতিক হামলা আমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে শনাক্ত করার জন্য একটি চিহ্ন বাতলে দিয়েছেন; অর্থাৎ তোমাদের খোদা হলেন সেই মহান সত্তা– যিনি ব্যাকুল হৃদয়ের প্রার্থনা শুনে থাকেন, যেমন তিনি বলেছেন, **আম্মাই ইউজীবুল মুযতাররা ইযা দাআহু**। আতএব দোয়া কবুলিয়তের বিষয়টিকে খোদা তা'লা যেখানে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন সেখানে কোনো বুদ্ধিমান এবং লজ্জাশীল ব্যক্তি কীভাবে এ ধারণা করতে পারে যে, দোয়া করার ফলে স্পষ্ট কোনো গ্রহণীয়তার কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হয় না আর এটি কেবল প্রথাগত একটি বিষয় যাতে কোনো আধ্যাত্মিকতা নেই। আমার মতে, কোনো সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি এমন শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ করবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজে বলছেন, আকাশ ও পৃথিবীর গুণাবলির প্রতি লক্ষ করলে যেমন সত্য খোদাকে চেনা যায় ঠিক তেমনি দোয়া গৃহীত হবার প্রতি লক্ষ করলেও খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস জন্মে।" (আইয়ামুস্ সুলহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৪, পৃ. ২৫৯-২৬০)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "ঐশী গ্রন্থে 'মুযতার' শব্দ দ্বারা এমন কষ্টে নিপতিত ব্যক্তিকে বুঝায়, যে কোনো শাস্তি পেয়ে নয় বরং কেবল পরীক্ষাস্বরূপ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু যারা শাস্তিস্বরূপ কোনো ক্ষতি বা কষ্টে নিপতিত– এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে বুঝায় না। নতুবা নূহ (আ.), লূত (আ.) এবং ফেরাউনের জাতির সেই ব্যাকুলতার সময়

কৃত দোয়া কবুল করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াতো, কিন্তু এমনটি হয় নি। সত্য কথা হলো, খোদার হাত সেসব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" (দাফেউল বালা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৮, পৃ. ২৩১)

অতএব বর্তমানে আহমদীয়া জামা'তই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'মুযতার' অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ব্যাকুল। কিছু দেশে জামা'ত কিংবা জামা'তের সদস্যদের মারাত্মক ক্ষতি করা হয় অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারছে না। আমরা বলে থাকি যে, আমরা এক খোদাকে মান্য করি, এক খোদার মান্যকারী এবং আমরা খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা বলে, না, তোমরা মিথ্যা বলছ। মহানবী (সা.) যেখানে কারো হৃদয়ের অবস্থা জানতে পারেন নি বা অবগত হন নি, সেখানে এসব মোল্লা-মৌলবি এবং সরকার হৃদয়ের অবস্থা জানতে শুরু করেছে। সুতরাং কারা খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হলো? আবার খতমে নবুওয়তের এই অস্বীকারকারীরা মৌখিকভাবে না বললেও কার্যত এটিই বলছে যে, মহানবী (সা.) মানুষের হৃদয়ের অবস্থা বুঝতে পারেন নি (নাউযুবিল্লাহ) কিন্তু আমরা তাঁর (সা.) চেয়ে বড়ো এবং সকল হৃদয়ের স্বরূপ আমরা জেনে গেছি। এরা নিজেদের সঙ্গীসাথিদের শিক্ষণীয় পরিণতি দেখে ঠিকই, কিন্তু নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতা দেখুন! এদের ওপর এর কোনো প্রভাবই পড়ে না।

যাহোক, আমি প্রারম্ভেই যেভাবে দোয়ার বিষয়ে বলেছি যে, দোয়াই যেন আমাদের একমাত্র অবলম্বন হয়। দোয়ার প্রতিই আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত কেননা এছাড়া আমাদের জীবনে আর কিছু নেই। রাবওয়াসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক আবেগঘন পত্রাবলি আমার নিকট আসে, যেখানে তারা বলেন, এমটিএ-র মাধ্যমে তো আমরা খিলাফতের সাথে কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারছি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খলীফাকে দেখতে পাচ্ছি এবং তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি যেগুলো কেবল একপক্ষীয় মিলন। জানি না স্বাধীনভাবে কবে আমাদের দু'পক্ষের মিলিত হবার উপকরণ সৃষ্টি হবে এবং কবে আমরা বাজারে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারব যাতে লোকেরা বুঝতে পারে, প্রকৃত প্রেমিক তো আমরাই। আইন কখন ন্যায়বিচারের দাবি পূরণের যোগ্যতা লাভ করবে? তাদের প্রতি আমার উত্তর এটিই হয়ে থাকে, বিগত একশ বছরেরও অধিক সময় জুড়ে সর্বদা যে খোদা তা'লা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন ও আমাদের কষ্ট দূর করছেন; আজও সে খোদা-ই আমাদের এসব দুঃখকষ্ট দূর করবেন, ইনশাআল্লাহ্। বাহ্যত অসম্ভব বিষয় ও অসম্ভব জিনিস শুধু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সম্ভব হয়ে যায় এবং হবেও ইনশাআল্লাহ্। অনেক বড়ো বড়ো ফেরাউন এসেছে এবং চলেও গেছে, কিন্তু এই ঐশী জামা'ত উন্নতি করেই চলেছে। তবে শর্ত হলো, ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অবনত হওয়া। এ কারণে রমযানে আপনারা যেভাবে দোয়া করার সামর্থ্য লাভ করেছেন, সেই মানকে অক্ষুণ্ন রাখলে কোনোকিছুই সামনে দাঁড়াতে পারবে না। দেশের বাইরে থেকে যারা রাবওয়াতে গিয়েছেন, তারা বলেছেন এবং লিখেছেনও, রমযানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মসজিদগুলো ইবাদতকারীতে পরিপূর্ণ ছিল আর সারা বিশ্বের সব জায়গায় অবস্থা এমনই ছিল আর

এখানেও আপনারা এই চিত্রই দেখেছেন। এক্ষেত্রে কেবল রাবওয়াই নয় বরং যেখানেই আহমদীরা বসবাস করেন, সেখানেই মসজিদ আবাদ রাখার এই ব্যবস্থা যদি অব্যাহত থাকে এতে যদি অলসতা দেখা না দেয়, মসজিদগুলো আবাদ করার চেষ্টা করেন এবং আমাদের মসজিদে স্থান সংকুলান কঠিন হয়ে যায়, উপস্থিতি এত অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ আবালবৃদ্ধবণিতা সকলে নামাযের সময় মসজিদে যায় তবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া অনেক বেশি গ্রহণ করবেন। একইভাবে মহিলারা বাড়িতে নামায এবং ইবাদতের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হোন। তারপর দেখবেন, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, ইনশাআল্লাহ্। এভাবে আমরা সবাই মিলে যখন দোয়া করব, আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত হবো এবং ইবাদত করার চেষ্টা করব তখন এটি সেই প্রবল বেগে প্রবহমান পানির ন্যায় হবে যা কোনো পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে। যেখানে (এই পাহাড়ি) নদীর গমনপথ সরু হয়ে থাকে সেখানে পানি এত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় যে, রাস্তার প্রতিবন্ধক পাথরকেও চিরতে থাকে, এমনকি কখনো কখনো সেগুলোকে ভাসিয়েও নিয়ে যায় এবং বড়ো বড়ো কড়িকাঠকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এর গতি এতটাই প্রবল হয় যে, তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। অতএব সবাই একত্রিত হয়ে একযোগে যখন দোয়া করব এবং সবার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হবে তখন সেই নদীর পানির মতো যা-ই সামনে আসবে, তা খড়কুটার ন্যায় ভেসে যাবে। কিন্তু শর্ত হলো, অবিচলতা এবং নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে যেন এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। রমযান অতিবাহিত হবার পর আমরা যেন অলস না হয়ে যাই এবং আমাদের মসজিদসমূহ যেন বিরান না দেখায়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা সম্পূর্ণভাবে পরবিমুখ। অজস্র ধারায় ও বার বার ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করা না হলে খোদা তা'লা কারো পরোয়া করেন না। লক্ষ করো! কারো স্ত্রী-সন্তান যদি অসুস্থ হয় কিংবা কাউকে যখন কোনো কঠিন মামলা মোকাদ্দমার মুখোমুখি হতে হয় তখন সে এ বিষয়গুলি নিয়ে কতটা ব্যাকুল থাকে। অতএব দোয়ার মাঝেও যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ তা একেবারেই অকার্যকর ও বৃথা কাজ বইকি। দোয়া কবুলিয়তের জন্য ব্যাকুলতা হলো শর্ত, যেভাবে বলা হয়েছে, আম্মাই ইউজীবুল মুযতাররা ইযা দাআহু ওয়া ইয়াকশিফুস্ সুআ।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ১২, সংখ্যা: ১৬, ২ মার্চ ১৯০৮, পৃ. ৫)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "দোয়া গৃহীত হবার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো, যার স্বপক্ষে মানুষ দোয়া করে থাকে তার জন্য হৃদয়ে মমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। যেভাবে বলা হয়েছে, আম্মাই ইউজীবুল মুযতাররা ইযা দাআহু।" (আল-হাকাম, খণ্ড: ০৫, সংখ্যা: ৩২, ৩১ আগস্ট ১৯০১, পৃ. ১৩)

অতএব জামা'তের জন্য যদি হৃদয়ে এমন বেদনা ও মমতা সৃষ্টি হয় তবে আপনাদের দোয়াও গৃহীত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ব্যক্তিগত এবং জামা'তী– এ উভয় বিষয়ে উন্নতি লাভের জন্য সে ধরনের ব্যাকুলতা নিয়ে ও ব্যথাতুর হৃদয়ে দোয়া করার সামর্থ্য দান করুন; যেমনটি

কিনা আমরা নিজেদের জন্য করে থাকি আর রমযানেও করে এসেছি। অতএব আমি এ বিষয়ের প্রতি বার বার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং করতে থাকব যে, রমযানে আপনারা যেভাবে নিজেদের মসজিদগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন এবং ইবাদতের মাধ্যমে নিজেদের বাড়িকে সাজিয়েছেন, এখন সেগুলোকে সেভাবে চলমান রাখার অঙ্গীকার করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অমান্যকারীদের মতো আমরা কাযায়ে উমরী আদায় করব না অর্থাৎ (এটি যেন না হয় যে,) রমযান চলে গেছে তাই এখন ছুটি, আবার আগামী রমযান আসলে দেখা যাবে! এখন নামাযের বিছানা গুটিয়ে আলমারিতে বন্ধ করে রাখো! পবিত্র কুরআন কাপড়ে মুড়িয়ে মাচা কিংবা তাকের ওপর রেখে দাও! এরূপ করলে হবে না বরং আমাদেরকে সদা খোদাভীতির নিরিখে নিম্নের হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যারা যিকরে এলাহী করে এবং যারা করে না তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়। অর্থাৎ যে খোদাকে স্মরণ করে সে জীবিত এবং যে করে না সে মৃত।

পরেরটি মুসলিম শরীফের হাদীস যেখানে মহানবী (সা.) বলেন, যে বাড়িতে খোদা তা'লাকে স্মরণ করা হয় এবং যে বাড়িতে করা হয় না, সেগুলোর দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (মুসলিম, কিতাবুস্ সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া কাসরিহা বাব ইসতিহবাবু সালাতিন্ নাফিলাতি ফি বাইতিহি ...)

আরেকটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, "আমি তোমাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'লাকে বেশি বেশি স্মরণ করো। যিকর বা খোদাকে স্মরণ করার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনো ব্যক্তিকে তার শত্রু দ্রুতগতিতে পিছু ধাওয়া করছে আর সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেল। একইভাবে বান্দারা আল্লাহ্ তা'লার যিকর বা স্মরণ ব্যতীত শয়তানের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না।" (জামে তিরমিযী)

সুতরাং লক্ষ করুন! এই হাদীসের মাধ্যমে একদিকে যেমন এ সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্কে স্মরণকারী আল্লাহ্র আশ্রয় লাভ করবে এবং একটি সুরক্ষিত দুর্গে নিজেকে নিরাপদ রাখবে। রমযান মাসে যেভাবে অনেকে এটি অনুভবও করছেন এবং এটি প্রকাশও করে থাকেন যে, দোয়ার পর আমাদের এমনটি মনে হয়েছে যেন আমরা একটি সুরক্ষিত দুর্গে এসে গেছি। অপরদিকে এটিও স্মরণ রাখুন! আপনারা যখনই আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে অলসতা প্রদর্শন করবেন ও আল্লাহ্র স্মরণের বিষয়ে উদাসীন হবেন, তখনই শত্রু হামলা করবে এবং শয়তান আবার হামলে পড়বে। সুতরাং এই দুর্গে থাকতে হলে আপনাদের অবিরাম দোয়া এবং ইবাদত করা প্রয়োজন। দোয়া এবং ইবাদতে রত থাকলেই এ সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করতে পারবেন। আল্লাহ্র কাছে সাহায্য যাচনা করা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। রমযান মাসে আমরা যে-সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং যে-সব স্বাদ পেয়েছি, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য কামনা ও তাঁর অনুগ্রহ যাচনার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত।

হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা

বলেন, যে ব্যক্তি কোনো পুণ্যকর্ম করে তাকে আমি দশগুণ বরং এর চেয়েও বেশি পুরস্কার দেবো এবং সে যদি কোনো মন্দকর্ম করে তাহলে সেই মন্দের সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করব অথবা তাকে ক্ষমা করে দেবো। যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয় আমি তার দিকে এক গজ পরিমাণ অগ্রসর হই। আবার যে ব্যক্তি এক গজ পরিমাণ আমার নিকটে আসে আমি দুই গজ পরিমাণ তার নিকটে যাই এবং যে ব্যক্তি আমার নিকট হেঁটে আসে আমি তার দিকে ছুঁটে যাই। আবার কেউ যদি জগৎসম পাপ কাজ করেও আমার কাছে আসে, আমি তার প্রতি তত বড়ো ক্ষমা ও মার্জনাপূর্ণ আচরণ করব এবং তাকে ক্ষমা করে দেবো, তবে শর্ত হলো, সে যদি আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকে।" (মুসলিম, কিতাবুয্ যিকরি ওয়াদ্ দুআ, বাব ফাযলুয্ যিকরি ওয়াদ্ দুআ)

অতএব এখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন যে, এভাবে আমি ক্ষমা করে থাকি। এর অর্থ এই নয় যে, বার বার ক্ষমা চাইতে থাকবে আর মন্দকর্ম করতেই থাকবে এবং আমার অবাধ্য হতে থাকবে। তাই আমাদের মধ্যে যারাই এই রমযানকে পুঁজি করে আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমা ও মার্জনাকে কাজে লাগিয়েছে তাদের দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্ তা'লা যে-সব অনুগ্রহের দ্বার আমাদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন, ক্ষমা ও মার্জনার সে দ্বার বন্ধ হতে না দেওয়া বরং তেমনই গুরুত্বের সাথে এবং নিয়মিত আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ কামনা করে তাঁর দরবারে অবনত হওয়া। আল্লাহ্ তা'লার দ্বার যেন সর্বদা আমাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে আর আমাদের দুর্বলতার কারণে কাছের গন্তব্য কোথাও দূরে সরে না যায়। আমরা যেন পথিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে বসে না পড়ি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী ইবাদত করার সামর্থ্য দান করুন।

হযরত আমর বিন আবাসা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী (সা.)-কে এটি বলতে শুনেছেন, "আমাদের প্রতিপালক-প্রভু রাতের মধ্যবর্তী অংশে বান্দার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করেন। অতএব তোমরা যদি পারো তবে অবশ্যই এ সময়ে আল্লাহ্র যিকরকারী (স্মরণে রত) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।" (সুনান আত্ তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব ফি দুআইদ্ দাইফ)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় রমযানের রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায এবং নফল ইবাদত করার অভ্যাস আমাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই অভ্যাসটিকে আমরা যদি ধরে রাখি তাহলে হাদীস অনুযায়ী আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনেক কাছে অবস্থান করব। আল্লাহ্ তা'লার নিকটে থাকার অর্থ হলো, আপনারা সবকিছু পেয়ে গেছেন। আরেকটি বিষয় হলো, দোয়া এবং ইবাদতের সাথে জুমুআর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। জুমুআর দিনে আল্লাহ্ তা'লা এমন একটি মুহূর্ত রেখেছেন যখন বান্দার দোয়া গৃহীত হয়। আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে অর্থাৎ ইসলামের পুনর্জাগরণের এই যুগের সাথে জুমুআর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই জুমুআর দিনটিকেও আমাদের যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা উচিত। জামা'তি এমন কিছু দোয়া রয়েছে যেগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। নফল ইবাদতের জন্য বাড়ির সকল সদস্যের জাগা উচিত। শত চেষ্টা করে হলেও জুমুআর নামাযের জন্য সকল পুরুষের অবশ্যই যাওয়া উচিত। এছাড়া মসজিদগুলোতে জুমুআর দিনের উপস্থিতিও রমযানের মতোই থাকা উচিত।

যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, "জুমুআর দিন এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'লার নিকট কল্যাণকর যা-ই কামনা করে, আল্লাহ্ তা দান করেন এবং সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।" (মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ বাব ফিস্ সাআতিল্লাতি ফি ইয়াওমিল জুমুআ)

অতএব দোয়ার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। কে জানে কখন সেই মুহূর্ত এসে যায় যা দোয়া গৃহীত হবার সেই সময় এবং দোয়া কবুলের সেই মুহূর্ত হবে। সুতরাং পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যাকুল লোকেরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে ভাবাবেগের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তাদেরকে আমি বলব, জুমুআর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে নিজেদের দুঃখকষ্টে ভরা আবেগ প্রকাশ করুন। পরিপূর্ণ আস্থার সাথে যদি তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করেন এবং তাঁর নিকট অনুগ্রহ যাচনা করতে থাকেন তবে তিনিও স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনাদের দোয়া শুনবেন এবং আপনাদের চাহিদা পূরণ করবেন। তিনি আপনাদের দোয়া গ্রহণ করবেন এবং (সবকিছু) সহজ করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা করো, কেননা তিনি তাঁর নিকট চাওয়া পছন্দ করেন। সর্বোত্তম ইবাদত হলো, স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করা। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব ফি ইনতিযার...)

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিকট চাওয়া বা যাচনা করা পছন্দ করেন। কিন্তু যাচনাকারী যেন চাইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, অধৈর্য না হয়, কেননা আমি যেভাবে পূর্বেই বলেছি, একবার ফেঁসে গেলে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন আঙ্গিকে দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য আমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন। এ সবকিছু তিনি দেখিয়ে থাকেন আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত ও আশ্বস্ত করার জন্য। বান্দারা যেন আশ্বস্ত হয় যে, দোয়ার বদৌলতে খোদা তা'লা যদি এসব কাজ করতে পারেন যার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে অর্থাৎ আমাদের দোয়াসমূহ গ্রহণ করার মাধ্যমে তিনি সেগুলো অর্জন করার কিংবা সেই কাজগুলোকে সম্পন্ন করার সামর্থ্য দান করেছেন তাহলে বাহ্যত যে-সব কাজ কঠিন এবং অনেক বড়ো বলে মনে হয় সেগুলোও করে দেবার ক্ষমতাও আল্লাহ্র মাঝে রয়েছে। এ কারণে ধৈর্য ও মনোবল নিয়ে দোয়া করতে থাকা উচিত আর কখনো ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "দোয়া হলো ইবাদতের সারবস্তু বা প্রাণ।" (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত বাব মা জাআ ফি ফাযলিদ্ দুআ)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "দোয়া এমন বিপদাপদ থেকে রক্ষার কাজে আসে যা এসে গেছে এবং এমন বিপদাপদ থেকেও– যা এখনো আপতিত হয় নি। অতএব হে আল্লাহ্র বান্দারা! দোয়া করা নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও।" (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত বাব মা জাআ ফি ফাযলিদ্ দুআ)

অতএব এই হাদীস অনুযায়ীও আমাদেরকে দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও জামা'তী উভয় প্রকার দুশ্চিন্তা এবং

বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন। বর্তমানে আমরা যে সমস্যার মাঝে দিনাতিপাত করছি, আল্লাহ্ তা'লা তা দ্রুত নিরসন করুন। তিনি যেন আমাদেরকে আর কোনো বিপদ ও পরীক্ষায় নিপতিত না করেন এবং সকল অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই আমাদেরকে বিরুদ্ধবাদীদের বিপরীতে বিজয় দান করুন। কিন্তু শর্ত সেটিই, অর্থাৎ একটি ব্যাকুলতাপূর্ণ অবস্থা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে এবং এটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই লাভ হয়ে থাকে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করে যে, আমি কোথায়– তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তিনি তোমাদের অতি নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনে থাকি। অতএব তাদের উচিত দোয়ার মাধ্যমে আমার সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যেন তারা সফল হয়।" [আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ. ১৩৯; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৪৮]

আল্লাহ্ তা'লার একথার প্রতি আমরা যদি বিশ্বাস স্থাপন না করি তাহলে আমরা চরম দুর্ভাগা সাব্যস্ত হবো। আমরা যদি আল্লাহ্র নিশ্চয়তা প্রদান সত্ত্বেও তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ না করি, তাঁকে সন্ধান না করি, রমযানে যে কৃপা তিনি আমাদের প্রতি বর্ষণ করেছেন সেগুলো যদি ভুলে যাই এবং ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করি তাহলে এটিই অবিশ্বাস। আল্লাহ্র কাছে একান্ত মিনতি, আমাদের মধ্যে কেউ যেন এমন আচরণ না করে বরং ঈমানের ক্ষেত্রে যেন আমাদের ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ হয়, উন্নয়নের দৃশ্য চোখে পড়ে এবং আগত প্রতিটি দিন যেন আরো বেশি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রদ হয়। আল্লাহ্ তা'লা যে আমাদেরকে রমযানের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন, এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমরা যেন তাঁর দরবারে অবনত থাকি এবং নিজেদের সকল চাহিদা আমাদের প্রিয় খোদার সামনে উপস্থাপন করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদা তা'লার পবিত্র বাণী বা কুরআন চারটি কারণে দোয়া করাকে মুসলমানদের জন্য আবশ্যক করেছে। আর তা হলো, প্রথমত সবসময় এবং সর্বাবস্থায় খোদার দরবারে বিনত হবার ফলে যেন তওহীদের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা লাভ হয় কেননা খোদার কাছে প্রার্থনা করার অর্থ হলো, একথা স্বীকার করা যে, একমাত্র খোদা-ই সকল অভিষ্টে পৌঁছে দিতে পারেন। ২) দোয়া গৃহীত হওয়া ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবার ফলে যেন ঈমান দৃঢ় হয়। ৩) অন্য কোনো আঙ্গিকে যদি খোদার অনুগ্রহ লাভ হয় তাহলে যেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বৃদ্ধি ঘটে। ৪) ইলহাম ও স্বপ্নে যদি দোয়া গৃহীত হবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় আর সেভাবেই তা প্রকাশ পায় তাহলে ঐশী তত্ত্বজ্ঞান লাভে যেন আরো উন্নতি সাধিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে যেন বিশ্বাস আর বিশ্বাসের মাধ্যমে ভালোবাসা এবং ভালবাসার কল্যাণে সকল পাপ ও আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, যা প্রকৃত পরিত্রাণের ফল। [আইয়ামুস্ সুল্হ, পৃ. ১৪; রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৪, পৃ. ২৪২; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৭২]

তিনি (আ.) বলেন, "পৃথিবীতে এমন কোনো নবী আসেন নি যিনি দোয়ার শিক্ষা দেন নি। দোয়া এমন একটি বিষয় যা দাস ও প্রভুর মাঝে একটি সম্পর্ক-বন্ধন রচনা করে (অর্থাৎ

বান্দা ও খোদার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করে)। সে পথে পদচারণা অনেক কঠিন কাজ, কিন্তু দোয়া এমন এক মাধ্যম যে, যারা পা বাড়ায় তা তাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দেয়। ... মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়ায় রত থাকে তখন সে অন্য এক মানুষে পরিণত হয়। সমস্ত আধ্যাত্মিক পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়ে সে একপ্রকার প্রশান্তি ও স্বাদ লাভ করে। সকল প্রকার বিদ্বেষ ও লোক-দেখানো কার্যকলাপ হতে পৃথক হয়ে নিজের পথের সমস্ত কষ্ট-কাঠিন্যকে সে বরণ করে নেয়। যে কষ্ট অন্যরা সহ্য করে না বা করতে পারে না, একমাত্র খোদা তা'লার জন্য অর্থাৎ এই ভেবে যে, খোদা সন্তুষ্ট হবেন সেসব কষ্ট-কাঠিন্য তারা সহ্য করে। তখন রহমান ও রহীম খোদা যিনি মূর্তিমান দয়া, তার দিকে দয়ার দৃষ্টি দেন এবং তার সমস্ত দুঃখকষ্ট ও বিষণ্নতাকে আনন্দে পরিবর্তন করে দেন।" [আল-হাকাম, খণ্ড: ০১, সংখ্যা: ১৭, ১০ মে ১৯০১, পৃ. ৩-৪; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ৪৫২]

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের একটি শক্তিশালী প্রমাণ হলো, দোয়া। অতএব আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে বলেন–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ. اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ আমার বান্দারা যখন তোমার নিকট প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ কোথায় এবং তাঁর (অস্তিত্বের) কী প্রমাণ আছে? তখন তুমি বলো, তিনি অতি নিকটে আর এর প্রমাণ হলো, কোনো প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। এই সাড়াদান কখনো সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে লাভ হয় আবার কখনো কাশফ কিংবা ইলহামের মাধ্যমে। এছাড়া দোয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার কুদরত ও শক্তিমত্তা প্রকাশ পায় এবং জানা যায় যে, তিনি এমন ক্ষমতাবান খোদা যিনি সকল সমস্যা দূর করে থাকেন। সর্বোপরি দোয়া অনেক বড় সম্পদ এবং শক্তি। কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার বিষয়ে প্রেরণা জোগানো হয়েছে এবং এমন লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে যারা দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যাবলি থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। নবীদের জীবনের মূল এবং তাঁদের সফলতার সত্য ও প্রকৃত মাধ্যম হলো এই দোয়া। অতএব আমার উপদেশ হলো, নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মগত শক্তি বৃদ্ধির জন্য দোয়ায় রত থাকো। দোয়ার মাধ্যমে এমন পরিবর্তন সাধিত হবে যার ফলে শেষ পরিণতি আল্লাহ্র কৃপায় উত্তম হবে।" [আল-হাকাম, খণ্ড: ০৯, সংখ্যা: ০২, ১৭ জানুয়ারি ১৯০৫, পৃ. ৩; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৫১]

অতএব আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নতি নির্ভর করে দোয়ার ওপর। এ কারণে এক্ষেত্রে কখনো অলস হবেন না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশনা অনুযায়ী দোয়া করার সামর্থ্য দান করুন। আমরা যেন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করি এবং আমাদের কর্মে এমন পরিবর্তন আনয়ন করি যার ফলে খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন। আমাদের আমিত্ব যেন কখনো আমাদেরকে তাকওয়া থেকে দূরে নিয়ে না যায় আর প্রকৃত তাকওয়া আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য যাচনার মাধ্যমে বিনয় প্রদর্শনের ফলেই সৃষ্টি হয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন বলে দাও), আমি অতি নিকটে। প্রার্থনাকারী যখনই প্রার্থনা করে আমি তাদের প্রার্থনার উত্তর দেই। কিছু মানুষ খোদা তা'লার সত্তায় সন্দেহ পোষণ করে থাকে। অতএব আমার অস্তিত্বের প্রমাণ হলো, তোমরা আমাকে ডাকো এবং আমার নিকট সাহায্য কামনা করো, ফলে আমিও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো, উত্তর দেবো এবং তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা যদি এটি বলো যে, আমরা তো ডাকি কিন্তু তিনি উত্তর দেন না, এর উত্তর হলো, দেখো! তোমরা একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি অনেক দূরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে ডাকো আর তোমাদের কানেও যদি সমস্যা থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি দূর থেকে তোমাদের ডাক শুনে সাড়া তো দেবে ঠিকই, কিন্তু বধির হবার কারণে তোমরা তা শুনতে পাবে না। অতএব তোমাদের মধ্যকার পর্দা, প্রতিবন্ধকতা ও দূরত্ব যতই দূর হতে থাকবে ততই তোমরা তার শব্দ শুনতে পারবে। পৃথিবী সৃষ্টি অবধি এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, খোদা তা'লা নিজের বিশেষ বান্দাদের সাথে বাক্যালাপ করে থাকেন। এমনটি যদি না হতো তবে খোদার অস্তিত্বের বিষয়টি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ লাভের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো তাঁর আওয়াজ শুনতে পাওয়া অথবা তাঁকে দেখতে পাওয়া কিংবা তাঁর সাথে বাক্যালাপ হওয়া। আর বর্তমানে কথোপকথনই দেখার কাজ দিচ্ছে। হয় কথা বলা, নয়তো দেখার সুযোগ পাওয়া। তবে একথা সত্য যে, আল্লাহ্ এবং প্রার্থনাকারীর মধ্যে যতক্ষণ কোনো পর্দা বিরাজমান থাকবে ততক্ষণ আমরা শুনতে পাবো না, কিন্তু মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধকতা যখন দূরীভূত হবে তখন তাঁর আওয়াজও শোনা যাবে।"

যাহোক, এ ধরনের বিভিন্ন চিঠিপত্র আমি পেয়ে থাকি, যা থেকে এটি বুঝা যায় এবং যা আমি পূর্বেও বলেছি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় রমযান মাসে অনেকের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মেছে। অনেকের প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হওয়া আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এখন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে আরো পরিশ্রমের প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষ্যমতে, এই পর্দাসমূহ পরিপূর্ণরূপে দূর করতে ইবাদতের প্রতি সেভাবে যথারীতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন যেভাবে রমযান মাসে আমাদের সকলের ছিল। অতএব আমাদের জামা'তের মধ্যে এমন প্রার্থনাকারীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে ততই জামা'তের আধ্যাত্মিক মান উন্নত হবে আর তা অব্যহত থাকবে। আপনাদের দোয়ার ফলে যুগ-খলীফাও সাহায্য পেতে থাকবেন আর এ দুয়ের মিলন যখন প্রবল বেগে ধাবমান স্রোতস্বিনীতে রূপান্তরিত হবে তখন বিজয়ের দ্বারসমূহও অবারিত হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। অতএব আমাদের অস্ত্র হলো 'দোয়া' যার মাধ্যমে আমরা বিজয় লাভ করব, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আশু এই মান অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমীন।

(৩৩)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ০৫ ডিসেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ০৫ ফাতাহ্ ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

(আলে-ইমরান: ১৬০)

অর্থ: অতএব আল্লাহ্‌র পরম কৃপায় তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ। আর তুমি যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। অতএব তুমি তাদের মার্জনা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। এরপর তুমি যখন (কোনো বিষয়ে) সংকল্পবদ্ধ হও, তখন আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। (আলে-ইমরান: ১৬০)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ব্যবস্থাপনা এমন এক ব্যবস্থাপনা যা প্রত্যেক আহমদীকে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রেমপ্রীতির ডোরে বেঁধে রাখে। ছেলেরা যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হয় তখন তাকে একটি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয় আর সে 'মজলিস আতফালুল আহমদীয়া'-র সদস্য হয়ে যায়। এক মেয়ে যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হয় তখন সে 'নাসেরাতুল আহমদীয়া'-র সদস্য হয়ে যায়, যেখানে তাদেরকে একটি সংগঠনের অধীনে কাজ করার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর তাদেরই মধ্য থেকে তাদের 'সায়েক' (তথা পরিচালক) বানিয়ে কর্মকর্তার প্রতি আনুগত্যের চেতনা সৃষ্টি করা হয়। পনেরো বছর বয়সে উপনীত হলে ছেলেরা 'খোদ্দামুল আহমদীয়া' এবং মেয়েরা 'লাজনা ইমাইল্লাহ্' সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়। একটি সুসংগঠিত অবকাঠামোর অধীনে শৈশব থেকে প্রশিক্ষণ লাভকারী ছেলেমেয়েরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন এসব পবিত্র সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হবার কল্যাণে জামা'তী ব্যবস্থাপনা এবং রীতিনীতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। বয়স বাড়ার এক পর্যায়ে এসব ছেলেমেয়ে এমন বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছে যখন তাদের মাঝে চেতনাবোধ জাগ্রত হয় আর এ কারণে পনেরো বছর বয়সের পর তারা নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকেই নিজেদের কর্মকর্তা বা নেতা নির্বাচন করে আর তাদের অধীনে তাদের প্রশিক্ষণ হতে থাকে এবং ব্যবস্থাপনা এগিয়ে যেতে থাকে। অতএব আমি যেমনটি বলেছি, পনেরো বছর বয়সের পরে গিয়ে লাজনা কিংবা

খোদ্দাম সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এরা নিজেদের কর্মকর্তা নিজেদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করে থাকে আর এরপর কেন্দ্রীয় দিকনির্দেশনার আলোকে তরবিয়তী দায়িত্বসহ তারা নিজেরাই বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব বাল্যকাল থেকেই এমন প্রশিক্ষণের কারণে এবং এমন অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণের কারণে তাদের প্রশিক্ষণ হয়ে যায় আর এরপর এসব শিশুই যখন বড়ো হয়ে জামা'তী ব্যবস্থাপনার পুরোপুরি জড়িয়ে যায় তখন তারা জামা'তী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অধিক কল্যাণকর ও উপকারী সত্তা প্রমাণিত হয় এবং এই ব্যবস্থাপনার একটি অংশ হয়ে যায়। এসব অঙ্গসংগঠনের অংশ হবার মাধ্যমে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই মূল জামা'তী ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে যায়। যদিও মূল জামা'তী নেযাম বা ব্যবস্থাপনাই সর্বাগ্রে এবং অগ্রগণ্য, কিন্তু তাতে প্রত্যেক শিশু ও যুবকের সেভাবে পুরোপুরি সংশ্লিষ্টতা থাকে না যেভাবে প্রাথমিকভাবে অঙ্গসংগঠনসমূহে হয়ে থাকে এবং তা হওয়া সম্ভবও নয়। এ কারণেই হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) দূরদৃষ্টির ভিত্তিতে অঙ্গসংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং জামা'তের প্রতি এটি তাঁর অনেক বড়ো একটি অনুগ্রহ। যেমনটি আমি বলেছি, এ কারণেই জামা'তের প্রতিটি শিশুর মাথায় প্রথম থেকেই জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি একটি মর্যাদা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এই মর্যাদা ও সম্মানবোধ নিয়েই তারা বড়ো হয়। যেহেতু শুরু থেকেই জামা'তের ব্যবস্থাপনায় প্রেমপ্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা এবং মিলেমিশে কাজ করার চেতনা নিয়ে সেই শিশু বড়ো হতে থাকে আর এই প্রশিক্ষণের ফলে যুগ-খলীফার সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে ও হয়ে যায়, ফলে জামা'তের প্রতিটি সদস্য জামা'তী কাজে অধিকহারে অংশগ্রহণ করে এবং সানন্দে স্ব স্ব কর্মকর্তাদের প্রতি আনুগত্যও প্রদর্শন করে। এর কারণ হলো, বাল্যকাল থেকেই জামা'তী নেযাম বা ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে প্রাপ্ত ধারণা এবং যুগ-খলীফার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ভালোবাসার কারণে সে তাতে একান্ত অনুগত হয়ে যায় আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের ব্যবস্থাপনা যেহেতু সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং যুগ-খলীফার সরাসরি দৃষ্টি এর প্রতি থাকে তাই জন্মগত আহমদীদের পাশাপাশি নবাগত অর্থাৎ নও-মুবাঈন সদস্যরাও অতি দ্রুত নেযাম বা ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

জামা'ত ক্রমশ যত বড়ো হচ্ছে ততই জামা'তী ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা এবং পদধারীদের দায়দায়িত্বও বেড়ে চলেছে। তাই তসবীহ এবং ইস্তিগফারের প্রতি তাদের অনেক বেশি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াসতাগফিরহ্-এর যে আদেশ রয়েছে সেদিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এ আদেশটি তাদেরকে আরো বেশি মনোযোগী করছে কিংবা কমপক্ষে মনোযোগী করা উচিত যে, নিজেদের স্বভাবে নম্রতা সৃষ্টি করার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। নিজেদের দায়িত্বাবলির প্রতি মনোযোগী হবার চেতনাকে আরো সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। জামা'তী দায়িত্ব পালনের সময় নিজেদের আমিত্ব এবং কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগ দেবার প্রয়োজন রয়েছে বরং পূর্বের চেয়ে বেশি প্রয়োজন রয়েছে। তুচ্ছ বিষয়াদি নিয়ে রেগে যাবার অভ্যাস কর্মকর্তাদের পরিত্যাগ করতে হবে এবং করা উচিত।

জামা'তের সদস্যদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি, তাদের কথা আগ্রহ ও মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাদের জন্য দোয়া করার অভ্যাস করা উচিত। কেবল তবেই মনে করা যেতে পারে যে, কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্বাবলি পূর্ণরূপে পালন করছেন কিংবা অন্ততপক্ষে পালন করার চেষ্টা করছেন।

স্টেজে বসা কিংবা দম্ভভরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য আহমদীয়া জামা'তে পদাধিকারী নির্বাচন করা হয় না, বরং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বানানো হয় যে, জাতির নেতা হলো জাতির সেবক। জামা'তকে একতাবদ্ধ রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে একটি পথনির্দেশক নীতি উক্ত আয়াতে বর্ণনা করেছেন যা আমি তিলাওয়াত করেছি। মহানবী (সা.)-এর এ বৈশিষ্ট্য ছিল, মানুষ তাঁর আশপাশে সমবেত হতো এবং তাঁর নিকটে আসত কেবল মানুষের জন্য তাঁর হৃদয়ের নম্রতা ও ভালোবাসার আবেগের কারণে; তাহলে আমি এবং আপনারা, অর্থাৎ আমরা কী এমন হয়ে গেছি যে, মানুষের প্রতি প্রেম-ভালোবাসাপূর্ণ আবেগ প্রদর্শন না করেই এই আশা করব যে, মানুষ আমাদের প্রতিটি কথা মান্য করবে? আমাদের উচিত স্বীয় মনিবের অনুসরণে মানুষের সাথে আরো বেশি বিনয়, নম্রতা এবং প্রেম-ভালোবাসার ব্যবহার করা। কেননা যুগ-খলীফার পক্ষে প্রতিটি দেশে, প্রতিটি শহরে ও প্রতিটি এলাকায় গিয়ে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া কঠিন কাজ। জামা'তী এই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে, আর আমি যেমনটি বলেছি, এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা অনেক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত পদধারী, তারা অঙ্গসংগঠনের পদাধিকারী হোক বা জামা'তী, যুগ-খলীফার প্রতিনিধিরূপে নিজ নিজ অঞ্চলে তারা নিযুক্ত আছেন আর তাদের কাছে এই প্রত্যাশা বরং এ সুধারণা রাখা হয় যে, তারা যুগ-খলীফার প্রতিনিধি। তারা যদি নিজ এলাকার আহমদীদের অধিকার প্রদান না করে, তাদের সুখ-দুঃখের সাথি না হয়, তাদের সাথে প্রেম-ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ না করে, কিংবা যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে কোনো রিপোর্ট চাওয়া হলে অনুসন্ধান না করেই পূর্ণ রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয় অথবা ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতার কারণে, যা আল্লাহ্ করুন যেন আমাদের কোনো পদাধিকারীর মাঝে না থাকে, ভুল রিপোর্ট দিয়ে দেয় তাহলে এমন সকল পদাধিকারী পাপাচারে লিপ্ত। অতি সম্প্রতি পূর্ণ অনুসন্ধান ছাড়াই কতিপয় আহমদী সম্পর্কে একটি রিপোর্ট স্থানীয় এক জামা'তের পক্ষ থেকে কেন্দ্রে আসে যে, তারা জামা'তের অমুক অমুক নীতিবহির্ভূত কাজ করেছে এবং জামা'তের বিধান অনুযায়ী এর শাস্তি হলো, জামা'তের নেযাম বা ব্যবস্থাপনা থেকে বহিষ্কার। কেন্দ্রীয় দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাকে লেখা হলে সেই ব্যক্তিবর্গের জামা'তের নেযাম বা ব্যবস্থাপনা থেকে বহিষ্কারের শাস্তি হয়ে যায়। যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তারা হইচই আরম্ভ করে যে, এ কাজের সাথে তো আমাদের কোনো সম্পৃক্ততাই নেই, আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং কোনোভাবেই এতে জড়িত নই। অতঃপর কেন্দ্র স্বয়ং নতুন করে তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং অনুসন্ধানে জানা যায় যে, জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব পূর্ণ অনুসন্ধান না করেই রিপোর্ট করেছিলেন আর এখন তিনি বলছেন, সে নামগুলো ভুলবশত চলে গিয়েছে। একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে এত বড়ো শাস্তির সম্মুখীন করছেন আবার নিজে মনভোলা সেজে বলছেন, ভুলবশত নাম চলে গিয়েছে; এ যেন ছেলেখেলা! আমি কেন্দ্রকে

বলে দিয়েছি, যেন দ্রুত এমন দায়িত্বহীন প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা হয় আর ভবিষ্যতেও যে-ই এমন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেবে সে এরপর সারাজীবন কোনো জামা'তী দায়িত্ব পাবে না। এমন ব্যক্তি আমাদেরকেও পাপের ভাগী করেছে। আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করুন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মা'কেল বিন ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'লা যাকে মানুষের তত্ত্বাবধায়ক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত নিযুক্ত করেছেন, সে যদি মানুষের দেখাশোনা করা, নিজের দায়িত্ব পালন এবং তাদের মঙ্গল কামনায় অবহেলা করে তাহলে তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেবেন এবং তাকে বেহেশতে যেতে দেবেন না। (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, বাব ফাযিলাতুল ইমামুল আদিল ...)

আরো একটি হাদীস রয়েছে। ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীর হলেন তত্ত্বাবধায়ক আর পুরুষ নিজ বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক, মহিলারাও নিজ স্বামীর বাড়ির এবং সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক। অতএব তোমাদের মধ্যে সকলেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে কীভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছে।

অতএব সকল কর্মকর্তাকে নিজ নিজ গণ্ডিতে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি পূর্বে অঙ্গসংগঠনসমূহেরও কথা বলেছি। কখনো কখনো কিছু রিপোর্ট অঙ্গসংগঠনসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে এসে থাকে। অতএব প্রতিটি স্তরে যদি তত্ত্বাবধানের এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত না হয় তাহলে মহানবী (সা.) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করো তাহলে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হওয়া এবং জিজ্ঞাসিত হওয়া ভীষণ ভীতিকর। কিন্তু এখানে যা বলা হয়েছে তা হলো, এটি মনে কোরো না যে, তোমরা জিজ্ঞাসিত হলেও হয়ত নম্র ব্যবহার করা হবে আর তোমরা বেঁচে যাবে; বরং বলা হয়েছে, এমন লোকদের জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এটি অনেক বড়ো একটি সতর্কবাণী এবং ভয়ের ব্যপার যা শুনে শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা সকল পদধারীকে যথাযথভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য দান করুন।

একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অঙ্গসংগঠনের অর্থাৎ লাজনা, আনসার ও খোদ্দামের আমেলা হোক বা জামা'তের আমেলা হোক, কারো সম্পর্কে যখন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় তখন কোনো তাড়াহুড়া করা উচিত নয়; যদিওবা সে ব্যক্তির পূর্ববর্তী আচরণ সম্পর্কে জানা থাকে যে, সে এমন কাজ করতে পারে। (এ ভিত্তিতে বোলো না যে,) তাকে শাস্তি দিয়ে দাও কিংবা শাস্তির সুপারিশ প্রেরণ করো। না, বরং যে বিষয়টি আমেলার সম্মুখে উত্থাপিত হয়েছে সেটির পূর্ণ অনুসন্ধান করুন। বৈধ কোনো সুবিধা যদি পাবার থাকে তাহলে তা তারই পাওয়া উচিত, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। সেই ব্যক্তি যদি অপরাধী হয়ে থাকে তার বোধোদয় ঘটবে যে, যদিও আমি অপরাধ করেছি কিন্তু

কেবল সন্দেহের সুযোগে আমাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে তার সংশোধনও হতে পারে কিংবা কমপক্ষে মজলিসে আমেলা বা এমন কর্মকর্তারা এ হাদীসের ওপর আমলকারী হবে যা হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, মুসলমানদের শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো। তাকে শাস্তি না দিয়ে যদি পারা যায় তাহলে বিষয়টি সেভাবেই নিষ্পত্তি করার কথা ভাবো। কেননা শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে ইমামের ভুল করার চেয়ে ক্ষমা ও মার্জনার ক্ষেত্রে ভুল করা উত্তম। (তিরমিযী, আবওয়াবুল হুদুদ, বাব মা জাআ ফি দারইল হুদুদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সমষ্টিগত বিষয়ের দায়িত্বে থাকে তার চাহিদা ও উদ্দেশ্যাবলি আল্লাহ্ তা'লা ততক্ষণ পূর্ণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মানুষের অভাব মোচন না করবে। (তারগীব ও তারহীব, কিতাবুল কাযা বাব তারগীবু মিন ওয়ালিয়্যি ...)

অতএব উক্ত হাদীসে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, পদাধিকারী হিসেবে তোমাদের ওপর অনেক বড়ো দায়িত্ব বর্তায়, অনেক বড়ো দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তাই কেবল এটি ভেবো না যে, পদধারী হয়ে আমেলায় বসে কেবল যে-সব ঝগড়াবিবাদ কিংবা লেনদেন-সংক্রান্ত বিষয় সামনে আসে সেসবের সমাধান করাই তোমাদের কাজ, বরং প্রত্যেক পদাধিকারীর দায়িত্ব হলো, সে যেন তার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে। প্রত্যেক সেক্রেটারির জন্য নিজ দায়িত্বাবলি পালন করা আবশ্যক। সেক্রেটারি উমুরে আম্মা-র কাজ কেবল এটি নয় যে, পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করাবেন অথবা কারো কোনো ভুল আচরণ দেখলে সে সম্পর্কে কেন্দ্রে রিপোর্ট করবেন। জামা'তের এমন বেকার সদস্য, যাদের আয়-উপার্জন নেই, তাদেরকে জীবিকার সন্ধানে সাহায্য করাও তার কাজ অর্থাৎ খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা এবং জীবিকার ব্যবস্থা করাও তার কাজ। কিছু মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ব্যবসায়িক মনমানসিকতা রাখে। এমন লোকদের তালিকা প্রস্তুত করুন। তাদের মধ্যে যদি যোগ্যতা দেখতে পান তাহলে সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য করে তাদের দ্বারা ছোটোখাটো ব্যাবসাও শুরু করানো যেতে পারে। তাদের মাঝে যদি যোগ্যতা থেকে থাকে তাহলে সেই ব্যাবসা সফলও হবে এবং ধীরে ধীরে বড়ো ব্যবসায়ও রূপ নিতে পারে। পাকিস্তানেও আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যারা সাইকেলে ফেরি করে, কিংবা কোনো দোকানের সামনে বসে ঝুড়ি রেখে অথবা কাপড়ের কিছু থান রেখে ব্যাবসা আরম্ভ করেছে আরএখন দোকানের মালিক। অতএব এমন লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এভাবে সাহস যোগানো ও উৎসাহ প্রদান করা এবং একথা বলা যে, কোনো না কোনো কাজে লেগে যাও– এটিও জামা'তী ব্যবস্থাপনা অথবা জামা'তী ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্ট পদাধিকারী অর্থাৎ সেক্রেটারি উমুরে আম্মারই কাজ।

তারপর রয়েছে সেক্রেটারি তালীম। সাধারণত আমাদের জামা'তগুলোতে সেক্রেটারি তালীমগণ ততটা কর্মতৎপর হন না যতটা তাদের কাছে আশা করা হয় অথবা কোনো পদাধিকারীর কাছে আশা করা যেতে পারে। একথা আমি ধারণাবশত বলছি না, প্রতিটি

জামা'ত নিজেদের বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবে যে, কোনো কোনো সেক্রেটারি সারা বছর কোনো কাজই করে না। উদাহরণস্বরূপ, আমি সেক্রেটারি তালীমেরই কথা বলছি। সেক্রেটারি তালীমের কাজ হলো, নিজ জামা'তের এমন ছেলেমেয়েদের তালিকা প্রস্তুত করা যারা পড়াশোনা করছে আর যারা স্কুলে যাবার বয়সে উপনীত হয়েছে অথচ স্কুলে যাচ্ছে না। অতঃপর এর কারণ খুঁজে বের করা যে, তারা কেন স্কুলে যাচ্ছে না? আর্থিক সমস্যা নাকি কেবল অবহেলার কারণে যাচ্ছে না। এক আহমদী শিশুর অবশ্যই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত যে, তার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানের প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এই শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, সে যেন অবশ্যই মেট্রিক পাশ করে, বরং এখন তো এই মানদণ্ড আরো উঁচু হয়েছে আর আমি বলব, প্রত্যেক আহমদী ছেলেমেয়ের অবশ্যই এফ.এ. (অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট) করা উচিত।

আফ্রিকার জন্য পড়াশোনার ন্যূনতম মানদণ্ড হলো, মাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা জি.সি.এস.সি, যা ইউকে এবং আফ্রিকা উভয়স্থানে রয়েছে। একইভাবে ভারত, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশে, এমনকি এখানেও আমি দেখেছি যে, ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু কিছু এমন ছেলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং ন্যূনতম এই মান অবশ্যই অর্জন করা উচিত, অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের এ পর্যন্ত শিক্ষা-সুবিধা রয়েছে কিন্তু তাদের আরো বেশি পড়াশোনা করা উচিত। সেক্রেটারি তালীমগণের নিজ নিজ জামা'তের ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকা উচিত। আমি যেমনটি পূর্বেই বলেছি, এই ছেলেমেয়েরা যদি আর্থিক কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহলে জামা'তকে অবহিত করুন। জামা'ত সাধ্যমতো তাদের জন্য ব্যবস্থা করবে, ইনশাআল্লাহ্। কখনো কখনো এমনও হয় যে, কিছু ছেলেমেয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বা জেনারেল লাইনে আগ্রহ থাকে না। এতে যদি তাদের আগ্রহ না থাকে তাহলে কোনো কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। মোটকথা, কোনো অবস্থাতেই কোনো আহমদী ছেলেমেয়ের সময় নষ্ট হওয়া উচিত নয়। এরপর এমন শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের তালিকা প্রস্তুত করুন যারা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়, যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু আর্থিক অসংগতির কারণে পড়তে পারছে না। অতএব যতটা সম্ভব জামা'ত এমন সদস্যদের সাহায্য করবে, কিন্তু অবশ্যই সেক্রেটারি তালীমদের এ বিষয়ে সক্রিয় হতে হবে এবং হওয়া উচিত। অতএব সেক্রেটারি তালীমের যেসব দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ আমি উপস্থাপন করলাম মাত্র। এছাড়াও আরো অনেক দায়িত্ব রয়েছে। স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল সেক্রেটারি তালীম যদি সোচ্চার হয়ে যায় এবং সক্রিয় হয় তাহলে যে-সব বিষয়ের কথা আমি উল্লেখ করলাম এগুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো জানা সম্ভব। তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং এমন শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা সাহায্য প্রদান করে উচ্চশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

এছাড়া রয়েছে সেক্রেটারি তরবিয়ত কিংবা ইসলাহ ও ইরশাদ। তাদেরও অনেক কর্মঠ হওয়া প্রয়োজন। সেক্রেটারি তরবিয়তগণ যাদের কোনো কোনো স্থানে ইসলাহ ও ইরশাদ

নামে অভিহিত করা হয়, তারা যদি নিজেদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সেভাবে কাজ করে যেমনটি করা উচিত, তাহলে উমুরে আম্মা-র সমস্যাদিও এই তরবিয়তের ফলে সমাধান হয়ে যাবে, তালীম বিভাগের সমস্যাদিও অনেকাংশে কমে যাবে এবং রিশতানাতার সমস্যাদিও বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এসব বিভাগ পরস্পরের সাথে এতটাই সম্পৃক্ত যে, তরবিয়ত বিভাগের সক্রিয়তার ফলে অনেক বিভাগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে যায় আর এর ফলে জামা'তের সামগ্রিক আধ্যাত্মিকতার সূচক উন্নীত হয়। অতএব উক্ত হাদীস অনুযায়ী মানুষের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার অর্থ হলো, যে বিভাগের দায়িত্বভার আপনার ওপর অর্পণ করা হয়েছে তা ভালোভাবে উপলব্ধি করুন এবং সঠিকভাবে পালন করুন। প্রত্যেক কর্মকর্তা যখন নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্বসমূহ সঠিকরূপে পালন করবে তখন মানুষের হৃদয়ে আপনাদের জন্য আরো বেশি সম্মান ও মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাবে; আর আমি যেমনটি বলেছি, এতে জামা'তের সার্বিক মানও উন্নত হবে।

এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর একটি উদ্ধৃতি রয়েছে যা আমি আপনাদের সামনে পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি (রা.) বলেন, "পৃথিবীতে সর্বোত্তম সংস্কারক তাকেই গণ্য করা হয় যিনি তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজ অনুসারীদের মাঝে এমন প্রেরণা সৃষ্টি করেন যার ফলে তার আদেশ মান্য করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায় এবং তারা (তার কথা মানতে গিয়ে) নিজেদের হৃদয়ে কোনো বোঝা অনুভব করে না। এ কারণেই পবিত্র কুরআন অন্যান্য ঐশী গ্রন্থাবলির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। অন্যান্য ঐশী কিতাব কেবল একথা বলে যে, এটা করো আর সেটা করো, কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে যে, এ কারণে করো এবং এজন্য করো। অর্থাৎ কুরআন কেবল নির্দেশ প্রদান করে না, বরং সেই নির্দেশ মান্য করার জন্য মানুষকে অণুপ্রাণিতও করে। অতএব বোঝানো এবং বুঝিয়ে স্বজাতির মানুষকে উন্নতির ময়দানে সহযাত্রী হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হলো সফলতার মূল রহস্য। আর পবিত্র কুরআন এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা লুকমান-এ হযরত লুকমান (আ.) নিজের পুত্রকে উদ্দেশ্য করে যে নসীহত প্রদান করেন সেগুলোর মধ্যে একটি নসীহত হলো, ওয়াকসিদ ফি মাশ্ইকা ওয়াগদুদ মিন সাওতিকা (লুকমান: ২০)। অর্থাৎ তোমার সাথে যেহেতু দুর্বল লোকেরাও থাকবে তাই এমনভাবে চলো যেন দুর্বলরা পেছনে রয়ে না যায়। নিঃসন্দেহে তুমি সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করো, কিন্তু এত দ্রুতগতিতে যেও না যার ফলে দুর্বল প্রকৃতির মানুষগুলো সম্পূর্ণভাবে পেছনে থেকে যাবে।

দ্বিতীয়ত, তুমি যখনই কোনো আদেশ দেবে, আন্তরিক ভালোবাসার সাথে বুঝিয়ে আদেশ দেবে। এভাবে বোলো না যে, "এই হলো আমার আদেশ"। (কুরআন করীমের শিক্ষা হলো, প্রেম-ভালোবাসার সাথে নির্দেশ দাও, তা যেন কঠোর আদেশ না হয়)। বরং এমনভাবে কথা উপস্থাপন করো যেন মানুষ তা বুঝতে পারে এবং তারা একথা বলে যে, এটি মানার মাঝে আমাদেরই কল্যাণ নিহিত– এটিই 'ওয়াগদুদ মিন সাওতিকা'-এর অর্থ।

অতএব মধ্যমপন্থা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা– এই দুটি জিনিস একযোগে জাতির মাঝে উন্নতির চেতনা সৃষ্টি করে থাকে। প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলার সর্বোত্তম উপায় হলো, মানুষের মাঝে এমন প্রেরণা সঞ্চার করা যে, যখনই তাদেরকে কোনো আদেশ দেওয়া হয় শ্রোতা বলে, আমাদের নিজেদের বাসনাও এটিই ছিল। আর এমন সময়েই কোনো জাতি উন্নতির পথে দ্রুত পদচারণা করে।" (মাশআলে রাহ, খণ্ড: ০১, পৃ. ১৫)

অতঃপর আরো কিছু অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো স্থান থেকে অভিযোগ এসে থাকে যে, আমরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে সাহায্যের আবেদন করেছিলাম যা কেন্দ্র থেকে স্থানীয় জামা'তের কাছে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য পাঠানো হলে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব খুবই ক্রোধান্বিত হন এবং বলেন, তোমরা সরাসরি কেন আবেদন করেছ, আমাদের মাধ্যমে কেন পাঠালে না? তারা লিখেছে যে, আমরা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি আর পুনরায় তাদের মাধ্যমে আবেদন পাঠানো হয়। এরপর একটি দীর্ঘ সময় কেটে গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি এবং কিছু জানতেও পারি নি আর আমাদের অভাব এখনো কাটে নি। একদিকে বকাঝকা করা হলো, অপমান করে ক্ষমা প্রার্থনায় বাধ্য করা হলো, পুনরায় আবেদন লেখানো হলো আবার কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয় নি। কোনো পদাধিকারী কিংবা জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব যদি একথা মনে করে থাকেন যে, এই আবেদনকারী সাহায্য পাবার মতো যোগ্য নয় তাহলে এমন লোকদের ভালোবাসার সাথেও বুঝিয়ে বলা যায়। সাহায্য যদি না-ই করার থাকে তাহলে পুনরায় আবেদন লেখানোর কী প্রয়োজন ছিল? সুতরাং এ বিষয়গুলি এমন যা বিনা কারণে কর্মকর্তা সম্পর্কে মানুষের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এগুলো পরিহার করা উচিত। আমীর হোক কিংবা প্রেসিডেন্ট, সর্বদা একথা মাথায় রাখা উচিত যে, তাদেরকে যুগ-খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে জামা'তগুলোতে দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত।

আবুল হাসান বর্ণনা করেন, হযরত মুয়াবিয়াকে হযরত আমর বিন মুর্‌রা বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ইমাম অভাবী, দরিদ্র এবং দুঃস্থদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ রাখে আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রয়োজনাদির জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করে দেন। (তিরমিযী, আবওয়াবুল আহকাম, বাব মা জাআ ফি ইমামির্ রা'ইয়্যা)

মহানবী (সা.)-এর একথা শোনার পর হযরত মুয়াবিয়া মানুষের প্রয়োজনাদি ও সমস্যাবলির সমাধান এবং তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিলেন। অতএব জামা'তী ব্যবস্থাপনাও এ কারণেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা যেখানেই থাকো আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করো। কোনো খারাপ কাজ করে ফেললে এরপর পুণ্যকর্ম করার চেষ্টা করো। এই পুণ্য, পাপকে মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করো এবং সদাচরণ প্রদর্শন করো। (তিরমিযী, আবওয়াবুল বির্ ওয়াস্ সিলা বাব মা জাআ ফি মা মুয়াশিরাতিন্ নাস)

হযরত আবু বুরদা থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) আবু মূসা (রা.) এবং হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেন-এর গভর্নর বানিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি (সা.) তাদের প্রত্যেককে একেকটি অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছিলেন (অর্থাৎ ইয়েমেন-এর দুটি অংশ ছিল)। তিনি (সা.) তাদের বলেন, (মানুষের জন্য) সবকিছু সহজসাধ্য করবে, কঠিন করবে না। ভালোবাসা ও আনন্দ ছড়িয়ে দেবে, ঘৃণার প্রসার ঘটতে দেবে না। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব বুয়েসা আবি মূসা ওয়া মুআয ইলাল ইয়েমেন)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমার এই কক্ষে বসে বলেন, হে আল্লাহ্! যে আমার উম্মতের শাসক নিযুক্ত হয়ে তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবে তুমিও তার সাথে কঠোরতা করো আর যে আমার উম্মতের শাসক হয়ে তাদের প্রতি বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করে তুমিও তার প্রতি কোমল হয়ো। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাব ফাযিলাতুল ইমামিল আদিল ...)

মূলত আমীর, প্রেসিডেন্ট, পদাধিকারী কিংবা কর্মী যারাই আছেন তাদের প্রধান কাজ হলো, নিজেদের মাঝেও এবং জামা'তের সদস্যদের মাঝেও জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা। অনুরূপভাবে জামা'তের প্রতিটি সদস্যেরও কাজ হলো, নিজেদের মাঝে এবং নিজেদের বংশধরদের মাঝে জামা'ত ও জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছিলেন, আমি পদধারীদের উদ্দেশ্যে যে-সব নসীহত করে থাকি সেগুলো কেবল পদাধিকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং জামা'তের সকল সদস্যকে উদ্দেশ্য করে তা বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই নসীহত সকলের জন্য। আগামীকাল হয়ত কোনো পদাধিকারীর এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যাবার কারণে বা অসুস্থতার কারণে অথবা বার্ধক্যজনিত কারণে কিংবা মৃত্যুবরণের কারণে অন্য কোনো ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করা হবে। এছাড়া নির্বাচনও হয়ে থাকে এবং পদের হাতবদলও হয়ে থাকে। অতএব প্রত্যেকের মাথায় এ চিন্তাধারা রাখা উচিত, তারা যখনই পদাধিকারী হবেন, একজন সেবকরূপে সেবা করার জন্য হবেন। কখনো কখনো কর্মকর্তা পরিবর্তন করা হয়। যুগ-খলীফা নিজেও প্রয়োজনমতো কতিপয় কর্মকর্তাকে পরিবর্তন করে থাকেন। যাহোক, নবাগতরাও এর অন্তর্ভুক্ত হয় আর তাদেরও একই চিন্তাধারা থাকা উচিত। মৌলিক শিক্ষা থাকলে এই মনমানসিকতাসম্পন্ন কেউ যদি দায়িত্ব লাভ করে তাহলে তার জন্য কাজ করাও সহজ হবে।

অতএব আমি যেমনটি বলেছি, প্রত্যেকের মাঝে এই দায়িত্ববোধ থাকা উচিত যে, তাকে জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং অন্যদেরকেও শ্রদ্ধাশীল বানাতে হবে। তখন যুগ-খলীফাও আশ্বস্ত হবেন যে, প্রতিটি স্থানে কাজ করার মতো কর্মী, ব্যবস্থাপনার জ্ঞান রাখে এমন কর্মী এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী কর্মী পাওয়া যাবে। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, মূল কাজ হলো, জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা এবং সেটিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মীদের দুই ধরনের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। একপ্রকার মানুষ হলো জামা'তের সাধারণ সদস্যরা। তারা যত বেশি

দৃঢ় হবে, ব্যবস্থাপনার সাথে প্রতিটি সদস্যের সম্পর্ক যত গভীর হবে, তাদের আনুগত্যের মান যত উন্নত হবে এবং যত বেশি ত্যাগের চেতনা তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে জামা'তী ব্যবস্থাপনাও তত বেশি সুদৃঢ় হবে। আর এসব বিষয় তাদের মাঝে কীভাবে সৃষ্টি করা যায়? এক্ষেত্রে পদাধিকারীদের দায়িত্ব কী– এর উল্লেখ আমি পূর্বে করে এসেছি। তারা যদি আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করেন তাহলে মানুষের মাঝে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সৃষ্টি হতে থাকবে। অতএব এটিই হলো আপনাদের অর্থাৎ পদধারীদের দল। জামা'ত ও পদাধিকারীদের সম্পর্ক যত বেশি দৃঢ় হবে জামা'তী ব্যবস্থাপনাও তত বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নির্বিঘ্নে পরিচালিত হবে, তত বেশি আমরা বিশ্বের সামনে স্বীয় আদর্শ তুলে ধরতে পারব। জামা'তের সদস্যদের সাথে পদাধিকারীদের সম্পর্ক যত গভীর হবে ততই জামা'তী ব্যবস্থাপনার পরিপক্বতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। আর এর ফলে যুগ-খলীফাও আশ্বস্ত হবেন যে, জামা'ত এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, যা থেকে প্রয়োজনের সময় আমি কর্মী এবং পদধারী বেছে নিতে পারি। (এটি সত্য যে,) কোনো স্থানে কিছু জামা'ত উন্নত মানের হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু জামা'ত যদি পিছিয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। অতএব পদাধিকারীদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা উচিত যে, তাদের নিজ অঞ্চল, নিজ জেলা কিংবা নিজ দেশে, কোথাও কোনো ঘাটতি নেই তো? নিজেদের কাজের পদ্ধতি খতিয়ে দেখতে হবে। আমেলার সদস্যদের পুরো সহযোগিতা কিংবা সেসব কাজে পুরো অংশগ্রহণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে হবে যে, কোথাও আপনি কেবল এজন্য দায়িত্ব নিয়ে রাখেন নি তো যে, পদ পেয়েছি আর অপারগতা প্রদর্শন করাও সমীচীন নয় তাই পদ ধরে রেখেছি, কোনোভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। এভাবে জামা'তী ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। যদি বিষয়টি এমনই হয়ে থাকে তাহলে পদ বা দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করার চেয়েও এটি বড়ো অন্যায় এবং আরো বড় পাপ। তাই এমন পদধারীরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তী ব্যবস্থাপনা এবং জামা'তের মর্যাদার ক্ষতিসাধনকারী।

সাধারণ লোকদের চেয়ে বর্ধিত দ্বিতীয় যে দায়িত্ব পদাধিকারীদের রয়েছে তা হলো, নিজেদের সমমর্যাদাসম্পন্ন অথবা অধীনস্থ কর্মকর্তা কিংবা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। আমি পূর্বেই বলে এসেছি যে, এটি কোনো জাগতিক পদ নয় যা লাভ করার পর আপনারা মনে করবেন যে, এখন আমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী আমীর তার আমেলার বা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন এবং সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন। কোনো অধীনস্থ যদি মতামত প্রদান করে তাহলে সেটিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে নয়, বরং সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবেন। মহানবী (সা.)-কে যদি পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বা আপনারা তো অনেক তুচ্ছ। তাই কারো মতামতকে কখনো অহংকারবশত তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত একটি ভাবমূর্তি থাকা উচিত। এমনটি যেন না হয় যে, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রধানত মতামতকে প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি মসজিদে কিংবা মিটিংয়ে তুইতোকারিও আরম্ভ হয়ে যাবে। অথবা এমন স্বরে যেন কথা বলা না হয় যার ফলে অন্য কোনো কর্মকর্তা কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয় বা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার ভাব প্রকাশ পায়। অতএব আমাদের

কর্মকর্তা কিংবা কর্মীদের বড়ো মনের পরিচয় দেওয়া উচিত। উদার মনে সমালোচনাও শোনা উচিত এবং তা সহ্যও করা উচিত। আর শিষ্টাচার বজায় রেখে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্মানবোধের প্রতি যত্নবান হয়ে দলিলপ্রমাণের মাধ্যমে উত্তর দেওয়া উচিত। একথা যেন বলা না হয় যে, আমি যে আদেশ দিয়ে দিয়েছি সেটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না, তোমরা এমন, তোমরা তেমন– এটি সম্পূর্ণ ভুল পদ্ধতি। জামা'তের কর্মকর্তা ছোটো হোক বা বড়ো, সে একজন কর্মকর্তার মর্যাদা রাখে। কম বয়স্কদের সাথে কিংবা পদের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে ছোটো কর্মকর্তার সাথেও যদি কেউ এমনভাবে কথা বলে যাতে অপমানের ভাব প্রকাশ পায় তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ যাকে তীর্যক কথা শোনানো হয়েছে সে বড় মনের পরিচয় দিয়ে আনুগত্যের চেতনায় এমন কথা সহ্য করে নিলেও যারা অন্যান্য কর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, এমন কর্মকর্তাদের বিষয় যদি আমার কাছে আসে তাহলে কোন কর্মকর্তা দীর্ঘদিন যাবৎ সেবা করছেন অথবা কে অল্প সময় থেকে সেবা করছেন বা কে কত সিনিয়র তা দেখা হবে না, অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং তদন্ত করা হবে। তাই একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন আর পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং পরামর্শের ক্ষেত্রে তাদেরকে গুরুত্ব প্রদান করুন। তাদের পরামর্শ যদি ভালো হয় তাহলে সেটিকে অবশ্যই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা উচিত এবং গুরুত্ব দেওয়া উচিত, এটি আবশ্যক নয় যে, আমি বড়ো বিধায় আমার পরামর্শই ভালো হবে এবং ছোটোদের পরামর্শ ভালো হতে পারে না।

অতঃপর আমাদের জামা'তে কাযা বা বিচার ব্যবস্থাও রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়েও এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়েও আর বিভিন্ন জামা'তেও তা প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব কাযা বা বিচারবিভাগ-সংক্রান্ত বিষয়গুলো এমন যেখানে প্রত্যেক বিচারককে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে, দোয়া করে বিচারকার্য শুরু করা উচিত। কখনো কোনো পক্ষের মনে এ ধারণা দানা বাধা উচিত নয় যে, বিচারক দ্বিতীয় পক্ষের কথা অধিক মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন কিংবা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমার যুক্তিগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয় নি এবং অপরপক্ষের প্রতি বেশি মনোযোগ ছিল। যদিও যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় সাধারণত তার কিছুটা অনুযোগ-অভিযোগ থেকেই থাকে, কিন্তু বিচারকের নিজ মনে উক্ত বিষয়ে পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকা উচিত।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, কোনো বিচারক যখন চিন্তাভাবনা করে পুরো তদন্তের পর সিদ্ধান্ত প্রদান করে তখন তার সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয় তাহলে সে দ্বিগুণ পুণ্য পাবে। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তার দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তাহলে সে নিজের এই চেষ্টা ও সৎ উদ্দেশ্যের কারণে একটি পুণ্য অবশ্যই পাবে। (বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম, বাব আজরুল হাকিম ইযা ইজতাহাদা ফাআসাবা আও আখতাআ)

অতঃপর হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর কিছু সঙ্গীসাথি, যারা হিমস-এ বসবাস করতেন, বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যখন হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়েমেনের কাযী অর্থাৎ বিচারক নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন তখন তিনি (সা.) মুআযকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সামনে কোনো মোকাদ্দমা উপস্থাপিত হলে তুমি কীভাবে তা মীমাংসা করবে? হযরত মুআয (রা.) নিবেদন করেন যে, আল্লাহ্‌র কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা

অনুসারে বিচার করব। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে যদি স্পষ্ট সমাধান না পাও তাহলে কী করবে? হযরত মুআয (রা.) নিবেদন করেন, তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করব। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সুন্নতের মাঝেও যদি কোনো দিকনির্দেশনা না পাও তখন কী করবে? এটি শুনে হযরত মুআয (রা.) নিবেদন করেন যে, সেক্ষেত্রে আমি চিন্তাভাবনা করে নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাধান করার চেষ্টা করব এবং তাতে কোনো প্রকার আলস্য ও অবহেলা প্রদর্শন করব না। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত মুআয (রা.)-কে বাহবা জানানো বা প্রশংসা করার জন্য তার বুকে হাত চাপটে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ, কেননা তিনি তাঁর রসূলের দূতকে এ যোগ্যতা দান করেছেন এবং সে সঠিক পদ্ধতি রপ্ত করেছে যা আল্লাহ্‌র রসূলের পছন্দ হয়েছে। (আবু দাউদ, কিতাবুল আকযিয়্যা, বাব ইজতিহাদুর্ রায়ে ফিল্ কাযা)

অতএব এটি হলো মীমাংসার মৌলিক নীতি অর্থাৎ প্রথমে কুরআন থেকে দিকনির্দেশনা নিতে হবে, তারপর সুন্নত থেকে দিকনির্দেশনা নিতে হবে, যদি এ বিষয়ে খলীফাদের কোনো বক্তব্য থেকে থাকে তাহলে তা থেকেও দিকনির্দেশনা নিতে হবে। অতঃপর কোনো জায়গায়ই যদি সেই নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা না পাওয়া যায় তাহলে দোয়া করে, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে এবং তাঁর নিকট সাহায্য যাচনা করে যেন বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। কাযী বা বিচারকদের সামনে যে বিচারই উত্থাপিত হোক না কেন তা যেন এর ওপর ভিত্তি করেই মীমাংসা করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল বিষয়েই নীতিগত আইন প্রণীত বা সংকলিত আকারে রয়েছে যা সকল বিচারক পেয়েও থাকেন। ফিকাহ-সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েলও পুস্তক আকারে ছাপানো আছে। অতএব সেগুলোর আলোকে সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। হযরত সাঈদ বিন আবু বুরদাহ (রা.) আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর একটি চিঠি বের করেন যা তিনি তাঁর এক গভর্নর হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন। এ রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তু হলো, "কাযা তথা বিচারকার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পোক্ত ধর্মীয় দায়িত্ব এবং (রসূলের) অবশ্যপালনীয় সুন্নত। কোনো মামলা বা মোকদ্দমা যখন আপনাদের সামনে উত্থাপিত হবে তখন সেটিকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন, কেননা কেবল সত্য কথা বলা আর সেটি প্রয়োগের চেষ্টা না করা বৃথা কাজ। যেমন বৈঠকই হোক না কেন সেখানে সবার প্রতি সমান মনোযোগ দিতে হবে এবং ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের বিষয়ে সবার সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে। সবার সাথে একই আচরণ করো, যেন কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি তোমার দ্বারা অন্যায় কাজ করানোর আশা না করে এবং কোনো দুর্বল ব্যক্তি যেন তোমার অত্যাচার-নিপীড়নের ভয় কিংবা আশঙ্কা না করে। সাক্ষীপ্রমাণ উপস্থাপন করা বাদীর দায়িত্ব এবং বিবাদী কসম খেয়ে অস্বীকার করতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে আপোশ বা মীমাংসার চেষ্টা করা পুণ্যের কাজ, কিন্তু এমন সন্ধি করার কোনো অনুমতি নেই যার ফলে অবৈধ জিনিস বৈধ আখ্যা পায় এবং বৈধ জিনিস অবৈধ, অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী কোনো সন্ধি করা বৈধ হবে না। তোমরা যখন কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে দাও আর পরবর্তীতে চিন্তাভাবনা করে আল্লাহ্ তা'লার হিদায়াতের মাধ্যমে যদি দেখো যে, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভুল

হয়ে গেছে এবং প্রকৃত বিষয় ভিন্ন কিছু, তাহলে নিজের পূর্বের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা কিংবা লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। কেননা সত্য এবং ন্যায় একটি মহান বিষয় আর অকাট্য সত্যকে কখনো কোনো জিনিস মিথ্যা এবং ভুল সাব্যস্ত করতে পারে না। তাই সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া– মিথ্যার মাঝে আটকে থাকা ও ভুল কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেয়ে অনেক উত্তম। তোমার মনে যে বিষয়ে সন্দেহ জাগে এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে যার সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না সেটিকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো আর অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করতে থাকো। এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দাও, অতঃপর সে অনুসারে কিয়াস (তথা অনুমান) করে বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদানের চেষ্টা করো। যে দিকটি আল্লাহ্ তা'লার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় বলে মনে করো এবং যা সত্য ও ন্যায়ের সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিভাত হয়, তা অবলম্বন করো। বাদীকে প্রমাণাদি উপস্থাপন করার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ এবং যথেষ্ট সময় প্রদান করো, যেন সে তার দাবির পক্ষে প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে। নির্ধারিত তারিখে সে যদি দলিলপ্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে তাহলে ভালো নতুবা তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদান করো। এ পদ্ধতি সকল অন্ধত্ব দূর করবে এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার ঘুচাবে। অর্থাৎ এর ফলে বিতর্কিত বিষয়ের সমাধান হয়ে যাবে এবং তা সকল আপত্তি ও অভিযোগের দাঁতভাঙা জবাব হবে। সকল মুসলমান ন্যায়সংগত সাক্ষ্য প্রদানের সমান অধিকার রাখে। তারা একে অপরের পক্ষে কিংবা একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে। এসব সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি পূর্বেই কোনো শাস্তি পেয়ে থাকে অথবা তার মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে থাকে কিংবা তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থাকে বা তার মূল সম্পর্ক থাকে এক ব্যক্তি কিংবা জাতির সাথে অথচ সে অন্য কারো আত্মীয় হবার দাবি করে অর্থাৎ বংশের দিক থেকে তার দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তাহলে এমন হেঁয়ালি আচরণকারী ব্যক্তির সত্যবাদী হবার বিষয়ে ভরসা করা যেতে পারে না। এছাড়া অন্য সকল মুসলমান সাক্ষ্য দেবার ক্ষেত্রে সমান অধিকার রাখে, কেননা কার হৃদয়ে কী আছে এবং প্রকৃত রহস্য ও সত্য কী? তা আল্লাহ্ তা'লা নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন বা তা কেবল আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কেউ যদি ভুল সাক্ষ্য দেয় তাহলে খোদা তাকে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে সাক্ষ্যপ্রমাণাদির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এটিও স্মরণ রেখো, তড়িঘড়ি মনোবল হারাবে না, দ্রুত ঘাবড়ে যাওয়া এবং মানুষের পক্ষ থেকে দুঃখকষ্ট পাওয়া, আর মামলার বাদী-বিবাদীর সাথে ঘৃণা এবং অপরিচিতির ভাব প্রদর্শন কোরো না। সত্য নিরূপণের ক্ষেত্রেএই রীতি এড়িয়ে চলো এবং সত্যান্বেষণের সঠিক চেষ্টা করো। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এর প্রতিদান দেবেন এবং এমন ব্যক্তিকে সুখ্যাতি দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পূর্ণ সদিচ্ছার বশবর্তী হবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি কেবল কৃত্রিমভাবে ভালো মানুষ সাজে আল্লাহ্ তা'লা কোনো এক সময় তার রহস্য ফাঁস করে দেবেন এবং তার লাঞ্ছিত হবার ব্যবস্থা করে দেবেন।" (সুনান দার কুতনী, কিতাবুল আকযিয়্যাতি ওয়াল আহকাম)

এছাড়া কর্মকর্তাদের ব্যাপারে কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ও রয়েছে যা আমি বলে

দিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের জামা'তের মধ্যে কেউই পদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে না আর যখন দায়িত্ব পায় তখন তারা এটি ভেবে ভায় পায় যে, আমি তা পালন করতে পারব কিনা। কিন্তু কিছু বিকৃত মস্তিষ্ক লোকও থেকে থাকে। তারা চিঠি লিখে দেয় যে, আমাদের জেলায় সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে না। পত্র প্রেরণকারী আরো লেখে, যদিও আমি জানি, পদের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু তবুও আমি মনে করি, আমার ওপর যদি আমীরের দায়িত্ব কিংবা অমুক দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহলে ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে আমি সংশোধন করতে পারি এবং পরিবর্তন আনতে পারব। সুতরাং এমন কিছু মাথা খারাপ লোকও থাকে যারা সরাসরি লিখে দেয়। আবার কিছু লোক অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে একই দাবি উপস্থাপন করে থাকে। তাই তাদের জন্য এ বিষয়টি আমি স্পষ্ট করে বলছি যে, আমাদের ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ আহমদীয়া জামা'তের ব্যবস্থাপনায় নির্বাচনের সময় যদি কারো নাম প্রস্তাব করা হয় তবে সে নিজেকে ভোট দেবার অধিকারও রাখে না। নিজেকে ভোট দেবার অর্থ হলো, আমি এ পদের যোগ্য। এমন লোকদের এ হাদীসটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই এবং আমার সাথে আমার দুইজন চাচাতো ভাই ছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যে-সব ভূখণ্ড দান করেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে আপনি আমাকে কোনো একটির আমীর নিযুক্ত করে দিন। আর দ্বিতীয়জনও একই কথা বললে মহানবী (সা.) এর উত্তরে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা এমন কারো হাতে শাসনভার প্রদান করি না, যে এর জন্য আবেদন করে কিংবা এর আকাঙ্ক্ষা করে। (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, বাব আন নাহা আন তালাবিল ইমারাহ্ ওয়াল হিরসি আলাইহা)

অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, হে আব্দুর রহমান! পদ এবং শাসনক্ষমতা লাভের জন্য আবেদন কোরো না, কেননা চাওয়ার ফলে যদি তুমি (পদ কিংবা শাসনক্ষমতা) লাভ করো তাহলে তুমি সে বোঝা বহন করতে পারবে না। আর যদি তুমি তা না চাইতে পাও তাহলে খোদার সাহায্য তোমার সাথে থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, বাব আন নাহয়ীউ আন তালাবিল ইমারাহ্ ওয়াল হিরসি আলাইহা)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "কোনো কোনো ব্যক্তির অভ্যাস হলো, তারা এ ধরনের পদ লাভের আশায় বিভিন্ন মজলিস বা সভায় অংশগ্রহণ করে। এমন লোকেরা নিজেদের জন্য এবং স্বজাতির জন্য অভিশাপ হয়ে থাকে। তারা হলো সেসব লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, ফাওয়াইলুল্ লিলমুসাল্লীনা, আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন, আল্লাযীনা হুম ইউরাউন। [অর্থাৎ অতএব এমন নামাযীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য– যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, (এবং) যারা কেবল লোক-দেখানো কাজ করে। (আল-মাউনঃ ৫-৭)] তাদের আপাদমস্তক শুধু লোক-দেখানো। কাজ করার কোনো আগ্রহ তাদের মাঝে থাকে না....।" (মাশআলে রাহ, খণ্ডঃ ০১, পৃ. ২০-২১)

অতঃপর জামা'তের কর্মীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে একস্থানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "কর্মীদের মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করা

উচিত। নাম ও খ্যাতির বাসনা অপছন্দনীয় বিষয়। এমন চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে অনেক মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, হয়ে থাকে এবং হতে থাকবে। তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করো এবং তাঁকেই ভয় করতে থাকো। এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখো যে, আল্লাহ্র কাজ করে তাঁর কাছেই পুরস্কার চাও.... আর মানুষের কাছ থেকে সুনাম কিংবা প্রশংসা প্রত্যাশা করবে না। আমাদের সকলের কাজকর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য হোক আমি এ দোয়াই করি। তিনি আপনাদের প্রতি দয়ার্দ্র হোন এবং আমার প্রতিও কৃপা করুন। আমীন।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ০৭, ২২ ডিসেম্বর ১৯২২ সালে প্রদত্ত খুতবা, পৃ. ৪৩৩)

এরপর তিনি (রা.) বলেন, "আমি জামা'তের কর্মকর্তাদের নসীহত করছি যেন তারা বিশেষভাবে নিজেদের চারিত্রিক সংশোধন করে। কোনো হঠকারী মানুষও যদি এসে যায় তাহলে তাদেরকেও প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করুন আর কঠোর পরিশ্রম ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। খোদা তা'লা 'ওয়ান্ নাযিয়াতি গারকান ওয়ান্ নাশিতাতি নাশতান' [অর্থাৎ তাদের শপথ– যারা ডুবন্ত অবস্থায় পদক্ষেপ নেয় (অথবা ডোবানোর লক্ষ্যে ছোটাছুটি করে)! আর (শপথ) তাদের– যারা দেশ-দেশান্তরে দ্রুত ছুটে বেড়ায়। (আন-নাযিআত: ২-৩)] আয়াতে এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করে বলেন, মুমিন যখন কাজে নিমগ্ন হয় তখন সে আপাদমস্তক তাতে নিমজ্জিত হয় এবং সকল সমস্যাকে জয় করে নেয়। এমতাবস্থায় বিরোধীদের পক্ষ থেকে যদি আপত্তিও উত্থাপিত হয় তাহলে দোয়ার মাধ্যমে তার সমাধান করা উচিত এবং আপত্তি দেখে কখনো ঘাবড়ানো উচিত নয়।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৫, পৃ. ২৫৬-২৫৭)

অতঃপর তিনি (রা.) কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমীর এবং প্রেসিডেন্টরা নিজ নিজ জামা'তে পবিত্র কুরআন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলি থেকে দরসের ব্যবস্থা করুন। এটি কেবল ওয়ায-নসীহতই হবে না, বরং এর মাঝে অন্তর্নিহিত থাকবে বাহ্যিক ও মনশ্চক্ষুর পর্যবেক্ষণ। কুরআন করীম নিছক কোনো ওয়ায-নসীহত নয়, বরং তা (বাহ্যিক ও মনশ্চক্ষুর) পর্যবেক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত (এক কিতাব)। একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলিও (বাহ্যিক ও মনশ্চক্ষুর) পর্যবেক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ কোনো বক্তা বলে থাকে যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এটি লেখা আছে কিন্তু আল্লাহ্র নবীরা একথা বলেন না যে, অমুক স্থানে এটি লেখা আছে, বরং তারা এটি বলেন, আমাদের হৃদয়ে এটি লেখা আছে। আমাদের জিহ্বায় একথা লেখা আছে। তাদের জীবনই হলো তাদের ওয়ায, আর এ কারণেই তাদের বই পড়ার ফলে সাধারণ ওয়াযের মতো প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে না, বরং বাস্তব পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। দোয়া যেমন নামাযের সারবস্তু– ঠিক তেমনি নবীদের পুস্তকাদিতে নসীহতের নির্যাস থাকে যা খোদা তা'লা এবং তার নবীদের বাণীতে বিদ্যমান থাকেই।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১১, পৃ. ২৮৩-২৮৪)

অতএব দরস দেবার প্রতিও অনেক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত, কেননা এটিও নিজেদের এবং জামা'তের তরবিয়তের একটি অংশ।

সবশেষে আমি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে যা যা বলেছি তা সংক্ষেপে পুনরায় বলে দিচ্ছি। এগুলো জামা'তের খলীফারা পূর্বেও বলেছেন, কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাবার পর কিছু কথা মনে থাকে না। নতুন যারা কর্মকর্তা হিসেবে আসেন তারা অনেক কিছু সঠিকভাবে বুঝতে পারেন না বিধায় বার বার স্মরণ করাতে হয়। যাহোক, সারাংশ হলো–

১) .... কর্মকর্তাদের নিজেদের জন্যও আবশ্যক হলো, তারা যেন আনুগত্যের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করেন। এটি যদি করা হয় তবে আপনাদের অধীনস্থ যারা রয়েছে, তারা জামা'তের সদস্য হন কিংবা কর্মী, আপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করবে।

২) .... সকলের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করার বিষয়টি সর্বদা মাথায় রাখুন। তাদের মন জয় করতে হবে এবং সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকতে হবে। প্রকৃতিগত এ চাহিদাগুলোই যদি আপনারা পূর্ণ না করেন তাহলে এর অর্থ হলো, এমন কর্মকর্তাদের হৃদয়ে অহংকার রয়েছে।

৩) ....আমীর, কর্মকর্তা কিংবা কেন্দ্রীয় কর্মীরা দোয়া করুন যেন তাদের অধীনস্থ কিংবা যে-সব মানুষের দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে তারা যেন ভদ্র হয়, জামা'তের আনুগত্যের চেতনা এবং জামা'তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যেন তাদের মাঝে থাকে।

৪) .... কখনো কোনো সদস্যের সাথে কোনো বিষয়ে বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করবেন না আর এটিও মনে রাখবেন, কিছু মানুষ ভীষণ বক্র স্বভাবের হয়ে থাকে। আমি ভালোভাবে জানি, এমন লোকেরা আমীর, কর্মকর্তা কিংবা জামা'তের নাভিশ্বাস তুলে দেয়; কিন্তু তারপরও তাদের এই অশিষ্ট আচরণ যতটা সম্ভব সহ্য করুন আর তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়ে কোনো প্রকার অভিযোগ করবেন না এবং প্রতিশোধ নেবার কথাও কখনো মাথায় আনবেন না। তাদের জন্য দোয়া করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য কামনা করুন।

৫) .... অতঃপর জামা'তী ব্যবস্থাপনার দৃঢ়তা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ অগ্রগণ্য হওয়া উচিত আর এজন্য সর্বদা চেষ্টা করতে থাকা উচিত। এছাড়া তল্পিবাহক কিংবা তোষামোদকারীদের কখনো নিজেদের আশপাশে ভিড়তে দেবেন না। যে-সব কর্মকর্তা এমন লোকদের কবলে পড়ে তাদের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের আশা করা যেতে পারে না। এমন কর্মকর্তারা সেসব লোকের হাতের পুতুল হয়ে যায়। এ কারণেই মহানবী (সা.) এ দোয়া করার নসীহত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কখনো যেন আমার আশপাশে মন্দ পরামর্শদাতাদের একত্রিত না করেন।

৬) .... অতঃপর এটিও স্মরণ রাখতে হবে, আমি যেমনটি পূর্বেও বলেছি যে, জামা'তী ব্যবস্থাপনার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা না থাকলে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের আচরণ করুন। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন যা তাদের সংশোধনের কারণ হবে। এগুলো হলো কর্মকর্তাদের জন্য। কিন্তু পরিশেষে আমি আবারো জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলছি যে, আপনারা যারা কর্মকর্তা নন তাদের ওপরও অনেক বড়ো দায়িত্ব রয়েছে আর তা হলো, আপনাদের কাজ কেবল আনুগত্য, আনুগত্য এবং আনুগত্য করা আর

সেইসাথে দোয়া করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব বোঝার তৌফিক দান করুন।

পরিশেষে আমি একটি দোয়ার আবেদনও করতে চাই। বাংলাদেশে অনেক উত্তেজনা বিরাজ করছে। অনেক দিন যাবৎ দেশের অবস্থা খুবই খারাপ এবং আজকেও বিরুদ্ধবাদীরা মসজিদে আক্রমণ করার হুমকি দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সার্বিকভাবে নিরাপদ রাখুন এবং সকল অনিষ্ট থেকে জামা'তকে রক্ষা করুন। দরসেও আমি একটি দোয়ার তাহ্রীক করেছিলাম, এখন তা পুনরায় করছি। অন্যান্য দোয়ার সাথে এ দোয়াটিও বিশেষভাবে অবশ্যই পড়ুন এবং আমি যেমনটি বলেছি, প্রত্যেক নতুন খিলাফতের পর এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। আর সে দোয়াটি হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে শিখিয়েছেন। স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমন করেন এবং বলেন, নিম্নলিখিত দোয়াটি যেন জামা'তের সদস্যরা পাঠ করেন–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! আমাদেরকে হিদায়াত দেবার পর তুমি আমাদের হৃদয়কে বক্র কোরো না এবং নিজের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কৃপা করো; নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা (আলে-ইমরান: ৯)। এই দোয়া অনেক বেশি করে পাঠ করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

(৩৪)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১২ ডিসেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১২ ফাতাহ্, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(আন-নূর: ২২)

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (তার জানা উচিত), নিশ্চয় সে অশ্লীলতার ও মন্দ কাজের আদেশ দেয়। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা যদি না থাকত তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আন-নূর: ২২)

পবিত্র কুরআনের ৪-৫টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই নির্দেশ রয়েছে যে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না, তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকো। কখনো সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে এটি বলা হয়েছে আবার কোনো কোনো স্থানে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব ঈমান আনয়নকারীদের তথা মু'মিনদের সাবধান করা হয়েছে যে, এটি মনে কোরো না, আমরা ঈমান এনেছি বিধায় এখন আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই। তিনি বলেন, না। তোমাদের চিন্তা করা উচিত, তোমরা সামান্য অসাবধান হলে বা খোদা তা'লা থেকে তোমাদের দৃষ্টি সরে গেলে তোমাদের ঈমান নষ্ট হবার আশঙ্কা সবসময় থেকে যায়, কেননা শয়তান ওত পেতে বসে আছে। সে তো আদমের জন্মের সময়ই বলে দিয়েছিল, এখন থেকে আমি সর্বদা তার রাস্তায় (ঘাঁপটি মেরে) বসে থাকব আর শয়তান নিজের জন্য এটি অবধারিত করে নিয়েছিল যে, আদম ও তার সন্তানদের পুণ্যের যে পথই আল্লাহ্ তা'লা দেখাবেন, সে সর্বদা সকল পথে ওত পেতে থাকবে এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করবে। এছাড়া শয়তান বলেছে, **'আমি তাদের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকার কামনা-বাসনা সৃষ্টি করব যাতে তারা সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত হতে থাকে। নানা পন্থায় মানুষকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে থাকব। একবার যদি আমার খপ্পর থেকে বেঁচেও যায় আমি লাগাতার আক্রমণ করতে থাকব, কেননা ক্লান্ত হয়ে বসে থাকার পাত্র আমি নই। আমি ডান দিক থেকেও আক্রমণ করব, বাম দিক থেকেও আক্রমণ করব, পেছন দিক থেকেও আক্রমণ করব, সম্মুখ দিক থেকেও আক্রমণ করব।'** আল্লাহ্ তা'লাকে সে

একপ্রকার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, **আক্রমণের এমন সব পন্থা অবলম্বন করব যে, তুমি তাদের মাঝে অনেককেই (তোমার প্রতি) কৃতজ্ঞ পাবে না**। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তাকে এর উত্তর দিয়েছেন কিন্তু জগতে আমরা দেখতে পাই, অকৃতজ্ঞ মানুষ (অনেক) রয়েছে, অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। অথচ নির্দেশ রয়েছে যে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। সেই নির্দেশটি কী? যেমনটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শয়তানের পথ অবলম্বন কোরো না। সেসব কথার অনুসরণ কোরো না যা শয়তানের পথের পানে নিয়ে যায়। মানুষ যদি মুমিন হয় আর এটিও জানে যে, শয়তানের পথ কোনটি আর এছাড়া এটিও জানা থাকে যে, শয়তানের পথ ভীষণ ভয়ংকর, তা আমাকে ধ্বংসের গহ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, তাহলে একবার ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি কেন শয়তানের পথ অবলম্বন করবে এবং নিজের ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করবে? কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে-কিনা ঈমানের স্বাদ পেয়েছে সে জেনেশুনে কখনো নিজেকে এই ধ্বংসের মাঝে নিপতিত করবে না। তাহলে কেন মুমিনদের এই সাবধানবাণী দেওয়া হয়েছে যে, শয়তানের পথে চলো না এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করো। অতএব এটি স্পষ্ট যে, এই সাবধানবাণী ও সতর্কবার্তা এ কারণে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, শয়তান প্রকাশ্যে আদম ও তার সন্তানসন্ততিকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, আমি তোমাদেরকে প্ররোচিত করতে থাকব আর এমন সব পন্থায় প্রলুব্ধ করব এবং এমন সব দিক থেকে আক্রমণ করব যে, তোমরা বুঝতেও পারবে না, কী হয়েছে! আর এসব আক্রমণ এমন সুপরিকল্পিতভাবে এবং ধীরস্থিরভাবে হবে যে, তোমরা অজান্তে অসাবধানে এ পথ অবলম্বন করতে থাকবে, আমার মতাদর্শ অনুসরণ করতে থাকবে।

আরেক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

(আল-বাকারা: ১৬৯)

অর্থাৎ "তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লেখেন, "এই আয়াতে 'খুতুওয়াত' শব্দটি এ বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, শয়তান মানুষকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়ে বা ধাপে ধাপে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। সে কখনো কোনো মানুষকে হঠাৎ করে কোনো বড়ো পাপে প্ররোচিত করে না, বরং তাকে পাপের দিকে কেবল একটি পদক্ষেপ রাখার জন্য প্ররোচিত করে। আর সে যখন একটি পদক্ষেপ নেয় তখন শয়তান দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেবার জন্য প্ররোচিত করে। এভাবে ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে তাকে বড়ো বড়ো পাপে লিপ্ত করে। অতএব তিনি বলেন, আমরা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, কেবল গুটি কতক আদেশ-নিষেধ মেনে তোমাদের আনন্দিত হয়ে যাওয়া এবং বাকি সব নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মনে করা যে, তোমরা খাঁটি মুসলমান– এটি একটি শয়তানী কুমন্ত্রণা। তোমরা যদি এভাবেই ঐশী নির্দেশাবলিকে অগ্রাহ্য করতে থাকো তাহলে যে-সব নির্দেশ

তোমরা এখন পালন করছ সেসব নির্দেশ পালনের সামর্থ্যও তোমাদের হারিয়ে যাবে। অতএব নিজেদের কর্মসমূহ বিশ্লেষণ করতে থাকো এবং শয়তানী প্ররোচনা থেকে সর্বদা আত্মরক্ষার চেষ্টা করো।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০২, পৃ. ৪৫৭)

অতঃপর এর তফসীরে তিনি (রা.) বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না, কেননা যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সে পাপ এবং পাপাচারিতায় নিমজ্জিত হবে, কেননা শয়তান অশ্লীলতা এবং অবাধ্যতার আদেশ দেয়। এতে এটি বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে, এমন সকল পাপের সূচনা ভয়ংকর হয় না। কোন ভয়ংকর কাজ করার জন্য শুরুতেই মানুষকে প্ররোচিত করা শয়তানের কার্যপদ্ধতি নয়, কেননা মানুষের প্রকৃতিতে লজ্জাবোধের উপকরণ রাখা হয়েছে, এ কারণে যে কাজকে মানুষ স্পষ্টভাবে মন্দ মনে করে তা করার জন্য সে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, শয়তান যদি কাউকে সোজা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে চায় তবে সে যাবে না। হ্যাঁ, প্রতারিত করে যদি নিয়ে যায় তাহলে চলে যাবে। অতএব শয়তান প্রথমেই কোন বড়ো পাপের দিকে ডাকে না, বরং প্রথমে ছোটো পাপের দিকে ডাকে, যা বাহ্যত পাপ বলে মনে হয় না। এরপর আরো সামনে নিয়ে যায়, এরপর সেটি থেকেও আরো এগিয়ে নিয়ে যায়, একপর্যায়ে ভয়ংকর পাপে নিমজ্জিত করে। বস্তুত শয়তান শুরুতেই গর্তের মুখে নিয়ে গিয়ে মানুষকে বলে না যে, এতে ঝাঁপ দাও, বরং প্রথমে সে বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে যায়। (এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন,) ডাকাতরা যেভাবে ঘরের আশপাশে ডাকাতি করে না, কিংবা যারা শিশুদের হত্যা করে, তারা বাড়ির পাশে এটি করে না বরং তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে ও প্রতারিত করে অনেক দূরে নিয়ে যায়। আর বলে, আসো! তোমাকে মিষ্টি খাওয়াবো। শহর কিংবা গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে যখন দেখে যে, এখন আর কেউ দেখবে না তখন গলা টিপে মেরে ফেলে। (এখানেও এমন বহু ঘটনা ঘটে, যা আপনারা পত্রপত্রিকায় পড়ে থাকবেন) শয়তানের কার্যপদ্ধতিও এটিই হয়ে থাকে। সে প্রথমে মানুষকে সেই দুর্গ থেকে বের করে আনে যেখানে খোদা তা'লা তাকে সুরক্ষিত করে রেখেছেন, অর্থাৎ পূতপ্রবৃত্তির দুর্গ থেকে। মানুষ তা থেকে বাইরে চলে যায় আর সে মনে করে, এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যেতে যেতে সে এতটাই দূরে চলে যায় যে, তার ফিরে আসা কঠিন হয়ে পড়ে আর শয়তানের থাবার কবলে পড়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। মিথ্যা অপবাদের প্রেক্ষাপটে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তোমরা একথা বোলো না, আমরা কারো ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে কী সমস্যা? অথবা আমরা তো অপবাদ দেই নি, কেউ আমাদেরকে শুনিয়েছে আর আমরাও অন্যের কাছে বলেছি– এখানে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, শয়তানেরও কার্যপদ্ধতি এটিই। সে প্রথমে নিজের পেছনে পরিচালিত করে এবং ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতা এবং শরীয়তের দুর্গ থেকে দূরে নিয়ে যায়। মানুষ যখন দূরে চলে যায় তখন তাকে হত্যা করে। অতএব শয়তানের প্রথম কাজ এটিই হবে যে, সে প্ররোচনামূলকভাবে বলবে, অন্যের বলা কথা বলে বেড়াও, এতে তোমার কী ক্ষতি? কিন্তু তুমি যখন এমনটি করবে তখন একান্ত তোমার মুখ থেকে সে এমন কথা বের করাবে। আর যখন তুমি তাতেও সাড়া দেবে তখন সে উক্ত কাজও তোমার দ্বারা করিয়ে নেবে। অতএব তোমরা প্রথম থেকেই তার পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না এবং

এবং প্রথম পদক্ষেপেই তার কথা প্রত্যাখ্যান করো, যেন তোমরা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারো এবং সুরক্ষিত থাকো। আর এই প্রত্যাখ্যানের জন্যও খোদা তা'লার সাহায্য এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রয়োজন। তাই আমাদেরকে নামাযের মাধ্যমে, ইস্তিগফারের মাধ্যমে খোদা তা'লার সাহায্য যাচনা করতে থাকা উচিত। পাঁচবেলার নামাযের আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই পদ্ধতিই শিখিয়েছেন যে, শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য পাঁচ বার আমার সমীপে উপস্থিত হও এবং আমার অনুগ্রহ যাচনা করো। তাহলে তা থেকে সুরক্ষিত থাকবে, অনেক পাপ তোমাদের মধ্যে প্রবেশই করবে না, কেননা শয়তান সর্বদা শরীরের ভেতরই রয়েছে যেমনটি এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট– হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, **মহানবী (সা.) বলেন, এমন মহিলাদের নিকট যেও না যাদের স্বামী অনুপস্থিত কেননা শয়তান মানুষের শিরায় রক্তের মতো ধাবিত হয়।** (সুনানে দারেমী, কিতাবুর্ রিকাক, বাব আশ্ শায়তানী জারি মাজরিদ্ দাম)

এখন এই হাদীসের অর্থ কেবল এটিই নয় যে, এমন ঘরে যেও না যেখানে কোনো পুরুষ লোক নেই বরং একটি মৌলিক নীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, না-মাহরামগণ পরস্পর কখনো যেন এতটা স্বাধীনভাবে মেলামেশা না করে যার ফলে শয়তান আক্রমণ করার সুযোগ লাভ করে। আরো কতিপয় স্থানে এ সম্পর্কিত হাদীস রয়েছে যেখানে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে যাতে এভাবে পুরুষ ও মহিলা একত্রিত না হয়। লক্ষ করুন, বর্তমান যুগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালগুলোতে শুরুতে ছেলেমেয়ের মাঝে বন্ধুত্ব হয় আর বলা হয়ে থাকে যে, এটি কেবল বন্ধুত্ব, তারা ছাত্র, তাই এটিকে যেন ভুল না বুঝা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ বন্ধুত্ব করতে বারণ করে তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়। আর এরপর ধীরে ধীরে এটি এতদূর গড়ায়, যেখানে আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না। মোটকথা, এটি ইসলামী শরীয়তের ওপর আমল না করার ফল। এটিই হলো শয়তানের ধীরে ধীরে কাজ করার নমুনা। এছাড়া আজকাল সমাজে বহু এমন ঘটনা ঘটছে যেমন বন্ধুদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু হয়ে যায়। প্রথমে বন্ধুবান্ধবদের উপস্থিতিতে আর এরপর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে তাদের অনুপস্থিতিতে আসা-যাওয়া আরম্ভ হয় লজ্জাবোধ উঠে যেতে আরম্ভ হয় আর এ অবস্থ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরিশেষে এর ফলাফল কী দাঁড়ায়? বহু এমন বিষয় ঘটে যার পরিণতিতে উভয় পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। এ সবই ইসলামী শিক্ষা অনুসারে না চলারই ফল।

ইন্টারনেটের উদাহরণ ইতিপূর্বে আমি বেশ কয়েকবার দিয়েছি। বহু পরিবার এর কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করলে এবং নির্দেশাবলি না মেনে চললে অবশ্যই শয়তান আক্রমণ করবে। এছাড়া এমন মন্দকর্ম রয়েছে যেগুলোকে শয়তান খুব আকর্ষণীয় করে দেখিয়ে থাকে এবং যেগুলো থেকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি যাকে বাহ্যত ভালো মনে হয়, যে মাঝেমধ্যে মসজিদেও আসে, জুমুআর নামাযেও হয়ত আসে, কিছু না কিছু চাঁদাও দিয়ে থাকে, কিন্তু সে যদি ব্যবসায় লাভের জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। আর শয়তান তাকে বিভিন্ন অজুহাত ও

বাহানায় লোভ দেখাচ্ছে যে, বর্তমানে এটাই ব্যাবসার নিয়ম। তুমি যদি এটি মেনে না চলো তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে-ও একথায় বিশ্বাসী হয়ে, এসব ধারণার বশবর্তী হয়ে উক্ত লালসায় চোরাবালিতে ডুবতে থাকে এবং যতটুকু অল্পবিস্তর পুণ্যকর্ম সে করে তা-ও ধীরে ধীরে লোপ পায় আর জগতের মোহ পুরোপুরি তাকে ঘিরে ফেলে। এমন লোকেরা এটি মনে করে, এখন এটিই আমাদের জীবন– মৃত্যুও হয়ত এখন আর আসবে না এবং আমরা সর্বদা এভাবেই থাকব। আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হতে হবে না। অতএব এমন লোকদের শয়তান এমনভাবে নিজ করায়ত্তে নিয়ে নেয় যে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেহেতু ঐশী কৃপা তাদের মধ্য থেকে উঠে যায় তাই একের পর এক পাপের আগমন হয়, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যেহেতু তাদের কাছ থেকে উঠে যায়, ফলে একটি মন্দকর্মের পরে আরেকটি মন্দকর্মের আগ্রাসন অব্যাহত থাকে। এমন লোকেরা অন্যের অধিকার হরণ করে থাকে, জোরপূর্বক অন্যের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে, ভাইবোনের সম্পত্তিও গ্রাস করে এবং রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তার তোয়াক্কা করে না। সর্বোপরি সকল প্রকার পুণ্য ও সকল প্রকার কল্যাণ তাদের এবং তাদের পরিবার থেকে হারিয়ে যায়। এরপর তারা নিজেরা ধীরে ধীরে বিপথগামিতার শিকার হয়ে যায় এবং তাদের সন্তানরা বিপথগামিতার শিকারে পরিণত হয়। অবশেষে পরিণতি যা দাঁড়ায় তা হলো, এমন লোকেরা জামা'ত থেকে বেরিয়ে যায়। অবশ্য শয়তানের এমন অনুসারীদের হাত থেকে আল্লাহ্ তা'লা নিজেও জামা'তকে পবিত্র করেন। আপনারা যদি যাচাই করেন তাহলে নিজেরাও এটি দেখতে পাবেন এবং এটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট দেখা যাবে যে, জামা'ত পরিত্যাগকারীদের অধিকাংশ এমন লোকেরাই হয়ে থাকে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে এমন পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন, এমন চিন্তা থেকে রক্ষা করুন এবং এমন লোকদের হাত থেকেও রক্ষা করুন যাদের ওঠাবসা কেবল জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের খাতিরেই হয়ে থাকে এবং যারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে। আমি যেমনটি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এসব শয়তানী রাস্তা থেকে বাঁচার পথ কেবল একটিই, আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করো, তাঁর দরবারে বিনত হও, তাঁর সমীপে কান্নাকাটি করো, সাহায্য চাও, বিনীতভাবে প্রার্থনা করো যে, হে আল্লাহ! শয়তান চতুর্দিক থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ করছে, এখন তুমিই আছো যে-কিনা আমাদেরকে এসব নোংরামি থেকে বাঁচাতে পারে ও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, **লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ্ শাইতান** বলে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, হে মুমিনগণ! শয়তানের রীতিনীতি, শয়তানী জীবনপদ্ধতি এবং শয়তানের প্রভাবকে গ্রহণ কোরো না আর এ বিষয়টি মনে রেখো, যে ব্যক্তি শয়তানের পথ ও রীতিনীতি অবলম্বন করে, সে নির্ঘাত পাপ এবং অপছন্দনীয় বিষয়াদির অনুসরণ করা আরম্ভ করে দেয়, কেননা শয়তান সর্বদা পাপ এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের দিকেই আহ্বান জানিয়ে থাকে। কিন্তু এটিও স্মরণ রেখো, পরিপূর্ণ পবিত্রতা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপা ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। সুতরাং এটি অর্জনের উপায়

হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করতে থাকা এবং নিজের অবস্থাকে আরো বেশি পবিত্র ব্যক্তিদের জীবনের আদলে পরিবর্তন করা। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা) তোমার পবিত্র হবার চেষ্টা দেখে যেন তোমাকে পবিত্র বানিয়ে দেন।

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, "শয়তান সবসময় মানুষের পেছনে লেগে থাকে। এমনকি মানুষ যখন খোদা তা'লার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তখনো সে তার পিছু ছাড়ে না এবং তাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় লেগে থাকে। বহু লোক তার প্রতারণার শিকার হয়ে ঈমান আনার পরও তার কথা অনুসরণ করে এবং মুরতাদ, পাপাচারী হয়ে যায়। এই বিপদ এতটাই ভয়াবহ যে, খোদা তা'লার কৃপা ছাড়া কোনো ব্যক্তি এই বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারে না। কিন্তু এই কৃপা লাভ করার উপায় হলো, মানুষ যেন খোদা তা'লার **'সামী'** (বা সর্বশ্রোতা) বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগায় এবং তাঁর দরজার কড়া নাড়ে। মানুষ যদি তাঁর দরবারে গিয়ে কড়া নাড়ে এবং তাঁর নিকট দোয়া করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা, যিনি **'আলীম'** (সর্বজ্ঞ) এবং নিজ বান্দাদের অবস্থা ও তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, তিনি তাদের হৃদয়ে এমন ঈমানী শক্তি সৃষ্টি করবেন যার ফলে সে শয়তানী আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং সে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা লাভ করবে।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৬, পৃ. ২৮১)

শয়তানের কবল থেকে রক্ষা লাভের জন্য যখন দোয়া করবেন তখন মহানবী (সা.)-এর এ দোয়াটিও সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন; প্রত্যেক আহমদীর প্রতিদিন অবশ্যই এই দোয়া করা উচিত, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে দোয়ার আদলে কিছু বাক্য শিখিয়েছেন আর দোয়ার শব্দগুলো শেখানোর ক্ষেত্রে তাঁর (সা.) রীতি সেটি হতো না যেটি তাশাহ্হুদ শেখানোর সময় হতো। সেই বাক্যগুলো হলো– "হে আল্লাহ্! আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করো, আমাদের সংশোধন করো আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করো, অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আমাদেরকে আলোর পানে নিয়ে যাও, আমাদেরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করো, আমাদের জন্য আমাদের কান, চোখ, হৃদয়, স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে কল্যাণ দান করো। আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও। নিশ্চয় তুমিই তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী। আর আমাদেরকে স্বীয় নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী, সেগুলোর স্মৃতিচারণকারী এবং সেগুলো গ্রহণকারী করো। আর হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর সেসব নিয়ামতরাজি পূর্ণ করো।" (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুস্ সালাত বাব আত্ তাশাহ্হুদ)

এখন দেখুন! আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যাচনার জন্য এটি কত সুন্দর একটি দোয়া যে, শয়তানের প্রবঞ্চনা, তার সৃষ্ট প্ররোচনা এবং তার দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও তাঁর আশ্রয় প্রয়োজন। অতএব মানুষ নিজেই সবচেয়ে বেশি এমন সব বিষয়ের শিকারে পরিণত হয়। আমি পূর্বে উদাহরণ দিয়েছি যে (কিছু লোক) এতটা বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়, এত দূরে চলে যায় যে, পুণ্যবানদের জামা'তে আর থাকতেই পারে না– এরা অবশ্য ততটা অধঃপতিত হয় না। কিন্তু ছোটো ছোটো যে-সব দুর্বলতা রয়েছে সেগুলোর সংশোধনের জন্য খোদা তা'লার নিকট দোয়া করতে থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ,

জামা'তের কোনো কর্মকর্তা বা সাধারণ কর্মীদের মাঝে দেখা যায় অথবা জাগতিক ব্যবস্থাপনায় সাধারণ সম্পর্কের গণ্ডিতেও এটি হয়ে থাকে যে, কেউ যদি কাজের কোনো সুযোগ পায় কিংবা কাউকে কোনো কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়, সে তার পূর্ববর্তী কর্মকর্তা কিংবা কর্মীর দুর্বলতা বের করা আরম্ভ করে। যেমন বলে, দেখো! আমি কত উত্তমরূপে এই কাজটি সম্পাদন করেছি অথচ আমার পূর্ববর্তী কর্মকর্তা বা কর্মীর দ্বারা এটি করা সম্ভবই হয় নি। কিংবা তার মাঝে এটি করার মতো যোগ্যতাই ছিল না। অথচ সঠিক পদ্ধতি হলো, কাজ যদি হয়ে গিয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লার নিকট (আরো) সাহায্য প্রার্থনা করুন, তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন যে, তিনি আপনাকে এই কাজ করার তৌফিক প্রদান করেছেন যার ফলে এই কাজ আপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। আর এই দোয়া করুন, হে আল্লাহ্! এখন এ কারণে আমার হৃদয়ে কোনো অহংকার সৃষ্টি হতে দিও না এবং আমার সংশোধন করে দাও। যাহোক, এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে যা দৈনন্দিন জীবনে ঘটতে থাকে। তাই মানুষের সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত অন্যথায় শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের ফলে অন্ততপক্ষে যতটুকুই ভালো কাজ সম্পাদিত হয়েছে, সেসব কাজ করার পর, আমি এটি করেছি, সেটি করেছি মর্মে নিজের পুণ্য প্রকাশ করা নিতান্তই নিজের পুণ্যকে নষ্ট করা বইকি। এভাবে যদি নিজের সংশোধনের চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটিই শান্তির পথ হয়ে থাকে। শান্তির পথ খোঁজার মাঝেই মানুষের নিরাপত্তা নিহিত নতুবা যেমনটি বলা হয়েছে, তোমরা আলো থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাবে আর আলোর পথ থেকে অন্ধকারের দিকে যাওয়া হলো শয়তানের পথ অবলম্বন করা। তাই সদা শয়তানের হাত থেকে (বাঁচার জন্য) আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকো। আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করো এবং এ দোয়া করো, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর পানে নিয়ে যাও আর বাহ্যিক হোক বা অভ্যন্তরীণ, সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। বাহ্যিক বা দৃশ্যমান পাপের যতটুকু সম্পর্ক আছে, কিছু ভয় রয়েছে যেগুলো সেটি থেকে বিরত রাখার ভূমিকা পালন করে, কিন্তু গুপ্ত অশ্লীলতা এমন– যেগুলো কখনো কখনো মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে তাকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কখনো কখনো অশ্লীল দৃশ্য, নোংরা চলচ্চিত্র, সম্পূর্ণ নগ্ন ছায়াছবি কিংবা এ ধরনের অন্যান্য জিনিস দেখার মাধ্যমে মানুষ চোখের ব্যভিচারে লিপ্ত হতে থাকে। এরপর রয়েছে কল্পনার ব্যভিচার, যেমন- অশ্লীল বইপুস্তক পড়া কিংবা অশ্লীল চিন্তাধারা মাথায় আনা। কতক পরিবেশ এমন রয়েছে যেখানে বসে মানুষ এরূপ অশ্লীলতার মাঝে ডুবে যায়। এরপর রয়েছে নির্লজ্জ কথাবার্তা শোনা। তাই এই দোয়া শেখানো হয়েছে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বীয় অনুগ্রহে পবিত্র করে দাও এবং সর্বদা সেগুলো পবিত্র রাখো যেন আমরা শয়তানের পথ অবলম্বন না করি। আমাদের সবাইকে শয়তানের পথ অবলম্বন করা থেকে রক্ষা করো।

এছাড়া কতক পরিবারে স্ত্রী কিংবা স্বামীর কারণে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরস্পরের মাঝে পারিবারিক এবং সাংসারিক সম্পর্ক ভালো থাকে না। ছোটোখাটো কথাতেই ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে যায়। অথবা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধুবান্ধবদের কারণে কিছু কিছু সমস্যা সৃষ্টি

হতে দেখা যায়। এই বন্ধুবান্ধবদের চরিত্র এমন যে, তারা এমনভাবে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে যা বোঝা-ই যায় না। অতএব এরা হলো শয়তান যারা কিনা এমন সব পরিবারকে তাদের অজান্তে নিজেদের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। এরপর আসে সন্তানসন্ততির প্রশ্ন। পুণ্যবান সন্তানসন্ততি একটি নিয়ামতস্বরূপ যার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট সর্বদা তাঁর কৃপা যাচনা করা উচিত। সন্তান একটু বিগড়ে গেলেই পিতামাতার অনেক দুশ্চিন্তা হয়ে থাকে, তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় (অর্থাৎ দুশ্চিন্তা হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যেতে থাকে)। **এছাড়া অনেক সময় মেয়েরা এমন স্থানে বিয়ে করতে চায় যেখানে পিতামাতা কিছু কারণে বিয়ে দিতে চান না, যেমন- ছেলে আহমদী নয়, কিংবা ধর্মের সাথে সম্পর্ক নেই, কিন্তু মেয়ে জেদ ধরে বসে যে, আমি এখানেই বিয়ে করব। আবার কিছু ছেলে এমন কাজ করে বসে যা পুরো বংশের দুর্নামের কারণ হয়।** তাই এই দোয়া শেখানো হয়েছে, হে আল্লাহ্! আমাদের সন্তানদের কারণে যেন আমাদেরকে কোনো প্রকার পরীক্ষায় পড়তে না হয় বরং তাদের মাঝে আমাদের জন্য কল্যাণ রেখে দাও। এই দোয়া সন্তানের জন্ম থেকে বরং যখন থেকে জন্মের আশা করা হয় তখন থেকেই আরম্ভ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার শেখানো, **'রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুর্‌রাতা আ'ইউনিন ওয়াজয়ালনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা'**– দোয়া অনুসারে সবসময় দোয়া করে যাওয়া উচিত। মানুষ যখন সবসময় এই দোয়া করতে থাকবে যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করো, আমাদের প্রতি সর্বদা এই অনুগ্রহের দৃষ্টি রেখো, শয়তানকে কখনো আমাদের ওপর বিজয়ী হতে দিও না, আমাদের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিও এবং আমরা তোমার নিকট ক্ষমার ভিখারী। তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও আর পাপ ক্ষমা করার পর আমাদের প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি দাও যেন আমরা পুনরায় কখনো শয়তানের ফাঁদে পা না দেই। এতটুকু অনুগ্রহ করার পর তুমি আমাদেরকে তোমার নিয়ামতরাজির জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা বানিয়ে দাও তোমার পুরস্কার যারা স্মরণ রাখে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। সবচেয়ে বড়ো নিয়ামত যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ তা হলো, ঈমানের নিয়ামত, আমাদেরকে সর্বদা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। আমরা যেন কখনো এ থেকে বিচ্যুত না হই। এরপর **'রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব'** (আলে ইমরান: ৯) দোয়া পড়তে থাকুন। দোয়ার প্রতি মনোযোগ না থাকলে শয়তান বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন পথে এসে প্ররোচিত করতে থাকবে যা থেকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপা ব্যতীত রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়– যেমনটি আমি পূর্বেই বর্ণনা করে এসেছি। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথেই কথা বলেন, যে তাঁর নিকট পূর্ব থেকেই দোয়া করে অভ্যস্ত এবং যার প্রতি তাঁর কৃপা থাকে। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি হয়ে গেলে এই কৃপা আরো বৃদ্ধি পায়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর তফসীরে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এক পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন যার কাছে তার এক শিষ্য দীর্ঘকাল অবস্থান করে শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষা শেষে সে যখন নিজের বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল তখন সেই বুযূর্গ তাকে জিজ্ঞেস করেন, মিয়াঁ! তুমি তো নিজের বাড়িতে যাচ্ছো, তোমার দেশে কি শয়তান আছে? সে এই

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে বলে, শয়তান আবার কোথায় থাকে না? সব দেশেই শয়তান থাকে আর আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানেও শয়তান রয়েছে। বুযূর্গ ব্যক্তি বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে। সেখানে যদি শয়তান থেকে থাকে তাহলে তুমি আমার কাছে অবস্থান করে এতদিন যে শিক্ষা অর্জন করেছ সেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গেলে শয়তান অবশ্যই তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, এমন পরিস্থিতিতে তুমি কী করবে? সে বলল, আমি শয়তানের মোকাবিলা করব, তার সাথে লড়াই করব। সেই বুযূর্গ বলেন, খুব ভালো কথা, ধরো তুমি শয়তানের মোকাবিলা করলে আর শয়তান তোমার আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার মোকাবিলা করতে না পেরে পালিয়ে গেল। কিন্তু তুমি যখন পুনরায় আমল শুরু করবে তখন সে আবার আক্রমণ করবে, তখন তুমি কী করবে? সে বলল, আমিও পুনরায় শয়তানকে প্রতিহত করব। তিনি বলেন, সে যদি আবার পালিয়ে যায় এবং তুমি আবার শিক্ষার বাস্তবায়ন শুরু করলে চলে আসে। এভাবে তিনি যখন দুই-তিন বার জিজ্ঞেস করেন তখন সেই শিষ্য বলল, আমি তো বুঝতে পারছি না, আপনিই বলে দিন, আমি কীভাবে তার মোকাবিলা করব? আমি মোকাবিলা করতে গেলে তো শয়তান পালিয়ে যাবে আর যখন শিক্ষার বাস্তবায়ন আরম্ভ করব তখন শয়তান পুনরায় ফিরে আসবে। সেই বুযূর্গ বলেন, তুমি যদি তোমার কোনো বন্ধুর বাসায় যাও আর তার দরজার সামনে একটি কুকুর বাঁধা থাকে আর তোমাকে কামড় দিতে চায় তবে তুমি কী করবে? সে বলল, আমি আমার হাতে থাকা লাঠি কিংবা ছড়ি দিয়ে তাকে প্রতিহত করব অথবা মাটিতে কোনো পাথরের টুকরো দেখতে পেলে সেটি তাকে ছুড়ে মারব এবং তাকে তাড়িয়ে দেবো।

তিনি বলেন, ঠিক আছে, সে পালিয়ে গেল, কিন্তু এরপর তুমি যখন দরজায় প্রবেশ করতে যাবে তখন সে যদি তোমার পা ধরে ফেলে তাহলে তুমি কী করবে? সে বলল, আমি একইভাবে পুনরায় তাকে মারব। এভাবে যখন দুই-তিন বার তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কুকুরের সাথে কী করবে, তখন সে বলল, পরিশেষে আমি সেই বন্ধুকে ডাকব যে, দেখো! তোমার কুকুর আমাকে আসতে দিচ্ছে না, তুমি তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। তখন সেই বুযূর্গ বলেন, শয়তানের অবস্থাও ঠিক এমনই। শয়তানও আল্লাহ্ তা'লার কুকুর। সে যখন বার বার মানুষের ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী হতে বাধা দেয় তখন এর চিকিৎসা কেবল এটিই। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকো এবং তাঁকে আহ্বান করো যে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আসতে চাই কিন্তু তোমার এই কুকুর আমাকে আসতে দিচ্ছে না, তাকে থামাও যেন আমি তোমার কাছে পৌঁছাতে পারি। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে থামিয়ে দেবেন এবং মানুষ শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, সারকথা হলো কেবল আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের ফলেই পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হয়, যার পরে আর কোনো অবাধ্যতা ও পাপ বাকি থাকে না। মানুষের উচিত প্রথমে নিজে পবিত্র হওয়া, আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করা, তাঁর সামনে এই বলে কান্নাকাটি ও আহাজারি করা যে, আমাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো, তখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহও তার লাভ হয়। এরপর বলেন, এসব জিনিস আল্লাহ্ তা'লার কৃপার ফলেই অর্জিত হয় যেটিকে মানুষের দোয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

অতএব শয়তান থেকে আত্মরক্ষার উপায় হলো, এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং কেবল আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কান্নাকাটি করা আর আল্লাহ্ ভিন্ন কাউকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া।

শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য হাদীসে নিম্নলিখিত দোয়া শেখানো হয়েছে। হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দোয়া সম্পর্কে বলব যা মহানবী (সা.) আমাদেরকে শেখাতেন? সেই দোয়াটি হলো, হে আল্লাহ্! আমি ব্যর্থতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, চরম বার্ধক্য এবং কবরের আযাব হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার আল্লাহ্! আমার আত্মাকে এর জন্য নির্ধারিত তাকওয়া দান করো। **'ওয়া যাক্কিহা ওয়া আনতা খাইরু মান যাক্কাহা'–** আর এটিকে অর্থাৎ আত্মাকে পবিত্র করো কেননা তুমিই সর্বোত্তম পবিত্রকারী। মানুষকে পবিত্র করা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কেবল আমিই যাকে চাই পবিত্র করি। (দোয়া হলো,) তুমি তার একমাত্র বন্ধু এবং অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আমি এমন হৃদয় থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা বিনয়াবনত হয় না এবং এমন হৃদয় থেকেও (আশ্রয় চাই) যা কখনো তৃপ্ত হয় না আর এমন জ্ঞান থেকেও (আশ্রয় প্রার্থনা করছি) যা কোনো উপকারে আসে না এবং এমন দোয়া থেকেও (তোমার আশ্রয় চাই) যা গৃহীত হয় না। (সুনান নিসাঈ, কিতাবুল ইসতিআযাহ্ বাব আল ইসতিআযাহ্ মিনাল ইজয্)

এখন এটিও একটি পূর্ণ দোয়া, কেননা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই পবিত্র করে, পবিত্র রাখে এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কোনো ব্যক্তি নিজ বাহুবলে কখনো পাক-পবিত্র হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই কেবল যাকে চায় পবিত্র করে থাকে। পবিত্র করার জন্য একজন পবিত্রকারীরও প্রয়োজন যিনি পবিত্র করবেন। (এখানে স্মরণ রাখতে হবে,) জামা'ত থেকে পৃথক হয়ে কোনো ব্যক্তি যতই দাবি করুক না কেন যে, আমরা অনেক পবিত্র হয়ে গেছি আর সুখের বিষয় যে, আমরা জামা'ত থেকে স্বাধীন হয়ে গেছি! এগুলো নিতান্তই তাদের দাবি। আপনি যদি গিয়ে দেখেন তাহলে তাদের বাড়িতে কখনোই পবিত্রতা চোখে পড়বে না। অতএব পবিত্রকারীও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দারা হয়ে থাকেন, নবীগণ হয়ে থাকেন। তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীরাও পবিত্র হতে পারে। তাদের সাথে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে না তাদেরকে কখনো পবিত্র বলা যেতে পারে না। অতএব আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এতে বিধৃত 'তিনি যাকে চান পবিত্র করেন' সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লেখেন, এ থেকে একথা মনে কোরো না যে, (আল্লাহ্) চোখ বন্ধ করে যাকে খুশি তাকে পবিত্র করে দেবেন এবং যাকে চাইবেন না তাকে পবিত্র করবেন না। তাহলে পুণ্যকর্ম করার বা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যাচনা করার কোনো অর্থই হয় না। এর অর্থ হলো, যে খোদার প্রিয়পাত্র হয়ে যায় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করে তাকে খোদা নিজের প্রিয় করে নেন এবং তাকে পবিত্র করেন। সুতরাং বর্তমান যুগে প্রিয় সে-ই যে কিনা তাঁর প্রেমাস্পদের প্রিয়। যারা তাঁর প্রিয়জনের সাথে সম্পর্ক রাখে। অতএব এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীরাই হলো আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে পবিত্রতার সম্পর্ক থাকা

উচিত। শয়তান থেকে বাঁচার জন্য, পবিত্র হবার জন্য সর্বদা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ খোদার নিকট তাঁর কৃপা যাচনা করতে থাকা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'ফালা তুযাক্কু আনফুসাকুম'** থেকেও এটিই প্রমাণিত হয় যে, নিষ্পাপ এবং নিরাপদ হয়ে যাওয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, বরং এটি খোদা তা'লার কাজ। সকল জ্যোতি এবং শক্তি আকাশ থেকেই এসে থাকে। (আল-বদর, খণ্ড: ০২, সংখ্যা: ৪৪, ১৯ জুন ১৯০৩ সনে মুদ্রিত)

আত্মশুদ্ধি এমন একটি জিনিস যা আপনা আপনি লাভ হতে পারে না, তাই খোদা তা'লা বলেন, **'ফালা তুযাক্কু আনফুসাকুম হুয়া আ'লামু বিমানিত্তাকা'** অর্থাৎ তোমরা এটি মনে কোরো না যে, আমরা স্বীয় সত্তা কিংবা বুদ্ধির জোরে নিজে নিজেই পবিত্র হয়ে যাব। এটি ভ্রান্ত কথা। তিনি খুব ভালোভাবে জানেন যে, কে মুত্তাকী? (আল-বদর, খণ্ড: ০২, সংখ্যা: ৩৬, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ সনে মুদ্রিত)

অতঃপর তিনি বলেন, "হে প্রিয়গণ! খোদা তা'লার নির্দেশাবলিকে অবমূল্যায়ন কোরো না। আধুনিক দর্শনের বিষ যেন তোমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। এক শিশুর ন্যায় তাঁর নির্দেশাবলির অধীনে চলো। নামায পড়ো, নামায কায়েম করো, কেননা এটি সকল শক্তির উৎস আর যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন প্রভাগতভাবে নামায পড়বে না, বরং নামাযের পূর্বে যেভাবে তুমি বাহ্যিকভাবে ওযূ করো, ঠিক সেভাবে অভ্যন্তরীণ ওযূও করো এবং নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সত্তার চিন্তা থেকে মুক্ত করে নাও। এরপর তুমি উভয় (দৈহিক ও আধ্যাত্মিক) ওযূ করে দাঁড়িয়ে যাও এবং নামাযে অনেক দোয়া করো। কান্নাকাটি এবং আহাজারি করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নাও, যেন তোমার প্রতি কৃপা করা যায়। সততা অবলম্বন করো, সততা অবলম্বন করো, কেননা খোদা দেখছেন যে, তোমাদের হৃদয়ের চিত্র কেমন! মানুষ কি তাঁকেও ধোঁকা দিতে পারে? তাঁর সামনেও কি ষড়যন্ত্র চলতে পারে? চরম হতভাগা ব্যক্তি নৈরাজ্যপূর্ণ কার্যকলাপকে এতটা বাড়িয়ে দেয় যেন খোদা-ই নেই। তখন তাকে অতি শীঘ্র ধ্বংস করা হয় এবং খোদা তা'লা তার কোনো পরোয়াই করেন না।

হে প্রিয়গণ! এ পৃথিবীর নিরস-নিরেট যুক্তি হলো একপ্রকার শয়তান এবং এ জগতের অন্তসারশূন্য দর্শন হলো এক ইবলীস, যে কিনা ঈমানের জ্যোতিকে ভীষণভাবে নিষ্প্রভ করে দেয়, ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করে এবং নাস্তিকতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। অতএব এ থেকে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করো এবং এমন হৃদয় সৃষ্টি করো যা হবে বিনয়ী ও নমনীয়। কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য ছাড়াই তোমরা খোদার নির্দেশাবলির মান্যকারী হয়ে যাও যেভাবে এক শিশু তার মায়ের কথা শুনে থাকে। কুরআন করীমের শিক্ষামালা তাকওয়ার উচ্চস্তরে উপনীত করতে চায়, সেগুলোর প্রতি কর্ণপাত করো এবং সে অনুযায়ী নিজেদেরকে গড়ে তোলো।

তিনি আবার বলেন "তোমরা তাঁর নিকট গ্রহণীয় হতে পারো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ভেতর-বাহির সমান না হবে। বড়ো হয়ে ছোটোদের প্রতি দয়া করো,

তুচ্ছতাচ্ছিল্য নয়। জ্ঞানী হয়ে অজ্ঞদেরকে আত্মগরিমাবশত হেয় কোরো না, বরং সদুপদেশ দাও। আর ধনী হয়ে আত্মশ্লাঘাবশত দরিদ্রদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন কোরো না, বরং তাদের সেবা করো। ধ্বংসের পথসমূহকে ভয় করো। সর্বদা আল্লাহ্-কে ভয় করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো। ....খোদা তা'লা চান যেন তোমাদের জীবনে পূর্ণ বিপ্লব সাধিত হয়। আর তিনি তোমাদের নিকট এক মৃত্যু চান যার পরে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা পরস্পরের মাঝে দ্রুত মীমাংসা করে নাও এবং নিজ ভাইদের অপরাধ ক্ষমা করো, কেননা যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের সাথে মীমাংসা করতে রাজি নয়; সে কর্তিত হবে কেননা সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা স্বীয় প্রবৃত্তির পূজা করা সর্বতোভাবে ছেড়ে দাও আর পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিহার করো এবং সত্যবাদী হয়ে মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও যেন তোমাদেরকে মার্জনা করা হয়। রিপুর স্থূলতা বর্জন করো কেননা যে দ্বারে প্রবেশের জন্য তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে সে পথে কোনো স্থূলকায় ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না। কত হতভাগা সেই ব্যক্তি! যে কিনা আমার দ্বারা বর্ণিত খোদা তা'লার মুখনিঃসৃত বাণীসমূহ মানে না। তোমরা যদি ঊর্ধ্বলোকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও তাহলে সহোদর ভাইয়ের ন্যায় হয়ে যাও। তোমাদের মাঝে সে-ই অধিক মহৎ, যে নিজ ভাইয়ের অপরাধ সর্বাধিক ক্ষমা করে আর হতভাগা সেই ব্যক্তি যে কিনা হঠকারিতাবশত ক্ষমা করে না। .... তোমরা নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে খোদা তা'লার বন্ধু হয়ে যাও, যেন তিনিও তোমাদের বন্ধু হয়ে যান। তোমরা নিজ অধীনস্থদের প্রতি, স্ত্রীদের প্রতি এবং দরিদ্র ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, যেন স্বর্গেও তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়। তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁর হয়ে যাও, যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৯, পৃ. ১২-১৩)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "ঐশী জ্যোতির বিকাশ এবং কৃপারাজি প্রকাশিত হবার জন্য দোয়া করা অত্যন্ত জরুরি। তাই সর্বদা এর জন্য সোচ্চার থেকো আর কখনো ক্লান্ত হয়ো না। মোটকথা, আত্মশুদ্ধি এবং শুভ পরিণামের জন্য আর পুণ্য কাজের সামর্থ্য অর্জনের জন্য দ্বিতীয় উপায় হলো দোয়া। এক্ষেত্রে যত বেশি আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং স্খলনমুক্ত পদচারণা করবে ততই উত্তম পরিণাম ও উত্তম ফলাফল লাভ হবে। সকল সমস্যা দূরীভূত হবে এবং প্রার্থনাকারী তাকওয়ার উন্নত মানে পৌঁছে যাবে। এটি একেবারেই সত্য কথা, খোদা তা'লা যতক্ষণ কাউকে পবিত্র না করেন কেউ পবিত্র হতে পারে না। খোদা তা'লার অনুগ্রহ এবং আন্তরিক প্রেরণার মাধ্যমেই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার মৃত্যু ঘটে। আর এই অনুগ্রহ ও প্রেরণা দোয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এই শক্তি কেবল দোয়ার কল্যাণেই লাভ হয়ে থাকে। [তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০১, পৃ. ৬৫৮]

তিনি (আ.) আরো বলেন, তাকওয়ার দুটি স্তর রয়েছে। পাপ এড়িয়ে চলা এবং পুণ্য কাজে তৎপর হওয়া। দ্বিতীয় স্তর হলো পুণ্যবানদের। এই স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন না আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতীত এই মর্যাদা ও স্তর অর্জন সম্ভব নয়। মানুষ যখন পাপ এড়িয়ে চলে এবং পুণ্যকাজ করার জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায়

আর সে খোদা তা'লার দরবারে দোয়া করে তখন খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহে তার হাত ধরেন এবং তাকে শান্তির নীড়ে পৌঁছে দেন (অর্থাৎ নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন)।

আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখুন, স্বীয় সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন, আমাদেরকে তাঁর ইবাদতকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলির আলোকে তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য প্রদানেরও সামর্থ্য দান করুন এবং আমাদেরকে সর্বদা তাঁর শান্তির নীড়ে স্থান দিন। আমীন।

(৩৫)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ১৯ ফাতাহ্, ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

(আত-তাওবা: ১১৯)

এ আয়াতের অর্থ হলো, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাহচর্যে থাকো।"

পৃথিবীতে নবীরা বিপথগামী মানুষকে অর্থাৎ যারা স্বীয় প্রভুর নিকট থেকে দূরে সরে যায় এবং পথভ্রষ্ট হয় তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এসে থাকেন। এসব মানুষকে খোদা তা'লার কাছে টেনে আনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা নবীদের প্রেরণ করেন। সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এই সঠিক ও সহজসরল পথ পাওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই সকল নবী সত্যের শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং সাহসিকতার সাথে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এক খোদার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, এখন ধর্মকে পূর্ণতা দেবার সময় এসে গেছে, এখন মানুষের চিন্তা-চেতনা পরিপক্বতা লাভ করেছে, তখন আল্লাহ্ তা'লা সত্যের মূর্তপ্রতীক হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-কে এই ধরাধামে আবির্ভূত করেছেন; যিনি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সকল বিষয়ে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং সর্বদা একে কর্মে বাস্তবায়নের উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে মুমিনরা! তোমরা যেহেতু এখন ঈমান এনেছ, কাজেই যদি এই ঈমানকে আরো দৃঢ় করতে চাও তবে আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করো। সর্বাবস্থায় তাঁর ভয় যেন তোমাদের হৃদয়ে বিরাজ করে আর সদা সত্যের পানে আহ্বানকারী, সত্য-পথ প্রদর্শনকারী এবং সত্যবাদী ও সত্যভাষী হও। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো, সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং সৎ লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করো। বর্তমানে জগতে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বড়ো কোনো সত্যবাদী নেই যিনি এত গভীরতা ও সূক্ষ্মতায় গিয়ে তোমাদেরকে সত্য, ন্যায় ও সততার শিক্ষা দেবেন। কাজেই, তোমরা এই নবীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও এবং খোদার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে এই সত্য নবী তোমাদেরকে যে শিক্ষা প্রদান করেছেন, তা কার্যত বাস্তবায়ন করো। আমরা আহমদীরা এর চেয়েও বেশি সৌভাগ্যবান, এজন্য আমরা যতই আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি কিংবা যতই প্রশংসা করি তা হবে অপ্রতুল; কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ যুগে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক এবং তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ

যুগের ইমাম মাহদী ও মসীহ্ (আ.)-কে মানার সৌভাগ্য দান করেছেন। যিনি আমাদেরকে এই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিকগুলো আরো বিশদভাবে দেখিয়েছেন এবং বর্ণনা করেছেন আর এই সত্য শিক্ষামালা সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য তিনি বিশদ উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি (আ.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, পবিত্র কুরআনে যেভাবে সত্য ও সততা অবলম্বনের বিষয়ে উপদেশ বিদ্যমান তা অন্য কোনো কিতাবে নেই।

তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে যেভাবে সত্য ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার জোর তাগিদ রয়েছে তার এক-দশমাংশও ইনজীলে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। অধিকন্তু তিনি (আ.) এ বিষয়ে খ্রিষ্টানদেরকে এই বলে চ্যালেঞ্জও দিয়েছিলেন যে, কুরআনে যেভাবে সততা ও সত্যসংবলিত শিক্ষা বিদ্যমান তোমরা যদি ইনজীলে অনুরূপ শিক্ষা রয়েছে বলে দেখাতে পারো তাহলে আমি তোমাদেরকে মোটা অংকের পুরস্কার প্রদান করব।

তিনি (আ.) আরো বলেন, পবিত্র কুরআনে মিথ্যাচার অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলাকে প্রতিমাপূজার সমতুল্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

(আল-হাজ্জ: ৩১)

অর্থাৎ অতএব মূর্তিপূজার অপবিত্রতা পরিহার করো আর মিথ্যা কথা বলাও পরিহার করো (সূরা আল-হাজ্জ: ৩১)। অনুরূপভাবে আরেক স্থানে আল্লাহ্ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

(আন-নিসা: ১৩৬)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে সাক্ষী হিসাবে ন্যায়ের স্বপক্ষে দৃঢ় অবস্থান নাও, আর তা যদি তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার অথবা স্বজনদের বিরুদ্ধেও যায়। (নূরুল কুরআন, খণ্ড: ০২, পৃ. ১৭-১৮)

অতএব এত জোরালো তাগিদ দেবার পর সত্যবাদিতার বৈশিষ্ট্যকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করা ও রপ্ত করার কত বড়ো গুরুদায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায়। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, আমরা যেন সর্বাবস্থায় সত্য বলি।

এখন আমি হাদীসের আলোকে বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট করছি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো পাপের বিষয়ে অবগত করব না? আমরা নিবেদন করলাম, জি হুযূর (সা.)! অবশ্যই বলুন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা (সবচেয়ে বড়ো পাপগুলোর অন্যতম) এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। একথা বলার সময় তিনি (সা.) বালিশে হেলান দিয়ে বসা অবস্থা থেকে হঠাৎ করে উত্তেজনার বশে সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং বজ্রকণ্ঠে বললেন, দেখো! তৃতীয় বড়ো পাপ হলো, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য

প্রদান করা। তিনি (সা.) একথাটি এতবার পুনরাবৃত্তি করলেন যে, আমাদের বাসনা হলো, হায়! হুযূর যদি এবার থামতেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদব বাব উকূকুল ওয়ালিদাইন)

অতএব এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) মিথ্যা বলাকে কতটা ঘৃণা করতেন! আর তাঁর (সা.) প্রতিটি শিক্ষাই ছিল আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলি অনুসারে। প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, শিরক এবং মিথ্যা মূলত একই জিনিসের দুটি ভিন্ন নাম। মানুষ নিজের ভেতরে অনেক (পূজনীয়) প্রতিমা বানিয়ে রাখে আর মিথ্যারও অনেক প্রতিমা বানিয়ে রাখে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বর্তমানে বিশ্বের অবস্থা খুবই শোচনীয়। যে আঙ্গিকে বা যেভাবেই দেখো না কেন তোমরা দেখবে, মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করানো হয়, মিথ্যা মামলা দায়ের করাকে কিছুই মনে করা হয় না এবং জাল দলিলপত্র বানিয়ে নেওয়া হয় (অর্থাৎ জাল নথিপত্র তৈরি করা হয়, মিথ্যা মামলা সাজানো হয়, শুনানি মিথ্যা, সাক্ষী মিথ্যা– মোটকথা, সবকিছুই মিথ্যা)। কোনো বিষয় বর্ণনা করলে সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে কথা বলে। যারা মনে করে, এ জামা'ত তথা আহমদীয়া জামা'তের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, তাদেরকে কেউ যদি এখন জিজ্ঞেস করে, মহানবী (সা.) কি এ ধর্মই নিয়ে এসেছিলেন? আল্লাহ্ তা'লা তো মিথ্যাকে নোংরামি আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, এটিকে পরিহার করো অর্থাৎ–

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকে প্রতিমাপূজার সাথে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। নির্বোধ মানুষ যেভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে দিয়ে পাথরকে সিজদা করে তেমনি সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য মিথ্যাকে প্রতিমা বানায়। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা প্রতিমাপূজার সাথে মিথ্যাকে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত করেছেন অর্থাৎ একজন প্রতিমাপূজারি যেমন প্রতিমার কাছে মুক্তি চায় (অর্থাৎ সে মনে করে, প্রতিমাই তাকে তার সমস্যাবলি থেকে মুক্তি দেবে) ঠিক একইভাবে এক মিথ্যাবাদীও নিজের পক্ষ থেকে (মিথ্যাকে) প্রতিমা বানিয়ে নেয় এবং মনে করে, এই প্রতিমার মাধ্যমে সে মুক্তি পেয়ে যাবে! কতটা অবক্ষয় হয়েছে দেখুন! তাদেরকে যদি বলা হয়, প্রতিমার পূজা কেন করো? এই অপবিত্রতা বর্জন করো। তখন তারা বলে, আমরা এটি কীভাবে ছাড়তে পারি, মিথ্যা ছাড়া তো চলা সম্ভব নয়। এর চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে, মিথ্যাকে তারা নিজেদের সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করছি, চূড়ান্ত পর্যায়ে সত্যেরই জয় হয় আর সকল কল্যাণ ও বিজয় এরই মাঝে নিহিত। (মলফুযাত, খণ্ড: ০৮, পৃ. ৩৪৯-৩৫০)

তারা মনে করে, অন্তরে তারা যে-সব প্রতিমাকে স্থান দিয়ে রেখেছে সেসবের মাধ্যমেই মুক্তি লাভ হবে। এই প্রতিমাও অনেক ধরনের হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষ হরেক প্রকারের প্রতিমা নিজেদের হৃদয়ে লালন করছে। বিভিন্ন পেশায় সততার অভাব এবং মিথ্যার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের প্রতিমা-ই তারা নিজেদের হৃদয়ে লালন করছে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, এ বিষয়ে যখন তাদের জিজ্ঞেস করা

হয় তখন তারা বলে, মিথ্যা ছাড়া এ কাজ হতেই পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ওকালতি পেশা খুবই সম্মানজনক একটি পেশা– যদি সঠিক পদ্ধতিতে অবলম্বন করা হয় তাহলে। কিন্তু কিছু উকিলের বদভ্যাস হলো, কোনো সোজা-সরল কেইসও তারা এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, এতে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানোর ফলে কখনো কখনো তার মক্কেলের ক্ষতি হয়ে যায় বা তার ক্ষতি করে। এখানে ইউরোপের দেশগুলোতেও আহমদীরা আসে এবং অ্যাসাইলেম-এর কেইস অনেক সময় খুবই সহজ হয়। আর সঠিক পন্থা অবলম্বন করলে সেগুলো সহজে সমাধান করা যেতে পারে কিন্তু বিনা কারণে তারা এমন সব জটিলতার মুখে মামলাকে ঠেলে দেয় যে, নিখাদ ও ভেজালমুক্ত কেইসও নষ্ট হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো মক্কেলের সাথে তারা সঠিক ও সহজভাবে কথাই বলে না, তাদেরকে সঠিক চিত্র সম্পর্কে অবহিত করে না এবং দীর্ঘদিন পর খোঁজ নিলে জানা যায়, কেইসই চালানো হচ্ছে না। একইভাবে আমাদের দেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও কিছু অশিক্ষিত মানুষকে উকিলরা অনেক ঘুরিয়ে থাকে। আদালতে কেইস উত্থাপন না করেই মক্কেলের কাছ থেকে টাকা নিতে থাকে। এরপর অপরাধীকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়ে থাকে আর যাদের কাছ থেকে ফি আদায় করে তাদের সাথেও মিথ্যা বলে, গড়িমসি করে এবং অসত্য কথা বলে থাকে। অতএব এমন আরো অনেক বিষয় রয়েছে। এমন লোকেরা অর্থাৎ এমন উকিলরা মনে করে, এভাবে কথা না বললে বা হেরফের না করলে কিংবা ধোঁকা না দিলে তাড়াতাড়ি মামলা নিষ্পত্তি করা হলে রিযক শেষ হয়ে যাবে বা তাদের আয় বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব এমন অসত্য কথা বলা ও মিথ্যাই তাদের উপার্জনের উৎস হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের রিযকদাতা আমি।

তাই আহমদী উকিলদের এসব বিষয় থেকে পবিত্র থাকা উচিত। আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমরা তখন ফয়সালাবাদে থাকতাম। তখন আমরা খোদ্দামুল আহমদীয়ার খিদমতে খালক বিভাগের অধীনে গ্রামের লোকদের কল্যাণার্থে বা তাদের প্রয়োজন মেটাতে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফরে যেতাম। কৃষকদের কী কী প্রয়োজন সেগুলো অনুসন্ধান করতে যেতাম। এমনই একটি দলের সাথে আমিও যাই। গ্রামের এক ব্যক্তি বসে ছিল, আলাপচারিতায় সে বুঝে গেল, আমরা আহমদী। সাধারণত কেউ না জিজ্ঞেস করলে এটি প্রকাশ করা হতো না। তিনি বললেন, ফয়সালাবাদে শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার নামে একজন উকিল আছেন, তিনি খুবই পুণ্যবান ও সৎ মানুষ। তিনি কখনো অসত্য বিবৃতি দেন না এবং কখনো কোনো মিথ্যা মামলা নেন না। কিন্তু (সে ব্যক্তি পাঞ্জাবি ভাষায় বলল) তার একটাই দোষ আর তা হলো, সে মির্যায়ী। মির্যায়ী তথা আহমদী হওয়াই কেবল তার দোষ ছিল এছাড়া তার আর কোনো ত্রুটি বের করতে পারি নি। যাহোক, তার না জানার কারণে কিংবা মৌলবিরা যেভাবে তাকে বলেছে সেভাবেই সে প্রকাশ করেছে কিন্তু তার একথা শুনে আবু জাহলের কথা মনে পড়ে যে-কিনা মহানবী (সা.)-কে বলেছিল–

إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ بَلْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ

অর্থাৎ আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না, তুমি সৎ ও সত্যবাদী; তবে যে শিক্ষা

তুমি নিয়ে এসেছ সেটিকে আমরা মিথ্যা আখ্যা দিচ্ছি। (জামে তিরমিযী, কিতাবুত্ তফসীর, তফসীর সূরাতুল আনআম, হাদীস নং: ৩০৬৪ ই.ফা.)

অতএব বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর আমল করার মাধ্যমে এবং কেবল তাঁরই প্রকৃত অনুসরণের ফলে এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা সম্ভব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের সদস্যরাই কেবল এই দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে। আহমদীদের সম্পর্কে কখনো যেন কেউ এটি বলতে না পারে বা কেউ যেন আঙুল তুলতে না পারে যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। এছাড়া শিক্ষাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা তো অস্বীকারকারীদের চিরাচরিত সুন্নত।

এরপর রয়েছেন ডাক্তাররা। ডাক্তারদের কেউ কেউ ভুল রিপোর্ট বানিয়ে দেন। আবার কখনো কখনো মিথ্যা মামলাও বানিয়ে দেন। অতএব যারা নিজেদের পেশার ক্ষেত্রে অসাধুতা অবলম্বন করে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েই তা করে থাকে কেননা বিশ্বাসঘাতকতা মিথ্যা ছাড়া আর কী?

এরপর শিক্ষকরা রয়েছেন। কিছু শিক্ষক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের এই মর্যাদাপূর্ণ পেশাকে দুর্নাম করছেন। ঘুষ কিংবা উৎকোচ নিয়ে পরীক্ষায় মনগড়া নম্বর দিয়ে থাকেন বরং কোনো কোনো দেশে কেউ কেউ জাল সনদ ব্যবহার করে চাকুরি নিয়েছে, অথচ তাদের কোনো যোগ্যতাই নেই। এমন ভয়ংকর পাপাচার আমাদের সমাজে বিরাজমান রয়েছে যে, পাকিস্তানসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এগুলো কোনো গোপন বিষয় নয় বরং এসব কথা পত্রপত্রিকাতেও আসে।

অতএব যখন মিথ্যাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে তখন মূল্যবোধ হারিয়ে যেতে থাকে আর একসময় গোটা সমাজই চেতনা হারিয়ে বসে এবং আল্লাহ্‌বিমুখ হয়ে যায়। তাই এমন সমাজে এসব বিষয় থেকে আহমদীদের নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে। নিজের মধ্যে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে এই চেতনা সৃষ্টি করতে হবে যে, আহমদী হবার কারণে তোমাকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। এর ফলে যত বড়ো ক্ষতির আশঙ্কাই থাকুক না কেন, সেদিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করবে না। কাজেই, প্রত্যেক আহমদী– হোক সে চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী কিংবা অন্য কোনো পেশায় তাকে এই অঙ্গীকার করতে হবে যে, আমি কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেব না। ব্যাবসার বিষয়টি ভেবে দেখুন; কোনো কোনো ব্যবসায়ী নিজের জিনিস বিক্রয় করার জন্য মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে। সাময়িকভাবে তাদের কাছে এটি লাভজনক মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যার পথ অবলম্বন করে তারা শিরকের পথে পা বাড়ায়। অতএব বর্তমান যুগে চলার পথে আহমদীদের অনেক সাবধানে পদচারণা করা উচিত কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর এবং 'মিথ্যাকে ঘৃণা করব' এই অঙ্গীকার করার পর অসাবধান হবার অর্থ হলো, আমরা মনে করছি যে, মিথ্যা বলে হয়ত আল্লাহ্ তা'লাকে প্রতারিত করতে পারব, নাউযুবিল্লাহ্। তাই সত্যিই ভয়ের বিষয় আর অনেক সাবধানতা অবলম্বনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত হাসান বিন আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে যে, সন্দেহে নিপতিত করে এমন বিষয়াবলি বর্জন করো। সন্দেহমুক্ত দৃঢ় বিশ্বাস অবলম্বন করো, কেননা বিশ্বাসপ্রদ সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকে। (তিরমিযী, কিতাব সিফাতুল কিয়ামাহ্, বাব মা জাআ ফি আওয়ানিয়াল হাওয....)

অনেক সময় মানুষ বলে, আমরা মিথ্যা বলি নি অথচ তারা এমন ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে যা মূলত মিথ্যাই হয়ে থাকে। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সন্দেহমুক্ত সত্য কথা বলো এবং সন্দেহ সৃষ্টি করে এমন কথাবার্তা পরিহার করো।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, কোনো বান্দার অন্তরে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, সত্য ও মিথ্যা এবং আমানত ও খিয়ানত সহাবস্থান করতে পারে না। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ০২, পৃ. ৩৪৯, লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

অতঃপর আরেকটি হাদীস রয়েছে। এটিও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস, মহানবী (সা.) বলেন, একজন মানুষের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তা-ই লোকদের মাঝে বলে বেড়ায়। (মুসলিম, মুকাদ্দামা, বাব আন্ নাহা আনিল হাদীস বিকুল্লি মা সামেয়া)

কিছু মানুষ কেবল মজা পাবার জন্য এদিক-সেদিক কথা বলে বেড়ায় অর্থাৎ একের কাছ থেকে অন্যের কাছে, এরপর তার কাছ থেকে আবার অপরজনের কাছে বলে বেড়ায়। অতএব এ হাদীস অনুযায়ী আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যেন আমরা অজ্ঞাতসারে কিংবা জেনেশুনে নিজেদের গায়ে এই মিথ্যাবাদীর তকমা না লাগাই।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, কেউ যদি তার সন্তানদের বলে, (এটি পিতামাতার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং শোনার মতো একটি কথা) আসো! আমি তোমাকে কিছু দেবো, কিন্তু যদি সে না দেয় তাহলে এটি মিথ্যার শামিল হবে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ০২, পৃ. ৪৫২, লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

এর অর্থ হলো, ছেলেমেয়েদের মধ্যে তখন সত্য-মিথ্যার চেতনাবোধটুকুও হারিয়ে যাবে। তার তরবিয়ত বা সুশিক্ষার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ কেননা আমাদেরকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরবিয়তও করতে হবে আর এটি অনেক বড়ো দায়িত্ব। এছাড়া প্রতিটি গ্রামে ও শহরে ওয়াকেফীনে নও ছেলেমেয়েদের অনেক বড়ো একটি সংখ্যা রয়েছে। তাদেরকে যদিও পারিবারিক আঙিনায় তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণ দিতে হবে, কিন্তু আহমদী পরিবেশেও তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই, বাল্যকাল থেকেই তাদের হৃদয়ে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা এবং সত্যের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা উচিত। এ কারণে প্রত্যেককে সর্বদা এবং প্রতিনিয়ত অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী (সা.) আমাদের

বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, আসো! আমি তোমাকে কিছু দিচ্ছি। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তাকে কী দিতে চাচ্ছো? তিনি নিবেদন করলেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় মিথ্যা বলার অপরাধ লেখা হতো। (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফিত্ তাশদীদে ফিল কিয্ব)

অতএব দেখুন! এটি কত বড়ো সতর্কবাণী!

অতঃপর হযরত আসমা (রা.)-এর নিকট থেকে হযরত ফাতেমা (রা.) বর্ণনা করেন, একজন মহিলা মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার একজন সতীন আছে। আমি যদি তাকে মিছেমিছি (কেবল উত্যক্ত কিংবা বিরক্ত করার জন্য) বলি যে, আমার স্বামী আমাকে অমুকতমুক জিনিস দিয়েছে যদিও বাস্তবে সে দেয় নি, তাহলে আমার কি কোনো পাপ হবে? মহানবী (সা.) বলেন, যা হস্তগত হয় নি তা মিছেমিছি পাবার ভান করা মিথ্যার পোশাক পরিধান করারই নামান্তর। (মুসলিম, কিতাবুয্ যিনাত কিতাবুল্ লেবাস ওয়ায্ যিনাহ্, বাব আন নাহা আনিত্ তাযভীর....)

অতএব এটিও মূলত মিথ্যা। এ সমাজেও কোনো কোনো সময় প্রতিযোগিতামূলকভাবে মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া হয়। অনেক সময় কাউকে ছোটো করার মানসে প্রচার করে যে, আমার অফিসের বড়ো স্যারের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক আছে। বিনা কারণে তখন এমন লোকেরা প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। এছাড়া আত্মীয়দের মাঝে নিছক উত্যক্ত করার মানসে কিংবা অন্য কারণেও যেমন কাউকে খ্যাপানোর উদ্দেশ্যে এমনটি করা হয়; যদিও এটি অপছন্দনীয় বিষয়। কারো সাথে যদি কারো সম্পর্ক থাকে তবে এতে করে জ্বলন কিংবা প্রতিহিংসা দেখা দেবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু যারাই এমনটি করে তারা মিথ্যার ছলে এমন ভাব প্রকাশ করে। এমন কথা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান সে নিশ্চিত মুনাফিক। আর এগুলোর মধ্য থেকে কারো মাঝে যদি একটি বিষয় পাওয়া যায় তার মধ্যে কপটতার একটি অংশ বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যতক্ষণ না সে সেটিকে পরিত্যাগ করে। বাকিগুলো কী? প্রথম বিষয় হলো, সে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে অর্থাৎ তার কথায় মিথ্যা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, কোনো চুক্তি করলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তৃতীয়টি হলো, সে কোনো অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে এবং চতুর্থ বিষয় হলো, ঝগড়াবিবাদের সময় সে গালাগালি করে। (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, এলামাতুল মুনাফিক)

এই হাদীসের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রতিটি বিষয় মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট অর্থাৎ প্রতিটি কথায় মিথ্যা বলার অভ্যাস থাকে। অনেক সময় কিছু মানুষ প্রকাশ্যে মিথ্যা বলে না বরং এমনভাবে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে এবং আরেকজনের কাছে এমনভাবে পৌঁছায় যে, শ্রোতা এর কোনো অর্থ উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। অনেক সময় এমন প্যাঁচানো কথা দুটি মনে ফাঁটল সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে।

উভয়ের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ পর্যন্ত বিষয় গড়ায়। জামা'তী ব্যবস্থাপনা কিংবা আত্মীয়স্বজনরা মিলে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করলে তদন্তের পর জানা যায়, বিষয়ের সূত্রপাতেই মিথ্যা ছিল। দ্বিতীয়পক্ষের প্রতি যে কথা আরোপ করা হয়েছিল, বিষয় আসলে এমনটি ছিলই না। যে ব্যক্তি একথা বলেছিল তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কেন এমন কথা বলে দুইজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলে! ঝগড়াবিবাদ বাঁধিয়ে দিলে? তখন সে অবলীলায় বলে বসে, আমি তো কথাটি এভাবে বলি নি। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। অতএব এমন মানুষ চালাক সাজে আর শুধু উপভোগ করার জন্য মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করে। তারা প্রকাশ্যে মিথ্যা বলুক কিংবা গোপনে, মহানবী (সা.) তাদেরকে মুনাফিকের পর্যায়ে রেখেছেন, কেননা মুমিনের জন্য সহজসরল কথা বলার স্পষ্ট আদেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, সোজাসাপ্টা এবং বোধগম্য কথা বলবে। কোনো প্রকার সন্দেহ যেন সৃষ্টি না হয় এবং এ কারণে বা একথার কারণে কারো অন্তরে যেন ফাঁটল সৃষ্টি না হয়।

অতঃপর কপটাচার বা মুনাফিকাতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, চুক্তি করার পর সে বিশ্বাসঘাতকতা করে অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গ করে। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ লক্ষ করুন; অসহায়, নিরুপায় ও নির্যাতনের জাঁতাকলে পিষ্ট মুসলমানরা যখন মক্কা থেকে মদীনায় চলে আসত তখন কাফিরদের সাথে 'এমন মুসলমানদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে' মর্মে চুক্তি থাকার কারণে তিনি (সা.) তাদের করুণ অবস্থা সত্ত্বেও নিজের আবেগকে পদদলিত করে তাদেরকে ফেরত পাঠাতেন। অতএব আমাদের সামনে এই হলো সর্বোত্তম আদর্শ। বর্তমানে বড়ো বড়ো রাষ্ট্র পরস্পর চুক্তি করে এরপর আবার তারাই তা ভঙ্গও করে। বিশেষভাবে মুসলমান কিংবা অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর সাথে যদি চুক্তির বিষয় থাকে তাহলে তো জিজ্ঞাসা করার কেউই থাকে না; অথচ ইসলামের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই আপত্তি উত্থাপন করে। যাহোক, তাদের কর্মের ফল তারাই পাবে কিন্তু মুসলমানদের জন্যও একই উপদেশ, তোমরা যদি চুক্তিভঙ্গ করো তাহলে তোমাদের মধ্যে কপটতার বীজ রয়েছে; অতএব চিন্তা করো এবং এই পাপ নিজেদের মধ্য থেকে সমূলে উৎপাটন করো।

এখন আমি পারিবারিক পর্যায়ে তথা আত্মীয়তার গণ্ডিতে সংগঠিত বিভিন্ন চুক্তির কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করতে চাই। বিয়েশাদির বিষয়টিও একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে চুক্তির মর্যাদা রাখে। নারীর প্রতি নির্দেশ হলো, বিয়ের এই চুক্তির ভিত্তিতে তোমাদের ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তায় যেমন- স্বামীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রাখা, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করা, পারিবারিক দায়িত্ব পালন প্রভৃতি। একইভাবে স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব একজন পুরুষের ওপর ন্যস্ত। তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্বও তার স্কন্ধে অর্পিত। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে সন্তানদের তরবিয়ত করতে হবে, এর দায়িত্ব তাদের উভয়ের ওপর বর্তায়। অতএব স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজ নিজ চুক্তি পালনার্থে যত বেশি একে অপরের অধিকার রক্ষার বিষয়ে যত্নবান হবে ততই সুন্দর হতে থাকবে।

কিন্তু অনেক সময় কিছু ঘটনা শুনে বা দেখে মন খুবই খারাপ হয়ে যায়। এখানে

ইউরোপ তথা পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসকারী কোনো মেয়ের বিয়ে যদি পাকিস্তান কিংবা ভারত প্রভৃতি দেশের কারো সাথে হয় তাহলে মেয়েটি স্পন্সর করে ছেলেকে এখানে ডাকে। আনন্দের মাঝে বিয়ের পরবর্তী দিনগুলো কাটে এমনকি সন্তান হয়ে যায়। কিন্তু ছেলের কাগজপত্র যখন সুসম্পন্ন হয়ে যায়, তখন অন্যায়ভাবে মেয়ের ওপর নির্যাতন করা আরম্ভ করে এই ভেবে যে, এখন কেউ আমাকে এদেশ থেকে বের করতে পারবে না। এভাবে সে একটি পবিত্র সম্পর্ক ও চুক্তি ভঙ্গকারীর নোংরা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ সময় বিবাদের মূল ভিত্তি কেবল অজুহাত হয়ে থাকে এবং মিথ্যাভিত্তিক কথাবার্তা হয়ে থাকে। অন্তঃসারশূন্য কথা হয়ে থাকে। মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে। অতএব এমন লোকেরাও মুনাফিকের দলভুক্তই হয়ে থাকে। আহমদীদের তথা আমাদের প্রত্যেকের এ বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

অতঃপর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় করা। এটিও মিথ্যার একটি প্রকারভেদ। আর বর্তমান সমাজে সরকার থেকে শুরু করে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির অবস্থা হলো তারা যখন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়, গোড়াতেই তাদের নিয়ত বা ইচ্ছা সৎ হয় না এবং পরবর্তী কার্যক্রমের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যায়, সত্যিই প্রথম থেকে তাদের ইচ্ছা শুভ ছিল না। প্রথমে তারা ভাবে, এখন অঙ্গীকার করে নেই আর যতটুকু উপকৃত হওয়া যায় হয়ে নেই বা মিথ্যা বলি তাতে কোনো সমস্যা নেই। এরপর যখন অঙ্গীকার পালনের সময় আসবে তখন দেখা যাবে। তখন কিছু একটা বলে দেওয়া যাবে বা একটু মিথ্যা কথা বলে দেবো। অতএব এমন লোকদেরও আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে তারা তুচ্ছ বলে মনে করছে এটি আসলে তুচ্ছ কোনো বিষয় নয়, বরং মহানবী (সা.) এমন ব্যক্তিদের মুনাফিকদের দলভুক্ত করেছেন এবং মুনাফিক কাফিরের চেয়েও বড়ো পাপী।

মুনাফিকদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা যখন ঝগড়া করে তখন গালাগালি করে। আহমদীরা এ বিষয়টি সবচেয়ে ভালো জানে। আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, আহমদী বিরোধীরা মিথ্যাবাদী বলেই গালিগালাজ কিংবা নোংরা ভাষা ব্যবহার করে। তারা যদি সত্যবাদী হতো তাহলে যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে এবং ভদ্রভাবে কথা বলত। কাজেই, মিথ্যাবাদীর কাছে যখন কোনো যুক্তি থাকে না তখন সে মারধর এবং গালিগালাজ করা আরম্ভ করে দেয়। এমন লোকেরা উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী মুনাফিকও বটে। এটিকে আরো বিশ্লেষণ করলে এমন লোকদের অনেক কপটতামূলক আচরণ প্রকাশ পেতে থাকবে। যাহোক, এটি গেল অন্যদের কথা। তাদের কর্মফল তাদেরকেই ভোগ করতে হবে এবং তাদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা দেখবেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাদের সাথে বোঝাপড়া করবেন, কিন্তু আহমদীদেরও অনেক বেশি সাবধান হওয়া উচিত এবং আত্মবিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, আত্মীয়দের মাঝে, গোষ্ঠীর মাঝে, নিজের পরিবেশে কিংবা ব্যবসায়িক গণ্ডিতে একে অপরের সাথে তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে যায়। ভুল নাকি সঠিক সেটা পরের বিষয় কিন্তু কোনো পক্ষকেই শোভা পায় না যে, মনোমালিন্য এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে যার ফলে গালাগালি করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি

হতে পারে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, এমন পরিস্থিতি দেখা দিলে বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করো। শান্তি-সন্ধির উদ্দেশ্যে নিজের হাত বাড়িয়ে দাও। সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও। কেননা গালাগালি করে নিজের গায়ে মুনাফিকের তকমা লাগানোর চেয়ে এটিই উত্তম। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এ থেকে রক্ষা করুন এবং পরিত্রাণ দিন। আমি প্রথমে যেভাবে বলেছি, মিথ্যাবাদীরাই গালিগালাজ করে থাকে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.) বলেন, "তোমরা মিথ্যা পরিহার করে চলো কেননা এটি এমন একটি ব্যাধি যা আধ্যাত্মিকতাকে ধ্বংস করে দেয়। আর শিরক নিজেই সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা কেননা যে-সব শক্তি খোদা তা'লা কাউকে দেন নি সে সম্পর্কে একজন মুশরিক দাবি করে যে, অমুক অমুক জিনিসের মধ্যে সেসব শক্তি বিদ্যমান। (তারা যে-সব প্রতিমা বানায় সেই প্রতিমার কাছে যাচনা করে। এর অর্থ হলো, তাদের মনে এই বিশ্বাস আছে যে, অমুক অমুক প্রতিমার মধ্যে এই-এই শক্তি আছে) আর এভাবে তারা মিথ্যার নোংরামিতে লিপ্ত হয়। প্রকৃত বিষয় হলো, নবীদের জামা'তের বৈশিষ্ট্যাবলির মাঝে সততা একটি বড়ো লক্ষণ। আর এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য যা নিজেই অনেক গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, পৃথিবীতে অনেক মানুষ সততার মূল্য এবং মর্যাদা উপলব্ধি করে না। এ যুগে বিশেষভাবে এ রোগ বেশি দেখা যায়। কেননা এ যুগ চাটুকারিতা এবং কপটতার যুগ। বর্তমান যুগে সভ্যতার অর্থ যা করা হয় তা হলো সত্য গোপন করে হলেও বক্তার উচিত অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, কিন্তু যুগের এমন প্রবণতা সত্ত্বেও এসব মন্দকর্মের মোকাবিলা করা প্রতিটি মানুষের অবশ্যকর্তব্য। এ অপকর্মকে পদদলিত করার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না কেননা মিথ্যাবাদী অন্যদের ধোকা দেবার চেষ্টা করে থাকে আর ধোকা এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব মিথ্যাবাদী কেবল নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেই অপরাধী নয় বরং মানবজাতির শত্রু ও তাদের ধ্বংসকারী। তাই প্রত্যেক সত্যবাদী এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানের এ অভ্যাস পরিত্যাগ করা অবশ্যকর্তব্য। মহানবী (সা.) মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে। আর মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, তাদেরকে দোযখের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে রাখা হবে, এমনকি খোদা তা'লা মুনাফিকদের সাথে কাফিরদের চেয়েও কঠোর আচরণ করবেন। কেননা কাফিরদের কারণে কেবল কাফিরদেরই ক্ষতি হয় কিন্তু মুনাফিকদের কারণে মুসলমানদেরও ক্ষতি হয়ে থাকে। যে জাতি নিজেদের মধ্য থেকে মিথ্যা দূর করতে পারে না আর এটি মনে করে যে, সে উন্নতি এবং সম্মান লাভ করবে! তাদের এমন ভাবনা ততটাই অলীক যেভাবে একটি শিশু কল্পনা করে যে, সে চাঁদে কিংবা তারায় পৌঁছে যাবে।

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, "সততা এমন জিনিস যা ছাড়া জাতির প্রভাব-প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যারা সততা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তারা স্বীয় জাতির সৌন্দর্যকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে আর যারা এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে না তারা তাদের জাতির ধ্বংস ডেকে আনে।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৬, পৃ. ৪১-৪৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও আর তোমাদের প্রতিটি সাক্ষ্য খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে হওয়া চাই। মিথ্যা কথা বলবে না এর ফলে তোমাদের জীবন হুমকির সম্মুখীন হলেও কিংবা তোমাদের পিতামাতা অথবা নিকটাত্মীয় যেমন- ছেলে প্রমুখরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও।" (ইসলামী নীতি দর্শন, পৃ. ৫৩)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "সত্যের মাঝে একপ্রকার সাহস থাকে। মিথ্যাবাদী মানুষ কাপুরুষ হয়ে থাকে। যার জীবন অপবিত্রতা ও নোংরা পাপে লিপ্ত সে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকে এবং সে কখনো সামনে দাঁড়াতে পারে না। একজন সত্যবাদী মানুষের ন্যায় সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে স্বীয় সততার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে না এবং নিজের পবিত্রতার প্রমাণ দিতে পারে না। জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেই লক্ষ করে দেখো, কে আছে যাকে আল্লাহ্ তা'লা একটু স্বচ্ছলতা দান করেছেন অথচ তার হিংসুক নেই। প্রত্যেক স্বচ্ছল ব্যক্তির কোনো না কোনো হিংসাকারী থেকেই থাকে এবং তার সাথে সে লেগে থাকে। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শয়তান হলো সংশোধনের শত্রু। অতএব প্রতিটি মানুষের নিজের সাথে এবং খোদা তা'লার সাথে নিজ নিজ হিসাব পরিষ্কার রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার পর কাউকে ভয় করা উচিত নয় এবং কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়। এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত, যার ফলে সে নিজেই শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু এ সবকিছু অদৃশ্য সত্তার সমর্থন ও ঐশী সাহায্য ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। খোদার অনুগ্রহ লাভ না হওয়া পর্যন্ত কেবল মানবীয় প্রচেষ্টায় কিছুই সম্ভব নয় কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (আন-নিসা: ২৯)। মানুষ দুর্বল, ভুলভ্রান্তিতে কলুষিত এবং চারদিক থেকে তাকে নানান সমস্যা ঘিরে রেখেছে। অতএব দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের তৌফিক দান করেন আর ঐশী সাহায্য ও সমর্থন এবং অনুগ্রহবারির উত্তরাধিকারী করেন।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ৫৪৩, নতুন প্রকাশনা)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "সিদ্দীক শব্দটি মুবালিগা বা অতিরঞ্জনের অর্থ দিয়ে থাকে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সততায় বিলীন ও এর ওপর শতভাগ প্রতিষ্ঠিত, সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে গভীরভাবে ভালোবাসে। এটি এমন এক মর্যাদা, কোনো ব্যক্তি যখন এ স্তরে উপনীত হয় তখন সে সকল প্রকার সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সমাহার হয়ে যায় এবং সে সেগুলোর অর্জনের জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করে। যেভাবে একজন সিদ্দীক ব্যক্তি সত্যের শ্রেষ্ঠ দিকগুলোকে আকর্ষণ করে থাকে। .... সিদ্দীকের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের রহস্য হলো, সে নিজের দুর্বলতা ও অপারগতা বুঝতে পেরে স্বীয় শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী إِيَّاكَ نَعْبُدُ বলে, সততা অবলম্বন করে, মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে, যে-সব অপবিত্রতা ও নোংরামি মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো থেকে দূরে পলায়ন করে এবং অঙ্গীকার করে যে, আর কখনো মিথ্যা বলব না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবো না, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মিথ্যা কথা বলব না– বাজে অভ্যাস হিসেবেও নয়, কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেও নয় কিংবা কোনো ক্ষতি এড়ানোর জন্যও নয়।

অনেকের ধারণা, প্রয়োজনের খাতিরে বা পরিবেশ-পরিস্থিতির দাবি অনুসারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা বৈধ। অমুক অসৎ কাজ করলে অমুকের সম্পর্কে উন্নতি ঘটতে পারে অর্থাৎ আমি অসৎ উপায়ে কোনো অনিষ্ট দূর করছি। অথবা পরিস্থিতি এমন সৃষ্টি হয়ে

গিয়েছিল, যেখানে মিথ্যা বলা বৈধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলা বৈধ নয়। তিনি (আ.) বলেন, অর্থাৎ এই অঙ্গীকার করুন, কোনো অবস্থায় বা কোনো পরিস্থিতিতেই মিথ্যার আশ্রয় নেব না। "আর যখন সে এই অঙ্গীকার করে তখন সে إِيَّاكَ نَعْبُدُ -এর ওপর এক বিশেষ আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার এই কর্ম উচ্চমর্যাদার ইবাদত পরিগণ্য হয়। إِيَّاكَ نَعْبُدُ -এর পর রয়েছে إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ । আর এটি তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হোক বা না হোক কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যিনি কল্যাণের উৎস এবং সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার উৎসস্থল [অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সত্তা হতেই ঐশী তত্ত্বজ্ঞান ও কল্যাণধারা উৎসারিত হয় এবং যিনিই সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার উৎস] তিনি তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং সততার উন্নত নীতি ও তত্ত্ব তার নিকট উন্মোচন করবেন। উদাহরণস্বরূপ, নীতিগত কথা হলো, যে ব্যবসায়ী ভালো নিয়মকানুন মেনে চলে এবং সর্বদা সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করে সে যদি এক পয়সা দিয়েও ব্যাবসা করে তবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক পয়সার বিনিময়ে লক্ষ টাকা দিয়ে দেন।

তেমনিভাবে কোনো মানুষ যখন সততা ও ন্যায়নিষ্ঠাকে সার্বিকভাবে ভালোবাসে এবং নিষ্ঠাকে নিজের আদর্শ বানিয়ে নেয় তখন এ সততাই সেই মহান সত্যকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে যা খোদা তা'লার দর্শন লাভ করায়। সত্য-সততা হলো মূর্তিমান কুরআন শরীফ এবং আমাদের নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র সত্তা হলো সত্যের মূর্ত প্রতীক। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিতরাও সত্য এবং সততার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকেন। অতএব তারা যখন সেই সত্য ও সততার পর্যায়ে পৌঁছে যান তখন তাদের চোখ খুলে যায় এবং তারা এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন যার ফলে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান তাদের নিকট উন্মোচিত হতে থাকে। আমি একথা কখনো মানতে পারি না যে, সততাকে যে ব্যক্তি ভালোবাসে না এবং ন্যায়নিষ্ঠাকে যে ব্যক্তি নিজের জীবনাদর্শ বানায় না সে পবিত্র কুরআনের তত্ত্বকথা বুঝতে পারে, কেননা তার হৃদয়ের সাথে এর কোনো সামঞ্জস্যই নেই। এটি তো সত্য ও সততার ঝরনাধারা আর এ থেকে কেবল তারাই পান করতে পারে যারা সততাকে ভালোবাসে।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি, কুরআন করীমে কয়েক হাজার আদেশ রয়েছে যেগুলো মেনে চলা হয় না। সামান্য সামান্য বিষয়ে (কুরআনের) নির্দেশ অমান্য করা হয়। এমনকি এটিও দৃষ্টিগোচর হয় যে, সাধারণ দোকানদাররা কিছু মিথ্যা বলে আর কিছু মিথ্যা মসলার ব্যবসায়ী বলে অথচ খোদা তা'লা মিথ্যাকে (প্রতিমাপূজার ন্যায়) নোংরামির শ্রেণিভুক্ত আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু অনেক লোকই দেখেছি যে, তারা রং লাগিয়ে অবস্থার বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত হয় না আর সেটিকে কোনো পাপ বলেই মনে করে না। হাসির ছলে মিথ্যা কথা বলে দেয়। কোনো মানুষকে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দীক বলা যাবে না যতক্ষণ সে মিথ্যার প্রত্যেকটি শাখাকে বর্জন না করে (অর্থাৎ যতক্ষণ সকল প্রকার মিথ্যা পরিত্যাগ না করবে)।"

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এজন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন

[অর্থাৎ আমরা আহমদীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছি] যেন তাকওয়া সৃষ্টি হয় এবং খোদার প্রতি যেন সেই খাঁটি ঈমান সৃষ্টি হয় যা পাপ থেকে রক্ষা করে। খোদা তা'লা জরিমানা দাবি করেন না, বরং খাঁটি তাকওয়া চান।" (মলফুযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ১২০-১২১)

আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমাদের প্রত্যেককেই সত্যের উন্নত মান অর্জন এবং মিথ্যাকে সত্যিকার অর্থে ঘৃণা করার তৌফিক দান করুন। একজন আহমদী যেখানেই যান না কেন তার দিকে কেউ যেন কখনো আঙুল তুলতে না পারে যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বরং প্রতিটি আঙুল যেন আহমদীদের প্রতি এ দৃষ্টিকোণ থেকে ওঠে যে, সত্যের কোনো মূর্তপ্রতীক দেখতে হলে এই আহমদীকে দেখো। কোনো জাতির মাঝে কেউ যদি সততা দেখতে চাও এবং বর্তমান বিশ্বের এহেন পরিস্থিতি সত্ত্বেও যদি কেউ সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা দেখতে চাও তবে তা আহমদীদের মাঝে খুঁজে দেখো। অতএব প্রত্যেক আহমদী, সে আমেরিকায় থাকুক কিংবা ইউরোপে, প্রত্যেক দর্শক যেন আহমদীদের সম্পর্কে একথা বলে যে, সততাই আহমদীদের মূল বৈশিষ্ট্য এবং পরিচয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(৩৬)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩, মোতাবেক ২৬ ফাতাহ্ ১৩৮২ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

(আল-হুজুরাত: ১৩)

আমাদের সমাজে এমন কিছু (চারিত্রিক) ব্যাধি রয়েছে যেগুলো বাহ্যত ছোটো মনে হলেও এর প্রভাব পুরো সমাজের ওপর পড়ে। এর ফলে অনেক বড়ো নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই বদভ্যাসগুলো মধ্যে কিছু এ আয়াতে (অর্থাৎ তিলাওয়াতকৃত আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ হলো, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকো, (কেননা) কোনো কোনো সন্দেহ অবশ্যই পাপ। আর ছিদ্রান্বেষণ কোরো না এবং তোমাদের কেউ যেন অন্য কারো গীবত (তথা পরনিন্দা-পরচর্চা) না করে। তোমাদের কেউ কি নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা একে ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনঃপুন তওবা গ্রহণকারী, বার বার কৃপাকারী।"

এখানে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। নীতিগত দিক থেকে প্রথম দুটি করতে বারণ করা হয়েছে আর তৃতীয় বিষয়টি অর্থাৎ গীবতে প্রথম দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত, কেননা সন্দেহ হলেই মানুষ গোয়েন্দাগিরি করে এবং এরপর পরচর্চা ও পরনিন্দা করে। এই আয়াতে এটি বলা হয়েছে যে, গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস খাবার মতোই একটি বিষয়। এখানে লক্ষ করলে দেখবেন, যত বড়ো সীমালঙ্ঘনকারী বা কঠোরচিত্ত মানুষই হোক না কেন, সে কখনোই নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পারে না। এরকম কথা ভাবতেই তো বমি চলে আসে আর কেমন যেন বমি-বমি ভাব হয়।

একটি হাদীসে কায়েস বর্ণনা করেন, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কয়েকজন সঙ্গীসাথি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তারা মৃত একটি খচ্চরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার পেট ফুলে গিয়েছিল (মৃত প্রাণী অনেক্ষণ পড়ে থাকলে পেট ফুলে যায়)। তিনি (রা.) বলেন, খোদার কসম! কোনো মুসলমানের মাংস খাবার চেয়ে তোমাদের জন্য এই মৃত প্রাণীর মাংস পেট ভরে খাওয়া অনেক উত্তম হবে (অর্থাৎ গীবত বা পরচর্চা করার চেয়ে)। অনেকে খুব স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। এরকম মৃত প্রাণী যার পেট ফুলে গেছে আর যা থেকে

উৎকট দুর্গন্ধ আসছে কিংবা পচেগলে যাবার উপক্রম, তার মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, অনেকের কাছে তা দেখাটাই অসহনীয়। কিন্তু বাহ্যত এমন স্পর্শকাতর মানুষ যারা মৃত প্রাণী দেখে সহ্য করতে পারে না অথবা সেগুলোর দুর্গন্ধ তাদের নিকট অসহনীয়, পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেও যারা ঘৃণাবোধ করে, তারাই আবার বৈঠক-সমাবেশে বসে এমনভাবে পরচর্চা ও চুগোলখোরী করে যেন এটা একেবারেই সাধারণ একটি বিষয়। অতএব এটি অনেক ভয়ের বিষয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজেদের অবস্থা যাচাই করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড়ো অনুগ্রহ এবং তিনি নিজ বান্দাদের প্রতি এতই কৃপাশীল যে, তিনি বলেন, এমন কথা যদি পূর্বে বলেও থাকো তাহলে ইস্তিগফার করো, আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করো এবং নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি শুধরে নাও। নিশ্চয় আমি অনেক অনুগ্রহশীল এবং তওবা গ্রহণকারী। আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি অনুগ্রহ করে তোমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। কিছু মানুষ পরনিন্দা এবং পরচর্চার বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখে না। তারা জানে না, গীবত বা পরচর্চা কী জিনিস? অনেক সময় সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, অমুক বিষয় বা কথাটি পরনিন্দা বা পরচর্চার পর্যায়ে পড়ে কি? অনেক সময় অনেক কথা নিছক ঠাট্টা মনে করে বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো পরচর্চা এবং কুৎসার গণ্ডিভুক্ত। এ কারণে আমি এ বিষয়ে কিছুটা বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করছি।

ওয়া লা ইয়াগতাব্ বা'দুকুম বা'দা– এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে আল্লামা আলূসী লেখেন, "এর অর্থ হলো, তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যেন অন্যের সম্পর্কে এমন কথা না বলে যা সে নিজের অনুপস্থিতিতে নিজের সম্পর্কে বলাকে অপছন্দ করে থাকে .... এবং যে জিনিস সে পছন্দ করে না– সাধারণভাবে এর অর্থ হবে, কোনো ব্যক্তির ধর্মীয়, বা জাগতিক অবস্থা, তার সম্পদ অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র হবার বিষয়ে, তার চেহারা ও শারীরিক গঠন, তার চরিত্র, তার স্ত্রী-সন্তানাদি, তার দাস-দাসী, তার পোশাক কিংবা তার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে-কোনো বিষয় নিয়ে যদি কেউ কারো আড়ালে-আবডালে কথা বলে আর সে এগুলো যদি অপছন্দ করে (তাহলে তা বারণ)।" (তফসীর রূহুল মায়ানী)

লক্ষ করুন! অধিকাংশ বৈঠকের মূল আলোচনার কেন্দ্র এসব বিষয়ই হয়ে থাকে। অন্যের সম্পর্কে কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু নিজের বেলায় কোনো কথা বলা হলে অপছন্দ করে। কথা বলার সময় পুরো লাগামহীনভাবে সমালোচনা করতে থাকে। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, সে যদি জানতে পারে, তার সম্পর্কে অমুক বৈঠকে এমন এমন কথা বলা হয়েছে তাহলে তার কষ্ট হয়, সহ্য করতে পারে না এবং তাৎক্ষণিক মারামারি করতে উদ্যত হয়। এ কারণে যে-সব কথা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে, তার উচিত হবে নিজের ভাইয়ের বেলাতেও তা বলা অপছন্দ করা। যে-সব কথা বৈঠকে বলাটা নিজের জন্য সমীচীন মনে করে না, সে যেন তা নিজের ভাইয়ের বেলাতেও কোনো বৈঠকে সেই রকম আলোচনা অপছন্দ করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "উপদেশস্বরূপ তোমাদের বলছি, যতবেশি সম্ভব, কুধারণা পোষণ করার অভ্যাস পরিহার করো (অর্থাৎ মন্দ ধারণা করা এড়িয়ে চলো), কেননা এর ফলে ঘৃণ্য মিথ্যা রটনা এবং ছিদ্রান্বেষণের অভ্যাস বৃদ্ধি পায়

(অর্থাৎ সন্দেহের ফলে দোষত্রুটি খুঁজে বের করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে)। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **ওয়া লা তাজাস্‌সাসু** অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরি কোরো না। আর গোয়েন্দাগিরির অভ্যাস সন্দেহ পোষণ করার ফলেই সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন কারো সম্বন্ধে খারাপ চিন্তা কিংবা কুধারণা পোষণ করে তখন তার সম্পর্কে একটি বাজে মনোভাব তার মাঝে সৃষ্টি হয়। এরপর সে চেষ্টা করতে থাকে যেন তার কোনো না কোনো দোষত্রুটি বা খারাপ কাজ চোখে পড়ে। আর সে দোষত্রুটি বের করার চেষ্টাতেই অধিক নিমগ্ন থাকে (অর্থাৎ দোষ খোঁজাতে এতটাই গুরুত্ব দেয়, যেন সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করছে)। আবার তার মাথায় এই চিন্তাও থাকে, তার সম্পর্কে আমি যা প্রকাশ করেছি সে ব্যাপারে কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে কী উত্তর দেবো? (অর্থাৎ এটি ভাবতে থাকে, একবার তার সম্পর্কে আমি একটা কথা বলে ফেলেছি আর সে সম্পর্কে যদি কেউ প্রমাণ চেয়ে বলে যে, তার মন্দকর্মের প্রমাণ কোথায়, তাহলে আমি কী বলব?)। অতএব এর উত্তর খোঁজার জন্য সে স্থায়ীভাবে (ত্রুটিবিচ্যুতি) অন্বেষণে রত থাকে এবং তার আরো মন্দকর্ম খুঁজে বের করার চেষ্টায় লেগে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, এমন ব্যক্তিরা নিজেদের কুধারণাকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টায় গোয়েন্দাগিরি করে এবং তা থেকে গীবত বা পরচর্চার অভ্যাস গড়ে ওঠে; যেমন- আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **ওয়া লা ইয়াগতাব্ বা'দুকুম বা'দা**। অতএব ভালোভাবে স্মরণ রেখো! কুধারণা পোষণ করার মাধ্যমে গোয়েন্দাগিরি এবং গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে পরনিন্দা করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। .... কোনো ব্যক্তি যদি রোযাদার অবস্থায় পরনিন্দা করে এবং গোয়েন্দাগিরি ও ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত থাকে তাহলে সেটা তার জন্য তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার অনুরূপ। যেভাবে বলা হয়েছে–

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোযা রেখেও এরূপ করে, সে প্রকৃত অর্থে রোযা রাখে না বরং সে কাবাব খায়, তা-ও আবার মৃত ভাইয়ের মাংসের কাবাব। আর এটি পরম সত্য যে, গীবতকারী প্রকৃত অর্থে এমনই মন্দ ও পাপিষ্ঠ লোক, যে তার মৃত ভাইয়ের মাংসের কাবাব খেয়ে থাকে, কিন্তু এই কাবাব সবাই গলধঃকরণ করতে পারে না।

একজন সুফি দিব্যদর্শনে দেখলেন, এক ব্যক্তি কারো গীবত করার পর তাকে যখন বমি করানো হলো, তখন তার পেট থেকে মাংসের টুকরা বের হলো যা থেকে দুর্গন্ধ আসছিল (এটি কত ঘৃণ্য বিষয় অথচ তারা যখন এমনটি করে তখন বুঝে না!)।

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, স্মরণ রেখো! এগুলো কোনো বানানো গল্প নয় বরং বাস্তব ঘটনা। যারা কুধারণা পোষণ করে, যতক্ষণ তারা নিজেদের সম্পর্কে কোনো বাজে কথা না শোনে ততক্ষণ তাদের মৃত্যু হয় না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এখানে যা বলছেন, তা এই হাদীসের আলোকেই বলছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে কিছু মানুষ বাহ্যত মুসলমান হবার দাবিদার হলেও তাদের হৃদয়ে এখনো ঈমান প্রবেশ করে নি।

তাদেরকে আমি সাবধান করছি, তারা যেন মুসলমানদেরকে তীর্যক এবং বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তার মাধ্যমে কষ্ট না দেয় এবং তাদের দোষক্রটি খুঁজে না বেড়ায়। অন্যথায় স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি অপরের দোষক্রটি অন্বেষণ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার অপ্রকাশিত দোষক্রটি মানুষের সামনে প্রকাশ করে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। (তিরমিযী, কিতাব আল বিররি ওয়াস্ সিলাহ্ বাব মা জাআ ফি তা'যীমিল মু'মিন)

কিছু মানুষ বিভিন্ন পন্থায় গোয়েন্দাগিরি করে। উদাহরণস্বরূপ, দৈনন্দিন জীবনের কথা যদি ধরা হয়, কারখানা কিংবা অন্য যে-সব জায়গায় মানুষ কাজ করে সেখানে সহকর্মীদের কোনো দুর্বলতা যদি তাদের চোখে পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেয়, যেন তার চোখে ভালো সাজতে পারে। অথবা কিছু মানুষ অযথা অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আর এরপর তার দোষক্রটি খুঁজতে আরম্ভ করে দেয়। স্মরণ রাখা উচিত, এমন লোকদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, এ ধরনের মানুষ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ক্ষণস্থায়ী জাগতিক আনন্দ কিংবা সামান্য মৌখিক বিনোদনের জন্য নিজের জান্নাত নষ্ট করতে চাইবে?

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "এ কারণে আমি তোমাদেরকে নসীহত করছি এবং মর্মজ্বালা নিয়ে বলছি, পরচর্চা করা ছেড়ে দাও। হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করো আর সম্পূর্ণরূপে তা হতে বিরত থাকো এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যাও, এতে অনেক লাভ হবে। মানুষ নিজেই ফাঁদে পা দেয়, তা না হলে বিষয়টি অত্যন্ত সহজ। যে-সব ছেলে অন্যদের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ভালোবাসেন না। কারো মধ্যে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি দেখতে পাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সঠিক পথে চলার সামর্থ্য দান করতে পারেন। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা **তাওওয়াবুর্ রহীম**। তিনি ক্ষমা করে দেন। অতএব মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হবে এবং নিজে কষ্ট স্বীকার না করবে ততক্ষণ সে অন্যকে সুখ দিতে পারে না। তাই মন্দ সংসর্গ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করো।

আমি পূর্বেও যেভাবে বলেছি, কিছু মানুষ নিছক উপভোগের মানসে এমন বৈঠকে যোগদান করে। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু কথাবার্তা শোনে এবং হাসিঠাট্টামূলক কথাবার্তায় হাসে। তারপর ধীরে ধীরে এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তারা নিজেরাও এরূপ কথায় জড়িয়ে যায়। অতএব যুবকদের বিশেষভাবে এ থেকে দূরে থাকা উচিত। প্রথম থেকেই অর্থাৎ বাল্যকাল তথা আতফাল এবং খোদ্দাম থাকতেই এই অভ্যাস গড়ে তুলুন যে, কারো দোষক্রটি বলে বেড়াবো না।

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, "সন্দেহের উদ্রেক হতেই তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলো, কেননা এ থেকে একসময় গোয়েন্দাগিরি করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে। ছিদ্রান্বেষণের পর্যায়ে যদি পৌঁছে গিয়ে থাকো তাহলে তৎক্ষণাৎ তা থেকে দূরে সরে আসো, কেননা এর ফলে তোমরা পরনিন্দায় লিপ্ত হবে। আর এটি অত্যন্ত মন্দ একটি অভ্যাস এবং মৃতের মাংস খাবার মতো বিষয়। **ওয়াত্তাকুল্লাহ্ ইন্নাল্লাহা তাওওয়াবুর্ রহীম**। তাকওয়া অবলম্বন করো

এবং পূর্ণরূপে পরহেযগার হয়ে যাও, কিন্তু এ সবকিছু কেবল আল্লাহ্ তা'লা চাইলেই সম্ভব।" (হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড: ০২, পৃ. ৬-৭)

এ কারণে এ সমাজে যেখানে কথাবার্তাসহ সব বিষয়ে নোংরামি বিরাজমান এবং সর্বত্র অবক্ষয় দৃশ্যমান .... সেখানে এ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অবনত হওয়া উচিত এবং তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করা উচিত, তবেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের কুৎসা কোরো না। তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে?" (লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ১৫৬)

অতএব কুৎসা রটনা করা কিংবা অভিযোগ করাও গীবত, কেননা একবার যখন বন্ধুরা একসাথে বসে অভিযোগ-অনুযোগ শুরু করে দেয় তখন ধীরে ধীরে এসব অভিযোগ-অনুযোগই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরচর্চার বদভ্যাস সৃষ্টি হয়। এ কারণে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় হলেও যদি পরচর্চার লেশমাত্র সন্দেহ থাকে তাহলে সেসব কথা বলা উচিত নয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "পরচর্চাকারীদের সম্পর্কে কুরআন করীমে আছে যে, তারা নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাবার মতো কাজ করে থাকে। মহিলাদের মাঝে এই রোগ বেশি (দেখা যায়)। তারা গভীর রাত পর্যন্ত বসে পরনিন্দা ও পরচর্চা করে এবং সকালে উঠে আবার সেই একই কাজ আরম্ভ করে দেয়। অথচ এসব থেকে এড়িয়ে চলা উচিত। কুরআন করীমে মহিলাদের সম্পর্কে একটি পৃথক সূরা রয়েছে। হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, আমি দেখলাম, বেহেশতে দরিদ্রদের সংখ্যা বেশি ছিল আর দোযখে নারীরা বেশি ছিল (অর্থাৎ বেহেশতে দরিদ্র লোক বেশি ছিল এবং দোযখে নারীদের আধিক্য ছিল)। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, মহিলাদের মধ্যে কিছু মারাত্মক দোষ থাকে এবং তা প্রকট আকারে বিদ্যমান থাকে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, নিজেকে নিয়ে বড়াই করা; অর্থাৎ আমি এমন, আমি তেমন। এরপর জাতপাত নিয়ে গর্ব করা আর বলা যে, অমুক মহিলা নীচু বংশের কিংবা অমুক আমাদের চেয়ে নিম্ন জাতের লোক। এছাড়া কোনো অভাবী মহিলা যদি তাদের মাঝে বসে, তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার দিকে অঙ্গুলি ইঙ্গিত করে বলে, দেখো! কত নোংরা কাপড় পরে আছে, তার কাছে কোনো অলংকারাদি নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।" (আল-বদর, ৭ জুন ১৯০৬; মলফুযাত, খণ্ড: ০৮, পৃ. ৪৪১)

এটি তো গেল সেই যুগের নারীদের অবস্থা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নারীদের অনেক বড়ো একটি শ্রেণি এখন এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তারা নিজেদেরকে ধর্মীয় সেবায় নিয়োজিত করছেন। কিছু কিছু নারী ধর্মসেবার ক্ষেত্রেও এই চেতনায় পুরুষদের চেয়েও এগিয়ে আছেন। কিন্তু এখনো কিছু গ্রাম ও শহরে, যে-সব নারীরা ধর্মের সেবাও করছে না আর তাদের অন্য কোনো কাজও নেই, তারা এখনো পরনিন্দা ও পরচর্চার ব্যাধিতে আক্রান্ত।

একইভাবে পুরুষদের সম্পর্কেও অভিযোগ আসে, এমন পুরুষও রয়েছে যারা বৈঠক-সমাবেশে বসে অন্যের সম্পর্কে কথাবার্তা বলে থাকে। এরা এমন পুরুষ, যাদের অকর্মণ্য বসে থাকার অভ্যাস রয়েছে। এমন লোকদের অসহায় স্ত্রী-সন্তানেরা আয়রোজগার করে সংসার চালায় অথচ তাদের নিজেদের কোনো লাজলজ্জার বালাই নেই। অতএব এই ব্যাধি নারীদের মাঝে দেখা দিক বা পুরুষদের মাঝে– এ থেকে মুক্ত থাকা উচিত। জামা'তী ব্যবস্থাপনা তথা খোদ্দাম, লাজনা প্রভৃতি সংগঠনকে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, কেননা এই ব্যাধি গ্রামের অশিক্ষিত এবং কর্মহীন বা কর্মবিমুখ মহিলাদের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। এ কারণে বিশেষভাবে লাজনাদের সারা বিশ্বের সকল স্থানে কার্যকর কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে-সব বিষয় চিহ্নিত করেছেন সেগুলো ছাড়াও আরেকটি ব্যাধিও মাথাচাড়া দিয়েছে। তা হলো, কোনো কাজ না থাকার কারণে মানুষের বাড়িঘরে না জানিয়ে অসময় উপস্থিত হওয়া। কোনো দরিদ্র ব্যক্তি নিজের আত্মসম্মানবোধ বজায় রেখে জীবনযাপন করলেও এরা (অনুমতি ছাড়াই) তাদের বাড়িঘরে প্রবেশ করে, এমনকি রান্নাঘরে পর্যন্ত ঢুকে যায়। কী কী রান্না হলো না হলো, তা উদ্‌ঘাটনে লেগে যায়। সহানুভূতি প্রদর্শন বা সাহায্য করা কিংবা কমপক্ষে তার জন্য দোয়া করার পরিবর্তে তার সম্পর্কে বিভিন্ন বৈঠকে সমালোচনা করে বলে যে, অমুক পয়সা বাঁচায়, তরকারির বদলে চাটনি বানিয়েছে অথবা তরকারি খুব অল্প বানিয়েছে, সে কৃপণ ইত্যাদি ইত্যাদি। সে কৃপণ হোক আর যা-ই হোক, নিজের সংসার নিজে চালাচ্ছে, সেটা যেভাবেই চালনা করুক না কেন। তোমার কারো ঘরে ঢুকে দোষত্রুটি খোঁজার এত কী প্রয়োজন? আবার এমন কৃচ্ছ্রতা সাধনকারী লোকদের মেয়েদের জন্য যদি কোনো বিয়ের প্রস্তাব আসে তখন এসব মহিলা হঠাৎ করে অনেক নড়েচড়ে বসে এবং খুবই সক্রিয় হয়ে যায়। এমনকি যেখান থেকে তাদের প্রস্তাব আসে, তাদের বাড়ি গিয়ে বলে, এদের বাড়িতে কিছুই নেই। সেখান থেকে তোমরা যৌতুকও পাবে না। এই মেয়ের মধ্যে অমুকতমুক দুর্বলতা রয়েছে। অমুক জায়গায় একটি ভালো মেয়ে আছে, সেখানে আত্মীয়তা করো, এখানে কোরো না। যদিও জামা'তের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, তারপরও এটি অনেক চিন্তার বিষয়– কেননা আমরা যে সমাজে বসবাস করছি সেটি অনেকটা এমনই হয়ে গেছে। সমাজ মানুষকে অবশ্যই প্রভাবিত করে আর এমন কথা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

এমন লোকদের সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আব্দুর রহমান বিন গানাম (রা.) এবং হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় ব্যক্তি তারা যাদেরকে দেখে খোদা মনে পড়ে। আর আল্লাহ্‌র পাপী বান্দারা পরচর্চা ও পরনিন্দা করে বেড়ায়, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, পুণ্যবান ও পবিত্রচেতা লোকদের কষ্ট, নৈরাজ্য, ধ্বংস ও পাপে নিপতিত করতে চায়। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদুশ্ শামিঈন, খণ্ড: ০৫, পৃ. ২৬৭) আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও মহিলাকে এ থেকে রক্ষা করুন।

আরেকটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে তারাই আমার সবচেয়ে প্রিয় যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী,

বিনম্র, মানুষকে ভালোবাসে এবং লোকেরাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। অপরদিকে তোমাদের মাঝে আমি তাদেরকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি যারা পরশ্রীকাতর, বন্ধুবান্ধবের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং নিষ্পাপ লোকদের ওপর অপবাদ আরোপকারী।" (তারগীব ও তারহীব, খণ্ড: ০৩, কিতাবুল আদাবুত্ তারগীবু ফিল খালকি ...)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, মি'রাজের ঘটনার সময় আমি দিব্যদর্শনে এমন এক জাতির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের নখ ছিল তামার তৈরি এবং তারা তা দিয়ে নিজেদের চেহারা ও বক্ষে আঁচড় দিচ্ছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা মানুষের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত এবং তাদের মানসম্ভ্রমের ওপর আঘাত হানত অর্থাৎ পরচর্চা করত, মিথ্যা অপবাদ আরোপ করত এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করত। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব বাব ফিল গীবত)

অতএব দেখুন, কত ভয়ানক দৃশ্য এটি! মৃত্যুর পর পরচর্চাকারীদের শাস্তি কত ভয়ংকর হবে! সাধারণত মানুষ অসাবধানতাবশত কখনো কখনো বেফাঁস কথা বলে বসে। অনেক সময় পরশ্রীকাতরতা বা পরচর্চা উদ্দেশ্য হয় না। কিন্তু মহানবী (সা.) এ বিষয়ে এতটাই সাবধান ছিলেন এবং এতটাই গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন যে, গীবতের পর্যায়ে পড়ার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলেও তিনি সেটি ভীষণ অপছন্দ করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট এক মহিলা সম্পর্কে বললাম, তিনি খাটো। এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি পরনিন্দা করছ। অতএব দেখুন! মহানবী (সা.) কত সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে আমাদেরকে সাবধান করছেন। তাই চিন্তা করে দেখুন, এটি কত ভয়ের বিষয় এবং এক্ষেত্রে কতটা সাবধানতা প্রয়োজন! আমরা যতক্ষণ সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে পরম সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে গীবত হতে বাঁচার চেষ্টা না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না যার দাবি নিয়ে আমরা দণ্ডায়মান হয়েছি। একইভাবে আমরা নিজেদের পরকালও সুন্দর করতে সক্ষম হবো না। যাহোক, পরচর্চাকারীদের পরিণতি কী হয়, তা আপনাদের নিকট এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে যাবার কথা।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, মানুষ অবচেতন মনে অনেক সময় এমন কোনো কথা বলে ফেলে যা আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে, যার ফলে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আবার কখনো মানুষ উদাসীনতাবশত আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে এমন কোনো কথা বলে বসে, যার ফলে সে জাহান্নামে গিয়ে নিপতিত হয়। (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক বাব হিফযুল্ লিসান)

হযরত আবু আমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে মানুষের সামনে তার আমলনামা উন্মুক্ত করা হবে। সে তা পড়বে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! আমি তো পৃথিবীতে অমুক অমুক ভালো কাজ করেছি। সেগুলো এখানে নেই কেন? তখন আল্লাহ্ তা'লা উত্তর দেবেন, গীবত বা পরচর্চার কারণে সেই পুণ্যসমূহ তোমার আমলনামা বা কর্মতালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। (তারগীব ও তারহীব)

অতএব লক্ষ করুন! কেবল গীবত বা পরচর্চার কারণে সকল পুণ্যকর্ম অর্থাৎ নামায, রোযা, সদকা, কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করা এককথায় সকল পুণ্যকর্ম আমলনামা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে; শুধুমাত্র পরচর্চার কারণে।

এ সম্পর্কে যতই হাদীস পড়ি ততই ভয় বাড়তে থাকে। এর একটাই সমাধান আর তা হলো, সর্বদা ইস্তিগফারে রত থাকা।

ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেন, যার নিকট পরনিন্দা করা হয় তার উচিত সে যেন সেই পরনিন্দাকারীর পক্ষপাতিত্ব না করে এবং যার সম্পর্কে নিন্দা করা হচ্ছে, তার সম্পর্কে যেন কুধারণা পোষণ না করে (এটি তাঁর কথার সারাংশ)। (ফাতহুল বায়ান, খণ্ড: ১০, পৃ. ৪৩৭)

ইমাম গায্যালী (রহ.) এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। অফিসার এবং কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে একথা স্মরণ রাখা উচিত। কখনো এক পক্ষের কোনো কথা শুনে কারো বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া উচিত নয় কিংবা কারো ওপর কুধারণা পোষণ করা উচিত নয় বরং সর্বদা তদন্ত করা উচিত, সঠিক পদ্ধতিতে তদন্ত করা উচিত ও বিষয়টির গভীরে গিয়ে তদন্ত করা উচিত। এরপরই যেন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাধারণত তদন্তের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানা যায়, অর্থাৎ সব মিথ্যা ও বানোয়াট ছিল, গীবত ও পরনিন্দা ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং কোনোভাবে অপর পক্ষের ক্ষতিসাধন করাই তার মূল উদ্দেশ্য ছিল– যারা পরশ্রীকাতর তাদের রিপোর্ট এমনই হয়ে থাকে; ভবিষ্যতে এমন লোকের বিষয়ে সাবধান থাকুন। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং তার কোনো অভিযোগে কর্ণপাত করবেন না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "ইসলাম ধর্মে গীবত বা পরচর্চা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়ে যে আদেশ প্রদান করা হয়েছে তার তাৎপর্য হলো, অনেক সময় মানুষ অন্যের সম্পর্কে কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে তার এই সিদ্ধান্তকে নিজের দিক থেকে সঠিক বলেও মনে করে (অর্থাৎ সে মনে করে, আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার এই সিদ্ধান্ত সঠিক হয় না)। তিনি (রা.) বলেন, আমি এরকম অসংখ্যবার দেখেছি, কেউ এক ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সে এমন হবে আর তার দৃঢ়বিশ্বাস থাকে যে, আমার ধারণাই সঠিক কিন্তু বাস্তবে তা ভুল। এমন পরিস্থিতিতে যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সে যদি সামনে উপস্থিত থাকে এবং তাকে এ ব্যাপারে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করবে আর বলবে আমাকে তুমি ভুল বুঝছ, আমার মধ্যে কথিত দুর্বলতা নেই। অতএব তিনি (রা.) বলেন, কারো কাছে কোনো কথা যদি সত্য বলেও মনে হয়, তবুও সে যখন তার কোনো ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এমন কোনো কথা বলে যা তার ভাইয়ের সম্মানহানি ঘটায়, তার জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকাশ করে এবং তার পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তাহলে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে পাপী, কেননা এর মাধ্যমে সে তার ভাইকে অভিযোগ খণ্ডানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করল।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড: ০৯, পৃ. ৫৭৯)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) পরনিন্দা করতে এবং

পরনিন্দা শুনতে নিষেধ করেছেন। (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ০৮, পৃ. ৯১, বাব মা জাআ ফিল গীবাতি ওয়ান্ নামিয়্যাতি)

আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, কিছু মানুষের এমন বৈঠকে বসে হাসিবিদ্রুপ শোনার অভ্যাস হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে তাদের পরনিন্দায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। অতএব মহানবী (সা.) এখানে পরনিন্দা শুনতেও বারণ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, হিংসুক, পরনিন্দাকারী এবং গণক আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয় এবং আমার সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ০৮, পৃ. ৯১)

আবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, "নিজের ভাইয়ের চোখের কুটো মানুষের চোখে পড়ে, কিন্তু নিজের চোখে পড়ে থাকা কাষ্ঠখড়ির কথাও সে ভুলে যায়" (অর্থাৎ ভাইয়ের ছোটো ছোটো দোষত্রুটি চোখে পড়ে ঠিকই অথচ নিজের বড়ো বড়ো পাপ দৃষ্টিগোচর হয় না)। (তারগীব ও তারহীব)

বর্তমানেও লক্ষ করলে আপনারা দেখবেন যে, যারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে আর অহংকারসূচক কথাবার্তা বলে তারা নিজেরাই ভাই সম্পর্কে বলা এমন মন্দ কর্মে, বরং এর চেয়ে অধিক মন্দকর্মে লিপ্ত থাকে। তারা এতটাই নির্লজ্জ, অনেক মানুষের কাছে তাদের এসব পাপ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের লজ্জা হয় না আর এই বোধশক্তির উদয় হয় না যে, আমরা আমাদের ভাইয়ের দুর্নাম করার আগে নিজেদের সংশোধন করি।

সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, উদ্দেশ্য যদি কেবল রসিকতা বা উপভোগ না হতো বা মানুষকে ছোটো দেখিয়ে নিজে বড়ো হওয়া, তাদেরকে মানুষের দৃষ্টিতে বা কর্মকর্তাদের চোখে ছোটো করে নিজের অবস্থান দৃঢ় করা না হতো, আর তারা যদি সমাজের প্রতি সত্যিকার সমবেদনা রাখত ও প্রকৃত অর্থেই সমাজের সংশোধন চাইত, তাহলে তারা হাদীসে বর্ণিত নসীহতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো। হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তুমি নিজের কোনো সঙ্গীসাথির দোষত্রুটি বর্ণনা করতে চাইলে প্রথমে নিজের দোষত্রুটির দিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করো। কারো দোষ বর্ণনা করার পূর্বে নিজের দোষের দিকে লক্ষ করে দেখো।

এ সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর একটি পঙ্‌ক্তিতে বলেন–

بدی پر غیر کی ہر دم نظر ہے
مگر اپنی بدی سے بے خبر ہے

অর্থ: অন্যের দোষত্রুটির দিকে সে সবসময় দৃষ্টি রাখে,
কিন্তু নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সে উদাসীন।

(পরিশিষ্ট হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ১১৫, প্রকাশ: ১৯০৭)

অতএব নিজেদের দোষত্রুটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া অনেক বড়ো বিষয়। অনেক কম মানুষ আছেন যারা নিজেদের দোষত্রুটির প্রতি এভাবে দৃষ্টি দেয়। যেভাবে বলা হয়েছে, নিজের চোখের কড়িকাঠ মানুষ দেখে না, নিজের অনেক বড়ো পাপও চোখে পড়ে না; এমনটি হওয়া খুব কঠিন বিষয়। কিন্তু সেগুলো যদি চোখে পড়ে, তবে বড়ো-ছোটো সকল পাপ চোখে পড়া আরম্ভ হবে। অন্যের দোষ বলে বেড়ানোর পূর্বে এমন ব্যক্তি চিন্তা করবে এবং সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমে নিজের সংশোধন করার চেষ্টা করবে, এরপর নিজের বন্ধুদের সংশোধন করার চেষ্টা করবে, যেন সুন্দর ও পবিত্র সমাজ গড়ে ওঠে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে আত্মবিশ্লেষণের সামর্থ্য দান করুন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, কুধারণা পোষণ পরিহার করো, কেননা কুধারণা অনেক বড়ো মিথ্যা। একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়িও না, নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি কোরো না, ভালো কোনো জিনিস জোরপূর্বক আত্মসাৎ করার লোভ রেখো না, হিংসা কোরো না, শত্রুতা পোষণ কোরো না এবং কারো ওপর অবজ্ঞা কোরো না। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন সেভাবে আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই এবং সে তার ওপর অত্যাচার করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না ও তাকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে না। নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করে মহানবী (সা.) বলেন, তাকওয়া এখানে! তাকওয়া এখানে। (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ বাব,লা ইয়াখতুবু আলা খাতবিহি ....)

অর্থাৎ তাকওয়ার প্রকৃত স্থান হলো হৃদয়। তাকওয়ায় সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণ স্থান বা যে হৃদয় সবচেয়ে বেশি তাকওয়ায় পরিপূর্ণ, তা হলো মহানবী (সা.)-এর হৃদয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ হৃদয়কে ভালোভাবে যাচাই করা উচিত এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। একজন মানুষের (ঈমান নষ্ট করার) জন্য এই একটি মন্দকর্মই যথেষ্ট যে, সে নিজের ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের তিনটি জিনিস অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য নিষিদ্ধ। তা হলো, তার প্রাণ, মানসম্মান এবং তার ধনসম্পদ। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের শারীরিক সৌন্দর্য, তোমাদের চেহারা এবং তোমাদের ধনসম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন। আরেকটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি কোরো না, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ কোরো না এবং একে অপরের ব্যাবসা নষ্ট কোরো না। ছেলেমেয়ের বিয়েতে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, এই বিষয়টিও এর অন্তর্গত। একথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। সুতরাং এমনটিও করা উচিত নয়। মহিলারা যৌতুক বা অন্যান্য বিষয়ে কথা বলার জন্য পৌঁছে যায় আর বলে অমুক জায়গায় না বরং তমুক জায়গায় সম্পর্ক করলে ভালো হবে। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নিষ্ঠাবান বান্দা এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থেকো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, "খিয়ানত কোরো না, পরনিন্দা কোরো না এবং এক মহিলা আরেক মহিলার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ কোরো না।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৯, পৃ. ৮১)

এর অর্থ এই নয় যে, পুরুষরা গিয়ে নিজেদের স্ত্রীদের বোঝানো আরম্ভ করবে, বরং তাদের নিজেদেরও বোঝার প্রয়োজন রয়েছে।

অতঃপর কোনো নারী অপর এক নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এমন এক ব্যক্তি ছিল যে অন্যের পাপকর্ম দেখে কঠিন সমালোচনা করে এবং বলে, সে দোযখে যাবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার কর্তৃত্ব তোমাকে কে দিল? জান্নাত এবং জাহান্নামে কে যাবে, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব আমার। দোযখ এবং বেহেশতে প্রেরণকারী আমি– তুমি কে? অতএব যে ব্যক্তি ছিদ্রান্বেষণ করেছিল এবং নিজেকে পুণ্যবান মনে করত, তাকে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, যাও! আমি তোমাকে দোযখে নিক্ষেপ করলাম আর যার বদনাম করে তুমি বলতে সে এমন! সে তেমন! সে দোযখে যাবে! তাকে আমি বেহেশতে পাঠিয়ে দিয়েছি, জান্নাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। (আল-বদর, ৯ মার্চ ১৯০৬; মলফুযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ. ১০-১১)

অতএব তিনি (আ.) বলেছেন, প্রত্যেকের সতর্ক থাকা উচিত যেন সে নিজেই নিজের ছোড়া তিরে বিদ্ধ না হয়ে যায়।

বর্তমানেও মানুষ অনেকের সম্বন্ধে বেফাঁস মন্তব্য করে বসে যে, অমুক ব্যক্তি অনেক নোংরা, পাপী এবং জাহান্নামী। আবার কেউ কেউ নিজের পুণ্য প্রকাশের জন্য এমন কথা বলে থাকে। অর্থাৎ প্রথমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করে, অমুক নেকীর কাজটি করেছ, নামায পড়েছ, এটি করেছ, সেটি করেছ, নামাযে কী দোয়া করো, কীভাবে দোয়া করো, আবেগ সৃষ্টি হয় কিনা, কান্নাকাটি করো কিনা? এরপর উদ্ধৃতি দিয়ে বলবে, যার কান্না আসে না তার হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে। তারা এমন কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে যা একেবারেই ঠিক নয়। এটি বান্দা এবং আল্লাহ্‌র মধ্যকার বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে জিজ্ঞেস করার কোনো অধিকার কারো নেই। সাধারণত জলসায় কিংবা জুমুআর খুতবায় এই নসীহত করা হয়, এভাবে নামায পড়া উচিত, এই পদ্ধতিতে নামায আদায় করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সকাশে পরিপূর্ণভাবে বিনত হওয়া উচিত। সুতরাং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করা এবং তার অবস্থা জেনে এরকম বলা উচিত নয় যে, এতদিন ধরে তুমি নামাযে কান্নাকাটি করো নি, তোমার আবেগ সৃষ্টি হয় নি, তুমি নিজেকে ধ্বংস করেছ কিংবা নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিপতিত করেছ! আর এমন লোকদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একথা স্মরণ রাখা উচিত, খোদার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হয় নি। এমনও হতে পারে, তোমার দোয়া ও কান্নাকাটি খোদা বাতিল করে দিলেন এবং তার দোয়া ও কান্নাকাটি না থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে গ্রহণ করে নিলেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, হৃদয় হলো আল্লাহ্ তা'লার সিন্দুক এবং এর চাবি তাঁর কাছেই থাকে। কার হৃদয়ে কী আছে কে বলতে পারে? তাই অযথা নিজেকে পাপের দিকে ঠেলে দিয়ে কী লাভ?

হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি অনেক পাপী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাকে বলবেন, আমার নিকটে আসো। এমনকি তিনি তার এবং অন্যান্যদের মাঝে নিজের হাত দিয়ে

আড়াল তৈরি করবেন। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি অমুক গুনাহ করেছ, অমুক পাপ করেছ? তিনি কেবল ছোটো ছোটো পাপের কথাগুলো স্মরণ করাবেন। সে ব্যক্তি বলবে, হ্যাঁ, এই পাপগুলো আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আজ আমি তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিলাম এবং প্রতিটি পাপের পরিবর্তে দশ গুণ পুণ্যের প্রতিদান দিয়ে দিলাম। এটি দেখে সেই বান্দা চিন্তা করবে, এই ছোটো ছোটো পাপ স্বীকার করার জন্য যদি দশ গুণ পুণ্য পাওয়া যায়, তবে বড়ো বড়ো পাপ স্বীকার করার জন্য আরো বেশি সওয়াব পাবো। এই চিন্তা করে সেই বান্দা তার বড়ো বড়ো গুনাহ গণনা করে বলবে, হে আল্লাহ্! আমি এই পাপগুলোও করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'লা তার কথা শুনে হাসবেন এবং বলবেন, দেখো! আমার বান্দা আমার অনুগ্রহ দেখে এতই সাহসী হয়ে গেছে যে, নিজেই নিজের পাপ স্বীকার করছে। অতঃপর তিনি তাকে আদেশ দেবেন, যাও! বেহেশতের আটটি দরজার মধ্যে যেটা ইচ্ছা সেটা দিয়ে তুমি প্রবেশ করো। (আল-বদর, ৯ মার্চ ১৯০৬; মলফুযাত, খণ্ড: ০৮, পৃ. ৪১৭)

অতএব এটিই হলো আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ। তাই বিনা কারণে কাউকে দোষারোপ করার অধিকার আমাদের নেই। আল্লাহ্ তা'লা কার সাথে কেমন আচরণ করবেন কিংবা কার হৃদয়ে কী আছে তা কে বলতে পারে? এ কারণে পরনিন্দা ও পরচর্চা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা উচিত।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "কিছু পাপ এত সূক্ষ্ম, মানুষ বুঝতেই পারে না কখন সে তা করছে। যৌবন পেরিয়ে একসময় বৃদ্ধ হয়ে যায়, তবুও বুঝতে পারে না যে, সে গুনাহ করছে। উদাহরণস্বরূপ, পরনিন্দা করার অভ্যাস (অভিযোগ-অনুযোগ করার অভ্যাস)। এমন লোকেরা এটিকে অনেক ছোটো এবং তুচ্ছ বিষয় মনে করে অথচ কুরআন করীম এটিকে অনেক মন্দ একটি বিষয় আখ্যা দিয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **আ ইউহিব্বু আহাদুকুম আইইয়া'কুলা লাহমা আখিহি মাইতা।** খোদা তা'লা এমন কথায় ও কাজে অনেক অসন্তুষ্ট হন যার ফলে তার ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এক ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলে বেড়ানো যার ফলে ভাইয়ের অজ্ঞতা বা জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকাশ পায় কিংবা তার অভ্যাস সম্পর্কে (এমন কথা) বলে বেড়ায় যার ফলে তার অজান্তে তার সম্মানহানি হয় বা শত্রুতা সৃষ্টি হয়– এ সবই অত্যন্ত খারাপ কাজ। [আল-হাকাম, খণ্ড: ১০, সংখ্যা: ২২, পৃ. ৩, ২৪ জুন ১৯০৬; তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খণ্ড: ০৪, পৃ. ২১৮-২১৯]

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের জামা'তের সদস্যদের উচিত তারা যেন কোনো ভাইয়ের দোষত্রুটি দেখে তার জন্য দোয়া করে। কিন্তু তারা যদি দোয়া না করে এবং সেগুলো বেশি করে প্রচার করতে থাকে তাহলে তারা পাপে লিপ্ত হচ্ছে। এমন কোনো দোষত্রুটি আছে কি যা দূর করা যায় না? এ কারণে সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে অপর ভাইয়ের সাহায্য করা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, এক সুফির দুইজন মুরিদ ছিল। একজন মদ পান করে অজ্ঞান হয়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল। অপরজন সুফির নিকট অভিযোগ করল। সুফি উত্তরে বললেন, তুমি দেখি একটা আস্ত বেয়াদব। তাকে সেখান থেকে তুলে না এনে অভিযোগ করছ?

তিনি (আ.) বলেন, সুফির একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, তুমি নিজের ভাইয়ের গীবত কেন করলে?

মহানবী (সা.)-এর নিকট গীবতের সংজ্ঞা জানতে চাইলে তিনি (সা.) বলেন, কারো সম্পর্কে এমন কোনো সত্য কথা তার অনুপস্থিতিতে বলা যা শুনলে তার খারাপ লাগে। অর্থাৎ কারো সম্পর্কে কোনো সঠিক কথাও যদি তার অবর্তমানে বলা হয় যেটি জানতে পারলে সেই ব্যক্তির খারাপ লাগবে, তা-ই গীবত। আর সেই দোষ বা দুর্বলতা যদি তার মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও তুমি তা প্রচার করে বেড়াও তবে তা অপবাদ, সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তার বিরুদ্ধে আপত্তি করার নামান্তর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

এখানে গীবত করাকে নিজের ভাইয়ের মাংস খাবার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে এটিও প্রমাণ হয় যে, ঐশী জামা'তেও কুৎসা রটনাকারী অবশ্যই থাকবে এবং তা যদি না হয় তাহলে এই আয়াত অর্থহীন হয়ে পড়ে (এ কারণে নসীহত করারও প্রয়োজন রয়েছে)। মুমিনরা যদি এতটাই সাবধানতা অবলম্বন করত কিংবা তার দ্বারা যদি কোনো পাপ সংঘটিত না-ই হতো তাহলে এমন আয়াতের কিবা প্রয়োজন ছিল? কিছু মানুষ দুর্বলচিত্তের হয়, যেমনটি কোনো কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ আধ্যাত্মিকভাবে শক্তি অর্জন করে ফেলে। **অতএব যার মাঝে দুর্বলতা দেখতে পাবে, তাকে গোপনে পরামর্শ দাও। সে যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে তার জন্য দোয়া করো। আর এ দুটি পদ্ধতিতেও যদি কাজ না হয় তাহলে এটিকে নিয়তির ওপর ছেড়ে দাও। খোদা তা'লা যেহেতু সহ্য করছেন, তোমার আগবাড়িয়ে জোশের সাথে তা প্রকাশ করা উচিত নয়। এমনও তো হতে পারে, সে একসময় শুধরে যাবে।** ....তড়িঘড়ি এবং ত্বরাপরায়ণ হয়ে কাউকে পরিত্যাগ করা বা কারো বিষয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া আমাদের কাজ নয়। কারো সন্তান যদি বিপথে চলে যায় তবে তাকে সংশোধন করার সম্পূর্ণ চেষ্টা তারা অবশ্যই করে। একইভাবে নিজের কোনো ভাইকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়, বরং তার সংশোধনের জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। কুরআন করীম কখনো এ শিক্ষা দেয় না যে, কারো কোনো দোষ দেখলে তা প্রচার করো এবং অন্যদেরকে বলে বেড়াও। বরং এটি বলে, **তাওয়াসাও বিস্ সাবরি ওয়া তাওয়াসাও বিল মারহামাহ্** (আল-বালাদ: ১৮)। অর্থাৎ সে ধৈর্য এবং অনুগ্রহের সাথে নসীহত করে থাকে। মারহামাহ্ শব্দের অর্থই হলো, অন্যের দোষ দেখে যেন তাকে নসীহত করা হয় এবং একই সাথে তার জন্য দোয়াও করা হয়। দোয়ার মাঝে অনেক প্রভাব বিদ্যমান। সেই ব্যক্তি বড়োই হতভাগা যে কিনা কারো দোষের কথা একশ বার বর্ণনা করে অথচ তার জন্য একবারও দোয়া করে না। কারো দোষ তখনই লোকসম্মুখে বলা যায় যখন তুমি তার জন্য কমপক্ষে চল্লিশ দিন কান্নাকাটি করে দোয়া করবে। শেখ সাদী বলেছেন–

خدا داند و پوشد همسایہ نداند و خروشد

অর্থ: খোদা তা'লা তো মানুষের দোষত্রুটি জেনেও তা ঢেকে রাখেন, কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা তা জানতে না পারলেও ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে।

আল্লাহ্ তা'লার একটি গুণবাচক নাম হলো, সাত্তার। **তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ্** (অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও)-এই আয়াত অনুযায়ী তোমাদের চলা উচিত। আমি এটি বলছি না যে, দোষত্রুটির সমর্থন করো। বরং আমি বলি, তোমরা সেগুলোর প্রচার এবং পরনিন্দা কোরো না, কেননা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র গ্রন্থে বলেছেন, এগুলোর প্রচার ও গীবত করা অবশ্যই গুনাহর কাজ। শেখ সাদী (রহ.)-এর দুইজন শিষ্য ছিল। এদের মধ্যে একজন সত্য মা'রেফত ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করত এবং অপরজন তা দেখে হিংসা করত। অবশেষে একদিন সেই প্রথম ব্যক্তি শেখ সাদী (রহ.)-কে বলল, আমি যখনই কিছু বর্ণনা করি তখন অপরজন জ্বলে-পুড়ে যায় এবং আমাকে হিংসা করে। উত্তরে শেখ বললেন, একজন হিংসা করে দোযখের পথ অবলম্বন করল আর তুমি পরনিন্দা করে তাকে অনুসরণ করলে। মোটকথা, যতক্ষণ পর্যন্ত অনুগ্রহ, দোয়া, দোষ ঢেকে রাখা এবং একে অপরের জন্য মায়ামমতা না জন্মাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জামা'ত অগ্রসর হতে পারবে না।" (আল-বদর, ৮ জুলাই ১৯০৪; মলফুযাত, খণ্ড: ০৪, পৃ. ৬০-৬১)

তিনি (আ.) বলেন, "নিজ ভাইবোনের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী যতক্ষণ পর্যন্ত তার এই ঘৃণিত কর্মের জন্য তওবা না করবে এবং বাজে বৈঠক পরিত্যাগ না করবে, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৯, পৃ. ১৯)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "বয়আতের মূল উদ্দেশ্য, যা কিনা খোদাভক্তি এবং তাকওয়া, তার সাথে জাগতিক উদ্দেশ্যের মিশ্রণ ঘটিও না। নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং তওবা ও ইস্তিগফারে রত থাকো। মানবজাতির অধিকার সংরক্ষণ করো এবং কাউকে দুঃখকষ্ট দিও না। সততা এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করো, তবেই আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রকার কৃপা বর্ষণ করবেন। নারীদেরকেও উপদেশ দাও, যেন তারা বাড়িতে নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠা করে আর তাদেরকে পরনিন্দা ও গীবত করার অভ্যাস থেকে বিরত রাখো। তাদেরকে পবিত্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দান করো। আমার কাজ কেবল বোঝানো। তোমাদের কাজ হলো তদনুযায়ী আমল করা।" (আল-হাকাম, ১৭ অক্টোবর ১৯০৩; মলফুযাত, খণ্ড: ০৬, পৃ. ১৪৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই নসীহতের ওপর আমল করার সামর্থ্য দান করুন। আর গীবত থেকে সবাইকে রক্ষা করুন। এটি এমন একটি ব্যাধি যা অনেক সময় অজান্তে মানুষকে আক্রান্ত করে। সর্বোপরি যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, অনেক বেশি ইস্তিগফার করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য ক্ষমার সুযোগ ও উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন।

কাদিয়ানে আজ থেকে জলসা আরম্ভ হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। এটি ১১২তম জলসা

সালানা। এই জলসার জন্যও আপনারা দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা সার্বিক সফলতার মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটান। পরশুদিন এটি শেষ হবে। সকল অর্থে এটি যেন কল্যাণকর হয় সেজন্যও দোয়া করবেন।

Khutbat-e-Masroor

Volume: 1

(Compilation of Friday Sermons of 2003 A. D.)

Translated into Bangla
from it's original Urdu

Delivered by
Hazrat Mirza Masroor Ahmad aba
Khalifatul Masih V